উৎসর্গ

আলো ... অন্ধকার সব বহু কাল চেনা,
সেই সব গোপন বিষাদ পার হয়ে যাই—
তবু এই জীবনে কী যেন বাকি থেকে গেল!

সম্পাদকের কথা

যা দেবি সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

ছোট থেকেই আমি ঈশ্বর বিশ্বাসী। খুব দরিদ্র পরিবারে জন্ম ও বেড়ে ওঠাই হয়ত এই মানসিকতার জন্য দায়ী। বড় হতে গিয়ে নানাভাবে যখন, যেখানে, যেভাবেই বাধা পেয়েছি, আমার অসহায় শক্তিময়ী, জন্মদায়িনীর মুখের বেদবাক্য শুনেছি, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ্, ঠিক এগিয়ে যাবি। তখন থেকেই শুরু।

একবার সরস্বতী পুজোর সময় আমাদের দশঘর ভাড়াবাড়ির প্রায় সব ঘরে পুজো হতে দেখে আমাদের ভাইবোনদেরও বায়না, পুজো করবো। তখন আমি ক্লাশ থ্রি। মা অনেক কষ্টে একটা ছোট ঠাকুর আর কিছু ফল-ফুল এনে দিয়েছিল। এক চিলতে ঘরে আমাদের আবেগ, আনন্দ আর ছেলেমানুষি অসাবধানতায় ঠাকুরটা যখন উল্টে গিয়ে দু-ভাগ হলো, তখন আমাদের সে কী কান্না, কে কাকে থামায়। মা-ই তখন ঠাকুরটা জুড়ে দিয়ে রামকৃষ্ণদেবের দক্ষিণেশ্বরের কালীমায়ের প্রতিষ্ঠার গল্প শুনিয়ে পুজোটা শেষ করেছিল। আর বলেছিল—কোনো কিছু ভেঙে যাওয়া মানেই শেষ হয়ে যাওয়া নয়, বরং আর একভাবে আর এক নতুনের শুরু। ব্যস, সেই থেকেই কি ব্যক্তিজীবন, কি কর্মজীবন, আমাকে আর কোনোদিন পেছন ফিরে দেখতে হয়নি। আজও মনে হচ্ছে মায়ের সেই প্রেরণা আর আশীর্বাদেই পারলাম 'ভালোবাসার অমল দিগন্ত'-র পূজা সংখ্যাটি সাজিয়ে তুলতে আর এক শক্তিময়ী জগজ্জননী দশভূজার আগমনের প্রাক্ মুহূর্তে।

আসলে দুর্গোৎসব তো শুধু কৃত্রিম আলোর রোশনাই নয়। সকল রকম বাধা-বিঘ্ন কাটিয়ে অ-সুরকে দমন করে সুরের আলোয় চারিদিক ভরিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকারও। সেই অঙ্গীকারেই এই শুভ মুহূর্তে প্রকাশ পেল দেশ-বিদেশের বিখ্যাত কবি-লেখক-লেখিকাদের, পাশাপাশি নবীন ও সম্ভাবনাময় কবি, লেখক-লেখিকাদের লেখা নিয়ে সংকলিত আন্তর্জাতিক সাহিত্য সংকলন ভালোবাসার অমল দিগন্ত'র পূজা সংখ্যাটি। আশা করি পাঠক-পাঠিকাদের ভালো লাগবে।

যাঁরা এই সংকলনটি প্রকাশে সমস্তরকম সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম। আর এই কাজের শিক্ষাগুরু যিনি আমাকে অন্তরীক্ষে, অশরীরে আশীর্বাদ করছেন সেই অমল মুখোপাধ্যায়ের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা—
তাঁরই কথায় শেষ শব্দটি লিখি—'সবাই ভালো থাকুন, সবাইকে ভালো রাখুন।'

সূচিপত্র—১

সূচিপত্র—২

এই বাংলার গুচ্ছ কবিতা

এই বাংলার গল্প

সূচিপত্র—৩

এই
বাংলার
কবিতা

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

প্রিয়তমাসু

তুমি বলেছিলে, ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই।
অথচ ক্ষমাই আছে।
প্রসন্ন হাতে কে ঢালে জীবন শীতের শীর্ণ গাছে;
অন্তরে তার কোনো ক্ষোভ জমা নেই।

তুমি বলেছিলে, তমিস্রা জয়ী হবে।
তমিস্রা জয়ী হল না।
দিনের দেবতা ছিন্ন করেছে অমারাত্রির ছলনা;
ভরেছে হৃদয় শিশিরের সৌরভে।

তুমি বলেছিলে, বিচ্ছেদই শেষ কথা।
শেষ কথা কেউ জানে?
কথা যে ছড়িয়ে আছে হৃদয়ের সব গানে, সবখানে;
তারও পরে আছে বাঙ্ময় নীরবতা।

এবং তুষারমৌলি পাহাড়ে কুয়াশা গিয়েছে টুটে,
এবং নীলাভ রৌদ্রকিরণে ঝরে প্রশান্ত ক্ষমা,
এবং পৃথিবী রৌদ্রকে ধরে প্রসন্ন করপুটে।
দ্যাখো, কোনোখানে কোনো বিচ্ছেদ নেই;
আছে অনন্ত মিলনে অমেয় আনন্দ, প্রিয়তমা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পাখির চোখে দেখা

১

একটা ঝর্নার মতন দুঃখ, অথবা ঝর্নাটাই স্মৃতিকাতর
সেখানে স্নান করি, দুঃখ গায়ে মাখি,
পায়ের নীচে থাকা ঝরা পাথর...

২

সাড়ে তিন হাত জীবন,
তার মধ্যে চোদ্দোশো মাইল
অন্ধকার...

৩

কেন জন্মালে,
যদি চিনলে না
ভালবাসা?

৪

চকিত হরিণী প্রেক্ষণা
হরিণী কখনও জানলো না...

৫

আলো নিয়ে বাড়াবাড়ি বিশ্ব চরাচরে
মানুষের পরম্পরা অন্ধকার ঘরে...

৬

ঘরখানি বড় শূন্য
শূন্যতার ছবিখানি দোলে...

৭

আমার যখন উনিশ,
তুমি কোথায় ছিলে,
নীরা?

৮

এখানে নীরা ছিল, এখানে কেউ নেই
এখনও এ পাথরে
রয়েছে উষ্ণতা...

৯

সংকেতময় বৃষ্টি এলো,

    এবার দরজা খুলবে না?

১০

তোমার চিঠির মধ্যে

    সহসা ঝড়ের শব্দ ওঠে...

১১

যথাসর্বস্বেরও পরে

    থেকে যায় একটা টুকরো...

১২

অকূলের কিনারায়

    শুধু বুড়ো আঙুলের ছোঁয়া...

১৩

মৃত্যু থমকে গেছে ছন্দের কাছে এসে

ওঠো, কন্যা,

    ওঠো!

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

স্পর্শ

যখন স্পর্শই রাজা, তখন তো কথা বলে লাভ নেই কোনো!
শিশুর ঠোঁট যখন ভাষা হয়ে ওঠে না, সে তখন ছুঁয়েই জানাতে চায়
প্রয়োজন তার, মানুষের আদি মল্ল ও স্পর্শ
তাতে অবশ্যই থাকে নর-রমণীর মাংস মাখানো,
মূক যা ইঙ্গিতে বোঝাতে চায়, স্পর্শেও তা বোঝানো যায়
আর মৌখিক নীরবতা তাকে ইঙ্গিতের সৌন্দর্যে সাজায়!

তবে এসো, কিছুদিন চুপ করে দেখি
এসো কিছুকাল, একটাও কথা না বলে
বেঁচে থাকতে পারি কি না বুঝি, সন্ধ্যার আঁচলে
যে-সব উদ্বিগ্ন তারা আকাশকেও ভাষাহীন করে, দেখি
আমরা তা পারি কিনা গড়ে নিতে কবিতাক্ষরে!
শুধু তার জন্যই স্পর্শ চাই, কলমে আঙুলস্পর্শ
কাগজে কালির স্পর্শ
আর
মৃত্যুনীরব হয়ে যাবার আগেই
হাতে তুলে দেওয়া ভাষাহীন স্পর্শের সংসার।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

আচ্ছাদন

প্রত্যেকবার
বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার সময়
বাড়িটা আমার

মুড়ে রেখে যাই
এক-একরকম লিখে রাখবার
মালমশলায়।

আগের বছরে
ম্যাপলিথো দিয়ে ছাতটাকে আমি
আপ্লুত করে

দূরে চলে গেছি—
ফিরে এসে দেখি তাতে লেখা আছে
কিছু ইংরেজি

এবং বাকিটা
বৃষ্টির হাতে প্রাকৃত ভাষায়
কিছু মুসাবিদা;

এবার আমার
যাবার বেলায় ছাতটাকে শুধু
শেলেট দিয়েই

ঢেকে দিয়ে যাই,
পাখিরা লিখবে আর্জা-তর্জা,
হাফ-আখড়াই

এবং আমার
ভাগ্যবিধাতা যোগ করে দেবে
কিছু সমাচার

আর আলপনা,
তবে কিনা আমি সেসব দেখতে
আর ফিরব না ...

আলোক সরকার

অচেনা মানুষ

অচেনা একটা বাড়ির সামনে
দাঁড়িয়ে পড়েছে।

এটা কার বাড়ি?
এটা খুব চেনা মানুষেব বাড়ি।

ফিরে যেতে
পা জড়িয়ে আসছে।

কাল যখন আসবে
চেনা মানুষের জন্যে
কিছু খাবার নিয়ে আসবে।
কিছু জল, তালপাতার পাখা।

আমাদের বাড়িতে
খুব জ্যোৎস্না নামে, জানো।
জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে
মাঝে মাঝে
সারা মেঝেটা ভিজিয়ে দেয়।

তরুণ সান্যাল

বসত

নাছদুয়ারে কাজী সাহেব
পাছ দুয়ারে দাশ
দুজন মিতে রয় নিভৃতে
দু-ভাঁজ তাদের তাস।

এর তাসটি হরতনি আর
ওরটি স্পেডের রানি
এজন চাইছে দেহতত্ত্ব
উনি বাখরখানি।

এর হাতটি উসুম উসুম
ওর পাঞ্জা সাদা
দুজনে বসলেন দুইটি কাঁধে
ফেরেস্তা দুই দাদা।

মাথায় তখন ফেনা ওড়াচ্ছে
চলন ইস্টিমার
মোহরজারি সাগর দাঁড়ির
করতেছে ঘরবার।

এ তিন যখন ঘাড়ে চড়লেন
শরীর আঁকু পাঁকুড়
বুকের মধ্যে পাকা আসনে
বসেন রবিঠাকুর।

শঙ্খ ঘোষ

শূন্যের ভিতরে ঢেউ

বলিনি কখনো?
আমি তো ভেবেছি বলা হয়ে গেছে কবে।

এভাবে নিথর এসে দাঁড়ানো তোমার সামনে
সেই এক বলা

কেননা নীরব এই শরীরের চেয়ে আরো বড়ো
কোনো ভাষা নেই

কেননা শরীর তার দেহহীন উত্থানে জেগে
যতদূর মুছে নিতে জানে

দীর্ঘ চরাচর,
তার চেয়ে আর কোনো দীর্ঘতর যবনিকা নেই

কেননা পড়ন্ত ফুল, চিতারতরূপালি ছাই, ধাবমান শেষ ট্রাম
সকলেই চেয়েছে আশ্রয়

সেকথা বলিনি? তবে কী ভাবে তাকাল এতদিন
জলের কিনারে নিচু জবা?

শূন্যতাই জানো শুধু? শূন্যের ভিতর এত ঢেউ আছে
সেকথা জানো না?

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

তিন গজ জমি

জমিদার কৃষককে বললেন, তুমি এক দৌড়ে
যতদূর যাবে, ততখানি জমি তোমাকে চাষ করতে দেব।
তবে সন্ধের আগে ফিরতে হবে।

কৃষক লোভে পড়ে দৌড়োতে থাকে।

যখন ক্লান্ত হয়ে পেছন ফিরে তাকায় দেখে,
অনেকখানি জমি সে পেয়ে গেছে।
কিন্তু তাকে তো সন্ধের আগে ফিরতে হবে।

ফেরার সময় তার আর দম নেই। কোনো রকমে
জমিদারের কাছে পৌঁছে সে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে।
জমিদার বলেন, এর দরকার ছিল
তিন গজ জায়গা। লোভে পড়ে প্রাণটা খোয়ালো।

টলস্টয়ের গল্প। পরবর্তী কালে শেকভ মন্তব্য করেছেন।

কে বলে মানুষের তিন গজ জমিই দরকার।
মানুষ চায় তিন গজ জমি নয়, বড়ো অট্টালিকাও নয়,
গোটা পৃথিবীটা।
পাহাড় অরণ্য সমুদ্রশুদ্ধ সমস্ত পৃথিবী, যেখানে তার
উৎফুল্ল মন মুক্তির আনন্দে বিচরণ করতে পারে।

এর পরেও অনেক বছর পার হয়ে গেছে। গোটা পৃথিবী
পাওয়ার জন্য মানুষের দৌড় আমি দেখছি,
আর ভাবছি, কে ঠিক? টলস্টয় না শেকভ?
কে ভুল? শেকভ না টলস্টয়?

নবনীতা দেব সেন

জলের অনেক নীচে

জলের অনেক নীচে খেলা করি, শর্তহীন, একা
সেইখানে পৌঁছবে না খাজনালোভী সমাজ পেয়াদা
জলের অনেক নীচে সৌজন্যের দুঃখ সুখ নেই।

জলের অনেক নীচে দিতে পারি নিঃসঙ্গ সাঁতার
আশ্চর্য বর্ণিল ফুলে নুয়ে পড়ে জলজ উদ্ভিদ
সাবলীল লুকোচুরি মাছেদের খিড়কি বাগানে।

উপরে এসেছে ভেসে বাষ্পতনু দু-এক বুদ্‌বুদ্‌
এই সব বুদ্‌বুদেরা স্বল্প আয়ু। ফেটে ফুটে গেলে
জলের উপরে কেউ কখনও জানে না কোনোদিন
শর্তহীন, সঙ্গহীন, অন্তরীণ ভালোবাসা-খেলা।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

পাখি

উঠেছিল পার্ক স্ট্রিটে
জীবন্ত একজোড়া।
ঠিক পিছনের সিটে,
দেখি : ডানামেলা, ওড়া।

একজন স্টেপস্-কাট,
কামিজে নকশাদার;
অন্যটি ফিটফাট
গেঞ্জি-ডেনিমে তার।

নড়েচড়ে পাখিদুটি,
খিলখিল, কলকল,
কথা হাসি খুনসুটি—
এই রোদ, ওই জল।

দুপুরের মিনিবাস
লোক নেই দমঠাসা।
সামনে খোলা আকাশ—
আলতো ডানায় ভাসা!

নেমে গেল হাজরায়,
উড়ে গেল দুটি পাখি।
যতদূর দেখা যায়—
রাস্তায় চোখ রাখি।

ছিল, নেই; কোনোখানে।
ভিড়ে মিশে গেছে ওরা।
কল্লোল-তোলা কানে
এখনও বাজে সমানে
অঝোর পাগলাঝোরা।।

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

প্রাতভ্রমণ

প্রাতভ্রমণের কাজ সারতে-সারতে
রাতের দরজা খুঁজে পেতে পেতে
কাউকে ভ্রমণসঙ্গীর প্রস্তাব নিয়ে
এঘর ওঘর ঘুরতে-ঘুরতে...
সম্পূর্ণ নিঃশেষিত সেই পরম ঊষাকাল!

প্রাতভ্রমণের কাজেরা আমাকে ছেড়ে
যে যার আস্তানায়...
সেই বিলম্বিত, ঘুমভাঙা ভুবন মধ্যে
আমি তখন নির্জন একা...
চারপাশের শিশুরোদের গায়ে তাপ বাড়ছে
যারা দিনের কাজে খেয়া পার হবে
তারা সকলেই পারঘাটায়...
এ-পাড়ে ও-পাড়ে সাতহাটের হাটুরে
রাতজাগা এক প্রজাতির দুটো পাখি ছাড়া
সকলেই ঘরমুখো...
এমন সকাল নিয়ে বড়ো বিব্রত একা আমি!

পরের সকালে ভ্রমণের জন্যে
আমি পুনরায় প্রস্তুত হতে থাকি!

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

খেলা

হাঁড়িকুড়ি, প্লাস্টিকের বালতি, বোঁচকা
নিয়ে বসে থাকা আর উত্তর দক্ষিণে
তাকানো কখন বাস আসবে—
এই ছবি শালের জঙ্গলে যেতে গিয়েও
চোখে পড়বে, গ্রাম এখনো এরকমই, যদিও
মাথার ওপর দিয়ে হাইটেনশন তার,
দুয়েকটা সাঁকো হয়েছে ব্রিজ, টিউকলের কাছে
বাচ্চারা খেলছে, অনেকে স্কুল যাচ্ছে,
তবু এর মধ্যেও যে কেউ কেউ
পেট ভরে খেতে পায় না
সেটা সকলেই জানে কিন্তু পঞ্চায়েতের রেকর্ডে
অন্যরকম লেখা হয় ইচ্ছেমত।

আসলে গরিব মানুষদের নিয়েই
যত খেলা, কত রকমের ...

পঙ্কজ সাহা

পুজো স্পেশাল

সময় বন্ধনে ওই
জলমেঘ সাঁতরে গেল আকাশ,
তোমার শাড়ির আঁচল ভুলে
ছাপিয়ে এল পুজোর অবকাশ।

টিকিট কেটে দাঁড়িয়ে আছি
ঘণ্টা বাজে স্টেশনে,
পলাশপুর লোকাল যাবে
অবুঝ সেই মহুয়া বনে।

ভুল টিকিট ভুল টিকিট
তোমার নাকি মন খারাপ,
গার্ড বলছে দ্বিধার পায়ে
চলতে বারণ জসিডি আপ,
ডাউন ট্রেনে চেন টানল
জানলা খোলা তোমার মুখ,
বাঙ্ক থেকে খসে পড়ল
পুজো সংখ্যার দুঃখ সুখ।

অমৃত মাইতি

উপনদী

এখনো কী তুমি সেই অবাধ কুমারী
নদী জলে সাঁতারকাটা দুপুর কুহেলী
এখনো কি তুমি হতে পারো
প্রেম প্রকৃতি ভালোবাসার অনুরাগী
এখনো কী হতে পারো সেই রোমান্টিক খুনী
কতদিন বেঁচে থাকবো আর
এখন যে এসে গেল
সেই ছায়াময় পটভূমি
জীবনে এর চেয়ে নেই কোন বিশ্বস্ত উপনদী।।

তমালিকা পণ্ডাশেঠ

চিঠি, দূরের তারাকে

এখনো গভীর কষ্টে জলে ডোবা মানুষের মতো ছটফট করি—
আর পদে পদে তোমার দোষ ধরি।
তুমি কেন বিনা শ্বাসে—
আলোর প্রতি অবিশ্বাসে বাঁচতে শেখালে না?
এমন বসন্ত দিনে পলাশে-বিলাসে নিমজ্জিত অখিল ভুবন
আমার রিক্ত দুপুর জুড়ে কান্নার মতো ঝরে যায় দেবদারু বন।
নীল বিষ বিষণ্ণতা খেলা করে শিরা উপশিরা জুড়ে।
এত বেশি নীল এই নগ্ন-আকাশ
চাঁদ নয় সূর্য নয় কেবল শূন্যতা ওড়ে
শুধু ওড়ে
পীড়িত আত্মার প্রাচীরে।

মানুষ প্রতিদিন বিষ্ণু দে'র অগম্য কবিতা, অমিল
কী করে—কেন করে—শেষ হিসেবেও চূড়ান্ত গরমিল।
ভালবাসা শর্তাধীন হলে বর্জ্য পদার্থ হয়ে যায়
ভাবনার শান্তি ছিঁড়ে ফেলে মেধাহীন কথা বলা ভালবাসা নয়।
আমার একান্ত ভাবনায় অনিবার্য ফিরে আসে, যে বারবার
ভালবাসা বাসা বাঁধে সেই শুদ্ধ নীরবতায়।
তোমার সমস্ত বীজ বোনা আছে আমার শরীরে
চুলের সুগন্ধসার মিশে আছে আত্মার গভীরে।

তুমি ছিলে —দিন ছিল ছায়াময় পথ মসৃণ
তুমিই আমার রঙিন খামে ভ্যালেন্টাইন দিন।

শ্যামলকান্তি দাশ

পুজো আসছে

কোত্থেকে আসে ফুলের বাগানে
এত সুন্দর গন্ধ,
আকাশের গায় কোত্থেকে আসে
এত নীল-সাদা ছন্দ?
গাছ ভরে আছে পাতায় পাতায়
যতদূর যায় দৃষ্টি,
দেখি অরূপের অপরূপ সাজ
সবুজ শ্যামল সৃষ্টি!
কোত্থেকে আসে সোনাঝরা রোদ
রূপোঝকঝকে রাত্রি,
তিরতিরে নদী বাতাসে উধাও
নৌকোয় চাঁদ যাত্রী!
শূন্যে রঙিন পাখি-পক্ষীরা
ছবি হয়ে যেন ভাসছে,
দেরি নেই আর, দেরি নেই আর,
দেরি নেই, পুজো আসছে!

কল্যাণ মৈত্র

দাহ

কাল রাতে অজন্তা চক্রবর্তীর মৃত্যু হয়েছে। ভোরের আলোয় তার দাহকার্য শেষ হয়। অজন্তা এত ভালোবাসতে জানত যে, সেই দাহকার্যের সময়ও বাতাসে কেবল ভালোবাসার গন্ধ বেরিয়ে আসছিল। আমার-ওর সব চেনা গন্ধ। একরাশ কবিতা-লেখার কাগজ দিয়ে ওকে আমি পুড়িয়েছি—ধোঁয়ার মধ্যে বারবার অজন্তার মুখ ভেসে উঠছিল—সে যেন ডুবে যাচ্ছে অনন্ত মৃত্যুর মধ্যে ...অজন্তা চলে গেছে আগুনের বুকে। আগুনের লেলিহান শিখা তাকে টেনে নিচ্ছে যেমন করে আমি তাকে টেনে নিতাম এই বুকে...আমাকে সামনে রেখে অজন্তা এবার মেনে নিচ্ছে আগুন। আমাকে সামনে রেখে অজন্তা পুড়ছে শুধু ছাই হবে বলে—

গতকাল রাতে অজন্তা চক্রবর্তীর মৃত্যু হয়েছে—তার বয়স হয়নি—মৃত্যুকালে সে রেখে গেছে কেবল আমাকেই...

সিদ্ধার্থ সিংহ

আমি ও আমার খোগু ৬

লাল তিলকধারীকে আমরা লালু বলে ডাকি
নীল তিলকধারীকে নিলু
আর কালো তিলক যার কপালে
সে আমাদের কাছে কালু।

এই কালু, সেই ছোট্টবেলা থেকেই
সবচেয়ে বেশি আদর খায় আমার।
আমি যখন লিখতে বসি
ও আমার পায়ের কাছে বসে আঙুল চাটে।
স্নান করিয়ে ওকে ছেড়ে দিলেও
অন্যদের মতো কক্ষনো আমার সামনে
গা ঝাড়া দিয়ে আমাকে ভিজিয়ে দেয় না।
দুপুরে যখন বিশ্রাম করি
প্রথমে চেয়ারে, তার পরে লাফ মেরে খাটে উঠে আসে
চুপটি করে আমার পাশে বসে থাকে
অন্য খরগোশগুলো উঠতে চাইলেই ও তেড়ে যায়।

ওর ভাইবোনদের থেকে তো বটেই
ওর মা, এমনকি, ওর বাবা, খোগুর চেয়েও
আমি ওকে একটু বেশিই ভালবাসি।

আমার দাদু মাথায় করে অলিতে-গলিতে
চিটে গুড় ফেরি করতেন
তার কাছে নাকি এক নয়াই ছিল অনেক
সেই দাদু পাঁচ পয়সা দিয়ে
আমাকে আইসক্রিম কিনে দিয়েছিলেন দেখে
বাবা বলেছিলেন, নাতির বেলায় এত!
দাদু বলেছিলেন—আসলের চেয়ে সুদের দাম বেশি।

যদি দেখি, মনমরা হয়ে ঘরের এক কোণে বসে আছে ও
আমি নির্ঘাৎ লিখতে লিখতে মাঝপথে বন্ধ করে দেবো
কবিতার খাতা
বন্ধ করে দেবো ঝর্না কলম...

কুমকুম বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই নদী

সব নদী পেরোনো যায় না
জল যতই কম থাক তাতে।
স্রোতহীন,
স্তিমিত বাঁকা ঢেউ
বহতা প্লাবনে যে কখনো
কাউকেও ভাসাতে পারেনি।

বরং পরম গৃহস্থ হয়ে,
হাঁড়িকুঁড়ি সামলে চলে।
মানসম্ভ্রম
দীনের যা একমাত্র ভূষণ।

সেই নদী,
মনে হয় অনায়াসে অতিক্রমনীয়
জলে নেমে বোঝা যায়
কত তীব্র হতে পারে
চোরা স্রোত

জলজ গুল্মে কি ভয়ানক বাধা
হাঁটুজলে আঁকপাঁকু
এক পা-ও এগোনো চলে না।

জ্যোতির্ময় দাশ

শান্তিনিকেতন : সার্ধশতবর্ষে

সেদিন এক আশ্চর্য সকাল ছিল। ভুবনডাঙার
মাঠে স্বপ্নের মায়াবী পথে যেতে যেতে দেখি
তিনি অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছেন
ভোরের শিশিরের মতো প্রসন্নতায়—
একটি কালজয়ী কবিতার বেদনা থেকে
দায়মুক্ত হতে এতদিন আত্মমগ্ন ছিলেন তিনি
ধর্ম এবং জিরাফের আদিগন্ত ভূ-মণ্ডলে
অনিঃশেষ ব্যাপ্তির মহিমায়—
শুধু আমার পৃথিবী আর তৃষ্ণার্ত চরাচরে
অধরা ছিলেন তিনি অতীত
বেদনার অস্পষ্ট অনুভূতির মতো—

আজ বৃষ্টিস্নাত উত্তরায়ণের
প্রসন্ন স্নিগ্ধতায় দাঁড়িয়ে
উপলব্ধি করলাম-—
তিনি রয়েছেন দৃশ্যমান প্রকৃতি
এবং পরিশুদ্ধ কবিতার পরিচিত
সমস্ত নান্দনিক বিভাসে—বিভঙ্গে...

রাখাল বিশ্বাস

একটি জীবন

একটি জীবন বিস্মরণের
স্মৃতি মুছে যাওয়া গান,
একা ঢেউ ভাঙে প্রাণিত প্রহর
জ্যোৎস্নায় নির্মাণ।

ভালোবাসাময় চিঠিগুলি শুধু
জ্বলে ওঠে চরাচর,
প্রোথিত মায়ায় নদী ভেসে যায়
পড়ে থাকে নির্ভর।

আঁধারের কাছে ক্ষরণের ছায়া
অলীক লোভের ঋণ,
বকুল বকুল আগুনে পোড়ায়
সাঁকো ভাঙা মরা দিন।

আশিস মিশ্র

বেঁচে থাকা

তোমাকে রোদ্দুর জেনে নিক
তোমাকে রাত্রি কুরে খায়
তোমার চতুর্দিক জুড়ে
পলাশ হেসে যায়।

তোমাকে দুপুর কাছে ডাকে
ফুল দেয় বিরহ নিজে
তোমার দু'চোখ জুড়ে মেঘ
এবার যাবেই তুমি ভিজে।

তোমাকে জ্যোৎস্না দিয়েছে প্রেম
প্রেমের কতোরকম দিন
তোমার সে-সব নিয়ে বাঁচা
বেঁচে থাকা কী গভীর-গহীন।

চন্দ্রা মজুমদার

মৃত

সেদিন প্রেমের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ
মজবুত করে গড়া হয়নি
এক দমকা হাওয়ায়
টুকরো হয়ে গেল সব
উত্থানশক্তিহীন
সেই আবেগ
মিলিয়ে গেল বড় তাড়াতাড়ি

এবারে অন্য প্রস্তুতি—
দড়িদড়া নাটবল্টু ঠুকে
দাঁড় করিয়েছি এক মূর্তি
মনের মাঝে শক্ত বাঁধন
ভালবাসা পোষ মেনেছে ভেবে
বাঁধন খুলে দিলাম—
লুটিয়ে পড়ল এক প্রাণহীন শরীর।

কালিদাস ভদ্র

ধানফুলের রুমাল

ধানফুলের রুমাল নাড়ছে হাওয়া

লিপস্টিক রং বিকেল
খেলছে আলোর কাটাকুটি,
টোকা মাথায় একটা মেয়ে
আলের পথ ধরে
উদোম গায়ে
আসছে গুটি গুটি।

একলা মেয়ে
নাম জানি না
শ্যামলা, রোগা
বুকের পরে আছে ফুটে
ব্রম্মকমল দুটি ...

ধানফুলের রুমাল নাড়ছে হাওয়া
গোধূলির গাছে গাছে উসকে দিয়ে আগুন।

গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

এসো হে

ধেয়ে আসছে আগুন —
গিলে নিতে চায় বেবাক কিছু
রক্ত জবাকুসুমের শ্বেত রূপান্তর
আগুন ছিটিয়ে যায় চরাচরে;
কাঁপা কাঁপা দৃশ্যের ধরণীতল
ব্যস্ত জ্বলন্ত উত্তাপ উদ্গীরণে
ভয়াল তাপ তাড়িয়ে নিয়ে যায় —
পৃথিবীর আদিম জন্মলগ্নে
অ-সভ্যতার যুগে ...
উৎসারিত অদৃশ্য লাভা মরুৎ
নিঃশব্দে চিৎকার করে যায়,
'দাও ফিরে সে তপ্ত গ্রহ
নীলগ্রহ রাঙুক মঙ্গলের রঙে'

এদিকে বাতাসে উড়ছে
ঘর্মাক্ত আহ্বান,
এসো হে বৈশাখ এসো এসো —

আদিখ্যেতা।

গণেশ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রজয়ন্তী

আমি জ্যোৎস্নার কাছে চেয়ে নেব
একটি বলিষ্ঠ চাঁদ
চাঁদের কাছে চেয়ে নেব
উজ্জ্বল ঝরনার মতো জ্যোৎস্নাকে—

তারপর পৃথিবীর মানুষের কাছে
বিলিয়ে দেব সব
বলব
এই নাও, দ্বিধা দ্বন্দ্ব হিংসা জীর্ণতা ভুলে
হয়ে ওঠো পরিপূর্ণ আকাশ।

সেতুর উপরে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে রয়েছে
খন্দের ধরার স্বপ্ন বুকে নিয়ে
কিংবা মায়ের আঁচল থেকে যে ছেলেটি বাড়িয়েছে হাত
ভিক্ষা পেতে
তাদের সবাইকে আমি বুকে টেনে নেব
দেব যৌনতাহীন চুম্বন, দেব ভালবাসা
খিদে মেটানোর জন্য একথালা ভাত ...

আমি ভাতকে বলব
তুমি কখনও এদের ছেড়ে যেও না
এরা দুঃখী খুব, ক্ষুধার্ত, তাই তো কাঙাল এত ...

তারপর একদিন
তাদের হাতেও আমি তুলে দেব
বলিষ্ঠ জ্যোৎস্নামাখা চাঁদ
দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের
মায়াভরা দুটি চোখ।

ঈশিতা ভাদুড়ী

ভাষা-অক্ষর

শহীদের রক্তে
বাজে শঙ্খ, বাজে মঙ্গল-শব্দ

অধরোষ্ঠে জ্বলছে মাতৃমুখের আলো
শিমুল-পলাশ-বাংলা ভাষা

স্তবকে স্তবকে ভেসে যায় ভেলা
নিঃশ্বাস ও রক্তে কাঁথাস্টিচ
উনিশে আর একুশে

ভাষা-অক্ষর
তুমি-ই শেখালে 'মা' উচ্চারণ

অসীমকুমার বসু

বসন্তসঙ্গীত

আমি দেখছিলুম গানের সঙ্গে সঙ্গে
হাওয়ায় মিশে যাচ্ছে তোমার ভ্রূভঙ্গি ও লাবণ্য
তোমার চোখের রহস্য
অন্তরা পেরিয়েও ছুঁয়ে যাচ্ছে অপরূপ সুরসপ্তক,
ফলে এখন থমকে আছে বসন্তবাতাস।

কিছু দূরের পুষ্পিত গাছটি থেকে
যে মৃদু সুগন্ধটি ভেসে আসছিল
আমাকে অন্যমনস্ক দেখে
সেটিও থমকে আছে ঘরের সীমানা থেকে দূরে,
সুরের মোহপাশ আর তোমার গায়নভঙ্গি
গানটিকে বেঁধে রাখে
সাপুড়ের বাঁশির মতো অনন্ত মায়ায়।

অমিত কাশ্যপ

ঈশ্বরী

কম্পিউটার থেকে খসখস টিকিট বেরচ্ছে
ওপিডি থেকে লাফিয়ে নেমে আসছেন ঈশ্বরী
দিদি একটু দেখবেন, কোন দিকের টিকিট
—কি হয়েছে

সারারাত জ্যোৎস্নায় বনভোজন হয়েছিল
তারপর হাঁড়িয়া, তারপর সোহাগ
তারপর নাচ, তারপর খুন
তারপর দিদি, এলিয়ে মাটির মতো শুয়ে

নির্জন দরজার দিকে চোখ
আঙুল তুলে রেসের ঘোড়া থামিয়ে দিল
এত আলো, পাখা, চেয়ার-টেবিল বিশ্রাম নিচ্ছে
মাটির মতো শুয়ে মানুষটা

ঈশ্বরী দেখতে থাকলেন
উপাসনা মন্ত্রের মধ্যে উচাটন
জ্যোৎস্নার মধ্যে জাদুকরী প্রভাব
একটু একটু চোখ খুলতে থাকলেন মানুষটা

দেবাশিস প্রধান

এ জীবন থেকে অন্য জীবনে

এখানে তিনি ছিলেন। এখন দেখছি আপনাকে। ও পাশের ঘরে কি রকম ফর্সা, তুলতে আলুভাতে মাখা দিদি, আলো হয়ে পাখির মতো উড়তেন চুলের পেখম ছড়িয়ে...এঘর ওঘর বনে-বাদাড়ে। ঘুলঘুলি, সিঁড়ি, কুঁয়োতলা থেকে বাথরুম, ট্যাক্সি-সুমো সর্বত্রই তার আন্তরিক প্রকাশ। কী আশ্চর্য, তিনিও নেই দেখছি। আপনাদের কারবারের জায়গাটাই পাল্টে গেছে। কেমন ফ্যাকাশে, আগের মতো তেমন চিকনাই নেই। নেই সেই আমলের ভাঁওর। কিছু একটা থাড়ো করার জন্য এ ওর মুখের দিকে চেয়ে চিন্তে শেষ মেষ জলো করে দিচ্ছিল ফাইল পত্তর। কথা চালাচালি, দলিল, দস্তাবেজ, জাবদা-রেকর্ড। ও পাশের ঘরে খাঁকরখাঁই কেশে কেশে প্রাজ্ঞজনের পারা একজন কাঁচাপাকা চুলের মানুষ বাজখাঁই গলায় বল্লে— একজন যাবে, অন্যজন আসবে ব্যস। এই তো জীবন প্রবাহ... ভরা কেটা, মরা কোটাল, আলো অন্ধকার, সবাই কি আর শিকড় চারিয়ে আউরান বাউরান করে

আসলে তেমন মাটি পেলে একটু আধটু চের চালিয়ে চুলিয়ে। মহানন্দে দিব্যি চালিয়ে যায় কেউ কেউ। এধার ওধার করে পাওনাগণ্ডা সমস্ত কিছু ভজিয়ে ভাজিয়ে ছাইগাদার ওলের মতো ফুলে ফেঁপে ওঠে দিনকে দিন। দশ দিগন্তে সেইসব মহা ফ্যাঁতাড়দের ভারি গুনপনার মাহাত্ম্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে পথে প্রান্তরে, অফিসে পাড়ায়, ঘরে-সংসারে, কানের গুহায়... কেউ থাকে নিজস্ব গন্ধে-গান্ধারে গর্বিত গহনে, কেউ কেউ চলে সঙ্গে মহার্ঘ্য চিন্তায় পর্বে-পাতায়।

জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়

কথামানবী

এস.এম.এসের প্রিন্টআউট দেখলে অভিজ্ঞ জ্যোতিষীও
হয়তো বলে বসবেন, এদের সম্পর্ক আজকের নয়,
বহুদিনের।
অথচ হালকা আলোয় একটিই সান্ধ্য সাক্ষাৎকার।

বৃষ্টিদিনে কেমন আছো তুমি। আমার অনুচ্চার
শব্দমালা মেঘ কী গ্রহণ করবে আজ? রুপোলি বৃষ্টিতে
ভিজিয়ে দেবে আমার অনন্ত মুগ্ধতা!

বহুকাল পাশাপাশি থাকলেও কিছু মানুষ অচেনাই
থেকে য়ায়। কিছু মানুষ জনারণ্য থেকে এসে
আপন হয়ে যায়, আবার কারো সান্নিধ্য শুধু
যন্ত্রণার ইতিহাস রেখে যায়।

মেধার বিকিরণ ছুঁয়ে তোমার লাবণ্য। সাধারণ
মানুষ হয়তো ধরতে পারবে তোমায় কিন্তু সন্ধান
পাবে না অতলান্তে লুকিয়ে থাকা ঐশ্বর্য।
হয়তো কেউ তোমাকে মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গী করে অধিকার
করতে পারবে, কিন্তু পড়তে পারবে না, তোমার
চোখের ভাষা, হৃদয়ের গহন ইশারা।

আবহমানের স্বপ্ন ছুঁয়ে তোমার অনন্ত অভিসার।
হৃদয়ের গভীরতম অনুভূতি মেঘের বুকে রামধনু হয়ে
জেগে ওঠে তোমার ইশারায়।

অক্ষর সাজিয়ে আমি বারবার ছুঁতে চাই তোমার দিগন্ত।
তুমি হাসো, ধরা দাও আবার মিলিয়ে যাও।

জাহানারা

গন্তব্য

ধূসর ধোঁয়াশায় আবৃত
মুকুলিত প্রকৃতির শোভা,
শান্ত হাওয়া তোমার ঠোঁটের পাঁপড়ি ছুঁয়ে
বিরামহীন দিগন্তে মিশে
সকৌতুকে হেসে ওঠে।
মাদলে মাতোয়ার মন,
কোন সুরে বাজায় বাঁশি
দ্বিধান্বিত পদক্ষেপ
নির্জন মাঠ, গৈরিক প্রান্তর পেরিয়ে
নোনা জলের তীব্রতায় আক্রান্ত
আনুগত্যহীন প্রত্যয়ে সৌহার্দ্যে একাত্ম হই
পৃথিবীর আলোয়।

টিনটিন (অমর্ত্য ভট্টাচার্য)

খুন-নয়ন

আমি শিশিরে ভেজা সবুজ মাঠে, কাটিয়ে দিলাম রাত,
ভোর হতে শুধু ক্ষণের অপেক্ষা!
ভেবেছিলাম আমি মোরগের ডাকে ঘুমটা যাবে ভেঙে,
বুঝিনি সময় এতটাই আধুনিক!
চোখ খুলে দেখি সবুজ মাঠটা হয়ে গেছে পিচ-রাস্তা,
সারি সারি গাড়ি ফুঁসছে আমায় দেখে!
ধড়মড় করে উঠে পড়লাম আমি,
সূর্য এখন মধ্য আকাশে প্রায়!
ব্যস্ত কর্মচারীর দল গালাগালি দিয়ে গেল,
কর্ণ বেচারার অভ্যেস নেই শুনে।
আমি অবাক চোখে তাকিয়ে রয়েছি সবুজ দেখব বলে,
কোন জাদু দিল এই মায়াজাল বুনে?
বিষণ্ণতার মেঘলা আকাশে রঙচঙে রামধনু,
দেখিয়ে দিলেই কাজটা বোধহয় শেষ!
যারা প্রাণ কেড়ে নিয়ে মমিকে পরায় মালা,
তাদের নোংরামিতে ধ্বংস আমার দেশ!
এই লোকারণ্যে কেউ জানে না, কোথায় আমার সবুজ ঘর,
কোথায় আমার বটগাছে দোলনা!
আমি জানি না কোথায় হারিয়ে গেলাম নিজের আত্মা থেকে,
দূষিত পৃথিবী এই বুঝি হল শেষ!
যারা প্রাণ কেড়ে নিয়ে মমিকে পরায় মালা,
তাদের নোংরামিতেই ধ্বংস আমার দেশ!

স্বর্ণালী গুপ্ত

নাস্তিক বউ

চটেন গুরু শিষ্যতে, বলেন—
মাটিতে পা পড়ে না তোর?
কোন সকালে ডেকেছি তোকে
আসিস পরের দিনের ভোর।।
চোখ জ্বলজ্বল আগুন ছোটে
ভয়েই কাঁপে তার বুক।
গুরু অভিশাপ ভীষণ কিনা
তাই তো ধুকপুক।।
ভয়ে ভয়ে কাজ সারে
ভাবে কোন দিকেতে যাবে?
বাড়ির বউ রেগে বলে
ও মিনসে বসে খাবে?
নাস্তিক বউ মানে না গুরু
বলবে—মিনসে ওরে হ্যাঁ।
বউ-এর মেজাজ বোঝে নাকো
সে কখন কিসে চটা।।
পরে যদি ভালোকথায় যায় বোঝাতে
বলবে আ-গ্যালোজা মিনসে।
তোর মত তোর গুরুর স্বভাব
সব-ব্য তাতেই ওর হিংসে।।

তপতী মিস্ত্রী

প্রেম

প্রেম তুমি প্রিয়ার চোখের জল—
চাতকের জল চাওয়া কঠোর নিদাঘে,
কোকিলের কুহুতান উদাসী বসন্তে।
ময়ূরের পেখম মেলা নিবিড় বরষায়
প্রেম, তুমি আমার কিশোরী মেয়ের
বন্ধুর একটি ফোনের আশা।
প্রেম তুমি আমার মায়ের কান্না
চিরশায়িত বাবার শয্যার পাশে
প্রেম তুমি কিছু চাওয়া—অনেক না চাওয়া
প্রেম তুমি কিছু বলা—অনেক না বলা
প্রেম তুমি কিছু পাওয়া—অনেক না পাওয়া
প্রেম তুমি আমার প্রবাসী বাবার ঘরে ফিরে আসা
একাকিনী মায়ের নদীঘাটে নৌকার পথ চাওয়া
প্রেম তুমি মিলনের বিহ্বলতা, বিরহের শূন্যতা
প্রেম তুমি আমার পক্ষাঘাতগ্রস্ত মায়ের
পাঁচ বছর বিছানা আঁকড়ে বেঁচে থাকা বোনেদের মুখ চেয়ে,
প্রেম তুমি মরীচিকা বর্ষা শেষের সাতরঙ্গী রামধনু
প্রেম তুমি প্রথম বরষা তপ্ত ধরণীর বুকে
শুষ্ক চারাগাছে জলসিঞ্চন।
প্রেম তুমি আমার গরিব মায়ের ছিন্ন আচলের
তলায় ছোটবোনেদের বেড়ে ওঠা,
গভীর রাতে বেজে চলা বেহাগের সুর
প্রেম তুমি ভোররাতে আমার মায়ের
হ্যারিকেন হাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা
দূরে চাকরি যাওয়া মেয়ের রাস্তার দিকে চেয়ে।
প্রেম তুমি মৃত্যুপথযাত্রীর চোখের জল
কিশোরীর প্রথম চঞ্চলতা, নববধূর চাহনি
দূর আকাশে বলাকার উড়ে যাওয়া
প্রেম তুমি কাছে আসা, দূরে চলে যাওয়া
চলে যেতে যেতে পিছু ফিরে চাওয়া, প্রেম তুমি ব্যথা পাওয়া
জ্যোৎস্নারাতে ভেসে যাওয়া অন্তহীন সাগর তুলনাহীন,
প্রেম তুমি প্রণম্য তুমি মুক্তির আর্তি দেবতার পায়ের ফুল
মানব মনের অনন্তে বিলীন হওয়া প্রাপ্তিযোগ।

শান্তনু ঘোষ

অদৃষ্ট

মধ্যবর্তী পরিবারের ছেলে ধ্রুব।
একবাক্যে প্রত্যেকেই তাকে এল.আই.সি
এজেন্ট হিসাবে চেনে।
ধ্রুব চেয়েছিল একটি মনের মতো নারী
যাকে অগ্নির সামনে সাতপাকে বেঁধে
করবে ঘরের বউ,
সুখে-স্বাচ্ছন্দে কাটাবে দাম্পত্য জীবন।
তৃতীয় পৃথিবীর স্বপ্ন দেখতে দেখতে
বছর যেতে না যেতেই সংবাদ পাবে
বাবা হওয়ার।
আনন্দে জড়িয়ে ধরে কংগ্রাচুলেশন্
জানাবে বউকে।
তারপর সপাটে খাবে চুমু।
ছোট্ট সংসার মানে সুখী সংসার যাকে বলে।

অথচ ধ্রুব যা চায়নি
তার ভাগ্যে তা জুটে গেল।
হঠাৎ করে গৃহপ্রবেশ করল ঘরে
শনি মহারাজ,
বিবাহ-বিচ্ছেদের জেরে দাঁড়াতে হলো
আদালতের দোরগোড়ায়।
ভেবেছিল ঘটা করে কার্ড ছেপে
বিবাহবার্ষিকী করবে,
ঘরে যার এমন বউ।
খোঁচা-খোঁচা দাড়িতে ধ্রুব অভিজ্ঞ হয়
'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'
প্রবাদবাক্যটা একেবারেই দেওয়ার
নয় উড়িয়ে।
তবু ধ্রুব স্বপ্ন দেখে...
স্বপ্ন দেখায় একটি ফুটফুটে শিশু মুখ।

গুরুদাস রায়

বসন্ত বিলাপ

আমরা তোমার নতুন দিনের রুক্মিণী,
আমরা তোমার স্বপনপুরের সুখ কিনি,
বাহিরে হাওয়া উদাস আলোর সুর খুঁজি,
ভৈরবী আর দাদরা তালের বুজরুকি।

দীপ্তিতে আজ বেসুর বিষাদ কুজ্ঝটিকা,
আঁধার ঘনায় ব্যর্থ প্রেমের লুপ্তশিখা।
সহসা তপন গোধূলি সায়রে অস্তমিত,
অশান্ত মাতাল তুফানে তরণী বক্ষস্ফীত।

আবেগে অধীর ফেনিল জোয়ারে বাক্যাহত,
তমিস্রা ঘেরিল ত্বরিতে বিপুল বেদনা যত।
অন্তরকমল নীরবে পশিল ভাগ্যাকাশে,
উতলা ঝঞ্ঝার অসীম রাত্রির দীর্ঘশ্বাসে।

বসন্ত আজিকে বেসুর পিঙ্গল তীব্ররোষে,
ভয়াল ভৈরবী বিবর্ণ সন্ধ্যার বার্তাঘোষে।
কুঞ্চিত ললাটে ভাবনা গভীর আবর্তিত,
বসন্ত বিবাগী চকিত পবনে নির্বাপিত।

অযুত কিরণ বিজলী ছটায় চিরন্তন,
কম্পিত বাহুর পরশে গেঁথেছে প্রাণপণ।
বিচিত্র দিবস যামিনী সুধায় বারে বার,
অশনি ঝঞ্ঝায় বিলাপী বসন্তে রুদ্ধদ্বার।

শাশ্বত হাজরা

আড়াল থেকে

ডিমের কুসুমের মত তোমার সুস্বাদু অবেলা হাত
আমার টুকরো অঙ্গ ছুঁয়ে ছুঁয়ে শুনিয়েছিল
লাভ-প্ল্যান্ট সচল রাখার প্রতিশ্রুতি—জীবনভর।
অঙ্গজোড়া অসংখ্য নদীপ্রবাহ আছড়ে ছিল
বুকের ভিতর সজোরে চলা টারবাইনের সামনে,
দায়বদ্ধতাহীন উদাসীনতা ব্যথা হয়ে তবু
একদিন চেপে বসে ভুরুযুগলের মাঝখানে
গোয়েন্দা চেয়ার টেনে।
ঝাঁপ বন্ধ কারখানার মজদুরের দাবি
যুদ্ধশেষে শহিদ হয় সম্পর্কের মৃত্যুতে।
অস্ত্র শানায় স্বৈরতন্ত্র, যে দিবস ফেরে প্রতিবার
ছবি হওয়া আত্মবীরত্বপ্রাপ্ত ভূত গান ধরে
নোনা ধরা বাথরুমের চার দেওয়ালের নির্জনতায়,
আর এক শ্রমিকভূত ভাঙা আয়নাতে
আড়াল থেকে আমাকে মুখ ভ্যাঙায়।

অনুপম বিশ্বাস

মিনতি

ও অন্ধকার রাত,
আমায় জাগিও না
কাল প্রাতে।
আজ সকালে
হবে আমার
মরা প্রেমের
নতুন অভিষেক।
করেছি নিমন্ত্রণ
ছাই চাপা পড়া প্রেমে,
জ্বলে পুড়ে যাওয়া
নিষ্প্রাণ প্রণয়ীকে।
কথা দিয়েছে সে
আসবে ঘুম ঘোরে
ফিরবে আবার
সকাল হবার আগেই।
আয়োজনের নেই ত্রুটি।
শুধু দু চোখের পাতা
করে না আলিঙ্গন।
কাকলি বাজায় প্রহর ঘণ্টা।
হার মেনেছে আমার
এই জীবনের রাতের সঙ্গী
একটি অ্যালজোলাম।

সুব্রত দাস

রিমঝিম বৃষ্টি

ঘুম থেকে উঠে দেখি
রিমঝিম বৃষ্টি
কিশোরী পথের নূপুর ছন্দে
বীণারও ঝঙ্কারে ঝরঝর

শান্‌শান্‌ বাতাসে
বরিষণ ঝিরিঝিরি
পৃথিবী আজ
সিক্তবসনা মা,
বাতাস মাতাল
মন উন্মনা।

দুন্দুভি মেঘে মেঘে
অশনীর ঝিলিকে ঝিলিকে।
বারিধারা দিগ হতে দিগন্তে
তাপ নিবারণে
ঝরনার সঙ্গীতে ধরা
নিরবধি আজ নিরুপম।

দিবস নস্কর

পেয়েছ

যা পেয়েছ তাতেই ভালো থাকো
যা পেয়েছ নেহাত কম নয়
যা পেয়েছ অনেকের তা নেই
চাহিদা আছে এবং থাকবেই
ওটা শেষ হলে যে মানুষ মরে
নয়তো ঐশ্বরিক অবদান লাভ করে।
উপরে উঠো কিন্তু সাবধানে
উপর শুধু নিচের দিকে টানে
ধরে থাকা ভালো, ভালো ঢের
তোমার থেকে অনেকের
অবস্থা খারাপ আরো, আরো
তুমি তো মাথা সোজা করে দাঁড়াতে পারো,
এটাই তোমার বড় পাওয়া
চাহিদার পিছনে না করে ধাওয়া
যা পাও তাতেই সুখে থাকো
এ জীবনে শেষ হবে নাকো
তুমি যা কিছু চাও।
যা পেয়েছ তাকে রক্ষা করো
জয় করে পাওয়া যদি হয়
সহজে হারাবার নয়
চিরকাল প্রতিদান দিয়ে যাবে
সুখের ঠিকানা খুঁজে পাবে।
যা পেয়েছ তা জেনো আশীর্বাদ।
তাতেই মনের সাধ
সবটা পুরিতে পারে
নইলে এ জীবনের পরাজয়
যা পেয়েছ নেহাত কম নয়।

কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায়

শক্তিরূপিণী

আমি সেই শক্তিময়ী নারী
অথচ আমার কাছে ছিলো না
শক্তির সেই খবর
কাজ করে গেছি অন্যের ইচ্ছায়,
অন্যের প্রয়োজনে মিলিয়েছি
নিজের কর্মব্যস্ততা, নিজের অবসর।

হয়তো ভালোবাসা মমতায়
নিজের অধিকার চাওয়া বড়ো হয়নিকো মনে
চলতে চলতে অনেকটা পথ
পেরিয়ে হঠাৎ এলাম,
এক বিশাল প্রাঙ্গণে।

মেঘলা আকাশের বিষণ্ন বর্ষণে,
মাঝে বিদ্যুতের অগ্নিঝিলিক,
এলোমেলো বাতাসের ঠাণ্ডা স্পর্শে
হঠাৎ মনে হয়েছিলো, এই তো আমি
আমারও করার কিছু ছিলো।
নিজের ইচ্ছায়, নিজের শক্তির জোরে।

সূর্য উঠলে রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে
শুরু হলো আমার কর্ম সূচনা
আমার বুকের ভেতর রাখা
একে একে সুপ্ত অবসাদ
সাধ্যের মুখ দেখতে চাইলো।
কোনো বাধাই আর মানলো না।
আমি জানলাম আমি শক্তিরূপিণী সেই নারী
আমার সযত্নে লুকিয়ে রাখা স্বপ্নকে
আমিও রূপ দিতে পারি।

অশোককুমার সান্তারা

গান্ধর্ব

ধ্যানমগ্ন ঋষি বসি অশ্বত্থতলে
অরণ্যের মাঝারে,
পথহারা যুবরাজ পথ খোঁজে
অরণ্যের চারিধারে,
কিছুদুর দেখিয়া এক ঋষিবরে
যুবকের কাছে আসি কহিল তাঁহারে।
কে আপনি ধ্যানমগ্ন অরণ্যের মাঝে—
বলিতে পারেন পথ কোন দিকে গেছে?
ধ্যানভঙ্গ ঋষি তাকায়
যুবরাজের পানে,
কোথা হতে আসিয়াছো
কোথা যাও কিসের সন্ধানে?

আমি যুবরাজ বিজয়াদিত্য
চলেছি উদয়পুরে,
ঋষিবর কাহিলেন সে তো বহু দূর
কয়েক ক্রোশ দূরে।
এখন তো হয়েছে দ্বি-প্রহর
অতিথি হও মোর দ্বারে,
একটু বিশ্রাম করে
চলে যেও তার পরে।

যুবরাজ কহিল, তাই হোক তবে;
আজি অতিথি আমি আপনার দ্বারে।
ঋষিবর কহিলেন—চলো মোর সনে
যুবরাজ চলিলো তাঁহারি পিছু পানে।

কিছুদুর আসিয়া কুটির প্রাঙ্গণে
চকিত হইল যুবরাজ,

একি দেখি আঙিনায়, ইন্দ্রপ্রাসাদ প্রায়
আলপনা পুষ্পে মনোহর সাজ।
চাহিয়া ঋষিবর পানে কহিল যুবরাজ
অভিভূত হয়েছি দেখে আমি আজ,
যদি অনুমতি পাই, কিছুদিন রহিবার তরে,
এই মনোরম নয়নাভিরাম বিদর্ভ নগরে।
মৃদু হেসে ঋষিবর কহিলেন যুবরাজে
থাকিতে দেব না কথা বলি কোন লাজে।

তুমি তো অতিথি আজ আমারই দ্বারে—
আতিথ্য গ্রহণে ধন্য করো মোরে,
যতদিন জাগিবে মনে থাকিও তুমি এইখানে
ফিরিতে হলে মনে, ফিরে যেও আপন
ঘরে।
ঋষিবর কহেন—তবে এসো মোর সাথে
সমাপন করি তোমায় কন্যার হাতে;
অবগত হইল যে শান্তা কুমারী
কুটির প্রাঙ্গণে বসিতে দিলো পিঁড়ি।

ঋষিবর কহিলেন—ওহে যুবরাজ
আশ্রম প্রাঙ্গণে কর হে বিরাজ,
কুম্ভ অবগাহন পুণ্যস্নানে—
ত্রিবেণী সঙ্গমে, যাবো আমি আজ।
ফিরিয়া আসিবো আমি
পক্ষকাল পরে—
কন্যাসহ, সখীগণ আশ্রম প্রাঙ্গণ
সবই ভার দিলাম আমি তোমারই পরে।

মৃদু হেসে যুবরাজ কহিল ঋষিবরে—
আপনার আদেশ আমি শিরোধার্য করে,
পালন করিব আমি আপন করে।

সিক্ত মনে যাত্রা করুন তবে
আপনার অপেক্ষায় সবে পথ চেয়ে রবে
মৃদু হেসে ঋষিবর আশীর্বাদ করে,
সিক্ত মনে চলে যান স্নান অভিসারে।

কিয়ৎক্ষণ পরে—ফলাহার নিয়ে শান্তা
আসে ধীরে ধীরে, যুবরাজের ঘরে।
সেবা যতনে আর আতিথ্যে তার
ভরে দিলো প্রাণ,
মুগ্ধ যে যুবরাজ করকলি ধরে
অঙ্গুরি করিল প্রদান,
শপথ করিল কুমার দুটি হাত ধরে
রানি করে তোমারে লয়ে যাবো ঘরে।

লজ্জায় শান্তার নত হলো মুখ—
উচ্ছল প্রেমে তার ভরে ওঠে বুক;
চিবুক ধরিয়া কুমার মুখ তুলে ধরি
মুদিত নয়নে তার অশ্রু ওঠে ভরি।

যুবরাজ কহিল—ভয় নাহি কোন
গান্ধর্ব বিবাহ করিবো তা জেনো।
দাঁড়াইয়া অশ্বত্থতলে
তাকাইয়া পূর্বাভালে
সাক্ষী রাখিয়া ভাস্করে
দু-হাতে মাল্য তুলে ধরে
পরাইয়া দিলো এ-ওর গলে।

হেনকালে ঋষিবর—স্নান কাজ সেরে,
কমণ্ডলু ভরে জল, ফিরে এলেন ঘরে,
করজোড়ে যুবরাজ কহিল ঋষিবরে
অন্যায় করেছি দেব ক্ষমা করুন মোরে।
গান্ধর্ব মতে আমি করি যে বিবাহ

বধূ করে শান্তাকে ঘরে নিয়ে যাবো।
মৃদু হেসে ঋষিবর কহিলেন কুমারে
চিন্তামুক্ত হইলাম আমি কন্যার তরে।
মাতৃহারা জনমদুঃখী কন্যা আমার
বিবাহ করে তুমি তার নিলে সব ভার।
ধন্য তুমি! ধন্য হে বীর! ধন্য তোমার প্রাণ
অগ্নিসাক্ষী রেখে কন্যা করিলাম সম্প্রদান।
ধীরপায়ে ঋষিবর আসি কন্যার কাছে
কহিলেন মাতা, যাইবার সময় তো হয়ে গেছে।

পিতৃবাক্য শুনিয়া কন্যা
নয়নে ভাসিল অশ্রুবন্যা,
দু-বাহু জড়াইয়া ধরিলো পিতায়
কেমনে থাকিবো আমি ছাড়িয়া তোমায়

কহিলেন পিতা—এ তো প্রকৃতির নিয়ম মাতা
যাও মাতা, অপেক্ষায় রয়েছে জামাতা,
যেতে হবে বহু দূরে, কত মাঠ প্রান্তরে
অরণ্যের ওপারে,
গড়া আছে রাজপ্রাসাদ শ্বেতপাথরে।

ধীরপায়ে শান্তা এলো কুটির বাহিরে
যুবরাজের হাত ধরে উঠিল অশ্ব'পরে।
তাকাইল পিতার দিকে যাইবার কালে
মুখবর ভরে যায় নয়নের জলে,
করজোড়ে যুবরাজ কহিল ঋষিবরে—
অনুমতি দিন পিতা যাইবার তরে।
ঋষিবর কহিলেন—যাত্রা করো তব
সংবাদের অপেক্ষায় আমি পথ চেয়ে রব
অশ্ব'পরে যুবরাজ শান্তাকে লয়ে
বনপথে গেল চলি অশ্ব ছুটিয়ে।
চাহিয়া রহিলেন পিতা বনপথ পানে
এ কী বিষম স্নেহ, ছিলো মোর মনে!

বনবাসী ঋষি আমি, এ কেমন করে—
ব্যথা আসি বিঁধিল বক্ষে বিদীর্ণ করে।
নয়নসিক্ত ঋষি ফেরেন
শূন্য কুটিরপানে,
নিস্তব্ধতায় ভরে গেছে
কুটির প্রাঙ্গণে।
চাহিয়া দেখিলেন তিনি বিষণ্ণমনে
ধীরপায়ে চলিলেন সিক্ত নয়নে,
অশ্বত্থমূলে পদ্মাসনে
বসেন এসে ধ্যানে।

রণজিৎ বিশ্বাস

প্রতিদান

রঙিন ফুলদানি সাথে রজনীগন্ধা
এ আমার প্রথম দেখার প্রতিদান,
মুগ্ধ হয়েছি, জীবন বর্ণমালায়
তোমার ভালোবাসার উপহারের
সে ক্ষণ ছিল বড়ই মধুময়,
শুধু দেবার আর নেবার পালা
অতীব যত্নে ভালোবাসার আভায়
সতেজ করে রেখেছি তোমায়...

তোমার ভালোলাগার রঙিন ডালি
তবুও কেন ঝরে যাওয়ার খেলায়।
ফুলের গন্ধ যতই শুঁকেছি,
ততই বেড়েছে তিক্ততা।
তবে কি ভালোবাসা মানে
জীবন স্মৃতি থেকে ঝরে যাওয়া—
নাকি কোন শব্দমালার প্রেক্ষাপটে
কবির বেঁচে থাকার সূত্র?

বিহঙ্গ নন্দী

যেই জন

বাবু একটা বিস্কুট দেবা?
তিনদিন কিছু খাইনি —
ছিন্ন মলিন ফ্রকপরা
কচি মেয়েটি হাতপাতে।
দেবো, বাড়ি গিয়ে বাসন ধুবি?

বাবু একটা বিস্কুট দেবা?
যাঃ বিরক্ত করিস না —
ভোট দেয়ার বয়েস হলে
আসিস।
আমাকে ভোট দিবি
আমি বিস্কুট দেবো।

বাবুগো একটা বিস্কুট দেবা?
যাব্‌বাবা আগে গায়ে-গতরে
ডব্‌কা হ, যইবন্‌ আসুক
সোনার বিস্কুট দেবো।

ষাটোর্ধ্ব, রাশভারী ভদ্রলোকের
জ্ঞান-গম্যি আছে। বিদ্বজ্জন।
কাউকে ঢপ্‌ দেন না।

দুলালচন্দ্র মণ্ডল

বিশ্বতীর্থ

ভারত আমার ভারত আমার, তুমিই মাগো পুণ্যক্ষেত্র,
জ্ঞান গরিমা শৌর্যে বীর্যে, এখানেই মা মিলনতীর্থ।
ধরার বুকে শস্যশ্যামল জলধিকে করি না ভয়,
মৃত্যুভয়ে মরি না মোরা সেথায় মাগো হয়েছি জয়।
মহিমা তোমা সৃজিলা বিশ্বে, এসেছে কত দস্যুদল।
তাতার দস্যু এসেছে হেথা চেঙ্গিস আর পাঠান মুঘল।
বেশাতি করিতে এসেছিল হেথা ইংরেজ নামে বণিক দল।
বিশ্বাসঘাতক বর্বরতায় কেড়ে নিল স্বাধীন বল।
কান্নাভেজা করুণামুরতি দেখেছিল সন্তানদল।
শত শহিদের রক্ত রাঙায়ে হয়েছি স্বাধীন পেয়েছি বল।
ধরার বুকে অধ্যাত্মসাধনা কোথায় এমন শান্ত ভাব,
ক্ষমা দয়া পবিত্রতা সদ্গুণের বিকাশ ভাব,
যুদ্ধ চাই না শান্তি চাই এটাই মোদের মূলমন্ত্র।
বীরশ্রেষ্ঠ বিবেকের বাণী এনেছে সুপথে জাতীয়তন্ত্র।
ভারত আমার ভারত আমার তুমিই মাগো তীর্থক্ষেত্র।
সীমার মাঝে অসীম তুমি তাই তো মাগো ভারততীর্থ।
মহিমায় তব উদ্ভাসিত জ্ঞানপিপাসায় এল কারা
জ্ঞানের ভাণ্ডার উজার দেখে হয়েছিল আত্মহারা
এই ভারতে এসেছিলেন ফা-হিয়েন আর হিউ-এন-সাঙ।
জ্ঞানের মাঝে পুষ্ট হলেন শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর
প্রাচীন বিশ্বে শীর্ষে ছিল জ্ঞানের আধার নালন্দা
বিশ্ববাণীর শিষ্যা হয়ে এলেন হেথা নিবেদিতা।
আধ্যাত্মিকের ঐতিহ্যে বিশ্বজোড়া তোমার নাম।
মুক্তি তরে বিলাইছেন শ্রীচৈতন্য হরিনাম।
শোকে দুঃখে সম্রাট অশোক জাগিয়ে ছিলেন মহান ধর্ম,
সেটাই ছিল বিশ্বমাঝে অহিংসা পরম ধর্ম।
যত মত তত পথ সবই তাঁর মতামত সবই ইচ্ছা জগৎমাতার।
জীবে দয়া পরম ধর্ম সবই তাঁর জ্ঞানের আধার।
ধর্ম-কর্ম সেবাব্রতে, মহীয়ান তুমি বিশ্ব-মাঝে।
রামকৃষ্ণ মিশন বাজায় সৃষ্টিসুধা সকাল-সাঁঝে।
ভারত আমার ভারত আমার তুমিই মাগো জ্ঞানের আধার
জ্ঞান গরিমা শৌর্যে বীর্যে থাকবে সদাই জ্ঞানের ভাণ্ডার।
ভারত আমার ভারত আমার তুমিই মাগো ধ্যানতীর্থ।
জ্ঞান রনে সৃষ্টি বিকাশে তুমি আজিও বিশ্বতীর্থ।

অমিতকুমার প্রধান

সতী নয় শহিদ

উন্মুক্ত প্রান্তরে কত প্রসববেদনা সহ্য করেছি যতনে
—শুধু তোমাদের জন্মদানে, শুভ আগমনে।
তোমরা রণমুখী সংস্কৃতির অলৌকিক পুণ্যের পূর্ণে
আত্মঘাতী আনন্দে
আমাকে জীবন্ত পুড়িয়ে 'সতী' সাজানোয় ব্যস্ত
দেহবোধে অসম্ভব বিন্যাসে।
বাঁচা-বাঁচানোর সূত্র হারিয়ে
দুর্বল আপত্তি উপেক্ষা করে
অনায়াসে অনধীনে।
উন্নয়নের নামাবলি চাপিয়ে দেহে,
আমায় আসলে শহিদ বানিয়েছ অজান্তে,
'সতী-সত্তা' ছিনিয়ে।
নীরবে হারিয়ে যাওয়া মিছিলে
আমি আছি — পরিপূর্ণে
প্রসবে শ্রেষ্ঠতম বীর পুত্রগণে
রাজা রামমোহন রায়ে,
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে,
মণি ভৌমিক,
কিংবা পূণ্যকাহিনি সঠিক বিশ্লেষণে
মৃত স্বামীর 'স্বামী-স্বত্ব' বিচ্ছিন্নে
'যমরাজ তথা ধর্মরাজ' — নিরূপণে
'সাবিত্রীর স্বাধিকার — স্বত্ববান জীবন' প্রতিপ্রদানে
'নতুন স্বামী-সত্তা' সংস্থাপনে,
'সত্যবানই সাবিত্রী' — এইমত অরোপণে
'সত্যবানের ঔরসজাত এক স্বতঃ পুত্র' — বর সত্যে।
সতী তাই সাবিত্রী সুবিখ্যাত জগতে।
বাঁচা—বাড়ার ছন্দে—সন্তান প্রসবে—বাসরে সূচনা যা'
এমতে স্বামীর শুক্রাণুত্যাগ — স্বামীর মৃত্যুসম তা'
গর্ভজাত পুত্র প্রসবে, স্বামী পুনঃ প্রাণ পায় ফিরে
ধন্য ধন্য রব তুলে সবে অন্তরে—অমর নগরে—সতীরে।

রীতা মণ্ডল

অপেক্ষা

পৃথিবীর কোলে ঘুমিয়েছে রাত
শুধু ঝিঁঝিঁপোকার ডাক,
অন্ধকূপে বসে সময় গুনছি
একটা ফোনের অপেক্ষা।
সীমাহীন জোছনা রূপালী ভালোবাসা
জলছবি হয়ে দাগ কাটে
মনের ক্যানভাসে।
প্রহরী অব্যক্ত যন্ত্রণায়, সুরতোলে
বিরহী ভাটিয়ালি,
তৃষ্ণিত হৃদয়ে স্মৃতির মোড়োকে
আটকে আছি—
কোন বর্ণমালার মাঝে
নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছিলে
ভালবাসার অন্য নাম,
শুধু দুঃখ।

মনোজিৎ কুইতি

অধিকার

সাম্যবাদের ভাবনা ভাবতে ভাবতে
ব্যাখ্যা, অপব্যাখ্যা করতে করতে
অজান্তে কখন শ্রমবিমুখ হয়ে গেছি।
বুঝতেই পারিনি।
এখন আর আটঘণ্টা লড়াই-এর অধিকার নয়।
ঘড়ি এখন অনেক বেশি কথা বলে।
অসহায় মূল্যবোধ, অনেক বেশি অসহায়,
সময়ের কাছে।
অধিকারের ভাবনা ভাবতে ভাবতে
কখন যে স্বার্থপর হয়ে উঠেছি
নিজেই বুঝতে পারি না।
মনে হয় এটাই স্বাভাবিক।
ভোগবিলাসে ভাসতে ভাসতে, বাহিরের দিকে চেয়ে দেখি।
অসহায়, নিরন্ন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশি
উদাসভাবে তাকিয়ে আছে।
এটা আমার অধিকার,
কর্তব্যের কথা তো বলা হয়নি, অধিকারের সাথে সাথে।
অধিকার পাওয়ার ভাবনা, ভাবতে ভাবতে
সত্যকে ছেড়ে, মিথ্যার সাথে কোলকুলি।
বর্তমান সাম্য ভাবনার মূল প্রাণ।
সত্যের কান্না আজো চোখের জল হয়ে, প্লাবন ঘটায়,
উপকূলভূমি, সবুজ শ্যামলীমায় ভরিয়ে দেয়।

বিজনবিহারী দলুই

বাংলার মুখ

বুকের মাঝে স্বপ্নের রঙে রক্তকরবী আঁকি
ধর্মঘটের ছুটিতে দিই চায়ের কাপে চুমুক,
সোফায় বসে কাগজ পড়ি টিভিতে চোখ রাখি
নিঃস্ব মানুষে ক্রুদ্ধ মানুষে দেখি বাংলার মুখ।

পথের পাশে থমকে যাই, ভিক্ষুকে দিই ভিক্ষা
আধুলি দিই, কঙ্কাল দেহ অপলক চেয়ে রয়
মায়ের কোলে নগ্ন শিশু দিচ্ছে বাঁচার পরীক্ষা
তবুও তার নিস্তেজ নিশ্বাসে জীবনটা বাঙ্ময়।

অর্থের ভারে মানুষে মানুষে দূরত্ব বেড়ে চলে
বিলাসিতার তুফান ওঠে মদের গ্লাসে গ্লাসে
বঞ্চিত কেউ লুণ্ঠিত কেউ জানি চোখের জলে
কারো জীবন ছুটেই চলে উন্মত্ত উল্লাসে।

মানুষ বলে গর্ব তবু স্বপ্ন এঁকেছি বুকে
ধ্বংসের মাঝে সৃষ্টি খুঁজি অনন্ত প্রত্যাশা
আবার হাসি আবার খুশি বাংলার মরা মুখে
মানুষের পাশে মানুষ রবে এই শুধু অভিলাষা।

দীপংকর রায়

তুমি

তুমি,
তুমি
আমার
নিশ্বাসে।
তুমি
আমার
প্রশ্বাসে।

তুমি,
আমার অস্থি-রক্ত-মাংস-মজ্জায়
তুমি আমার ভাষায়
আমার কবিতায়
নির্জনতায় ... নিরালায় ...
শুধু তুমি ... শুধু তুমি ... শুধু তুমি ...

তুমি কে?
কে তুমি
—এ বিষণ্ন দীর্ঘশ্বাসে ... ?

দেখ, সূর্য অস্ত যায়।

বিষ্ণুপদ বৈদ্য

বাস্তব চিত্র

এই যুগে, বাঁশের চেয়ে
কঞ্চি শক্ত।
ভূত এখন
রামের ভক্ত।

এই যুগে, শিয়াল ডাকছে
হাম্বা ডাক।
পেখম মেলেছে
দাঁড় কাক।

এই যুগে, কেউটের চেয়ে
বিষাক্ত এখন,
হেলে সাপ।
মাংস ছেড়ে
বাঘ খাচ্ছে
দুগ্ধভাত।

এই যুগে, খেঁকি কুত্তা
সেজেছে বাঘ।।

বন্দনা পাল

বরণ করি

সোনা আমার ওঠ দেখি,
করন কেটে বরণ করি।
ঘুম জাগানিয়াকে আদর করি,
তাই তো তোমায় জাগতে বলি।
ঘুমেই যেন সময় কাটালি,
পড়াশুনার কি আর সময় পেলি?
সকাল সকাল ঘুম তাড়াও
তাই তো তোমায় বলি বার বার।
রাত জেগেছ ক্ষতি কি তায়
সময় পেলেই পুষিয়ে নিও।
সুঅভ্যাসটা বজায় রেখ,
তোমায় দেখেই শিখবে সবাই।
সেই লক্ষ্য কি মাথায় রাখ?
সুঅভ্যাস বজায় রাখ,
তবেই তোমায় সবাই বাসবে ভালো,
তুমিই হবে পথের আলো।
তুমি সদাই সুখে থেক দেখতে হবে ভালো,
তাই তো তোমার দুচোখ ভরা আলো।
জাগাও তুমি, জাগবে তুমি সঙ্গে থেক,
এই কথা কি মনে কর? তবেই হবে ভালো।

আশুতোষ মণ্ডল

অদৃশ্য বিন্দু

দেখা হল, কথা হল,
অনেক সময় নিলাম
একটা কিছু খুঁজে ছিলাম
কিছু দেব ভেবেছিলাম,

কিন্তু—
এক ঝাঁক কথা প্রতিবাদ করলো

অনেক দূর চলে এলাম।

আমার চাওয়াটা নিঃশব্দ দৃষ্টি
প্রেম বা ভালোবাসা নয়—
একটা পথ চলার পথ।

স্টেশনের বাতিগুলোর মতো স্থির আলো।
অন্ধকার দূর করে সারা রাত আলো দেবে।

যত সময় না
প্রভাতের সূর্যে সব পরিষ্কার হয়।

অমিত মুখোপাধ্যায়

চাতক

আমাকে একটা বিকেল দাও,
আর একটু নির্জনতা—
আমি দুষ্টু হবো
আর ফিরিয়ে দেবো তোমার কৈশোর।

না হয় একটা ফাগুন দাও,
আর একটু ফাগ—
আমি মরদ হবো
ঘর বাঁধবো লাল মাটির দেশে।

যদি একটা আকাশ দাও,
আর দুটি হংসপাখা—
হবো নীড়হারা
দুজনেই ভেসে যাবো বলাকার সাথে।

তবে একটা বর্ষা পেলে,
আর একটু আবডাল—
পরশপ্রেমিক হতাম
ফিরিয়ে দিতাম তোমার প্রথম লজ্জা।

তুমি একটা কলম দিলে,
আর একটু করুণা—
আমি কবি হলাম
তুমি এখন অনাবাসী, ধনী পাঠিকা।।

রঞ্জন ব্যানার্জি

মেটাতে ঋণ

ঝরছে রক্ত জলাজঙ্গলে
ঝরছে রক্ত বনেবাদাড়ে
ঝরছে রক্ত পথেঘাটে
ঝরছে রক্ত পাহাড়ে।।

রক্তঝরার উন্মাদনায়
উল্লাসে মাতে ওরা
প্রাণ বাঁচাতে লাগুক যত
রক্ত দেবো মোরা।

বন্ধ হোক রক্তঝরা
মেটাতে রক্তের খরা
চলো সবাই বেরিয়ে পড়ি
একসাথে মোরা।।

রক্তের জন্য রক্ত চাই
শুদ্ধ মানব রক্ত
রক্তের টানে রক্ত চাই
বন্ধন হবে শক্ত।।

রক্তের ঋণ মেটানো কি যায়?
তবু রক্তের অবহেলা
নিজ স্বার্থে রক্তের হোলি
বন্ধ হোক এ খেলা।

সুদীপ বিশ্বাস

গোপন অভিসার

কিছু ভালোবাসা রোদ্দুর হতে চায়
কিছু ভালোবাসা মেঘ হয়ে যায় ভেসে,
কিছু কিছু প্রেম দিশাহীন গাঙ্‌চিল
বিজন দুপুরে এখনো মন হারায়।

আজও খুঁজে মরি সেই অনন্ত আলো
বুকের ভিতর চেপে রাখা কথকথা—
আঁধার রাতের স্বপ্নালু দুই চোখে,
অলোকে পুলকে তোমারে বেসেছি ভালো।

কিছু ভালোবাসা বর্ষা শেষের রাত
স্বপ্নরা যেন দু'কূল ছাপানো নদী;
কিছু কিছু দিন রয়ে যায় অমলিন—
প্রথম যখন ও হাতে রেখেছি হাত।

আজও শুধু মন হতে চায় রোদ-ঝড়
ঈশান কোণের দুর্জয় কালো মেঘ,
শ্রাবণ দিনের গোপন অভিসারে
ডানা ঝাপটায় মন খুঁজে মরে তারে।
প্রাণের ভিতর উত্তুরে হাওয়া বয়,
শুধু কিছু প্রেম ভালোবাসা হতে পারে।।

সুমি দে

ফিরে আসার বিদায়

জানো তোমাকে ছেড়ে আসতে
আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল,
কি করব বল, আমাকে ফিরতেই হবে।
নদীর তো সাগরের প্রতি টান থাকবেই।
আমিও তার ব্যতিক্রম নই,
সেদিন সন্ধ্যায় যখন তীরে বসেছিলাম
এ যেন এক স্বপ্নের ভালোলাগাকে
ঈশ্বর আমার হাতে তুলে দিয়েছেন।
ওই দুরন্ত উত্তাল ঢেউ এর উপর যেন
আমার যা খুশি করার অধিকার আছে।
ঢেউ এর উপর আমি উঠছি, বসছি, নাচ করছি।
নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে ভাসছি।
আবার ঢেউ-এর সাথে আছড়ে পড়ে
তোমার গহিনে হারিয়ে যাচ্ছি।
এই অনুভব কি ভোলা যায়?
তুমি সাগর। এই ক্ষুদ্র নদীর কথা
তোমার মনে থাকবে না। সাগরে যে
অনেক নদী এসে মিশেছে।
আবার দেখা হবে
বিদায় জলধি।

বিপুলকুমার ঘোষ

এ বড় দুঃসময়

তখন ঝিরিঝিরি শীতের রোদ নেমেছে
অঘ্রানের গন্ধে যে ছবিটা এঁকেছিল
জলছবি, ধুয়ে মুছে গেছে—
বাঁচার ক্ষীণ আশা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে;
প্রকাশ্য করিডোর। তার চারপাশ ঘিরে
তোমার গায়ের আতপ চালের গন্ধ
বাতাস ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে একচিলতে
রেশমি রুমাল, একঝাঁক বুনো পায়রা।

তোমার চোখমুখ সিঁথি সাদা।
থিরি থিরি নাকের ডগা কাঁপতে কাঁপতে
এক লহমায় ঝাঁপিয়ে পড়ে কম্পিত পাঁজরে।
কে যেন অনুচ্চারিত স্পর্শে ঢেকে দেয়
ছোপ-পড়া ক্লান্তির ধোঁয়ার আস্তরণ।

কাঁদানে গ্যাস!
আর্ত চিৎকার!!
জ্বালাধরা চোখ!!!
কিছু সময়ের জন্য হারিয়ে যাচ্ছ তুমি আর
তখন বাসনার শাড়িটা পড়্-পড়্ করে পুড়ে যাচ্ছে...

অপূর্ব চক্রবর্তী

নূতন পরিধি

রাত্রির নির্জনতাকে পকেটে ভরে,
হেঁটে চলি উদ্দেশ্যহীন—অজানা পথে—

ঘন কুয়াশার ভিতর হতে,
চোখ টিপে ব্যঙ্গ করে জোনাকির হাসি—
বার বারই পথ আটকে দাঁড়ায়,
ঝিঁঝির একটানা কানফাটা উল্লাস।

বিচলিত হই না তবু,
নিজস্ব আত্মবিশ্বাসে করি পরিষ্কার পথ;

অবশেষে সমস্ত রাত্রি জুড়ে,
জনহীন শূন্যতায় চলে জীবনের ভাঙচুর;
গভীর গভীরতম মন.
প্রত্যুষের আলো ফোটার
সাথে সাথেই
খুঁজে চলে নূতন পরিধি।।

নবীন চক্রবর্তী

ক্রোধে রাঙা

যখন মাথায় অগ্নিরাশি,
শরীর কাঁপে থরথরিয়ে।
রাগটা আমার বড্ড বেশি,
ভস্ম-প্রলয় সব পুড়িয়ে।।

পুড়বে সকল অগ্নিলীলায়,
বেতসলতায় লাগবে আঁচ।
আমি তখন ধ্বংসখেলায়,
হীরক কলম কাটবে কাঁচ।।

লাল জবা রঙ চোখ দুটোতে,
আগুন গোলা জোড়ায়-জোড়ায়।
বাঘনখ পরানখেরাঘাতে
হানব আঘাত অস্থি শিরায়।।

ক্রোধে রাঙা রক্তপলাশ,
হিংস্র কুমির, সিংহ, শেয়াল।।
চোখ ফেরালে কত লাশ,
দুনিয়া বোঝাই খুনির দালাল।।

অজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

স্মৃতির রেখাপথ বেয়ে

শিশিরের জল চুষে
মেঘের মেঝেতে পা রেখে
চলে যাব
স্মৃতির রেখাপথ বেয়ে।।

চাঁদের কিরণে ভিজে
জোনাকি আলোতে ভেসে ভেসে
চলে যাব
স্মৃতির রেখাপথ বেয়ে।।

ভাসমান তারা গুনে
তোমাকে স্মরণ পথে এনে
চলে যাব
স্মৃতির রেখাপথ বেয়ে।।

পৃথিবীর কোল ছেড়ে
কত মেঘ ঝরে পড়ে পথে
চলে গেলে
প্রকৃতির নিয়মে পা রেখে।।

আকাশের চোখ জেগে
পৃথিবী তেমনি আছে চেয়ে
জেগে রব
স্মৃতিকণা স্মরণেতে রেখে।।

দীপ্র মানব

আড়ি

বাণী, তুমি আমাকে ভালোবাসলেও
কিছুই দিতে পারতাম না
হয়তো রংছড়ানো ইজেলে কিছুক্ষণ ...
তবুও একটা মিথ্যা কথা বলে দাও না
তুমি আমাকে ভালোবাস।

আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যু
আমার হাত ধরবে ভীষণ তাড়া ওর
ওকে বলে দাও না আমার যেতে ইচ্ছে করছে না,
এখনও অনেক রং মাখবো দুহাতে
জানি বাণী তুমি স্বার্থপরের মত চুপটি করে থাকবে

কিন্তু সেদিন থেকে আড়ি
যে দিন ওর সাথে সখ্যতা হবে
মৃত্যুর হাত দুটি ধরব আমি
একফোঁটা চোখের জল ফেলবে না কিন্তু ...

সমীর বিশ্বাস

অবক্ষয়

একবুক আশা নিয়ে
আজও বেঁচে আছি
এই অবক্ষয়ের যুগে।

মায়া-মমতাহীন, স্বজনহীন
জীবন-যৌবন বিসর্জনের দিনে।।
আজও বেঁচে আছি
এই অবক্ষয়ের যুগে।

সমাজ সভ্যতা কলঙ্ক গরিমা
আজও আছে বেঁচে;
মেরেছি গলা টিপে শুধু ভালবাসা
আভিজাত্য আর ঠুনকো প্রেমের নামে।।

নন্দন চত্বরে হাতে হাত ধরে
জড়িয়ে প্রেমিকার গলা
ধীরে ধীরে পথ চলা
এই তো জীবন

শুধু বেঁচে থাকা।।

মীনা বিশ্বাস

একুশে ফেব্রুয়ারি

আমরা করি দেশের সেবা
রক্তে ভেজাই পথ
মায়ের বুকে ছুরি মেরে
গড়ে তুলি ইমারত
আমাদের কতো ভক্তি জানো
মায়ের প্রতি মনে মনে
শহিদ বেদিতে ফুল ছড়িয়ে
কেটে পড়ি মানে মানে
যে ভাষাতে কথা বলি
সেই ভাষা মায়ের প্রতি
নেই কোন ভ্রূকুটি
সেই ভাষাতে আমাদের আছে
কত যে দ্বিরুক্তি
বাঙালির মনে বাংলা ভাষার
নেই কোথাও জায়গা
বাংলা মায়ের সন্তান আমরা
এমনি হতভাগা
ইংরেজি দিয়ে ঘষামাজা করি
আমাদের সন্তানের মস্তক
বিদেশির কাছে নতজানু হয়ে
গাই শত শত স্তবক
রফিক শালাম দিয়ে গেছে প্রাণ
একুশের ছন্দ তুলে
আমরা শুধু আনুষ্ঠানিক
একুশে ফেব্রুয়ারি সাজাই
ভাষা আন্দোলন ভুলে।

বিবেক চৌধুরী

চেনা মুখের পাঁচালি

তোমার দেহের উঠোন ভরা রৌদ্র
আর সেই রৌদ্রে সেঁকে নেবে যৌবন
তোমার ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকাতে
মনে হয় এক রহস্যময়ী নারী,
আর সেই রহস্যের জাল ভেদ করতে গিয়ে
নৈকট্যের সীমা ছাড়িয়ে আরও সন্নিকটে।
নস্টালজিয়ার ঘেরাটোপে উচ্ছ্বাসের অনুরণন
চোখের উজ্জ্বলতায় স্বচ্ছতার প্রক্ষেপ
তোমার দেহের উঠোনে খেলে বেড়ানো
শিশুর মত দস্যিপনা
খেয়ালী মনের লুকানো দুষ্টুমি ভরা আবেগ
তখনই হয়তো ধরা দেবে নতুনভাবে।
কিছু পাবার তাগিদে স্বভাবসিদ্ধতার মাঝে ডুব দেওয়া
আর হৃদয়ের গভীরে সেই মনোভাবের স্থিতধী
বিস্ময়ের আর এক পর্যায়ে উন্নীত
মনে হয় এক মানব আর এক মানবী
জগৎসংসার ভুলে এক হয়ে গেছে।

দেবাশিস দাস

জমা খরচ

ভিক্ষা ভূষণ অঙ্গে তাহার
দাঁড়ায়ে উঠোন ধারে
তিন দিন উপবাসী একজন
ডাক দেয় বারে বারে।
কর্তা আসিয়া চেয়ারে বসিয়া
কহিল উচ্চস্বরে—
দিন ভোর শুধু খরচ করেছি
কিছু নেই তোর তরে।

সজল নয়নে করুণ কণ্ঠে
বাবুরে বলিল শেষে
চোখে তো দেখেছি জমার চিহ্ন
খরচ করিলে কীসে?

দীর্ঘ সময়ে টানিয়া টুনিয়া
বাহির করিল আনি,
শুধাইল তারে গর্বের ভরে
খরচ ফর্দখানি।
বিশলাখ গেছে গৃহনির্মাণে
জমিন কিনেছি মস্ত
গৃহিণীর মোর শখের বাগানে
গিয়েছে আর সমস্ত।
ছেলেকে করেছি বিলেতফেরত
মেয়ে যে রাজার ঘরণি
এত সব শুনে বল তুই শুনে
খরচ আমি কি করিনি?
ভিখারি হাসিয়া বাবুরে বলিল,

বাবুগো এতো জমার ফর্দ শুনি,
খরচ ফর্দ রাখিয়াছ কোথা
নিয়ে এসো ত্বরা মানি।

সুখের গৃহেতে তুমি সুখীজন
শখের বাগানে মধুর গান,
ছেলে যে তোমার বিলেতফেরত
রাজ ঘরণি বাড়ায়েছে মান।
পাবে বলে তুমি দিয়েছ সকলি
ভরেছ জমার খাতা
সন্ধ্যা হলে যে খোলো বাবুজি—
খরচের দুটি পাতা।

লজ্জিত হয়ে অবনত শিরে
বলিল সে ভিখারিরে,
তুমি জ্ঞানবান জ্ঞান করো দান
ঝুলি লয়ে কাঁধে ফিরে।
দিনের শেষে গোধুলি লগ্নে
খরচের মানে বুঝলাম,
দু-মুঠো ভিক্ষে দিয়ে তোরে আজ—
খরচের খাতা খুললাম।

তপন পাল

হনন

ব্যর্থ জীবনের বোঝা বয়ে চলেছি
হাজার ছলনায় মুড়েছি
কখনো সুখ
শান্তি
কিংবা আনন্দে
শব্দহীন
বেদনহীন
মুক্তিহীন জ্যান্ত লাশ যেমন,...
প্রতি গ্রাসে
বঁটির ডগায় ডগায় কেটেছি নিজেকে
অকাল বন্যার আঘাতের মতো
সহসা বুনেছি প্রেম আবার
সে ক্রমশ কালো আরো।

হিসেবের পলে পলে তুমি চলো
আমি বড় বেমানান
নিজেকে খুঁজবো বলেই হাত ধরেছিলাম
চলতে চেয়েছিলাম
আজ একাকী এ-পথে,

আমি ভেঙে গেলে ক্ষতি নেই কারো
এ-শূন্যতা ও ব্যর্থতা আমারই জন্য কেবল
ভয় পেও না
তোমার পথে ফুল ঝরবে
ভরবে রোশনাই
সুখের চাঁদ মরীচিকা
স্বপ্নছেঁড়া ক্ষতর মতো ছলনাময়ী
তার কাছে আমার হৃদয়
বড় অবহেলার

রংহীন শুকনো পথে এ-ধূসর অভিসার
ভুলতে চেয়েও পারিনি
শুধু...
ভাঙা হৃদয়ে আবর্জনার মত লীন,

আমার পথ ফুরাবে
তোমার থেকে বহু দূরে
মুছে যাবো পৃথিবীর ধূলাঝড়ে
ফিরবো না আর
কোনোদিন ওই দু'চোখে।

প্রীতম পাল

জলছবি

তোমার ছবি আঁকতে গিয়ে
এঁকে ফেলি আকাশ আর মাটি
তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখবো ভেবে
লিখি জল-কাদার-উপন্যাস
তোমার মূর্তি গড়বো বলে ছেনি-হাতুড়ি-তুলি
নির্মিত হয় একটি কলসী ও দাঁড়-কাক

দেওয়ালের কোণে মাকড়সা ঘর বাঁধে
আয়নায় ফুটে ওঠে মোমবাতির ছবি
আগুনে ঝল্‌সায় ডানাকাটা রাত্তির...

তোমার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি
ঘুমের ভেতর মাকড়সার সংসার।

সঞ্জয় কুমার ঘোড়াই

শিশির বিন্দু

এক ফোঁটা শিশির বিন্দু
তার কি আর দাম ছিল
ছোট বলে সবাই তারে
পা দিয়ে দোলে যাচ্ছিল।

বৃক্ষ তা বক্ষে ধরে
করল তারে ফুল
চারিদিকে সৌরভ ছড়ায়
ভ্রমরা হল আকুল।

ঘাসগুলি মেঘের কাছে
নিল এক ফোঁটা জল ধারে
না হলে যে মরুদেশে
গরু-ছাগল থাকবে উপবাসে।

শুষণি শাক মিলছে পাতা
শিশিরে ভিজে
দুর্দিনে নবান্ন পাঠাবে
ঘরে ঘরে অশ্রুধারা মুছে।

বেলা দাস

মন

ভেতর ঘরেই থেকো তুমি
দরজা-জানলা বন্ধ
শব্দ যদি না আর আসে
থাকবে ঠিক তাল ও ছন্দ।

তবে যদি বৃষ্টি ডাকে
নদী বলে কাছে আয়
রাত্রি একটু ছুঁয়ে দিলেই
সব অভিমান মুছে যায়।

তখন আকাশ ছন্নছাড়া
তখন আমি বাধ্য নই
তখন আমার মন্দ সবই
তখনই কেবল মানুষ হই।

স্বনির্বাচনে
গুচ্ছ
কবিতা

দুটি কবিতা

শেলী সিন্‌হা (গুহ রায়)

চাই তাপ

চোখের জলে মনের আগুনকে
সহজেই নিভিয়ে ফেলা যায়
কিন্তু সেই আগুনকে জিইয়ে
রাখাটাই মস্ত বড়ো কাজ।
উত্তাপের এখন তীব্র প্রয়োজন
জমাট বরফ—
তৃষ্ণার্ত চাতকের ফাঁক করা ঠোঁট।
নিস্তেজ ন্যাতানো মিছিল
নুব্জ কিন্তু নয়,
চাঙ্গা করতে চাই শুধু—তাপ,
গনগনে চাপ চাপ তাপ।
ঘামঝরা বাতাসের ক্ষুব্ধ লেলিহান
অবগুণ্ঠনহীন প্রকাশে
বহ্নিমান রুদ্রমূর্তি ধরে
তছনছ করে দিক
যত্ত সব কিছু—অবশ্যই জঞ্জাল।

সামহালকে

যে গান আমার ভাল লাগবে
আমি তা গাইবই,
যে ছবি আমায় টানবে
ইচ্ছে খুশি মতো তা আঁকবই।
কার কি বলার আছে।
কেই বা কী বলবে,
বলবে বড়োজোর—
তোমার গান ঘরে আটকে রাখো
তোমার ছবি ঘরে লটকে রাখো
কীই-বা এসে যায়।।
কথার কারখানায় খালি জিঞ্জির তোলো।
দেখেশুনে ঝোপ বুঝে জানলা খুলো
ওখানে নিক্তির সুতো সমান টানা
ইয়ার...সামহালকে চল্‌না,
সামহালকে চল্‌না।

গুচ্ছ কবিতা

অমর চক্রবর্ত্তী

আমার বাড়ি

আমি জীবনের গান গাই
আমি মানুষের কথা বলি
সৃষ্টিসুখের উন্মাদনায়
নতুন পথে চলি।

কৃষকের মনে আশার আলো
শ্রমিকের মুখে হাসি
জীবন যুদ্ধে সংগ্রামী আমি
তারাদের মাঝে শশী।

অজানা পৃথিবী—অচেনা সবাই
কেও নয় পর।
মানুষেরই গড়া বিশ্বসমাজ
বিশ্বই আমার ঘর।

পথ

চাই না কিছুই আমার জন্য
মনেতে অনেক আশা
জাগ্রত হোক মানুষের প্রেম
নিবিড় ভালবাসা।

শোষণমুক্ত হবে সমাজ
স্বচ্ছ প্রশাসন
থাকবে না কোনো দুর্নীতি আর
ঘৃণ্য অপশাসন।

জাতিতে জাতিতে রবে না প্রভেদ
আমরা ভারতবাসী
হিমালয় হতে কন্যাকুমারী
একটি মহান জাতি।

কুহকিনী চাঁদ

আমার কুটিরে সাথী হয়ে চাঁদ
এসেছিল আশ্বিনে
হয়েছিল কথা, প্রেমের বলাকা
নবমীর রাত্রিরে।

পূর্ণিমা রাতে উজ্জ্বল তুমি
আকাশে আলোর মেলা
মিলনের ক্ষণ, লক্ষ্মীতিথিতে
করেছি অনেক খেলা।

দুজনার মন দুইটি হৃদয়
বেঁধেছিনু এক সুরে,
আকাশেতে তুমি দিলেনাতো দেখা
অমাবস্যার রাত্রিরে।

মিলনের ক্ষণ হল তিমির
বিনিদ্র রজনী
প্রেমের প্রদীপ নিভে গেল মোর
চাঁদ তুমি কুহকিনী।

মিনতি

তোমার কাছে আসব বলে
সারাটি রাত্রি জেগে
স্মৃতির রাজ্যে গেঁথেছি মালা
তোমাকে পরাব বলে।

প্রখর সূর্যে ঢেকে মেঘমালা
বায়ু খেলেছিল বাতাসে
বরষার মেঘ হয়নিতো কালো
রবি জেগে ছিল আকাশে।

জুঁই চামেলীর মিষ্টি সুবাস
হয়েছিল পথে সাথী
চঞ্চল মন নবীন প্রাণে
জাগালে অতীত স্মৃতি।

বাধা বহু পথ ঘুরে
এসেছি তোমার দ্বারে।
স্মৃতির চিতায় ভাসব দুজনে
একটি হৃদয় গড়ে।

পথচলা

প্রভাতে রবির মিলেছে দেখা
চাঁদ গিয়েছে শয়নে।
দাঁড়িয়ে ছিলাম নদীর এপারে
কথা ছিল যাব দুজনে।

সাগর, পাহাড় নদীর প্রাচীর
হবেনাকো কোনো বাধা।
চলব দুজনে সুদূর যে পথে
হয়নি কখনও চলা।

ভালবেসে মন দিয়েছি দুজনে
যা ছিল গোপনে জমা।
মিষ্টি প্রেমের পরাগমিলন
হৃদয়ে হৃদয়ে গাঁথা।

যে পথে সূর্য আসল আকাশে
গেল সে অন্য পথে
আমাদের চলা হবেনাতো শেষ
চলেছি নতুন পথে।

চিরদুঃখী

দুঃখ যাদের জীবনসাথী
সুখের স্বপ্ন মিছে
আশার আলো জ্বলে না কখনও
তিমির রাত্রি পিছে।

শিশুকাল হতে বঞ্চনা আর
অবিচার সয়ে সয়ে
কোমল হৃদয় হয়েছে কঠিন
সামাজিকতার দায়ে।

ভালবাসা তারা পায়নি কখনও
পায়নি মমতা, মায়া।
চির সংগ্রামে দুঃখী জীবন
প্রভাতে মেঘের ছায়া।

দেখেছি তাদের চোখের জলের
মূল্য দেয়নি কেহ
অবহেলা করে সমাজ তাদের
করছে শুধুই হেয়।

সংগ্রামী তারা জীবনযুদ্ধে
আজকে বিবেকহীন।
সমাজের ঘৃণা করেছে কঠোর
আবেগ হৃদয়হীন।

বন্ধু তোমায় বুঝিনিতো ভুল
জেনেছি তোমার ব্যথা।
তোমার দুঃখে আমার অশ্রু
ব্যথিত হৃদয় কথা।

গুচ্ছ কবিতা

শ্যামল কুমার সরকার

মাতৃভূমি

এ পৃথিবী আমার বড়ো ভাল লাগে
এই নীলাকাশ, সবুজ প্রান্তর
প্রাণভ'রে শ্বাস নিয়ে তোমাদের মাঝে বেঁচে রব
যখন উঠবে ঝড়
আমার কুটিরে আশ্রয় নিও
পৃথিবীকে দিও না সরায়ে
সে যে বড়ো আপনার জন।

জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করতে করতে ...

তুমি আর আমি রাস্তায় ঘুরে ঘুরে
নুড়ি পাথর কুড়িয়ে যাব শুধু
বিকেলের পড়ন্তবেলায়
দু'জনে কোথাও কোনো এক
পুরানো বটবৃক্ষের স্নিগ্ধছায়ায় বসে
জীবনের হিসাব কষব,
ক্রমে ঘনিয়ে আসবে সন্ধ্যা
কালো ঘুটঘুটে অন্ধকার
আমাদের চোখের সামনে
রঙিন পর্দা টেনে দেবে,
অতীতের দিকে পিছন ফিরে আমরা
চলতে থাকব অনির্দিষ্টের পথে।
অন্ধকারে কিছুই দেখতে না পেয়ে
হাতড়ে হাতড়ে পথ চলব,
রাত শেষ হয়ে যাবে চলতে চলতে ...
ভোরের আলোয় নুড়ি পাথরগুলো
ঝিকমিক করে জ্বলে উঠবে

অপার বিস্ময়ে তাদের দিকে চেয়ে
ভ'রে উঠবে বুক।
জীবনের পাথেয় সঞ্চয় করতে করতে
আমরা একদিন বিলীন হয়ে যাব
এই পৃথিবীর মাটিতে।

আত্ম-সমালোচনা

শত সমস্যা জর্জরিত কলকাতায়
মাঝে মাঝে বন্যা হলে বেশ ভাল হয়
যত জঞ্জাল, ময়লা, আবর্জনা সব ধুয়ে মুছে যাবে
শহরের রাস্তা, উদ্যান ও ধূলিকণা মুক্তি পাবে
মানুষের পাশবিক অত্যাচার থেকে।
মানুষ মনে মনে শান্তি পাবে
বাড়িগুলো সব বাসযোগ্য হবে
তাতে বিষাক্ত নদীটা আরো একটু কলুষিত হবে
হয়তো দু-চার দিনের জন্য কারো কারো
একটু-আধটু ভোগান্তি হবে
কিন্তু তাতে ক্ষতি কি?

মাঝে মাঝে যদি কালবৈশাখী ঝড় কিংবা
আয়লা বা ভূমিকম্প হয়
বেশ ভালো হয়
যত সব অবৈধ নির্মান ও অনৈতিক কাজ
তাতে চাপা পড়ে যাবে
হয়তো কারো কারো একটু-আধটু ভোগান্তি হবে
কিন্তু তাতে ক্ষতি কি?

যদি মাঝে মাঝে বিকৃত সমাজে
কোনো মহাপুরুষের উদয় হয়
যদি কোনো ধর্মযুদ্ধ হয়
তবে মানুষ একটু শুদ্ধ হবে

হবে ঔদ্ধত্যের পরাজয়
হয়তো কেউ কেউ তা মানতে পারবে না
তবু কারো কারো তো শান্তি হবে
এতেই তো লাভ,
কোনো ক্ষতি আছে কি?

এ পৃথিবী বড়ো ক্লান্ত, একটু শান্তি চাই
সবাই স্বার্থপর হয়ে গেছে
মানুষের মধ্যে আর মানুষ নেই
পরিবর্তনের ঢেউয়ে আমরা ভুলেছি অতীত
সভ্যতা, সংস্কৃতি সব ভূলুণ্ঠিত আজ
দ্বন্দ্ব-দ্বেষ ভুলে
শান্তির খোঁজে সময় কাটালে
কোনো ক্ষতি আছে কি?

নিজেকে সংশোধন করার এই তো সময়
ভুলতে হবে আমাদের জয় পরাজয়
ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে
স্বার্থত্যাগ করলে
কোনো ক্ষতি হয় কি?

অপেক্ষা

যখন জন্ম নিলাম এই পৃথিবীতে
রক্তমাখা শরীরে দুর্গন্ধের আঁচ পেলাম
বড্ড ঘেন্না হল,
হিসাব বহির্ভূত সময়ে পৌঁছেছি, তাই
প্রচণ্ড অস্বস্তিতে কেটেছে সবার
দুদিন আধমরা হয়ে পড়েছিলাম, তারপর
যখন চোখ মেললাম
সূর্যের প্রচণ্ড তাপে চোখ ঝলসে গেল
চোখ বুজলাম আমি।

বিষাক্ত আবহাওয়ায়
শ্বাসরোধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম,
একটু শুদ্ধ হাওয়ার জন্য কেঁদে উঠেছিলাম
সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

সেদিন থেকেই অপেক্ষা
অপেক্ষাই করে গেলাম এতদিন
সবাই সান্ত্বনা দিল, শান্ত হলাম, কিন্তু
শান্তি মিলল না।

মাতৃকোলে মাতৃদুগ্ধের জন্য লাইনে দাঁড়িয়েও
সময়মত কিছুই পাইনি।
ভেজালে পরিপূর্ণ এই পৃথিবীতে
মায়েরাও যে ছেলেকে ধোঁকা দেয়
তা জানতে পারলাম।

(আমি) অপেক্ষা করতে করতে বেড়ে উঠলাম
রুগ্ণ, শীর্ণ শরীরে কোনোমতে উঠে দাঁড়ালাম
নিজেকে কেমন যেন ছোটো মনে হল
কাঁদতে ইচ্ছা করলো, কিন্তু পারলাম না।
চোখের জল শুকিয়ে গেছে কখন, কে জানে!
ক্ষীণদৃষ্টিতে যা দেখলাম, তাতে
আমার বুকটা শুকিয়ে গেল।
পৃথিবীটা যেন এক মহাশ্মশান!
তবুও দমলাম না
চারিদিকের হাহাকার উপেক্ষা করে
শত শ্যেনদৃষ্টিকে এড়িয়ে
এই অশান্ত পৃথিবীতে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার জন্য
আবার বুক বাঁধলাম।

তারপর শুধুই অপেক্ষা,—
স্কুলের লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে
পায়ে বাত ধরে গেল,

কলেজ জীবনটাও এভাবেই কাটল।
দুটো ভাতের জন্য যে এত হাভাতে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে
তা জানতাম না, শেষে
অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে একটা চাকরি তো জুটল, কিন্তু
সেখানেও যে ল্যাং মারার জন্য
এত লোক বেলাইনে ঢুকে পড়ে
সুযোগের অপেক্ষায় লাইনে দাঁড়িয়ে আছে
তা খেয়াল হল অনেক পরে, যখন
আমি ল্যাং খেয়ে ছিটকে পড়েছি অনেক দূরে।
আবার অপেক্ষা,
সামনের দিকে চেয়ে দেখলাম
অগুনতি মানুষ, পিছনেও তাই
মাথা ঘুরে গেল
বিকিকিনির বাজারে আমি হারিয়ে গেলাম।

দুটি কবিতা

সুদীপ বিশ্বাস

বৃষ্টি-আলো রঙ্

দাও আলো, অনন্ত সঞ্জীবনী প্রেম,
দুচোখ ভরিয়ে দাও অনির্বাণ ভালোবাসা
বাঁধভাঙা উৎসব।
দৃষ্টির নীলকান্ত মণি, খুঁজে দাও
আত্মজন কথা, ভরে দাও
এ প্রাণে মাতাল সমীরণ
গন্ধে গানে গানে।

আকাশ জুড়ে বৃষ্টি দাও, প্রিয় জল
অঝোর ধারায়, বাতায়নে আনো
প্রিয় মুখ দেখিবারে আরবার
বৃষ্টি-ধোয়া স্নিগ্ধ চোখদু'টি।
মায়াময় স্নেহ প্রেম
সামুদ্রিক দৃষ্টি অনিবার, গভীরে গোপন আলো
আনন্দ উদ্বেল শরীর মহোৎসবে।।

চলো বদলে যাই

বদলাবো বলেই বদলানো যায় না
কিছু কিছু পিছুটান রয়ে যায় পিছনে,
সামনে পড়ে থাকে দিগন্তের ডাক—
তবু বদলাই নীরবে নিভৃতে।

কিছু বদলায়, কিছু বদলায় না
মন পেতে চায় নতুনের স্বাদ—
হাত বাড়ালেই বন্ধু পাবো বলে,
দু'হাত মেলে ধরি নতুনের দিকে
কিছুক্ষণ কিছুটা সময় অন্যভাবে,
আরও অন্যভাবে পাব বলে—
বদলে যেতে চাই।
একঘেয়ে ক্লান্ত জীবন দু'পায়ে ঠেলে
চলো বদলে যাই।।

রঞ্জন ব্যানার্জি

মাটি

কোটি কোটি প্রাণীর
মরণ বাঁচন মাটি
মাটিতেই অঙ্কুরোদ্গম
মাটিতেই ফল
বাঁধ বাধে মাটি
মা-টি আমার নমস্য
মা-টিই আমার খাঁটি
মাটি নিয়ে ডাণ্ডাবাজি
মাটি নিয়ে লড়াই
মা-টি আমার বড্ড ভালো
তাইতো করি বড়াই।।

ঢেউ

কিছুতেই ধরা দেয় না
হাত বাড়ালেই
উড়ে যায় সুখটা।
কল্যাণেশ্বরী মাইথনের
টিলায় বাকে
আছড়ে পরে সাক্ষী
দামোদরের ঢেউ
চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়
অণুকণা, কানায় কানায়
আমারে জানায়
দু হাত ভরা প্রেমের কণা
নিয়ে গেছে
অন্য কেউ।।

ভাদুমা

শেষ ভোটের বাজার
কলা মূলা কুড়ি-বুড়ি
রেগা—কত দিন?
চ্যালা চামুণ্ডারা
বাগাতে ব্যস্ত
তুমি পাথর ভাঙতে,
তবু খুশি উপচে পড়া
কেন? কেন ভাদুমা?
এত উল্লাস কেন?
তোমারই পাথরের প্রশস্ত পথে
পরিবর্ত্তনের ব্যাকগিয়ারে
চুরমার হলো তোমার
শাঁখা-পলা...।
সেদিন তোমার গগনভেদী
স্বামীহারার চিৎকার
ভাড়া করে নিয়ে গেল
দিল্লির সুবেদার
কাক চেনে ময়ূরে
'ভাদুমা'—তুমি সেই তিমিরে
ভাদুতলায় যাও ফিরে।।

দুটি কবিতা

রতনকুমার মৃধা

স্বাধীনতা

আজকের সেই স্বাধীনতা—
যে স্বাধীনতা এনেছিলো রূপালী দেশ
রাতের সঙ্কট জীবনের এক মুক্ত বাতাস।
যেখানে আছে পড়ে রক্তের ধূলির রেখা।
আজকের সেই স্বাধীনতা—
রক্তমাখা চিহ্ন নিবিড় শ্যামল ধরায়
আছে যেখানে লক্ষ শহিদের প্রাণ নিষুপ্তে
ফুটে ওঠা কুসুম কলির এক কানন।
আজকের সেই স্বাধীনতা—
রুদ্ধ অন্ধকার থেকে দীপ্ত আশার বান
নিশ্চল স্বপ্নের প্রত্যাশার ভালোবাসা
ক্ষয়িত জীবনের মহা উৎ-সর্জন।
আজকের সেই স্বাধীনতা
রক্তিম উদ্ভাসিত বীর শহিদের শিহরন
কানে বাজে রোমাঞ্চকর বিস্ফোরণ
সুস্পষ্ট বিদ্রোহীদের দুর্জ্ঞেয় প্রাণ
শহিদ, তোমাদের জানাই সেলাম, সেলাম!

ব্যবধান

ইচ্ছে করে যেতে সেই নীলদেশে
তৃষিত জলধারা মোহ আছে পড়ে
রাতের জোছনায় জ্বলে ওঠে
নির্বিকার নিস্তব্ধ শশী ওই আকাশে।
চেয়ে থাকি আমি দৃষ্টির চোখে
পিছন ফিরে চেয়ে থাকি না
কে আছে মোর সাথে?
শুধু অন্তর অন্তরালে একটু পাওয়া
নিঃস্বার্থ অথচ মোহনহীন প্রাণে
সেই চাওয়া—সেই পাওয়া
তার মাঝে ব্যবধান কত?
পরিমাপ নেই জানা।

গুচ্ছ কবিতা

তপন দে

প্রত্যাশিত প্রেক্ষিত

সবকিছু বাঁধা ছকে, একের পর এক
আসে যায়, শেষ হয় পল্লবের বেলা,
চলমান জীবন, ওঠাপড়ার টানাপোড়েন,
গতানুশোচন, ঝড়ে তারণিতে চলা।।

পিঠ পেতে কশাঘাতে ভাবনার অপূর্ণতা
শয়নে স্বপনে শিহরিত মননের ধারাপাত,
উল্লাস, হাসি-গানের যাওয়া আসার মাঝে
হৃদয়ে যায় শোনা যন্ত্রণার করাঘাত।।

চাওয়া-পাওয়ার রোশনাই জয়ের ঝলকানি
সায়ক বিদ্ধ মানুষ ক্ষেত্রজ্ঞের খেলনা
চড়াই-উতরাইয়ে জীবন একটুকু উজ্জ্বলতা
ক্লিষ্ট চলাচলে তাঁর অসীম প্রবাহিনী করুণা।।

সে যায় না হারিয়ে

পিঠ পেতে আছি শুয়ে
ঘোড়সওয়ার ছুটে যায়
যাকে দেখেছি রাজপথে
কখনও কোনো রেস্তোরাঁয়।।

হাজার মানুষের ভিড়ে
সে যায় না হারিয়ে
সুন্দর-অসুন্দরের মাঝে
ধূলিঝড়ে বৈশাখে
অতীন্দ্র ইন্দ্রিয়ে তার ছুটে চলা
শুরু আছে শুধু শেষ তার নেই।।

উত্তাপ

দিনের আলোয় সূর্যের কাছে বলেছি
এভাবে আর পুড়িয়ে দিও না—
শুধু শরীরের বাইরে নয়
তোমার তাপে পুড়ছে অন্তরও।
রক্তের মাঝে এক চোরাস্রোতেও
সেই প্রখর রৌদ্রের তাপ—
ঠিক দুপুরে মাথার উপরে যখন তুমি
সেই তাপ নিয়েও নিজেকে সামলে রাখি।
বেলাশেষে তোমার স্নিগ্ধতার মাঝে
আমার বোঝাপড়া—
যে তাপে প্রাণসঞ্চার
যে স্নিগ্ধতায় ভালবাসা,
যে রক্তস্রোতে উত্তেজনা—
সেই আসে কোমল হয়ে অন্তরে।
থাক ওইটুকু উত্তাপ
যে উত্তাপেই বেঁচে থাকা।।

বিধি

বিতংসে সততই আটকে পড়ে সুখপাখি
একফালি মেঘ যদিও বা বৃষ্টি আনে
কাঠফাটা রোদ্দুরে শুকিয়ে যায় চাওয়া-পাওয়া
পরশপাথর যায় না জানা আছে কোনখানে।।

ভালবাসা থাকে সুখনীড়ে ভালবাসার ভিতর
ঝিনুকের পেটে উপল মুক্ত অকলুষ অক্ষয়
যষ্টি হারিয়ে অন্ধ খুঁজে ফেরে পথ
বার বার ফিরে করুণার কাছে জীবনের পরাজয়।।

এই
বাংলার
গল্প
ও
উপন্যাস

ওষুধ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

উকিলবাবু এখনো আসেননি। মক্কেলরা বসে বসে মশা মারছে।

দুর্গাপদ খুবই ধৈর্যশীল লোক। সে জানে, বড় অফিসার বড় ডাক্তার, বড় উকিল ধরলে ধৈর্য রাখতে হয়। যে যত বড় সে তত ঘোরাবে।

দুর্গাপদ রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকের পানের দোকানে গিয়ে লেমনেড চাইল। তেষ্টা পেয়ে রয়েছে অনেকক্ষণ। উকিলবাবুর বাড়ির চাকরের কাছে জল চাইলে দিত নিশ্চয়ই, কিন্তু চাইতে কেমন ভয়-ভয় আর লজ্জা লজ্জা করছিল তার।

দোকানদার বুড়ো মানুষ। তার দোকানটাও তেমনি কিছু বড় দোকান নয়। ছোটে মোটো, গরিবগুর্বোর দোকান। বিড়ি চাও আছে, পিলাপাতি কালাপাতি চমন বাহার মোহিনী জর্দা দেওয়া পান পাবে, ক্যাপস্টান গোল্ড ফ্লেক চাও তাও মজুদ, কম দামী কোল্ড ড্রিংকস রাখতে হয় বলে তাও রাখা, কিন্তু বেশি বায়নাক্কা হলে অন্য দোকান দেখতে হবে।

বুড়ো তার লাল বাক্স খুলে বরফে রাখা বোতল অনেক বেছে গুছে একটা বের করে হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে—এরকম ঠাণ্ডা হলে চলবে?

অন্যমনস্ক দুর্গাপদ বলে—হুঁ।

লজেনচুসের গন্ধওলা ঠাণ্ডা, মিষ্টি ঝাঁঝালো জলটা খেতে গিয়ে বুকের জামা ভিজে গেল দুর্গাপদর। কাগজের নল দিয়ে টেনে সে এসব খেতে পারে না। চুরুক চুরুক খাওয়া তার পছন্দ নয়। ঘঁৎঘঁৎ করে না গিললে তৃপ্তিটা পায় না।

জলটা খেতে খেতে চেয়ে আছে উল্টোদিকের বাড়িটার দিকে। না, উকিলবাবু এখনো আসেননি।

কতকগুলো ব্যাপার আছে যা কেবল এই উকিল, ডাক্তার বা অফিসাররাই জানে, আর কেউ জানে না। মুশকিলটা সেখানেই। তার ওপর দুর্গাপদ কস্মিনকালে মামলা মোকদ্দমা বা কোর্টকাছারি করেনি। উকিলবাবু আগের দিনই সাফ বলে দিয়েছে—কেউ বিয়ে ভাঙতে চাইলে আটকানো কি যায়? কিছুদিন ঝুলিয়ে রাখতে পারি বড় জোর। আর চাও তো, ভাল মাসোহারার ব্যবস্থাও করে দিতে পারি। সে এমন ব্যবস্থা যাতে বাছাধনকে দ্বিতীয় বার বিয়েয় বসতে খুব ভেবে-চিন্তে বসতে হবে।

কিন্তু দুর্গাপদ তার জামাইকে খুব একটা অপছন্দ করে না। লোকটা নরম সরম, ভদ্র, বিনয়ী, খরচে ধরনের। বরং তার মেয়ে লক্ষ্মীই ট্যাটন। বিয়ের আগে পাড়া জ্বালিয়েছে। বিয়ের পর বছর দুই যেতে না যেতে বাপের বাড়িতে এসে খাদিমা হয়ে বসেছে। জামাই নিতে আসেনি। জামাইয়ের বদলে দিন কুড়ি আগে

জামাইয়ের পক্ষের এক উকিলের চিঠি এসেছে। জামাই ডিভোর্সের মামলা আনছে।

তার মেয়ে লক্ষ্মীর তাতে কোনো ভাব বৈলক্ষণ নেই। রেজিস্ট্রি করা খামটা খুলে চিঠিটা তেরছা নজরে পড়ে বারান্দায় ফেলে রেখে পা ছড়িয়ে উকুন বাছতে বসল সরু চিরুনি দিয়ে। বাতাসে উড়ে উড়ে ঘুড়ির মতো লাট খেয়ে চিঠিটা করুণ মুখে এসে উঠোনে দুর্গাপদর পায়ের পাতায় লেগে রইল। দুর্গাপদ উঠোনে বসে একটা ভাঙা মিটসেফের ডালায় কব্জা লাগাচ্ছিল। ইংরেজিতে লেখা চিঠিটা বুঝতে একটু দেরি হল বটে, কিন্তু অবশেষে বুঝতে এবং মাথাটা তখনই একটা পাক মারল জোর।

জামাইবাবাজি যে লোক খুব খারাপ নয় তা জানে বলেই দুর্গাপদ কটমট করে তাকায় মেয়ের দিকে। কিন্তু এসব তাকানো টাকানোয় ইদানীং আর কাজ হয় না। কোনোদিন হতও না।

—বলি ব্যাপারটা কি শুনছিস? হুংকার দিল দুর্গাপদ।

সূক্ষ্ম চিরুনিতে উঠে আসা চুলের গোছা আলোয় তুলে উকুন খুঁজতে খুঁজতে নির্বিকার গলায় বলে—দেখলে তো, আবার জিজ্ঞেস করছো কেন?

দুর্গাপদ বুঝল পুরুষকারে কাজ হবে না। গলা নরম করে বলল—স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া হয় সে তো দিন রাত্তিরের মতো সত্য। তা বলে উকিলের চিঠি কেন? তেমন কী হল তোদের?

লক্ষ্মীর মা ঘরেই ছিল। বরাবরের কুঁদুলী মেয়েছেলে। সেখান থেকেই গলা তুলে জিজ্ঞেস করল—কে উকিলের চিঠি দিল আবার?

—নবীন। হাল ছেড়ে দুর্গাপদ বলে।

—জামাই?

—তবে আর কে নবীন আছে?

লক্ষ্মীর মা কিছু মোটাসোটা। ফর্সা গোলগাল প্রতিমার মতো চেহারা। বড় বড় চোখে রক্ত হিম-করা দৃষ্টিতে চাইতে পারে। দুর্গাপদর প্রাণ এই চোখের সামনে ভারী ধড়ফড় করে ওঠে।

ইংরিজি জানে না, তবু উঠোনে নেমে এসে চিঠিখানা হাতে নিয়ে একটু ঠাণ্ডা চোখে চেয়ে রইল সেটার দিকে। তারপর দুর্গাপদকে জিজ্ঞেস করল, ডিভোর্স করবে নাকি?

—তাই তো লিখেছে।

—করলেই হল? আইন নেই?

—ডিভোর্সের কথা তো আইনেই আছে।

—তোমার মাথা। ডিভোর্স হল বে-আইনি ব্যাপার। কেউ ডিভোর্স করেছে জানতে পারলে পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। জেল হয়।

লক্ষ্মীর মা তার বাপের বাড়ি থেকে যা যা শিখে এসেছে তার ওপরে আজ পর্যন্ত কেউ তাকে কিছু শেখাতে পারেনি। অনেক ঠেকে দুর্গাপদ আর সে চেষ্টা করে না। তবু বলল—জেল দাওগে না। কে আটকাচ্ছে পুলিশ যেতে৷

লক্ষ্মীর মা বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে কঠিন স্বরে বলল—আমি যাবো পুলিশের কাছে? তবে তুমি পুরুষ মানুষ আছো কী করতে?

এ নিয়ে যখন লক্ষ্মীর মার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক চলছিল তখন লক্ষ্মী ম্যাটিনি শোয়ে যাবে বলে রান্নাঘরে গিয়ে পান্তা খেতে বসল।

লক্ষ্মীর মায়ের বাঁজা নাম ঘুচিয়ে ঐ লক্ষ্মীই জন্মেছিল, আর ছেলেপুলে হয়নি। একমাত্র সন্তান বলে আশকারা পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সে দুর্গাপদর কাছে যতটা তার চেয়ে ঢের বেশি তার মায়ের কাছ থেকে। সারাদিন মায়ে মেয়ের গলাগলি ভাব, গুজগুজ ফুসফুস। দুটো মেয়েছেলে একজোট, অন্যধারে দুর্গাপদ একা পুরুষ। কীই বা করবে? চোখের সামনেই মেয়েটা বখে গেল।

লক্ষ্মী সিনেমায় বেরিয়ে যাওয়ার পর লক্ষ্মীর মা দুর্গাপদকে বলে—জামাই খারাপ নয়, কিন্তু ওর বাড়ির লোকেরা হাড়জ্বালানি। সব কটাকে কোমরে দড়ি বেঁধে সদরে চালান দিয়ে আসবে। যাও। এ কী কথা! দেশে আইন নেই? কোর্ট কাছারি নেই? পুলিশ জেলখানা নেই? ডিভোর্স করলেই হল?

এসব ক্ষেত্রে পুলিশের কাছে গিয়ে লাভ নেই তা দুর্গাপদ জানে। কিন্তু কোথায় যেতে হয় তা তারও মাথায় আসে না। সে তেমন লেখাপড়া জানে না, খুব ভদ্রসমাজের লোকও সে নয়। তবে ইলেকট্রিক মিস্তিরি হিসেবে গয়েশপুর থেকে কাঁচরাপাড়া অবধি তার ফলাও প্র্যাকটিস। বলতে কি উকিল, ডাক্তার, অফিসারদের মতোই তার গ্রাহককেও ঘুরে ঘুরে আসতে হয়। বলতে নেই তার টাকা অঢেল। সে সাইকেলখানা নিয়ে ভরদুপুরে বেরিয়ে পড়ল।

বুদ্ধি দেওয়ার লোকের অভাব দুনিয়ায় নেই। একজন দুঁদে এক উকিলের ঠিকানা মায় একটা হাতচিঠিও দিয়ে দিল। তাতে লাভ হল কিনা দুর্গাপদ জানে না। প্রথমদিন জামাইয়ের উকিলের দেওয়া চিঠিটা পড়ে দুঁদে উকিল মোট মিনিট দশেক তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পাঁচিশ টাকা নিল। কিন্তু তবু কোনো ভরসা দিতে পারল না।

দুর্গাপদ আজও এসেছে। বুকের মধ্যে সারাক্ষণ ঢিব-ঢিব, মুখ শুকনো, গলা জুড়ে অষ্টপ্রহর এক তেষ্টা। মেয়েটা ঘাড়ে এসে পড়লে সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। আর হারামজাদি শুধু যে ঘাড়ে এসে পড়বে তা তো নয়, ঘাড়ে বসে চুল ওপড়াবে। পাড়ায় ঢি-ঢি ফেলে দেবে দু দিনেই। স্বভাব জানে তো দুর্গাপদ।

গতকাল সে লক্ষ্মীকে খুব সোহাগ দেখিয়ে বলেছিল—মা গো, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বনিবনা করে থাকো গে যাও। আমি সঙ্গে যাবো, বুঝিয়ে সুঝিয়ে সব ঠিকঠাক করে দিয়ে আসব। থাকতে যদি পারো তো মাসে তিনশো টাকা করে হাত খরচ পাঠাবো তোমায়।

শুনে লক্ষ্মীর কী হাসি! পা ছড়িয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে, এলো চুলে বসে ছিল। হাসির চোটে সেই চুলে মুখ ঢাকা পড়ল। বলল—মাসোহারার লোভ দেখাচ্ছো? তুমি মরলে সর্বস্ব তো এমনিতেই আমি পাবো।

মূর্তি দেখে দুর্গাপদ ভারী মুষড়ে পড়েছিল। লক্ষ্মীর মা বলল—পুরুষমানুষ বোকা হয় সে তো জানা কথা। কিন্তু তোমার মতো এমন হাঁদারাম আর মেনিমুখো তো জন্মেও দেখিনি। লক্ষ্মী শ্বশুরবাড়ি যাবে কেন, ওর সম্মান নেই? জামাইদের দেমাকের দিন শেষ হয়ে গেছে। তারা পায়ে ধরে নিতে এলেও যাবে না। এ বাড়িতে বাকি জীবন বসে বসে খাবে। মেয়ে কি ফ্যালনা?

উকিলবাবুর গাড়ি এসে থামল। তাড়াহুড়োয় দুর্গাপদ লেমনেডের দাম দিতে ভুলে গিয়ে রাস্তা পেরোতে যাচ্ছিল। পিছন থেকে "ও দাদা দাম দিয়ে গেলেন না" শুনে লজ্জা পেয়ে ফিরে এসে দাম মেটাতে গেলে বুড়ো দোকানদার মোলায়েম গলায় বলল—উকিলবাবুর এখন দেরি হবে। হাত পা ধোবেন, জল-টল খাবেন, পাক্কা এক ঘণ্টা, রোজ দেখছি। আপনার নাম লেখানো আছে তো?

দুর্গাপদ মাথা নেড়ে বলল—জনা আষ্টেকের পর।

—তাহলে আরো দেড়ঘণ্টা ধরে নিন।

—বড় উকিল ধরে বড্ড মুশকিল হল দেখছি।

—আসানও হবে। উনি হারা মামলা জিতিয়ে দেন। কত খুনিকে খালাস করেছেন।

দুর্গাপদ বলল—কিন্তু আমারটা কিছু হল না।

—আপনার মুশকিলটা কি?

—সে আছে অনেক ঝামেলার ব্যাপার। জামাই ডিভোর্স চাইছে।

—অ। বলে বুড়ো মুখে কুলুপ আঁটল।

দুর্গাপদ লেমনেডের দাম দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে এসে উকিলবাবুর বাইরের ঘরে আরো জনা ত্রিশেক লোকের মধ্যে ঠাসাঠাসি হয়ে বসে থাকে। আড়াই ঘণ্টা বসতে হবে। ঘরটা বিড়ি আর সিগারেটের ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার। শোনা গেল, উকিলবাবু এখনো চেম্বারে আসেননি। জল খাচ্ছেন বোধহয়। গুটি গুটি আরো মক্কেল আসছে।

ঝাড়া তিন ঘণ্টা। হাঁটু ব্যথা হল, মাজা ধরে গেল, হাই উঠতে লাগল ঘন ঘন। তারপর ডাক এল। ব্যস্ত বড উকিলবাবু মক্কেলদের এক দুইবার দেখে

মনে রাখতে পারেন না, তাই ফের পুরানো পরিচয় এবং বখেরার কথা বুঝিয়ে বলতে হল। সব বুঝে উকিলবাবু হাসি হাসি মুখ করে বললেন—ভাঙন রুখতে চাইছেন? আজ হোক কাল হোক এ ভাঙবেই। আমরা ভাবের কথা বুঝি না, কেবল আইন বুঝি। কে কাকে ভালোবাসে বা বাসে না, কার বিয়ে ভাঙা ভাল নয়, বা কার ভাল এসব হল নীতির কথা, ভাবের কথা। আইন তার তোয়াক্কা করে না। বলেন তো লড়তে পারি। কিন্তু খামোকা।

ফের পঁচিশটা টাকা গুনে দিয়ে দুর্গাপদ উঠে পড়ল।

।। ২ ।।

খেয়ে উঠে নবীন বারান্দায় দাঁড়িয়ে ঘটির জলে আঁচাচ্ছিল। এমন সময় দেখল, উঠোনে জ্যোৎস্না পড়েছে। এই হেমন্তকালের জ্যোৎস্নার রকম-সকমই আলাদা। একটু দুধের সরের মতো কুয়াশায় মাখামাখি চাঁদখানা ভারী আহ্লাদী চেহারা নিয়ে হাসছে। বাতাসে চোরা শীত। উঠোনে বসে থাকা ঘেয়ো কুকুরটা এঁটো খেতে খেতে ভ্যাক ভ্যাক করে ডেকে উঠল।

নবীন কাঁধের গামছায় মুখ মুছতে মুছতে শুনল মা তাকে ডেকে বলছে—ও নবীন, গায়ে একটা গেঞ্জি দে। এ সময়কার ঠাণ্ডা ভাল না।

আঁচাতে গিয়ে চারদিককার দৃশ্য দেখে জগৎ সংসার বেবাক ভুলে চেয়ে রইল নবীনচন্দ্র। ঘটিতে আঙুলের টোকা মেরে মৃদুস্বরে একটু গানওগেয়ে ফেলল সে—না মারো না মারো পিচকারি...

ঘেরা উঠোনের যে ধারটায় দেয়ালের গায়ে দরজাটা রয়েছে তার পাশেই মায়ের আদরের দু দুটো মানকচুর ঝোপ আশকারা পেয়ে মানুষপ্রমাণ প্রকাণ্ড হয়ে উঠেছে। এক-একখানা পাতা ডবল সাইজের কুলোকেও হার মানাবে। কুকুরটা ভ্যাক ভ্যাক করে সেদিকেই বারবার ছুটে গিয়ে ফের লেজ নামিয়ে চলে আসছে। নবীনের মুখের দিকে চেয়ে কী যেন বোঝাবারও চেষ্টা করল ভ্যাক ভ্যাক করে।

নবীন গান থামিয়ে বলে—কে?

কচুপাতার আড়ালে কপাটের গায়ে লেগে থাকা ছায়ামূর্তি বলে উঠল—আমি হে নবীন। কথা ছিল। আঁচাচ্ছিলে বলে ডাকিনি, বিষম খেতে পারো তো।

অক্ষয় উকিলের হয়ে এসেছে। আজকাল বড় আলতুফালতু কথা বলে, মানে হয় না।

নবীন উঠোন পেরিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে বাতি জ্বেলে বলে—আসুন।

বিবর্ণ একটা শাল জড়ানো বুড়োটে লোকটা খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে চেয়ারে বসে ঠ্যাঙ তুলে ফেলল। বলল—ডিভোর্সের মামলা বড় সোজা হয় হে।

নবীন ভ্রূ কুঁচকে বলল—ও পক্ষ কোনো জবাব দিয়েছে?

—জবাব এত টপ করে দেবে? অত সোজা নাকি? যা সব আর্গুমেন্ট

দিয়েছি তার জবাব ভেবে বের করে মসিাবিদা করতে দুঁদে উকিলের কালঘাম ছুটে যাবে। তবে এও ঠিক কথা ডিভোর্স জিনিসটা অত সহজ নয়।

নবীন গম্ভীর মুখে বলে—শক্তটাই বা কি? রোজ কাঁড়ি কাঁড়ি ডিভোর্স হচ্ছে দেখছি।

—আরে না। সরকার ডিভোর্স জিনিসটা পছন্দ করে না। আইনের অনেক ফ্যাকড়া আছে। যা হোক সে নিয়ে আমি ভাবব, তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। খরচাপাতি কিছু দেবে না কি আজ?

—খরচা আবার কি? নবীন অবাক হয়ে বলে—এখনো মোকদ্দমা শুরুই হয়নি।

—আছে আছে। মোকদ্দমা শুরু হয়নি বলে কি আর উকিলের বসে থাকলে চলে? আইনের পাহাড় প্রমাণ বই ঘাঁটতে হচ্ছে না? এই যে মাঝে মাঝে এসে খবর দিচ্ছি এর জন্যও তো কিছু পাওনা হয় বাপু। মহেশ উকিলের সঙ্গে বাজারদর নিয়ে কথা বলতে গেলে পর্যন্ত ফিজ চায়।

নবীন বেজার হল। তবে বলল—ঠিক আছে, কাল সকালে কারখানায় যাওয়ার সময় কিছু টাকা দিয়ে আসবখন। মোকদ্দমাটা বুঝছেন কেমন?

অক্ষয় শালটা খুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বলে, সোজা নয়। তোমার বউ বাগড়া দিতে পারে। তারও অনেক পয়েন্ট আছে। সবচেয়ে মুশকিল হল মাসোহাবা নিয়ে।

নবীন খেঁকিয়ে উঠে বলে—মাসোহারাই যদি দেবো তবে আর উকিলকে খাওয়াচ্ছি কেন?

সান্ত্বনা দিয়ে উকিল বলে—সেই নিয়েই তো ভাবছি। ওরা কী কী পয়েন্ট দেবে, আর আমাদেরই বা কী কী পয়েন্ট দেবার আছে সে সব গুছিয়ে ভাবতে হচছে। তোমার বউ যদি বলে যে শ্বশুরবাড়িতে তার ওপর অত্যাচার হত?

অত্যাচার আবার কি? মা খুড়ি একটু খিচখিচ করত, তা অমন সব মা খুড়িই করে। ভারী বেয়াড়া মেয়েছেলে, কাউকে গ্রাহ্য করত না। উল্টে মুখ করত, বিনা পারমিশনে সিনেমায় যেত, যে সব বাড়ির সঙ্গে আমাদের ঝগড়া সেই সব বাড়িতে গিয়ে আমাদের নিন্দে করে আসত।

—মারধর করা হয়নি তো?

—কস্মিনকালেও না। বরং ও-ই উল্টে আমার হাত খিমচে দিয়েছিল। একবার কামড়েও দেয়। আমি দু একটা চটকান মেরেছি হয়তো! তাকে মারধোর বলে না।

—চরিত্রদোষ ছিল কি? থাকলে একটু সুবিধে হয়। ডিভোর্সের বদলে অ্যানালমেন্ট পেয়ে যাবে, মাসোহারা দিতে হবে না।

—ছিল কি আর না? তবে সে সব খোঁজখবর আর কে নিয়েছে!

অক্ষয় উকিল উঠতে উঠতে বলে—কোন পয়েন্ট টিকবে কোনটা টিকবে না বলা শক্ত। ভাবতে হবে।

জ্বলন্ত চোখে নবীন চেয়েছিল। অক্ষয় উকিলের আসল রোজগার হল জামিন দেওয়া। সস্তা হয় বলে নবীন ধরেছে, কিন্তু এখন ভারী সন্দেহ হচ্ছে তার যে লোকটা এজলাসে দাঁড়িয়ে সব গুলিয়ে না ফেলে।

জ্যোৎস্নাটা আর তেমন ভাল বলে মনে হয় না নবীনের। গলায় গানও এল না। নিজের বিবাহিত জীবনের ভুল-ভ্রান্তিগুলো মনে হয়ে খুব আফসোস হচ্ছে। ঢ্যামনা মেয়েছেলেটাকে সে চিরকালটা প্রশ্রয় দিয়েছে। উচিত ছিল ধরে আগাপাশতলা ধোলাই দেওয়া। তাহলে হাতের সুখের একটা স্মৃতি থাকত। এখন দাঁত কিড়মিড় করে মরা ছাড়া গতি নেই। আদালত তো বড় জোর বিয়ে ভেঙে দেবে, তার বেশি কিছু করবে না। আইনে মারধরের নিয়ম নেই, কিন্তু থাকা উচিত ছিল।

কাউকে কিছু না বলে লক্ষ্মী সটকে পড়েছিল। প্রথমে সবাই ধরে নিয়েছিল, অন্য কারো সঙ্গে ভেগেছে। পরে খবর এল, তা নয়। বাপের বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। তাতে খানিকটা স্বস্তি বোধ করেছিল নবীন। মুখটা বাঁচল। কিন্তু সেই থেকে তার লোহা-পেটানো হাত-পা নিশপিশ করে।

সকালে কারখানা যাওয়ার পথে অক্ষয় উকিলের চেম্বারে উঁকি দেয় নবীন। চেম্বারের অবস্থা শোচনীয়। ওপরে চিনের চালওলা পাকা ঘরের চুন বালি গত বর্ষার স্যাঁতস্যাঁতে ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি, ঝুরঝুর করে সব ঝরে পড়ে যাচ্ছে। উকিলের নিজস্ব চেয়ারের গদি ফেড়ে গিয়ে ছোবড়া বেরিয়ে পড়েছে। তিন আলমারি বইতে উই লেগেছে, আলমারির গায়ে উইপোকার আঁকাবাঁকা মেটে সুড়ঙ্গ। বই অবশ্য নকল, মক্কেলদের শ্রদ্ধা জাগানোর জন্য সাজিয়ে রাখা বেশির ভাগ বই-ই ডামি। ওপরে মলাট। ভিতরে ফোঁপরা। মক্কেলহীন ঘরে বসে অক্ষয় উকিল গতকালের শালটা গায়ে দিয়ে নাতিকে অঙ্ক কষাচ্ছে। টাকা পেয়ে গম্ভীর মুখে বলল—এ মামলা তুমি জিতেই গেছ ধরে নাও।

নবীন নিশ্চিন্ত হল না।

।। ৩ ।।

শীতের বেলা তাড়াতাড়ি পড়ে আসে। ওভারটাইম খেটে বেরোতে বেরোতে সাঁঝের আঁধার ঘনিয়ে এসেছে।

কারখানা ছাড়িয়ে বাজারের পথে পা দিতেই মোড়ের মাথায় শুকনো মুখে তার শ্বশুর দুর্গাপদকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু থমকাল নবীন। কথা বলা উচিত কিনা ভাবছে। লোকটা তেমন খারাপ নয়।

নবীনকে বলতে হল না, দুর্গাপদই শুকনো মুখে একটু হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে এগিয়ে এল—সব ভাল তো?

নবীন বে-খেয়ালে প্রণাম করে ফেলে। বলে—মন্দ কি?

দুর্গাপদ শুকনো ঠোঁট জিভে চেটে বলে—এদিকে একটু বিষয় কাজে এসেছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই।

নবীন ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করে—ওদিকে সব ভাল?

দুর্গাপদ হতাশ মুখে বলে—ভাল আর কই? তুমি উকিলের চিঠি দিয়েছো। আমি অতশত ইংরিজি বুঝি না, তবে পড়ে মনে হল, ডিভোর্স-টিভোর্স কিছু একটা কথা আছে।

নবীন বিনীতভাবেই বলল—তাই লেখার কথা। ঠিকমতো লিখেছে কি না কে জানে? আইনের ইংরিজির অনেক ঘোরপ্যাঁচ।

দুর্গাপদ বলে—শুধু ইংরিজি কি, উকিলের মুখের কথাও ভাল বোঝা যায় না। দু বারে কড়কড়ে পঞ্চাশটা টাকা দিলাম দুটো মুখের কথা শোনার জন্য। ডিভোর্স ঠেকানোর নাকি উপায় নেই, বলছে উকিল। আমরা তবু ঠেকাতে চাই।

নবীন গম্ভীর হয়ে বলে—আমার উকিল বলছে ডিভোর্স পাওয়া নাকি খুব শক্ত। সরকার নাকি ডিভোর্স পছন্দ করে না।

—কারো কথাই বোঝা যাচ্ছে না। ওদিকে লক্ষ্মীর মা বলছে, ডিভোর্স নাকি বে-আইনি। পুলিশ খবর পেলে জেল দেবে।

নবীন হাসল।

দুর্গাপদ করুণ নয়নে চেয়ে বলল—হাসছো বাবা? লক্ষ্মীর মা যে কীভাবে আমার জীবনটা ঝাঁঝরা করে দিল তা যদি জানতে!

লোহা পেটানো শরীরটা গরম হয়ে গেল নবীনের মেনিমুখো শ্বশুরের কথা শুনে। ঝাঁকি দিয়ে বলল—স্ট্রং হতে পারেন না? মেয়েছেলেকে দরকার হলে চুলের মুঠি ধরে কিলোতে হয়।

এ কথায় দুর্গাপদও গরম হয়ে বলল—বেশি বলো না বাবাজীবন! তুমি নিজে পেরেছো? পারলে উকিলের শামলার তলায় গিয়ে ঢুকতে না!

এ কথায় নবীন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

॥ ৪ ॥

সিনেমা থেকে বেরিয়ে লক্ষ্মীর খুব উদাস লাগছিল। দুনিয়ায় সে কাউকে গ্রাহ্য করে না, শুধু এই উদাস ভাবটাকে করে। এই যে কিছু ভাল লাগে না, উদাস লাগে, এই যে দুনিয়ার সঙ্গে নিজেকে ভারী আলাদা মনে হয়, এই যে সিনেমা দেখেও মন ভাল হতে চায় না—এই তার রোগ। ভিতরে নাড়াচাড়া নেই, নিথর, ভ্যাতভ্যাতে পান্তার মতো জল-ঢ্যাপসা একটা মন নেতিয়ে পড়ে

আছে।

সিনেমা-হলের বাইরে দাঁড়িয়ে উদাস চোখে চেয়ে থাকে লক্ষ্মী। কোথায় যাবে তা যেন মনে পড়তে চায় না।

লক্ষ্মী একটা রিকশা নিল। স্টেশনে এসে উদাসভাবেই নৈহাটির ট্রেনে উঠে বসল। নিজের কোনো কাজের জন্য কখনও কাউকে সে কৈফিয়ত দেয় না।

উঠোনে ঢুকতেই নেড়ি কুকুরটা ভ্যাকভ্যাক করে তেড়ে এসে লেজ নেড়ে ফুঁইফুঁই করে গা শোঁকে। কচুপাতা একটু গলা বাড়িয়ে গায়ে একটা ঝাপটা দেয়।

প্রথমটা কেউ টের পায়নি। কয়েক মুহূর্ত পরেই সারা বাড়িতে একটা চাপা শোরগোল পড়ে গেল।

লক্ষই করল না লক্ষ্মী। উদাস পায়ে নিজের ঘরে গিয়ে উঠল। বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে রাস্তার ধকলটা সামলাতে বড় বড় শ্বাস টানতে লাগল।

কতক্ষণ কেটেছে কে জানে! লক্ষ্মীর হয়তো একটু ঘুমই পেয়ে থাকবে। হঠাৎ ঘরে একটা বোমা ফাটল দড়াম করে। কানের কাছে একটা বিকট গলা বলে উঠল—উকিলের শামলার তলায় ঢুকেছি? কেন আমার হাত নেই?

বলতে না-বলতেই চুলের গোছায় বিভীষণ এক হ্যাঁচকা টানে লক্ষ্মী খাড়া হয়ে স্তম্ভিত শরীরে দাঁড়িয়ে রইল। গালে ঠাস করে একটা চড় পড়ল দুনম্বর বোমার মতো। মেঝেয় পড়তে না পড়তেই নড়া ধরে কে যেন ফের দাঁড় করায়।

বিকট গলাটা বলে ওঠে—কার পরোয়া করি? কোন উকিলের ইয়েতে তেল মাখাতে যাবে এই শর্মা? এই তো আইন আমার হাতে? বলি, পেরেছে দুর্গাপদ দাস?

বলতে না বলতেই আর একটা তত জোরে নয় থাপ্পড় পড়ল গালে।

লক্ষ্মীর গালে হাত। ছেলেবেলা থেকে এত বড়টি হল কেউ মারেনি তাকে। এই প্রথম। কিন্তু কী আশ্চর্য দেখ! মনের ম্যাদামরা ভাবটা কেমন কেটে যাচ্ছে। টগবগ করছে রক্ত! আর তো মনে হচ্ছে না পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক নেই। নেই মানে? ভীষণভাবে সম্পর্ক আছে। ভয়ঙ্কর নিবিড় সম্পর্ক যে।

মেঝেয় বসে লক্ষ্মী কাঁদতে লাগল হাঁটুতে মুখ গুঁজে। কিন্তু সে কাঁদতে হয় বলে কাঁদা। মনে মনে কী যে আনন্দে ভেসে যাচ্ছে সে।

দরজার একটু তফাত থেকে উঁকি মেরে দৃশ্যটা দেখে দুর্গাপদ হাঁ। বজ্জাত মেয়ে বটে। এত নাকাল করিয়ে নিজে এসেছে।

একমাত্র সন্তান মার খাচ্ছে বলে একটু কষ্টও হল দুর্গাপদর। কিন্তু লোভীর মতো জুলজুল চোখে সে দেখলও দৃশ্যটা। ঠিক এরকমই দরকার ছিল লক্ষ্মীর মায়ের। দুর্গাপদ পেরে ওঠেনি। কিন্তু বহুদিনকার সেই পাকা ফোড়ার যন্ত্রণার মতো

ব্যথাটা আজ যেন ফেটে গিয়ে টনটনানি কমে গেল অনেক।

পরিশ্রান্ত নবীন ঘরে শিকল তুলে বেরিয়ে এলে পর দুর্গাপদ গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে হাসি হাসি মুখে বলল—এই না হলে পুরুষ।

রাত্রিবেলা লক্ষ্মী নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছিল বাপকে। মার খেয়ে মুখ-চোখ কিছু ফুলেছে। কিন্তু সেটা নয়, দুর্গাপদ লক্ষ করল লক্ষ্মীর চোখ দুখানায় আর সেই পাগুলে চাউনি নেই। বেশ জমজম করছে মুখ-চোখ।

লক্ষ্মী বলল—বাবা, রাতটা থেকে যাও না কেন?

নবীন সায় দিল—রাত হয়েছে, যাওয়ার দরকার কি?

দুর্গাপদ মাথা নেড়ে ম্লান মুখে বলে—ও বাবা, তোর মা কুরুক্ষেত্র করবে তা হলে। চিনিস তো!

দুর্গাপদ জানে সকলের দ্বারা সব হয় না। নিয়তি কেন বাধ্যতে।

সাদা গুঁড়ো লাল রং

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

চায়ের কাপে চিনি নাড়তে নাড়তে নীলা বলল, সরস্বতীর শয়তানিটা দেখেছ! আজ আবার ডুব মারল।

ফাল্গুনের সকাল। শুভময় সোফায় বসে কাগজ গিলছিল। অনেকটা ঝুঁকে, বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে। এমন ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদেও তার কোনও হিল্‌দোল নেই, হাতের ইশারায় নীলাকে বসতে বলল শুধু।

নীলার খটকা লাগল। বাজার যাওয়ার আগে ভারি অলস মেজাজে থাকে শুভময়, নীলার বিরক্তির উত্তরে পালটা চুটকি ছোড়াই তার স্বভাব। আজ শুভময়ের মুখভাব যেন কেমন কেমন!

নীলা জিজ্ঞাসা করল—কী হয়েছে?

—কেলো হয়ে গেছে। শুভময়ের স্বর চাপা, সরোজ ধরা পড়েছে।

—কে সরোজ?

—আমাদের সরোজ। অফিসের সরোজ ব্যানার্জি। যার ছেলের পৈতেতে সেদিন খেয়ে এলে। কাল পার্কস্ট্রিটের কোন বারে বসে পার্টির কাছ থেকে টাকা নিচ্ছিল, ভিজিলেন্সের লোক গিয়ে...একেবারে কট্ রেডহ্যান্ডেড।

নীলা ঝাঁকুনি খেয়ে গেল। একেবারে সামান্যও নয়, আবার ভীষণও নয়। সরোজ ব্যানার্জি শুভময়ের পুরনো সহকর্মী, তবে তেমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু নয়। ইদানিং দুজনেই এক অফিসে পোস্টেড বলে শুভময়ের মুখে নাম শুনেছে সরোজের, তবে দেখেছে সাকুল্যে ওই একবারই। ওই পৈতের দিনই। মুখটাও মনে পড়ে গেল নীলার। ফর্সা, গোলগাল, মাথায় অল্প টাক, চোখ দুটো হাস্যময়। কথাবার্তায়ও ভারি অমায়িক, নীলাদের খাবার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ তদারকি করছিল। মাংস পোলাও-এর পালা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও কেটারারকে ডেকে লাল্টুর পাতে জোর করে দুটো ফ্রিশফ্রাই চাপিয়ে দিল। বেচারা লাল্টু একটা ফ্রাই তো ছুঁতেই পারল না। দেখে ভদ্রলোকের কি হাসি! কী মিসেস চক্রবর্তী, আজকাল ইয়াং ছেলেরাও ডায়েটিং শুরু করেছে নাকি! আমরা তো ওই বয়সে...। শুভময় যে এত মুখের রক্ত তুলে পয়সা রোজগার করছে, খাবেটা কে!

সেই লোকটা ধরা পড়েছে!

নীলা অবিশ্বাসের সুরে বলল,—যাহ্।

—যা নয়, হ্যাঁ। থার্ড পেজের লাস্ট কলমটা দ্যাখো।

খবরের কাগজখানা হাতে নিল নীলা। তেমন বড়সড় কিছু খবর নয়, জোর সাত আট লাইন। তবে তাকালেই হেডিংটা চোখে পড়ে যায়—ঘুষ নিতে গিয়ে

সরকারি অফিসার ধৃত। ভেতরের লাইনের খুদি খুদি অক্ষরগুলো পড়ছে নীলা। চোখ কুঁচকে, দৃষ্টি থেকে কাগজ বেশ খানিক তফাতে রেখে। সম্প্রতি নীলার চোখে চালশে এসেছে, চশমা করানো হয়নি। গড়িমসি। কী হবে ছাতার মাথা দুটো ঠুলি এঁটে! সিনেমা টিভি তো খালি চোখেই দিব্যি সাফ দেখা যায়।

শুভময় বড় বড় চুমুক দিচ্ছে কাপে। মাথা ঝাঁকাচ্ছে, ছি ছি ছি, মানইজ্জত সব চলে গেল। কোথ্থাও আর মুখ দেখানো যাবে না।

—তোমার কি? পড়া থামিয়ে নীলা টেরচা চোখে তাকাল—তোমাকে ধরেছে?

—এই না হলে মেয়েছেলের বুদ্ধি! দেখছ না, অফিসের নাম ধাম সব ছেপে দিয়েছে!

—তো? বিশ্বসুদ্ধ সবাই বুঝি তোমার অফিসের নাম জেনে বসে আছে?

—চেনা লোকেরা তো জানেই। শুভময় গোঁজ মুখে কিংসাইজ সিগারেট ধরাল,—বাকিরাও জানে। না জানার ভান করে।

—জানলে জানে। অত কেয়ার করার কী আছে?

কথাটা নীলা বলল বটে, তবে স্বরে যেন তেমন প্রত্যয় ফুটল না। আশঙ্কাটা তার বুকেও ছ্যাঁক করে উঠেছে। এই না বাপের বাড়ি থেকে ফোন এসে পড়ে। বাবা, দাদা করবে না, তারা যথেষ্ট বুঝদার। কিন্তু বউদি? তা ওই কৌতূহলী মার্জারীকে সামাল দেওয়ার ক্ষমতা অবশ্য আছে নীলার। স্ট্রেটকাট্ বলে দেবে, চোর ডাকাত আজকাল কোন্ অফিসে নেই ভাই! আগেও ছিল, চিরকালই থাকবে। উৎকোচ শব্দটা বাংলা নয়, সংস্কৃত।

শুভময় কাকে যেন ফোন করতে উঠল। বোধহয় অফিসের কোনও বন্ধু-টন্ধুকে। নিচুগ্রামে বাক্যালাপ চলছে, এত নিচু যে স্বরযন্ত্রের ওঠানামাকে অলীক বলে ভ্রম হয়। ফিরে এসে আবার সিগারেট ধরাল, দুটান দিয়েই নিভিয়ে দিল। এক হাতে কপাল চেপে বসে আছে। হঠাৎ পাড়ার থিয়েটারের স্বগতোক্তির ঢং-এ বলে উঠল—এক্কেবারে ক্যালাস্। মাথামোটা। একুশ বছর চাকরি হয়ে গেল, অ্যাদ্দিন পর ধরা পড়ার কোনও মানে হয়!

আক্ষেপের মর্মার্থ সঠিক উদ্ধার করতে পারল না নীলা। আগে ধরা পড়লে তার বুঝি কোনও মানে হত?

চিন্তিত মুখে নীলা প্রশ্ন করল—এখন তাহলে কী হবে?

—কার? সরোজের? শুভময় ফোঁস শ্বাস ফেলল—ধরে নাও, চাকরি গন্।

—চাকরিই গন্?

—আপাতত সাসপেন্ড হবে, কেস চলবে...যদি তরে গেল তো ভাল, নইলে...হাতে-নাতে ধরা পড়েছে, এ কেসে বাঁচা খুব মুশকিল।

—ইশ্ ফ্যামিলিটা তো তা হলে ভেসে গেল।

—হুম্। অত সুন্দর সুন্দর দুটো ছেলেমেয়ে....তুমি তো দেখেছ, ছেলেটা সামনের বছর সিবিএসসি দেবে। মেয়েটাও কী একটা কন্‌ভেন্টে পড়ে। ক্লাস এইট। ভাইবোন দুটোই নাকি লেখাপাড়ায় খুব ব্রিলিয়ান্ট।

—মেয়েটার কথাবার্তাও খুব মিষ্টি। কী সুন্দর প্রজাপতির মতো উড়ে উড়ে সকলকে আপ্যায়ন করছিল।

—মেয়েটার চোখে কী একটা প্রবলেম হচ্ছে। সরোজ মেয়েকে নিয়ে খুব চিন্তায় ছিল। গরমের ছুটিতে ম্যাড্রাসে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আনবে বলেছিল।

—আহারে। নীলাব মন দুঃখে ভরে গেল,—ওদের বাড়িতে একটা ফোন করো না। তোমার অ্যাদ্দিনের কলিগ, একটা তো খোঁজখবর নেওয়া উচিত।

একমুহূর্তে থমকে থেকে শুভময় বলল—খেপেছ? এই সময়ে? কী করতে কী হয়ে যাবে...। থলি দাও, বাজার সেরে আসি। আজ একটু সকাল সকাল অফিস বেরোব।

পাঞ্জাবি চড়িয়ে বেরিয়ে গেল শুভময়।

লাল্টু এখনও ঘুমোচ্ছে। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার আর তিন সপ্তাহর মতো বাকি, রাত জেগে পড়ে ছেলে, উঠতে বেলা হয়। নীলা ছেলের ঘরে ঢুকে চারদিকের ছত্রখান চেহারাটা দেখল একবার। টেবিল অগোছালো, জামাকাপড় লুটোচ্ছে মেঝেয়, খাটময় বইখাতা। বালিশের পাশে ওয়াকম্যান। গান শুনতে শুনতে অঙ্ক কষে লাল্টু ওতে নাকি মনোযোগ বাড়ে। ছেলে শুয়েও আছে দ্যাখো কেমন কুঁকড়ে মুকড়ে, যেন শিশুটি! আপন মনে হাসল নীলা, দ্রুত হাত চালিয়ে মোটামুটি বিন্যস্ত করল ঘরটাকে। বেরিয়ে রান্নাঘরে যাওয়ার মুখে কী ভেবে একটু থামল। সেন্টার টেবিল থেকে ছোঁ মেরে কাগজটা তুলে নিয়ে সোজা চালান করে দিল নিজেদের ঘরের বিছানার নীচে। শুভময়দের খবরটা লাল্টুর না দেখাই ভাল। এমনি অবশ্য ছেলের কাগজ পড়ার তেমন নেশা নেই, ওই খেলার পাতাই যা দেখে দু-চার মিনিট। দরকার কি, যদি চোখে পড়ে যায়! কী ভাবতে কী ভাববে, উল্টোপাল্টা প্রশ্ন জুড়বে, মিছিমিছি বিব্রত হবে শুভময়।

নীলা কর্মযজ্ঞে নেমে পড়ল। সিঙ্কে গত রাতের বাসনের কাঁড়ি, একটা একটা করে মাজছে। চেপে চেপে। ঘষে ঘষে। সরস্বতীটা মহা নেমকহারাম। এত টাকা মাইনে দেওয়া হয়, তবু কথায় কথায় কামাই, কথায় কথায় কামাই। এ মাসে ছাড়বে না নীলা, মাইনে কাটবে। কাজ ছেড়ে দেয় দিক, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। চড়াং করে মনে পড়ল, কাপড়ের স্তূপ ভেজানো রয়েছে বাথরুমে। হা ঈশ্বর, ওসব এখন কে কাচে, কে মেলে। কদ্দিন ধরে শুভময়কে বলছে, একটা ওয়াশিং মেশিন কেনো, একটা ওয়াশিং মেশিন কেনো...। আচ্ছা,

সরোজ ব্যানার্জির ছেলেমেয়ের স্কুলে খবরটা জানাজানি হলে কী হবে? ইস্, বাচ্চা দুটোর ইহকাল পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেল। লান্টু ঘঙ ঘঙ কাশছে কেন? উঠে পড়েছে কি? সকালের দিকে এখনও বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব থাকে, ফুলস্পিডে ফ্যান না চালিয়ে ঘুমোয় না ছেলে, পরীক্ষার আগে অসুখ-বিসুখ না বাধিয়ে বসে। কী ব্রেকফাস্ট করা যায় আজ লান্টুর জন্য? সেই টোস্ট ওমলেট কলা? নাকি চিকেন স্যান্ডুইচ বানিয়ে দেবে? ফ্রিজে তো মুরগি সেদ্ধ করা আছেই। দুধ খাওয়া নিয়ে বড় নকর থকর করে লান্টু, আজ একটু চকোলেট গুলে দিতে হবে। সরোজ ব্যানার্জি কি করে বসে মদ গিলছিল? মনে হয়, তাই। মোদোমাতালরা ভারি সাবধানি হয়। ভাগ্যিস শুভময়ের ওই কুঅভ্যাসটি নেই! ও হরি, শুভময়ের ভাতও তো বসাতে হবে। বাজার থেকে মাছ আনলে নো প্রবলেম। দু পিস্ ভেজে দিলেই সোনামুখ করে খেয়ে নেবে শুভময়। যদি মাংস আনে? কিংবা পাবদা, কি চিতল? কাল রাতে লান্টু মালাইকারি বলছিল, শুভময়ের কানে গেছে, যদি চিংড়ি নিয়ে হাজির হয়? দেখা যাবেখন। আলুটালু ভেজে দিলেও চলবে, সঙ্গে ঘি। সরোজবাবুর বউ কি কাল রাতেই খবর পেয়েছিল? পুলিশ বোধহয় জানিয়ে দেয়, নাহলে সারা রাত...!

বিজবিজে ঘামের মতো সরোজ ব্যানার্জির ভাবনাটা কিছুক্ষণ লেগে রইল নীলার মস্তিষ্কে, তারপর উবে গেল। কত কাজ হাতে, কত কাজ!

চিন্তাটা ফিরে এল সন্ধেবেলা। শুভময় অফিস থেকে ফেরার পর।

শার্ট ছাড়তে ছাড়তে শুভময় বলল—বুঝলে গো, যা ভয় পেয়েছিলাম, তাই। কেস পুরো জন্ডিস হয়ে গেছে। সরোজ আজ বেল পায়নি।

নীলা হাঁ হয়ে গেল—কেন?

—পেল না। আরও সাতদিন এখন পিসিতে থাকবে। পিসি মানে জানো তো? পুলিস কাস্টডি। থানার হাজত। সাতদিনে রস একেবারে নিংড়ে নেবে।

—সে কী! একজন শিক্ষিত ভদ্রলোককে চোর-ছ্যাঁচোরদের সঙ্গে রাখবে?

—কপাল। শুভময় হাত ওল্টাল—যা ইন্টারোগেশান চলবে না!...পেট থেকে সর্ষেদানা পর্যন্ত বার করে আনবে।

নীলা ঘাবড়ে যাওয়া মুখে বলল—তোমাদের কথা কিছু বলে দেবে না তো সরোজবাবু?

—ধুৎ, আমাদের কথা কী বলবে?

—না, মানে তোমরাও তো...নীলা বুদবুদটা গিলে নিল।

লান্টু টিউটোরিয়ালে, আটটা সাড়ে আটটার আগে ফিরবে না। এখন এই চার দেওয়ালের মধ্যে লুকোছাপা হাশহাশ না করলেও চলে। শুভময় হো হো

হেসে উঠল—দূর দুর, আমরা কি আয় তবে সহচরী হাতে হাতে ধরি ধরি করে কাজ করি নাকি? যার যার, তার তার। একজনের সিক্রেট অন্যজন জানবে কী করে?

আশ্বস্ত নীলা রান্নাঘরে গিয়ে কফির জল চড়াল। সন্ধের পর শুভময় চা তেমন পছন্দ করে না। বিকেলে একবার বেরিয়েছিল নীলা, টুকটাক সাংসারিক জিনিসপত্র কিনতে। গোটা কয়েক বার্গার এনেছিল সেসময়ে, হট অ্যান্ড কোল্ড থেকে। দুটো বার্গার বার করে আভেনে গরম করতে দিল।

সরোজের থেকে বিপদের কোনও আশঙ্কা নেই বুঝে সরোজের ওপর আবার যেন একটু একটু মায়া জন্মাচ্ছিল নীলার। দুঃখী দুঃখী গলায় প্রশ্ন ছুড়ল—ওদের বাড়ির লোকের খবর কিছু পেলে?

—শুনলাম তো সরোজের মিসেস কোর্টে গিয়েছিল। ভাল উকিল-টুকিলও লাগিয়েছে। নো রেজাল্ট। বউটা নাকি খুব কান্নাকাটি করছিল কোর্টে।

—তোমায় কে বলল?

—অনিমেষ, আবার কে। ও তো আজ সারাক্ষণ কোর্টে ছিল।

অনিমেষকে ভালই চেনে নীলা। সে নাকি খুব দাপুটে অফিসার। শুভময়দের অ্যাসোসিয়েশানের একটা মাথাও বটে। শুভময় বলে, অনিমেষ ভারি আপরাইট মানুষ। ঠিকাদার কনট্রাক্টর ছাড়া কারুর কাছে সে মাথা নোয়ায় না। এমনকি নিজের বাবা-মার কাছেও না। পাছে নত হতে হয় সেই কারণে মিনিবাসে পর্যন্ত ওঠা ছেড়ে দিয়েছে অনিমেষ, গাড়ি-ট্যাক্সি ছাড়া সে দু পা-ও চলে না। অফিস-কলিকদের বিপদে-আপদে সব সময়ে অনিমেষ পাশে থাকে। তাই চাকরিতে ঢের জুনিয়ার হলেও অনিমেষের ওপর শুভময়ের গভীর শ্রদ্ধা নীলা জানে।

কফি আর বার্গার নিয়ে শোওয়ার ঘরে এল নীলা। মুখ-হাত ধুয়ে পাজামা-পাঞ্জাবি পরে নিয়েছে শুভময়, গড়াচ্ছে বিছানায়। ট্রেটা বিছানার পাশের টেবিলে রাখল নীলা, বেতের গোল মোড়া টেনে খাটের ধারে বসল—আর কী বলল অনিমেষ?

—কী আর বলবে? দুঃখ করছিল। সরোজের মিসেসকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল...

—কাল ঠিক কী ঘটেছিল কিছু শুনলে?

—ও হ্যাঁ, সে তো এক কেচ্ছাকেলেঙ্কারি কাণ্ড। শুভময় তড়াং করে উঠে বসেছে। একটা বার্গার হাতে তুলে নিল—ঠক্কর ব্রাদার্স বলে একটা পার্টির লাইসেন্স নাকি সরোজ অনেক দিন ধরে আটকে রেখেছিল। দরটরে বনছিল না বোধহয়। ওই শালারাই কাল টোপ দিয়ে ওকে নিয়ে গিয়েছিল গ্রিন হেভেনে। পার্টির কাছ থেকে একশো টাকার একটা বান্ডিল নিয়ে যেই না সরোজ ব্রিফকেসে ভরতে গেছে, ওমনি ভিজিলেন্সের লোক এসে ক্যাঁক। সরোজ নাকি নার্ভাস হয়ে সঙ্গে

সঙ্গে টাকাটা মাটিতে ফেলে দিয়েছিল, বাট ততক্ষণে দা গেম ইজ ওভার। টেবিলে জলের গ্লাস ছিল, সরোজের হাত ধরে গ্লাসে চুবিয়ে দিয়েছে. দেন অ্যান্ড দেন গ্লাসের জল লাল।

নীলা মুখের হাঁ বন্ধ করতেও ভুলে গেল—বুঝলাম না।

—তুমি একটা ট্যাড়োশ। ডিটেকটিভ সিরিয়ালে দ্যাখো না, অপরাধীর দুষ্কর্ম প্রমাণ করার জন্য ফিঙ্গার প্রিন্ট লাগে? সরোজের হাতের ছাপ তোলার জন্য নোটের গায়ে এক ধরনের গুঁড়ো লাগানো ছিল। সাদা সাদা কী যেন নাম! মিনপ্থেলিন, না ফিনপ্থেলিন। লাল্টু বলতে পারবে।

—আহ, লাল্টুকে এর মধ্যে টানা কেন?

—না, মানে...লাল্টু সায়েন্সের স্টুডেন্ট তো, হয়তো জিনিটার নাম জানে।... হ্যাঁ, যা বলছিলাম, ওই গুঁড়ো মাখা হাত জলে ডোবালেই জল নাকি লাল হয়ে যায়। এইজন্যেই না বলে কট্ রেডহ্যান্ডেড। এখন আর সরোজ ডিনাই করতে পারবে না। সাক্ষীরা ছিল, তারা দেখেছে। সঙ্গে নোটেও আঙুলের ছাপ...

নীলার হঠাৎ কেমন শীত শীত করে উঠল। কী সব্বনেশে ব্যাপার! গুঁড়োটাও সাদা সাদা, জলেরও কোন রং নেই, অথচ ওই গুঁড়োমাখা হাত জলে পড়লেই...!

অস্ফুটে নীলা বলল—ধরারও এতসব প্যাঁচপয়জার আছে নাকি?

—আছে বৈকি। ফাঁদ কি একরকম হয়?

—তুমি জানতে ব্যাপারটা?

শুভময় উত্তর দিল না। কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে সিগারেট ধরিয়েছে। চোখ ঘুরছে এদিক-ওদিক। খাটে আলগা ঠেশান দিল—তবে আমরাও ছাড়ছি না। ওই ঠক্কর ব্রাদার্সকে আমরা এমন শিক্ষা দেব...! হতে পারে সরোজের সঙ্গে তার ইয়ে চলছিল। হতে পারে সরোজেরই দোষ। বেশি স্কুইজ করার চেষ্টা করছিল। বাট দিস ইজ আনএথিকাল।

—কোনটা আনএথিকাল? স্কুইজ করা?

—উঁহু, ওই ধরিয়ে দেওয়াটা। তোরা টাকা দিস কেন বাছা? তোরা হারামজাদারা চোর নোস? রবি ঠাকুর কী বলেছেন? অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে...! শুভময় স্পষ্টতই উত্তেজিত—আমরা সইব না। ছুটির পর অনিমেষকে নিয়ে বসেছিলাম। ডিসিশান হয়ে গেছে। এককাট্টা হয়ে ঠক্কর ব্রাদার্সকে বয়কট করব আমরা। দেখি শালা কী করে ব্যবসা করে খায়! দরকার হলে অন্য পার্টিদেরও সমঝে দেব।

—সব্বাই তোমাদের কথা মানবে? তুমিই তো বলো, তোমাদের অফিসে যে যার নিজের ধান্দা নিয়ে চলে?

—এটা মানবে। মানতেই হবে। সারভাইভালের প্রশ্ন না? ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড ইউ ফল।

রাতে শুয়ে ঘুম আসছিল না নীলার। এলোমেলো কথা ভাবছিল। শুভময়ের কথা, সরোজ ব্যানার্জির কথা...। নীলা অন্ধকারে হঠাৎ হঠাৎ দেখতে পাচ্ছে সরোজ ব্যানার্জি বসে আছে হাজতে, তার বউ ছেলেমেয়ে মুখ কালো করে দেখতে এসেছে তাকে, দাঁড়িয়ে আছে গরাদের এপারে। কী লজ্জা! কী অপমান! কে বেশি হেনস্থা হচ্ছে? সরোজ ব্যানার্জি, না তার বাড়ির লোকজন? কেন এত লোভ করল সরোজ ব্যানার্জি? মেয়ের চিকিৎসার জন্য? শত বিপদে পড়লেও এমনটা করবে না শুভময়। মুখে যতই তড়পাক, শুভময় কখনো খামচা-খামচি করে না। কাজ হাশিল হলে যে যা ভাল মনে দেয় শুভময় তাতেই খুশি। সারা মাস খেটে ক-পয়সাই বা পায় শুভময়! কারুর পাকা ধানে মই না দিয়ে কটা টাকা বাড়তি আনলে যদি একটু বেশি সুখ কেনা যায়, সেটা কি খুব দোষের?

নীলা টের পেল শুভময় নড়াচড়া করছে। মৃদু স্বরে বলল—ঘুমোওনি?

—গরম লাগছে।

—গরম না হাতি! নীলা আলগা ছুঁলো স্বামীকে,—উল্টোপাল্টা ভাবনা করছ তো?

—নাহ্ কী আর ভাবব...

শুভময় চুপ করে গেল। ঘর যেন নিঝুম হঠাৎ। পাখা ঘুরছে সোঁ সোঁ, একঘেয়ে চাপা শব্দে বেড়ে যাচ্ছে নৈঃশব্দ্য। অন্ধকারে সময়ও যেন সহসা প্রলম্বিত হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ পর শুভময়ই কথা বলল—শুনছ?

—উঁ?

—এবার বোধহয় আমাদের একটু রয়ে সয়ে চলার সময়।

নীলা ছোট্ট হাই তুলল—হঠাৎ এ কথা?

—বোঝই তো, সারাক্ষণ সকলের চোখ টাটাচ্ছে। আত্মীয়স্বজন পাড়াপড়শি সব্বার।

—তো?

—আড়ালে, আবডালে কে কী ফিসফাস করে ঠিক নেই...

—তো?

—তো তো করছ কেন? সব কথা কি খুলে বলতে হবে?

এই অন্ধকারও যেন সব কথা খুলে বলার জন্য যথেষ্ট আড়াল নয়!

নীলা ভার ভার গলায় বলল,—ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলছ কেন? সোজাসুজি বলো। কী বড়মানুষিটা করি আমরা যে লোকের চোখ টাটাবে?

—আমরা নয়, তুমি। কলকাতায় এসেই ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট করে পাগল হয়ে গেলে। ঠিক আছে, চিরটাকাল বাইরে বাইরে ঘুরছি, আজ এখানে বদলি, কাল ওখানে। এবার যখন কলকাতায় মোটামুটি থিতুই হয়েছি, একটা নয় নিজের আশ্রয় বানালামই। কিন্তু তারপর?

—কী তারপর?

—লিস্ট দিতে হবে? আজ হাড়ে আদা দিয়ে চালু ফ্রিজ পাল্‌টে হাম্ভার সাইজের ফ্রিজ কিনছ, কাল কালার টিভির মডেল বদলাচ্ছ। কথায় কথায় গয়না গড়াচ্ছ, শাড়ি কিনছ...এই সেদিন পনেরো হাজার দিয়ে নতুন সোফা কিনলে... পরশুদিনই তুমি সাড়ে তিন হাজার দিয়ে একটা বালুচরী কেনোনি? আবার বউদিকে ফোনে ঘটা করে দাম জানাচ্ছিলে! পৃথিবীসুদ্ধু লোক কি ঘাসে মুখ দিয়ে চলে, অ্যাঁ?

—সব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছ? ছেলেকে আহ্লাদ করে ভিসিআর কিনে দিল কে? প্যাকেট প্যাকেট বিদেশি সিগারেট ওড়াচ্ছ...বোন ভগ্নিপতিকে নিয়ে দিঘা বেড়াতে যাবে, টুরিস্ট বাস নয়, গাড়িভাড়া করে চলো...এগুলো বুঝি কারুর নজরে পড়ে না?

—ঠিক আছে, নয় আমরা দুজনেই করি। এবার থেকে একটু সমঝে বুঝে চললে...

—থামো তো। রামের ঠ্যাং ভেঙেছে বলে কি শ্যামকেও খুঁড়িয়ে হাঁটতে হবে? নীলা খ্যাক খ্যাক করে উঠল,পাড়াপড়শি আত্মীয়স্বজন দেখিও না। সব্বার সব আমার জানা আছে। ঘাঁটলে প্রত্যেকের গু থেকেই গন্ধ বেরোবে।

—সকলের গু তো এক্ষুনি পাওয়া যাচ্ছে না। যারটা নিউজ হয়েছে, তারটা নিয়েই এখন সকলে খোঁচাখুঁচি করবে।

—রাতদুপুরে সতীপনার নাটক শুরু করলে কেন বলো তো? নীলা ঝটকা মেরে উল্টোদিকে পাশ ফিরল। গরগর করতে করতে বলল—বেশ তো, কাল থেকে তেলাপিয়া নাইলন টিকা ছাড়া মাছ আনবে না। ঝিঙে কুমড়ো দিয়ে থলি ভর্তি কোরো, তাই তোমাদের পাতে ঢেলে দেব। দেখি, বাপ ছেলের কদ্দিন রোচে!

—খচে যাচ্ছ কেন? ভালর জন্যই তো বলছি। শুভময় নীলাকে টানার চেষ্টা করল,—সরোজটা এমন একটা স্টুপিডের মতো কাজ করল...

নীলা ঠেলে সরিয়ে দিল শুভময়কে। সে যতবার শুভময়কে সরোজের থেকে পৃথক করার চেষ্টা করে, ততই নিজেকে সরোজের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে শুভময়।

কে স্টুপিড? সরোজ, না শুভময়?

দুটো দিন যেতে না যেতে সব আবার স্বাভাবিক। অথবা গয়ংগচ্ছ।

সরোজ সংবাদের আর কোনও প্রচার নেই, সকালবেলা অলস মেজাজে চায়ে চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজের পাতা উল্টোতে পারছে শুভময়। বাজার থেকে চিতল চিংড়িও আসছে নিয়মিত। আসছে মুরগি মাটন, আসছে পনির-কলা-আপেল-আঙুর-বেদনা। স্বামী আর ছেলের জন্য নিত্যনতুন খাবার বানাচ্ছে নীলা, পুষ্টি আর জিভ দু-দিকেই খেয়াল রাখে। পায়েস-পুডিং-কাবাব-চাঁপ...। একদিন দুপুরে দোতলার ফ্ল্যাটের সেনগিন্নির সঙ্গে বেরিয়ে নিউমার্কেট চষল নীলা, চল্লিশ-মিটার পর্দার কাপড় কিনে আনল। প্রায়শই বিকেলে পার্টির গাড়ি নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছে শুভময়কে, ঘরে ঢুকেই ঘটাং ঘটাং আলমারি খুলছে শুভময়। সুরেলা বাজনাওলা নতুন গ্যাসলাইটারটায় শোভা পাচ্ছে শুভময়ের পকেটে উপহার।

এরপর শুভময় একদিন জানাল সরোজ জামিন পেয়ে গেছে। মুক্ত হয়েই সরোজ পরদিন অফিসে এসেছিল, গাল ফুলিয়ে বলে গেছে আরও বড় উকিল লাগাবে। সেই উকিল নাকি কোর্টে ভিজিলেন্স অফিসারদের প্যান্টজামা খুলে নেবে।

শুনে নীলার কী হাসি।—যেন কল্পচোখে ভিজিলেন্সের দুঁদে লোকগুলোকে দেখতে পাচ্ছে। জাঙ্গিয়া পরে কোর্টের বারান্দায় মলিন মুখে চোখ মুছছে লোকগুলো।

হাসতে হাসতেই স্বামীকে চিমটি কাটল—তাহলে যে তুমি বললে সরোজবাবুর দফা রফা?

—সেরকমই তো মনে হয়েছিল। অবশ্য ওটা সরোজের বারফাট্টাইও হতে পারে। চালবাজ টাইপের লোক, ভাঙবে তবু মচকাবে না।

—উঁহু, নিশ্চয়ই কোনও ক্যাচ আছে। দ্যাখো হয়তো তোমাদের ভিজিলেন্সকেই ম্যানেজ করে ফেলেছে সরোজবাবু। ভিজিলেন্সের লোকরা তো আর কন্‌খল থেকে নৌকো ভাসিয়ে কলকাতায় আসেনি। তেমন টাকনাদার চার খাওয়ালে তাদেরও গাঁথা যেতে পারে।

—আই ডাউট। এখানে ট্যাঁ-ফোঁ করতে পারবে কি? সত্যি খুঁটি যদি ওর থাকে, অন্য জায়গায় আছে। মিনিস্ট্রি মহলের। ওর ভায়রাভাই নাকি কোন্ এক মন্ত্রীর পি.এ-র বোতলবন্ধু। সে কোনও কলকাঠি নাড়লেও নাড়তে পারে।

নীলা প্রাণপণে মনে করার চেষ্টা করল ওপর মহলে তাদের কেউ জানাশুনো আছে কিনা, হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল। ধুস্, কেন এত ভাবছে সে? শুভময় তো সরোজ নয়।

অন্য কথায় গেল নীলা—তোমাদের সেই ঠক্কর ব্রাদার্সকে টাইট দেওয়ার কী হল? ছেড়ে দিলে?

—সে হারামজাদা তো এখনও ঘাপটি মেরে বসে আছে। অফিসের

ত্রিসীমানা মাড়াচ্ছে না। সেন্স অফ গিল্ট্। অপরাধবোধে ভুগছে। শুভময় ঠোঁট টিপল,—তবে একটা মোক্ষম উপকার হয়েছে। বলো তো কী?

নীলা ফ্যালফ্যাল চোখে দুদিকে ঘাড় নাড়ল।

—এইজন্যই তো তোমায় ট্যাঁড়োশ বলি। শুধু ট্যাঁড়োশ নয়, তুমি একটি চালকুমড়ো। অন্য পার্টিরা এখন আতঙ্কে কেঁচো হয়ে থাকে, বুঝলে? টুসকি বাজালেই অ্যামাউন্ট গুঁজে দেয়। শুভময় চোখ মারল,—রেটও চড়েছে।

ঈশ্বরকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল নীলা। মঙ্গলময় তিনি, যা করেন মানুষের ভালর জন্যই করেন। সরোজ ব্যানার্জির ধরা পড়াটা শাপে বর হয়ে গেল।

না, শুভময় নয়, সরোজটাই স্টুপিড। শুভময় ধরা পড়লে সরোজ এই পরিস্থিতিটার ফায়দা লুটতে পারত।

পরের পরের দিন ছবিটা আমূল বদলে গেল।

অফিস থেকে প্রায় ছুটতে ছুটতে বাড়ি ফিরল শুভময়। মুখ শুকিয়ে আমসি। ঘামছে দরদর। নীলাকে শোওয়ার ঘরে টেনে নিয়ে এসে বলল,—খুব খারাপ খবর। শিয়রে শমন।

নীলা উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করল—কী হয়েছে?

—ঠক্কর ব্রাদার্স মেইন কালপ্রিট নয়। সর্ষের মধ্যে ভূত। আমাদের ডিপার্টমেন্টই বেশ কয়েকজনকে বাঁশ পুরে দিয়েছে। নাম পাঠিয়ে দিয়েছে ভিজিলেন্সে। সেই মতোই আমাদের অনেক পার্টিকে ট্যাপ করেছিল। ভিজিলেন্স, আল্‌টিমেটলি ঠক্কর ব্রাদার্সই দাবার ঘুঁটি হতে রাজি হয়। সরোজ ব্যানার্জির ভিক্টিম হওয়াটা মিয়ার অ্যাক্সিডেন্ট। ওটা সরোজ না হয়ে অন্য কেউও হতে পারত।

—যা। নীলা ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল,—গুজব-টুজব নয়তো?

—একদম না। এ হল গিয়ে একেবারে ঘোড়ার মুখের খবর। আমাদের অফিসের মিসেস মুখার্জিকে তো চেনো। বেঁটে মতন, গোলগাল মুখ, চশমা পরা, টিকটিকির ল্যাজের মতো চুল...তোমার সঙ্গে রিক্রিয়েশান ক্লাবের ফাংশানের দিন আলাপ হয়েছিল...

—বুঝেছি। যে মহিলা হাঁসের মতো ঘুষ খায়, তাই তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। নারী প্রগতি! সমান অধিকার! মেয়েছেলেরাই বা কম যাবে কেন!...ওই বলছিল।

—সে জানল কোত্থেকে?

—ওরেব্বাস্, ওর যা দারুণ নেটওয়ার্ক। হেড কোয়ার্টারে রেগুলার বাতাসা ছড়ায়, অনেক পোষা গুপ্তচর আছে। শুভময় বড় করে শ্বাস টানল,—এ তো হল খারাপ খবরের ট্রেলার। আসল দুঃসংবাদটি শুনলে পিলে চমকে যাবে।

ভিজিলেন্স সাসপেক্ট করছে ওই ঠক্কর ব্রাদার্সের মেথডে কাউকে পাকড়াও করা যাবে না, তাই এবার তারা সরাসরি বাড়িতে হানা দেবে। মানে আর যাদের নাম আছে তাদের বাড়িতে। হঠাৎ করে। কাকপক্ষীও টের পাবে না।

নীলার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল,—কার কার নাম আছে?

—সে লিস্ট তো আর অফিসে টাঙিয়ে দেয়নি। মিসেস মুখার্জির খোঁচড়রাও পুরো ডিটেল জানে না। তবে...

—কী তবে?

—লিসন্ নীলা। শুভময়ের স্বর গম্ভীর—সাবধানের মার নেই। ঘরদোর ক্লিন রাখাই ভাল।

ইঙ্গিত বুঝল নীলা। এত হিসেবি, এত সতর্ক বলেই না শুভময়ের ওপর নীলার এত আস্থা। এই গুণের জন্যই শুভময়রা কখনও সরোজ হয় না।

তবু নীলা মিনমিন করল—আমাদের কী এমন হিরেজহরত আছে?

—নো। যেটুকু না থাকলেই নয় সেটুকুই শুধু বাড়িতে থাকবে। বাকি সব লকারে চালান করে দাও।

—লকারও যদি দেখতে যায়?

—আহ্, ব্যাঙ্কের লকার নয়। অনিমেষ আমাকে একটা প্রাইভেট লকারের সন্ধান দিয়েছে. বড়বাজারে।

—সেফ তো? চোটপোট হয়ে যাবে না তো?

—আরে না না। মিনিস্টারদের সুইস ব্যাঙ্কের থেকেও সেফ।

দরজায় ছায়া। নীলা চমকে তাকাল। লক্ষ্মী। সরস্বতীর বদলে কাজে ঢুকেছে। সকালবেলা আসে, সন্ধেয় যায়।

লক্ষ্মীর দু-হাতে কফির পেয়ালা। ইশারায় টেবিলে রাখতে বলল নীলা। রেখেও দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা।

নীলার ভুরু জড়ো হল—কিছু বলবি?

—রাতের জন্য কটা রুটি করব আজ?

—যা করিস তাই করবি। বারো চোদ্দটা।...লাল্টুকে জলখাবার দিয়েছিস?

—হ্যাঁ।

—কী করছে দাদা? পড়ছে?

—হ্যাঁ।

দু-এক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে লক্ষ্মী চলে গেল।

চোখের কোণ দিয়ে মেয়েটার চলে যাওয়া দেখল নীলা। মেয়েটার আড়িপাতার অভ্যেস নেই তো? কী নিঃসাড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল! শুনেছে কি কিছু?

নীলা দরজায় এসে গলা ওঠাল,—লক্ষ্মী শোন্।...রুটি করতে হবে না।

আটাটা মেখে রেখে চলে যাস।

শুভময় পোশাক বদলে দ্রুত কফি শেষ করল। তারপর আলমারি খুলেছে। কী একটা ফাইল দেখছে উল্টেপাল্টে।

নীলা বকের মতো গলা বাড়াল—কী ওটা?

—অ্যাসেট স্টেটমেন্টের কপি। দেখছি কী কী শো করা আছে।...নতুন ফ্রিজ টিভি কিছুরই তো এনট্রি নেই দেখছি।

—ও দুটো পুরনোর সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করে কিনেছ। তাও ক্যাশে নয়, মাসে মাসে ইনস্টলমেন্ট গুনতে হয়।...ও নিয়ে কেউ ঝামেলা করবে না।

—ফ্যাচ্ ফ্যাচ কোরো না। কিস্তির মাল বলে কি সাত খুন মাপ? মাসে মাসে কত করে কিস্তি গুনতে হয় সেটা ওরা দেখবে না? যদি জিজ্ঞাসা করে মাসে সাড়ে দশ হাজার টাকা মাইনে পেয়ে একত্রিশো টাকা ইনস্টলমেন্ট গোনেন কি করে? মনে রেখো, সঙ্গে আবার ফ্ল্যাটের লোনের আঠাশশো আছে।

—বলবে, পেটে কিল মেরে চালাই।

—ওরকমই কিছু বলতে হবে। মানলে হয়।...সে কি এই ফ্ল্যাট দেখেও মানবে সাড়ে তিন লাখের মাল?

—বারে, প্রোমোটার তো কাগজে-কলমে দাম দেখিয়েই দিয়েছে। তোমারও সমস্ত পেপার সাবমিট করাও আছে।

—হ্যাঁ, ওই যা রক্ষে। তবে ওরা কি বুঝবে না কতটা দুধে কত জল মেশানো হয়!...কিন্তু কিছু করতে পারবে না।...ফ্রিজ টিভির মেমোগুলো অন্তত বার করে রাখো।

কোনও কাগজপত্রই নীলার সেভাবে গোছানো থাকে না। কোনওটা খুচরো কয়েনের বাক্সে, তো কোনওটা শাড়ির ভাঁজে...। তবে সবই পাওয়া গেল।

শুভময় চোখ কুঁচকে বিল-মেমো দেখছে, নীলা ফস করে বলে উঠল—তোমার ভি.সি.আরের কোনও কাগজপত্র কিন্তু আমার কাছে নেই।

থাকার কথাও নয়। ভি.সি.আর-টি খাঁটি জাপানি জিনিস, খিদিরপুরের চোরাই মার্কেট থেকে কেনা। স্মাগলড্ গুডসের রসিদ দেওয়ার রীতি এখনও চালু হয়নি।

শুভময় চিন্তিত মুখে বলল—ওটা কদিনের জন্য তোমার বাপের বাড়িতে রেখে আসা যায় না?

—পাগল! গত মাসে বউদি চেয়েছিল দিইনি, এখন যেচে রাখতে গেলে...! বরং তোমার বোনের বাড়ি চালান করো।

—হুম্। নট আ ব্যাড আইডিয়া।...লাল্টু কিছু ভাববে না তো?

—ভাবার কী আছে! ওকে কি এখন টিভিও দেখতে দিই! বলব, তোমার পরীক্ষা বলে পিসিকে দেখতে দিয়েছি। শুভ্রাকেও তাই বলব।

বলতে বলতে দরজাটা আলগা ভেজিয়ে দিয়ে এল নীলা। আলমারির লকার খুলে গয়না বার করল। একজোড়া বালা, একজোড়া চুড়, দুটো নেকলেস, কানের ঝুমকো গোটা চারেক, বেশ কয়েকটা টাব, আংটি।

শুভময় আঁতকে উঠল—বাড়িতেই এত গয়না রেখে দিয়েছ?

—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরি যে। নীলা ঢোঁক গিলল—কাল ব্যাঙ্কে রেখে আসব।

—খবরদার না। ব্যাঙ্কেও বেশি রাখবে না। সব একটা দুটো রেখে বাকিগুলো শুভ্রাকে দিয়ে আসবে। কালই।

—সব? শুভ্রা কী ভাববে?

—সে আমার দায়িত্ব। আমার বোন, আমি বুঝিয়ে বলব।

হ্যাঁ, তারপর ফোকটের মাল ভেবে সব ঝেড়ে দিক, মনে মনে বলল নীলা। তার অপ্রসন্ন মুখ দেখে কিছু যেন আঁচ করল শুভময়। একটু যেন দ্বিধান্বিতও হয়েছে,—ঠিক আছে, এগুলোও সব প্রাইভেট লকারে পুরে দেব। বটুয়ায় একসঙ্গে ভরে রাখো।

আলমারির দুই তাকের মাঝে টানা চ্যাপ্টা গোপন কুঠুরি। তার থেকে এবার এক এক করে নোটের বাণ্ডিল বার করছে শুভময়। একশো টাকার, পঞ্চাশ টাকার, দশ টাকাও আছে। পুরনো পুরনো মলিন বাণ্ডিল।

শুভময় গুনছে। একবার, দুবার, বার বার। চোখ ছোট করে তাকাল,—একটা পঞ্চাশ টাকার বাণ্ডিল কম আছে মনে হচ্ছে!

—কম!

—হ্যাঁ। শুভময় আবার গোটা তাক হাতড়াল,—না, ভেতরে তো নেই।

—কম কী করে হবে! ভাল করে গোনা।

—বিশবার কাউন্ট করেছি। বলতে বলতে আরেকবার গুনল শুভময়—থাকার কথা একচল্লিশ, আছে ছত্রিশ।

—অসম্ভব! টাকার কি ডানা আছে?

—সে তুমিই জানো। বের করোনি?

—আমি ওখানে হাতই দিইনি।

—এ তো মহাচিন্তার কথা হল। তোমার শাড়ির ভাঁজে ফাজে নেই? তুমি তুলবার সময়ে কোনদিন ভুল করে...যা ন্যাতা-ছ্যাতা করে রাখার স্বভাব।

—বাজে কথা বোলো না। ঝট করে কথাটা নীলার গায়ে লেগে গেল। ঝপাৎ ঝপাৎ করে নামাচ্ছে শাড়িগুলো,—দ্যাখো দ্যাখো, কোথায় আছে দ্যাখো।

—ও কি আর এখন পাওয়া যাবে? কোথায় কোন্ স্যাকরার গর্ভে ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছ! কিংবা শাড়ি কিনে বসে আছ। হারামের মাল পেয়েছে...

—চেঁচিও না। তোমার এই তাকের টাকায় আমি কক্ষনো হাত দিই না।

যা খরচা করি, সব এই লকারের টাকা থেকে করি। কিংবা যা ভিক্ষে দাও তাতে করি। নীলার দাঁতে বিষ এসে গেল,—নিজে কোথাও ফুর্তিফার্তা করে ওড়াওনি তো? এখন ভুলে গিয়ে ঢং করছ।

—আমি ফুর্তিফার্তা করি? কী ফুর্তি করি?

—সে তুমিই জানো। আমি তো আর তোমার পেছনে গোয়েন্দা লাগাইনি।

ক্রমশ গলা চড়ছে দুজনের। মানুষ থেকে শ্বাপদ, শ্বাপদ থেকে ক্রমে সরীসৃপ হয়ে যাচ্ছে স্বামী-স্ত্রী।

ভটাং করে দরজা খুলে গেল,—কী ব্যাপার? সন্ধেবেলা হঠাৎ ফাইট শুরু করলে কেন?

দুজনেই থতমত খেয়ে চুপ।

লাল্টু ঘরে ঢুকল,—একি! সব এমন লণ্ডভণ্ড করল কে? এদিকে গয়না, ওদিকে শাড়ি...!

ছড়ানো টাকা শাড়ির আড়ালে চাপা দেওয়ার অক্ষম চেষ্টা করল নীলা। শুভময় চটপট বলে উঠল,—একটা টাকা রাখা ছিল...পাচ্ছি না।

—কত টাকা?

—পাঁচ হাজার।

—পঞ্চাশ টাকার একটা গোছা তো? লাল্টুর স্বর নির্বিকার,—ওটা আমি নিয়েছি।

—তুই! নীলা শুভময়ের গলা কোরাসে বেজে উঠল,—কেন?

—দরকার ছিল।

—কী দরকার? আমাদের বলিসনি কেন?

—সব ব্যাপার কি তোমাদের বলা যায়!...তবে ওড়াইনি।

নীলা স্থিত হয়েছে খানিকটা। ছেলের এই ভাবলেশহীন আচরণ সহ্য হচ্ছে না তার। কড়া সুরে বলল,—কী এমন ব্যাপার যে আমাদেরও বলা যায় না?

—শুনবে? খুব সিক্রেট। লোককে আবার বলে বেরিও না। শর্টস-টিশার্ট পরা লাল্টুর মসৃণ চোয়ালে রহস্যময় হাসি খেলে বেড়াচ্ছে। একটা চোখ ছোট করে বলল,—আমাদের টিউটোরিয়ালের জ্যোতির্ময় স্যার তিনটে পেপারের কোয়েশ্চেন দিয়েছেন। ফিজিক্সের দুটো পেপার আর কেমিস্ট্রির সেকেন্ড পেপার। তিন-দুগুণে-ছ হাজার চেয়েছিলেন, বলেকয়ে পাঁচ হাজারে করিয়েছি। জেনুইন কোয়েশ্চেন। একদম অরিজিনাল। না হলে টাকা ফেরত।

ঘরে কি বাজ পড়ল? মাটি কাঁপছে নাকি? ফ্যানটা যথেষ্ট জোরে ঘুরছে না?

শুভময় বিস্ফারিত চোখে দেখছে ছেলেকে। কোনক্রমে বলল, —কোয়েশ্চেন

পেপার কিনে পরীক্ষা দিবি তুই?

—হাতে এসে গেলে নেব না? উনি বেচছেন, তাই তো কিনছি। আমি তো আর একা নই, অনেকেই...

—এত যে তোর রাত জেগে পড়া, নোট বানানো, ঘড়ি দেখে উত্তর লেখা, সবই কি ফাঁকি? শুধু আমাদের দেখানোর জন্য? নীলার গলা কেঁপে গেল।

—তা কেন? খেটে তো আমি ষাট-সত্তর পেতেই পারি। তাই বলে কি সেখানেই থেমে থাকব? কটা টাকা দিলে যদি নাইনটি পারসেন্ট এসে যায়, সেটা কি দোষের? লান্টুর গলায় অভিমান,—মনে রেখো, মাধ্যমিকে আমি স্টার মিস করেছিলাম।

নিজের ঘরে ফিরে গেল লান্টু।

নীলা অবশ হাতে শাড়িগুলো তুলছে এক এক করে। গয়নাগুলো জড়ো করছে, টাকাও। হঠাৎই আয়নায় চোখ পড়ে গেল। দর্পণে পাশাপাশি দুটো মুখ। শুভময় আর নীলা। দুজনে দেখছে দুজনকে।

কী সরাবে এখন? কোথায় সরাবে!

খোলস

আশিস সান্যাল

অনিমেষ যখন লঞ্চ থেকে নামলো, তখন প্রায় সন্ধে। বিদায়ী সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু নদীর জলে লেপটে পাড়ে চিক চিক করে হাসছে। সজনেখালির জঙ্গলে পাখিদের কিচিরমিচির ডাক ভেসে আসছে যেন বাতাসে। কিন্তু সেদিকে কোনও খেয়াল ছিলো না অনিমেষের। চারদিকে সে তাকিয়ে দেখল, কোথাও তুষার নেই। অথচ তুষার লিখেছিল, সে নিজে উপস্থিত থাকবে লঞ্চঘাটে।

লঞ্চ থেকে যে ক'জন যাত্রী নেমেছিল, তারাও একে একে চলে গেল যে যার পথে। লঞ্চটাও ঘাট ছেড়ে চলে গেছে অনেকক্ষণ। সুতরাং আর অকারণ অপেক্ষা করা শ্রেয় নয় মনে করে, নিজেই ঘাড়ে বেডিং আর একটা ছোট সুটকেস নিয়ে এগিয়ে চলল সামনের একটা ছোট চায়ের দোকানের দিকে।

জায়গাটা একেবারে অপরিচিত নয় অনিমেষের কাছে। এর আগেও সে দু'বার এসেছে এখানে পার্টির কাজে। প্রথম যেবার এসেছিল, সে প্রায় বিশ বছর আগের কথা। তখন এখানে দোকান-পাট বলতে কিছুই ছিল না। সপ্তাহে একদিন মাত্র হাট বসত। তখন দূর-দূরান্ত থেকে কেনাবেচার জন্য লোকজন আসত এখানে। এখন বেশ কয়েকটা দোকান হয়েছে। সপ্তাহের সব কদিনই খোলা থাকে। তবু এখনও বিশেষ উন্নতি হয়নি জায়গাটার। একটা সাইকেল রিকশা পর্যন্ত নেই। কুলি নেই লঞ্চ-ঘাটে। হ্যামিলটন সাহেব যখন ছিলেন, তখন নাকি একটা সুন্দর গেস্ট হাউস ছিল। এখন আর সে-সব কিছু নেই। একটা ছোট গেস্ট হাউস আছে বটে, তবে সেখানে সরকারি আমলা ছাড়া কারও স্থান মিলে না।

মনে মনে ভাবছিল অনিমেষ, যদি তুষার না আসে, তবে কোনও পার্টি সদস্যের বাড়ি গিয়েই উঠতে হবে তার, দু-একজনের নামও তার মনে পড়ল। এ-সব ভাবতে ভাবতে সে এসে দাঁড়াল চায়ের দোকানটার সামনে। তাকে দেখেই দোকানের বেঞ্চে বসা দু-একজন প্রায় ছুটে এল।

'কমরেড, আপনি? আপনার তো কাল আসার কথা। আমরা আপনাকে লঞ্চঘাটে স্বাগত জানাব বলে সব ঠিক করে রেখেছি।'

'একদিন আগেই চলে এলাম। আসলে আমার এক পুরোনো বন্ধু থাকে এখানে। তার আমন্ত্রণেই এসেছি একদিন আগে।'

'কি নাম আপনার বন্ধুর?'

'তুষার রায়।'

'ও, মাস্টারবাবু! সে তো এখান থেকে তিন-চার মাইলের পথ।'

'তিন-চার মাইল!' বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করে অনিমেষ।

'হ্যাঁ, তা তো হবেই।' বলে একজন দ্বিতীয় জনের দিকে তাকিয়ে বলল,

'ঠিক বলেছি তো? রাঙাবেলিয়া এখান থেকে তিন-চার মাইল তো হবেই, কি বলো?'

'হ্যাঁ, দু'ক্রোশ তো হবেই।' সম্মতি জানাল দ্বিতীয় জন। পথের দূরত্বের কথা শুনে অনিমেষ বেশ ঘাবড়ে গেল। ঘাড়ে এসব মালপত্র নিয়ে যদি এতদূর যেতে হয়, তাহলে আর কাল পার্টির মিটিংয়ে ভাষণ দেওয়া হবে না। গায়ে-পিঠে ব্যথা নিয়েই কাটাতে হবে।

একগ্লাস চা নিয়ে অনিমেষ সবে চুমুক দিতে যাবে, তখন দেখে তুষার একটা সাইকেলে চেপে এদিকে আসছে। একটু স্বস্তি অনুভব করল অনিমেষ। তুষার সাইকেল থেকে নেমে প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠল।

'তুই এখানে। আর আমি সারা লঞ্চঘাট তন্ন তন্ন করে খুঁজে এলাম।'

'মানে? আমি লঞ্চ থেকে নেমে দাঁড়িয়ে রইলাম কতক্ষণ তোর জন্যে। আর তুই বলছিস—।'

'না। আসলে আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। প্রতিদিন-ই তিন-চার ঘণ্টা লেট করে লঞ্চটা। আজ যে আবার ঠিক সময়ে এসে যাবে, কি করে বুঝব? তোর মতো ভি-আই-পিকে দেখে ভয় পেয়ে ঠিক সময়েই এসে গেছে।' বলে বেশ গর্বের সঙ্গে হাসল তুষার রায়।

তারপর সাইকেলের পেছনে অনিমেষের জিনিসপত্র বেঁধে নিল তুষার। এর মধ্যে আবছা অন্ধকারে ঢেকে গেছে চারদিক। চা খেয়ে অনিমেষ উঠে দাঁড়াল। তুষারের পাশাপাশি এগিয়ে চলল সামনের পথ ধরে।

কিছুদূর গিয়েই তারা মাঠে নামল। তুষার জানাল, একটু সর্টকার্ট করা হল। টর্চের আলোতে দেখতে পেল অনিমেষ, কাটা ধানের গোছা ইতস্তত ছড়িয়ে আছে চারদিকে। তবু চলতে মন্দ লাগছে না, কেমন যেন মাটির সোদা গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। আকাশে দপ দপ করে জ্বলছে তারাগুলো। এমন স্বচ্ছ আকাশ কতদিন দেখেনি অনিমেষ। মনটা কেমন যেন তার উদাস হয়ে যাচ্ছে। গুনগুন করে একটা গান ধরল। তুষার বলল—

'তোর দেখছি, এখনও গানের অভ্যাস আছে।'

'আরে দূর! সে সব পাট কবে চুকে গেছে। এখন দিনরাত শুধু পার্টির কাজ।

'সত্যি! কত নাম হয়েছে তোর। পত্রিকা খুললেই তোর নাম দেখতে পাই। তনিমা তো বিশ্বাস-ই করতে চায় না, তুই আমার বন্ধু। কি বলে জানিস?'

'কি বলে?'

'বলে কি, এতবড় একজন লোক কখনও তোমার মতো স্কুলমাস্টারের বন্ধু হতে পারে? আমিও বলেছি, দেখো এবার, সত্যি বন্ধু কিনা। আমরা এক পাড়ায় থেকেছি, একসঙ্গে পড়েছি। সব শুনতে পাবে ও এলে।'

বলতে বলতে এক সময় তারা এসে পৌঁছে গেল বাড়িতে। তনিমা প্রতীক্ষাই করেছিলো। দূর থেকে টর্চের আলো দেখেই চা বসিয়ে দিয়েছিল উনুনে। কাছে আসতেই সপ্রতিভভাবেই অনিমেষকে স্বাগত জানিয়ে বলল—

'আসুন, আসুন। আপনি যে সত্যিই আসবেন তা ভাবতে পারিনি। আপনার চিঠি পেয়ে ভেবেছিলাম, ওটা কথার কথা।'

'এখন বুঝতে পারলেন তো কথার কথা নয়।'

'হ্যাঁ, আপনি সত্যি মহৎ। নইলে আমাদের মতো একজন সাধারণের ঘরে কখনও পা দিতেন না।'

'সে কি বলছেন! তুষার আমার বাল্যবন্ধু। তার বাড়ি আসব না?'

'কত বাল্যবন্ধুর কথাই তো শুনি। কিন্তু এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে কাউকে আসতে দেখিনি কোনওদিন। পাঁচ বছর ধরে আছি এখানে। এই পাঁচ বছরের মধ্যে কেউ আসেনি। আপনিই প্রথম এলেন।'

'তাই বুঝি?'

'এসব কথা এখন থাক। পরে হবে। আগে হাত-মুখ ধুয়ে একটু চা খেয়ে জিরিয়ে নিন। সারাদিন যা ধকল গেছে।'

'ওসব অভ্যেস হয়ে গেছে আমাদের। চা দিন। আগে খেয়ে তারপর হাত-মুখ ধুতে যাব।'

'না-না, হাতে পায়ে ধুলো বালি লেগে আছে। ধুয়ে নিন হাত-পা। নইলে শরীর খারাপ হবে। ব'লে তনিমা একটা গামছা দিল অনিমেষের হাতে। অনিমেষ আর না করতে পারল না। এমনভাবে কতদিন কেউ তাকে আদেশ দেয়নি। অদ্ভুত মায়া-মমতায় ভরা এই আদেশ। অনিমেষ তা উপেক্ষা করতে পারল না। গামছাটা নিয়ে সোজা চলে গেল স্নান-ঘরে। সেখানে একটা চৌবাচ্চায় জল ভর্তিই ছিল। হাত-পা ধুয়ে ঘরে আসতেই তনিমা ইস্তিরি করা ধুতি-জামা এগিয়ে দিল তার দিকে। আগের মতোই সপ্রতিভভাবে বলল—'জামা-কাপড়টা পাল্টে নিন। আমি চা নিয়ে আসছি।'

'আমার নিজের জামা-কাপড়ই তো ছিল, মিছিমিছি একটা ধোয়া ধুতি-জামা নষ্ট করা।'

'না হয় একটু নষ্ট হলই। আপনার মতো একজন নামী লোকের সেবায় লেগেছে জেনে নিজেদের কৃতার্থ মনে করব।'

বলেই চলে গেল তনিমা। অনিমেষ জামা-কাপড় পাল্টে ইজি চেয়ারে বসতে না বসতেই তনিমা এসে আবার ঢুকল ঘরে। তার এক হাতে চায়ের কাপ এবং অন্য হাতে একটা প্লেটে গরম গরম লুচি ও বেগুন ভাজা। একটা ছোট টেবিলের উপর সেগুলি রেখে এগিয়ে দিল তনিমা অনিমেষের দিকে।

'খান। সারাদিন তো পেটে নিশ্চয়ই কিছু পড়েনি।'

'একেবারে কিছু পড়েনি, বলব না। লঞ্চে কিছু খেয়েছি।'

লঞ্চে খেয়েছেন?' আশ্চর্য হল তনিমা। 'কি খেয়েছেন?'

'তেলেভাজা আর মুড়ি।'

'সর্বনাশ! এসব আর খাবেন না কোনওদিন। শরীর খারাপ হবে।'

'আমাদের এ-সব সইয়ে গেছে।'

'তা হলেও। আপনার মতো একজন লোকের কাছে দেশের কত আশা-ভরসা।'

রাতে খাবার-দাবার শেষে তিনজনে মিলে বসল বাইরের খোলা বারান্দায় পাটি পেতে। তনিমা তার তিন বছরের মেয়েটিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে এসেছে ঘরে। কাজের মেয়েটিও চলে গেছে অনেকক্ষণ। চারদিকে কী গভীর নির্জনতা। কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই। কেবল মাঝে মাঝে হাওয়ার থাবায় নারকেল গাছের পাতায় পাতায় বেজে যাচ্ছিল সুরের রিমঝিম। স্বচ্ছ আকাশে অসংখ্য তারার ঝিলিমিলি। খুব ভালো লাগছিল অনিমেষের। বহুদিন পর এমন একটা দুর্লভ মুহূর্তকে পেয়ে তার মন যেন খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এল আরেক জগতে। পুরোনো দিনের অনেক কথা নিয়ে দুই বন্ধুতে চলছিল রোমন্থন। আর তনিমা অবাক বিস্ময়ে তা উপভোগ করছিল। তুষার বলল—

'তুই যে এত বড় নেতা হবি, তা কিন্তু তোকে দেখে কখনও মনে হয়নি।'

'সব কথাই কি মানুষ আগে থেকে জানতে পারে?'

'তা ঠিক। তবু কিছুটা আঁচ করা যায়। তোকে দেখে কিন্তু কখনও আঁচ করা যায়নি। কলেজে পড়ার সময় তুই কিন্তু রাজনীতি থেকে দূরেই ছিলিস। লেখাপড়া আর গান-বাজনা নিয়েই তোর দিন কাটত। বরং বলতে পারিস, আমিই একটু-আধটু রাজনীতির হই-হল্লায় ছিলাম।'

'তা অবশ্য ঠিক। আমার জীবনটা হঠাৎ কেমন পাল্টে গেল।'

কথা বলতে বলতে অনেক রাত হল। এক সময় সবাই উঠে দাঁড়াল। তনিমা বলল—

'আপনার বিছানা পেতে রেখেছি। শুয়ে পড়ুন। সারাদিন ঝামেলায় নিশ্চয়ই ক্লান্তি বোধ করছিলেন। অকারণে এতক্ষণ বকবক করালাম।'

'না-না। আমার ভালোই লাগছিল।'

'তা তো বলবেনই। খারাপ লাগলেও কি আর বলতে পারতেন।'

'ঠিক বলতাম। আমার ও-সব ব্যাপারে লজ্জা নেই।'

'হ্যাঁ, পেটে খিদে, মুখে লাজ—আমিও পছন্দ করি না।' কথাটা বলেই তনিমা হো-হো করে হেসে উঠল। অনিমেষের বুকটা কেমন যেন ছলাৎ করে উঠল। তবু খুব একটা আবেগে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে পারল না। ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল বিছানায়। এমন পরিপাটি বিছানায় কত কাল সে

ঘুমোয়নি। মা মারা যাওয়ার পর একদিনও না। কাচা ধবধবে সাদা চাদর। নতুন মশারির চারদিক সুন্দর করে গোঁজা। একটা কোমল প্রাণের স্পর্শ অনুভব করল অনিমেষ। শুতে না শুতেই চোখ বুজে এল ঘুমে।

পরদিন কখন যে ভোর হয়েছিল, তার কিছুই টের পায়নি অনিমেষ। টের পায়নি, কখন ভোরের পাখিগুলো কিচির মিচির ডেকে উঠেছিল। ঘুম ভাঙল একটা মধুর ডাকে। তাকিয়ে দেখে তনিমা হাতে চা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে চোখ মেলতে দেখে তনিমা বলল—

'এবার উঠুন। অনেক বেলা হয়ে গেছে। আপনার মিটিং আছে না?'

'কটা বাজে?'

'ন'টা।'

'ন'টা? কি বলছেন আপনি? দশটায় আমার মিটিং।'

'একটু দেরি করে গেলে কিছু হবে না। আমি ইচ্ছে করেই আপনাকে ডাকিনি। কাল যা ধকল গেছে।'

'একটু ডেকে দিলেই পারতেন। ঠিক সময়ে না পৌঁছানোটা উচিত নয়।'

'তা হোক। তাই বলে এমন বেঘোর ঘুম থেকে ডেকে দেবো না কি?'

অনিমেষ আর কথা না বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিলো। তনিমা জল-খাবার এনে দিল। খুব তৃপ্তি করে খেল অনিমেষ। তারপর বাক্স-বেডিংয়ের খোঁজ করতেই তনিমা বলল—

'সব ঠিক আছে। আপনার ভাবতে হবে না।'

'ভাবছিলাম সঙ্গে নিয়ে যাব। কাল ভোরে গোসবা থেকেই লঞ্চে উঠব।'

'তা কি হয়? এই প্রথম এখানে এলেন। আর কোনওদিন আসবেন কিনা, কে জানে? দু-একদিন না থেকে গেলে আমাদের মন খারাপ লাগবে। তাছাড়া আপনার বন্ধু বিশেষ একটা কাজে গেছে সাতজেলেতে। কাল ফিরবে। সে না ফেরা পর্যন্ত আপনাকে যেতে দেব কেমন করে?'

অগত্যা খালি হাতেই রওনা হতে হল অনিমেষকে গোসবার দিকে। এর মধ্যে চার-পাঁচজন পার্টি কর্মীও এসে গেছে অনিমেষকে নিয়ে যাবার জন্য। সারাটি দিন মিটিং করতে করতেই কেটে গেল অনিমেষের। কর্মীসভা, জনসভা ইত্যাদি নানা কাজে সারাদিন যে কিভাবে কাটল, তার কিছুই বুঝতে পারল না অনিমেষ। কিন্তু সন্ধ্যা হতেই মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল তার। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে ফিরে চলল রাঙাবেলিয়ার পথে। দু'জন পার্টিকর্মী তাকে পৌঁছে দিয়ে গেল বাড়ি পর্যন্ত। তনিমা প্রতীক্ষাই করেছিল তার জন্য।

অনিমেষ ফিরে এসে ইজি চেয়ারটায় হেলান দিয়ে বসল। তনিমা চা আর জল-খাবার রেখে গেল টেবিলটার উপর। তারপর যথারীতি অনিমেষের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল—

'আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় পাল্টাবেন। আমি এর মধ্যে স্নান করে আসি।'

'এখন স্নান করবেন?'

'হ্যাঁ, আজ বৃহস্পতিবার না? লক্ষ্মীপুজো আছে। একটু দেরিই হয়ে গেল। আসলে যে মেয়েটা কাজ করে, ওকে পাঠিয়েছিলুম দুধ আনতে। আপনাকে একটু পায়েস করে খাওয়াব বলে।'

'মেয়েটি কোথায়?'

'এই তো, এইমাত্র দুধ এনে দিয়ে চলে গেল বাড়ি। অনেক দূরে থাকে কিনা। তাই সন্ধে হলেই ছেড়ে দিই।'

'তার মানে আজ আপনি বাড়িতে একা?'

'হ্যাঁ, একাই বলতে পারেন। তবে তিন বছরের মুন্না আছে সঙ্গে।'

'আপনার ভয় করে না?'

'অন্যদিন তো ও থাকে বাড়িতে। আজ আপনি আছেন বলেই ও বলল, অনেকদিন যাবার কথা। কাজটা সেরে আসি।'

'তাই বলুন। নইলে এমন নির্জন স্থানে ভয় না লেগে পারে?'

তনিমা চলে গেল ঘর থেকে। তারপর একটা লণ্ঠন নিয়ে ঢুকল স্নানঘরে। আধখোলা দরজা দিয়ে স্নান-ঘরটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভাঙা বাঁশের বেড়ার ভেতর তনিমাকেও দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট। অনিমেষ দেখল, তনিমা কাপড় খুলে রেখেছে বেড়ার উপর। তারপর জামা, শায়া এবং আরো একটা ছোট জামা। তনিমার উন্মোচিত শরীরের লাবণ্যে চোখ ধাঁধিয়ে গেল অনিমেষের। শরীরের গঠন এখনও বেশ আঁটোসাঁটো। ফর্সা, সুগোল হাত-পা। স্নান করে একটা লাল-পেড়ে শাড়ি পড়ল তনিমা। শাড়ির আঁচলেই শরীরটা ঢাকল। ঘরে এসে কপালে আর মাথার সিঁথিতে সিঁদুর দিল। অলক্ষ্যে থেকে সব কিছুই লক্ষ করল অনিমেষ। রক্তে তখন তার সে কী মাতামাতি।

একটু পরে এসে তনিমা বলল অনিমেষকে—

'এবার আপনি যান। ধুতি-জামা রেখে গেলাম। হাত-মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় পাল্টে একটু বসুন। আমি এর মধ্যে পুজোটা সেরে নিচ্ছি। তারপর আপনার সঙ্গে গল্প করা যাবে।'

অনিমেষের যে রাজনৈতিক দর্শনে আস্থা, তাতে ধর্মের কোনও স্থান নেই। তবু তনিমাকে অদ্ভুত ভালো লাগছিল তার। তবে কি ঐতিহ্যের প্রতি মানুষের টান স্বাভাবিক? লোকাচার জাতীয় সংস্কৃতিরই অঙ্গীভূত? এ সব ভাবতে ভাবতে অনিমেষ গিয়ে ঢুকল স্নান-ঘরে। হাত-মুখ ধুয়ে, জামা-কাপড় পাল্টে সে এসে বসল আবার ইজি চেয়ারটায়। তার মন আজ খোলস ছেড়ে অনেক দূরে এগিয়ে এসেছে। কি যেন একটা অনাস্বাদিত দুর্লভ বস্তু তাকে আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছে

এক অজানা রহস্যালোকের দিকে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে গতকালের মতো আজও তারা পাটি পেতে বসল বাইরের বারান্দায়। তনিমার ছোট মেয়েটি আজ ঘুমিয়ে পড়েছে অনেক আগেই। আজ শুধু তারা দু'জন। এই বহুদূর বিস্তারিত নিবিড় নির্জনতার মধ্যে মুখোমুখি একটি পুরুষ আর একটি নারী। লণ্ঠনের মৃদু আলোয় এক আশ্চর্য মোহময় পরিবেশে যেন ভিনদেশী মানুষ বলে মনে হচ্ছে দু'জনকে। বাতাসে ভেসে আসছে বুনো ফুলের গন্ধ। অনেক দূর থেকে ভেসে আসা একটা অচেনা পাখির ডাকে অনিমেষের সমস্ত শরীর অকারণে চঞ্চল হয়ে উঠল। অপলক দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে রইল তনিমার দিকে। তনিমা বিষয়টাকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বলে উঠলো—

'কি দেখছেন?'

'তোমাকে।'

'ছিঃ, আপনার মতো লোক এ-সব কথা বললে বিশ্রী লাগে শুনতে।'

নিজের খোলসের মধ্যে ঢুকে পড়ল আবার অনিমেষ। নিজেকে সংযত করে নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই বলল—

'বন্ধু-পত্নী কিনা, তাই ঠাট্টা করছিলাম।'

'আপনি বিয়ে করেননি কেন?' হঠাৎ একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল তনিমা। অনিমেষের বুকের ভেতরে হঠাৎ উঠল জোর তুফান। কি উত্তর দেবে সে এই প্রশ্নের? তার মনে হল, যেন এক অজানা নদীপথে তরী ভাসিয়ে হাওয়ার বেগে ভেসে চলেছে সে উত্তর থেকে দক্ষিণে। পাল ধরে বসবার মতো শক্তিটুকুও যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। একটি মুখের অস্পষ্ট ছবি ফুটে উঠছে তার চোখের সামনে।

অনেক দিন আগের কথা। তখন সে তৃতীয় বার্ষিক কলা বিভাগের ছাত্র। পড়াশুনায় বেশ নামডাক তার। কলেজের সেরা ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সে একজন। গান-বাজনাতেও যে তার অধিকার ছিল, তা কলেজের প্রায় সকলেই জানত। সেই সুবাদেই কলেজের বার্ষিক উৎসবে 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনয়ে বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য ডাক পড়ল তার। প্রথমে খুব আপত্তি করেছিল সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলের অনুরোধে সে অভিনয় করেছিল। এই সূত্রেই আলাপ হয়েছিল মালার সঙ্গে।

প্রথম পরিচয়ের দিনটি এখনও তার স্পষ্ট মনে আছে। সেদিনটি ছিল কলেজের ছুটির দিন। ছুটির দিন বলেই বিশেষ রিহার্সেলের ব্যবস্থা হয়েছিল। অনিমেষ এসে দেখে রিহার্সেল-রুমটি একেবারে ফাঁকা। শুধু এককোণে বসে আপন মনে গান গাইছে একটি মেয়ে। তাকে দেখেই চোখ নাচিয়ে বলে উঠেছিল মেয়েটি—

'যাক, তবু একজনের দেখা পাওয়া গেল।'

'মানে?' প্রশ্ন করেছিল অনিমেষ।

'মানে আবার কি? সেই কখন থেকে একা বসে আছি। কতক্ষণ এভাবে একা বসে থাকা যায়।'

'এত আগে এলেন-ই বা কেন?'

'কেমন করে জানব, আপনারা এত পাঙ্চুয়াল।' বলেই হেসে উঠেছিল মেয়েটি। এমনভাবে মেয়েটি হাসছিল, যেন অনিমেষ তার কতকালের চেনা। এই পরিচয় ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল। মেয়েটির নাম মালা। এই মালাই হয়ে উঠল তার সর্ব সময়ের ধ্যান-জ্ঞান। বার্ষিক উৎসব শেষ হয়ে গেল। রিহার্সেল বন্ধ হল। কিন্তু ওদের দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হল না। বরং প্রায়ই তাদের দেখা যেত, কলেজ ছুটির পর অথবা কলেজ ফাঁকি দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে লেকে, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে অথবা কোনও সিনেমায়। একদিনের কথা মনে পড়ল অনিমেষের।

সেদিন সকাল থেকেই ঝির্ ঝির্ বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু সেই বৃষ্টি উপেক্ষা করে তারা গিয়েছিল চিড়িয়াখানায়। এপাশ ওপাশ ঘুরে বেড়িয়েছিল অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ ঝমঝম বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। একটা বড়গাছের গোড়ায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তারা। বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পায়নি তবু। ভিজে একদম জ্যাবজ্যাবে হয়ে গিয়েছিল তাদের শরীর। মালা একদম গাঁ ঘেষে দাঁড়িয়েছিল তার। ওর শাড়ি-জামা সব ভিজে গিয়েছিল। শাড়িটা শরীরের সঙ্গে এমনভাবে লেপটে গিয়েছিল যে ওর শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্ধত ভঙ্গিতে এক আশ্চর্য মাধুর্য ছড়িয়ে দিয়েছিল তার সামনে। এক সময় অনিমেষ দিক-বিদিক জ্ঞান-শূন্য হয়ে ওকে জড়িয়ে ধরেছিল বুকে। মালা কোনও আপত্তি করেনি। বৃষ্টি কমলে আবার তারা ঘুরতে শুরু করেছিল। চিড়িয়াখানা থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গড়ের মাঠে। সেখানে একটা নির্জন স্থান বেছে নিয়ে তারা বসেছিল পাশাপাশি। বলতে গেলে শরীরে শরীর জড়িয়ে। অনেক রাতে সেদিন ফিরেছিল তারা। মালাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসেছিলো সে। ফেরার আগে জিজ্ঞেস করেছিল অনিমেষ—

'কাল যাবে তো?'

'কোথায়?'

'বোটানিক্যালে।'

'কখন?'

'ঠিক দশটায়। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব মেট্রোর সামনে।'

পরদিন অনিমেষ দশটার অনেক আগে থেকেই দাঁড়িয়েছিল মেট্রোর সামনে। কিন্তু মালা আসেনি। তবে কি কাল বৃষ্টিতে ভিজে শরীর খারাপ হয়েছে মালার? বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে অধৈর্য হয়ে গিয়েছিল মালার বাড়িতে। গিয়ে

শুনেছিলো সুধার সঙ্গে কোথায় বেরিয়ে গেছে দশটা নাগাদ।

এর পরের ইতিহাস শুধু বেদনা আর ব্যর্থতার। মালাকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতে চাইল অনিমেষ। কিন্তু ভুলতে গিয়ে আরো বেশি করে জড়িয়ে পড়তে লাগল ওর সঙ্গে। সব সময় বুকের ভেতরে একটা উদ্দাম অস্থিরতা। এর থেকে সে মুক্তি চায়। আর এই মুক্তি খুঁজতে খুঁজতে সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলল রাজনীতির সঙ্গে। বি-এ পাশ করার পরেই সে হয়ে উঠল দলের সর্ব সময়ের কর্মী। কৃষক ফ্রন্টের কাজে নিয়োজিত করল সে নিজেকে। শুধু কাজ আর কাজ। কাজের চাপে ভুলে গিয়েছিল সে মালার কথা। মনটাকে খোলসের মধ্যে ঢুকিয়ে শুধু বুদ্ধি আর কাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল নিজেকে। দেখতে দেখতে রাজ্য নেতৃত্বের প্রথম সারিতে স্থান হল তার।

আজ বহুদিন পর তনিমা তার বুকের সেই ক্ষতে যেন আঘাত করেছে। অনিমেষ লক্ষ করল, যেন সেখান থেকে দর্ দর্ করে রক্ত পড়ছে। অনেক চেষ্টা করেও সে খোলসের মধ্যে মনটাকে ধরে রাখতে পারল না। আবেগ-জড়ানো কণ্ঠে বলে উঠল অনিমেষ—

'তনিমা! একটা গান শোনাবে?'

'গান? আমি গান শোনাব আপনাকে? শুনেছি, আপনি নাকি খুব ভাল গান গাইতে পারতেন।'

'পারতাম। কিন্তু এখন ভুলে গেছি।'

'তাহলেও, আপনিই শোনান একটা গান।'

'ঠিক আছে। আগে তুমি শোনাও।'

তনিমা গান ধরল একটা। তাল-লয় না মিললেও শুনতে বেশ ভালো লাগছিল অনিমেষের। গানের সুরে সুরে সে তাল দিচ্ছিল। তাল দিতে গিয়ে বারবার তনিমার হাতে হাত লাগছিল। তনিমা কেমন যেন উদাসীন হয়ে গেছে এর মধ্যে। অনিমেষের স্পর্শকে সে যেন গ্রাহ্যই করছে না। গান শেষ হলে সে অনিমেষের দিকে তাকিয়ে বলল—

'খুব বিশ্রী লাগল, না?'

'না-না। বেশ ভালো লেগেছে।'

'এ-সব আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলছেন। আপনার মতো মহৎ ব্যক্তি তো এরকমই বলবেন।'

'বিশ্বাস করো তনিমা. আমি সত্যি বলছি।'

'তাহলে এবার আপনার পালা। কি ভাগ্যি আমার যে আপনার মতো লোকের গান শোনবার সুযোগ পেয়েছি।'

একটু ভেবে-চিন্তে গান ধরল অনিমেষ ঃ জাগরণে যায় বিভাবরী। গান তো নয়। যেন বুকের কান্না ছড়িয়ে পড়তে লাগল নির্জনতার বুকে। খোলস ছেড়ে

বেরিয়ে এল অনিমেষের মন। গান থামলে অনিমেষ একেবারে তনিমার শরীর ঘেঁষে বসল। একটা হাত ছড়িয়ে দিল তনিমার পিঠের উপর। তনিমা সরে বসল অনেকটা। বেশ রাগতভাবেই বলল—

'ছিঃ, এ-সব আপনার মানায় না।'

'কেন তনিমা? একটু সময় যদি তোমাকে নিয়ে জ্বালাধরা বুকটা শান্ত করতে পারি, সেটা কি অন্যায়? তুমি কি পারো না আমার বুকে একটু শান্তির প্রলেপ লাগিয়ে দিতে?'

'কি বলতে চাইছেন আপনি? উঠে দাঁড়াল তনিমা। অনিমেষ তেমনি আবেগ জড়ানো কণ্ঠেই বলল—

'শুধু তোমার একটু সান্নিধ্য। আজকের এই রাতটা।

'ছিঃ-ছিঃ। এই আপনার মহত্ত্বের নমুনা? বন্ধুর অনুপস্থিতিতে বন্ধুপত্নীর শালীনতা নষ্ট করতে চাইছেন? ধিক, আপনার এই মহত্ত্বের ভানকে ধিক।'

তনিমা ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। কিন্তু অনিমেষের হৃদয়ে চলছে তখন অশান্ত সমুদ্র গর্জন। এক ভয়ঙ্কর মাত্রায় অস্থির উতল হাওয়ায় ক্রমাগত ঘুরপাক খাচ্ছে তার চিন্তা-ভাবনা। সে কি তলিয়ে যাচ্ছে অতল সমুদ্রগর্ভে? সহসা গভীর উত্তেজনায় সে ছুটে গেল ঘরে। বেডিং আর সুটকেস নিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। পথ ধরে সে এগিয়ে চলতে লাগল সামনের দিকে। কাটা ধানের ক্ষেতে চলতে চলতে তার পা কেটে রক্ত পড়তে লাগল। কিন্তু কোনওদিকে খেয়াল নেই তার। উন্মত্তের মতো সে এ-পাশ এ-পাশ ছুটোছুটি করতে লাগল। তার কেবলই মনে হচ্ছে—এই আকাশ, এই নক্ষত্র, এই নির্জনতা, যেন তার অস্তিত্বকে ঘিরে উপহাস করছে।

দেখতে দেখতে পুবের আকাশটা ফিকে হয়ে এলো। অনিমেষ দ্রুত এগিয়ে চললো গোসবার লঞ্চঘাটের দিকে। টিকিট কেটে লঞ্চে উঠল। শব্দ করে ছুটে চলল লঞ্চ। এর মধ্যে ভোরের নরম রোদ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। নদীর জলেও সেই রোদের ঝিলিমিলি। ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল অনিমেষের মন। খোলসের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল মনটা। এক বিবেকবান বুদ্ধিদীপ্ত নামী নেতার ভূমিকায় আবার অধিষ্ঠিত হল সে। তাকে চিনতে পেরে লঞ্চের একজন যাত্রী বলে উঠল—

'কমরেড, আপনি? আপনার না আগামীকাল যাবার কথা?'

'কথা ছিল। কিন্তু একটা বিশেষ কাজে আজ-ই ফিরে যাচ্ছি।'

অনেক দূরে দেখা গেল, একঝাঁক বুনো হাঁস ডানা ঝটপট করে উড়ে যাচ্ছে। অনিমেষ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

শ্রাবণের ধারার মতো

প্রচেত গুপ্ত

আজ বাইশে শ্রাবণ। মন-খারাপ-করা দিন। এইদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। আজ ঘটুরও মন খারাপের দিন। কারণ আজ তাকে ছেড়ে ... বেকার যুবকদের সকাল ন'টার আগে ঘুম ভাঙার কোনও নিয়ম নেই। ন'টাও যথেষ্ট আগে। এই সময় যার ঘুম ভাঙে তাকে অনায়াসে 'আর্লি রাইজার' বলা যায়। মনে রাখতে হবে, বেকারদের 'আর্লি রাইজার' আর স-কারদের 'আর্লি রাইজার' এক জিনিস নয়। স-কারদের ঘুম ভাঙার অর্থ শয্যাত্যাগ। বেকারদের ঘুম ভাঙার অর্থ শয্যাত্যাগ নয়, নিদ্রাত্যাগ। ঘুম ভাঙলেই হবে। বিছানা ছাড়ার কিছু নেই। তারপরও আরও ঘণ্টা খানেকের মতো ছাড় আছে। একে বলা হয় 'গ্রেস টাইম'। সমাজ-সংসার বেকারদের কাজকর্মের তেমন সুযোগ দিতে পারেনি, তবে অন্য নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধে দিয়ে রেখেছে। 'গ্রেস টাইম' সেগুলোর একটা। এটাও কম নয়। এই এক ঘণ্টার অতিরিক্ত সময়ের মধ্যে মিনিট কুড়ি হল গড়াগড়ি পর্যায়। খাটের এ-পাশ থেকে ও-পাশ। ও-পাশ থেকে এ-পাশ। খাট ছোট হলে চক্রাকারেও ঘোরা যাবে। মিনিট কুড়ি মোবাইল ফোনে 'জরুরি' আলোচনার জন্য রাখা হয়েছে। আরও কুড়ি মিনিট চিৎ হয়ে শুয়ে পা নাড়াতে হবে। এটা হল ফ্রেশ মাথায় ভাবনাচিন্তার টাইম। নিজের চিন্তা সারাদিন ধরে করা যায়। কিন্তু দেশ ও দশের চিন্তার জন্য তরতাজা মস্তিষ্ক প্রয়োজন। সকাল ছাড়া সেই মস্তিষ্ক কোথায়? এ সবের মাঝখানে মাঝখানে বাড়ির অন্য সদস্যদের গালমন্দ ভেসে আসে। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মতো। সেই গালমন্দ গায়ে নেওয়া যায় না। তাচ্ছিল্য করতে হয়। ভেবে নিতে হয়, এগুলো আসলে হিংসে। যারা বেলা পর্যন্ত শুয়ে গড়াতে পারে না, খেটে খেটে মরে, তাদের হিংসে।

আমাদের এই সামান্য কাহিনিটির নায়কের নাম ঘটু। সে একজন বেকার যুবক। চাকরিবাকরি, ব্যবসাপাতি কিছু নেই। কলেজ টপকে শুয়ে-বসে আছে। বয়স পঁচিশ বছর কয়েক মাস। বেকারত্বের নিয়ম অনুযায়ী তারও বেলা পর্যন্ত বিছানার নিশ্চিন্তে আশ্রয়ে থাকার কথা। কিন্তু কিছুদিন হল সে ভোর সাড়ে পাঁচটায় মুখ বেজার করে ঘুম থেকে উঠছে। ছ'টা পনেরোতে আরও মুখ বেজার করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ছে। বাড়ির সবাই অবাক। পাড়ার লোকেরা আড়চোখে তাকায়। বন্ধুরা হাসাহাসি করে। বেকার মর্নিং ওয়াক করে—এমন অদ্ভুত কথা কেউ কখনও শোনেনি। তাছাড়া ঘটু ওয়াক করে না। দৌড়ে গিয়ে ট্রামে উঠে পড়ে। কারণ রোজই তার লেট হয়ে যায়। কীসের লেট? কার কাছে লেট?

লেট হয় অচিরার কাছে। গত বৈশাখ মাসে অচিরা নামে এই সুন্দর ফুটফুটে

মেয়ের সঙ্গে ঘটুর প্রেম হয়েছে। নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে প্রেমের দিনক্ষণ ছিল পঁচিশে বৈশাখ প্রভাত। সেদিন 'লেবুতলা সাংস্কৃতিক সংঘ' নিজেদের ক্লাবে স্টেজ বানিয়ে রবীন্দ্র জন্মোৎসবের ব্যবস্থা করেছিল। ঘটুর বন্ধু বিশুর আলো-মাইকের বিজনেস। সরস্বতী পুজো, বিশ্বকর্মা, পঁচিশে বৈশাখে অর্ডার বেশি। লোকে টান পড়ে। বিশু বন্ধু-বান্ধবের হাতে-পায়ে ধরে ম্যানেজ করে। রিকশায় লাইট-মাইক তুলে তাদের এদিক-ওদিক পাঠায়। ঘটু গেল লেবুতলা। সেখানে অচিরার একটাই গান ছিল। মেঘ ছিল। মেঘ বলেছে যাব যাব। সেই সময় আবার মাইকে হল বড় ঝামেলা। আচমকা ঘড় ঘড়, ঘড় ঘড় আওয়াজ শুরু। আওয়াজ চলতেই থাকল। সবাই বলল, 'মেঘের গান বলে মাইকে মেঘ ডাকছে।' ঘটু অনেক কষ্ট করেও মাইকের মেঘগর্জন থামাতে পারল না। থামাবে কী করে? সে যন্ত্রপাতির তেমন কিছুই জানে না। গায়িকা তো রেগেমেগে তাকে এই মারে তো সেই মারে! ধমকের পর ধমক। সেই ধমক বিকেলের দিকে প্রেমের চেহারা নিল। হৃষীকেশ পার্কে দুজনে দেখা করল। মাইক ও শিল্পীর মিলন ঘটল।

রাগের মধ্যে দিয়ে মানব-মানবীর প্রেম নতুন কিছু নয়। আকছার ঘটেছে। কিন্তু খুব অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ঘটু বুঝতে পারল, তার ফুটফুটে সুন্দরী, সুমিষ্ট গলার প্রেমিকার রাগ মারাত্মক। কথায় কথায় ধমক দিতে সে বিশেষ পছন্দ করে। অচিরার মর্নিং কলেজ। থার্ড ইয়ার চলছে। ফার্স্ট ক্লাস ছ'টা চল্লিশ। তার আগে ঠিক দশ-বারো মিনিট সে আমাদের ঘটুর সঙ্গে হৃষীকেশ পার্কের কোনায় দেখা করে। টাইম হয়ে গেলেই আমহার্স্ট স্ট্রিট ধরে কলেজের দিকে ছোটে। রোজ ঘুম চোখে ছুটে এসে প্রেম করতে ঘটুর একেবারেই মন চায় না। সে চায় অচিরার কলেজ ছুটির পর আসতে। অচিরাকে সে কথা বলেও ছিল। অচিরা ঝাঁঝিয়ে ওঠে—'আমি ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠব, আর তুমি বিছানায় পড়ে পড়ে নাক ডাকবে, এটা কেমন কথা? ছি ছি। মেয়েদের তোমরা এমন চোখে দেখ?'

ঘটু আমতা আমতা করে বলে, 'না এইটুকু তো সময়, দশ মিনিট মাত্র টাইম। কোনও কোনও দিন তাও থাকে না। আমি দাঁড়িয়ে থাকি, তুমি হাত নেড়ে চলে যাও। এক-একদিন হাত নাড়ারও সময় পাও না। তাকাও না পর্যন্ত। তাই বলছিলাম তোমার ক্লাস শেষ হওয়ার পর যদি দুপুরে আসতাম, বেশ বেড়াতে যাওয়া যেত। গঙ্গার ঘাট, আজকাল সবাই সিটি সেন্টারে যায়।'

'চুপ। একদম চুপ। তুমি সকালে আসবে, দুপুরেও আসবে। আর যদি সকালে না আসো, তাহলে কখনই আসবে না। আমি খেটে মরব আর তুমি নাক ডেকে ঘুমোবে? মামাবাড়ি পেয়েছ? এই রে, দেরি হয়ে গেল। এস কে

পি-র ক্লাস একমিনিটও লেট চলবে না। লেট হলে বাইরে।'

অচিরা দৌড় লাগায়। ঘটু হৃষীকেশ পার্কের কোনায় বেঞ্চ খুঁজে বসে পড়ে। কোনও কোনও দিন ঘুমিয়ে পড়ে বেচারি। মনে মনে ভাবে, অসুবিধে কিছু নেই। বেকার ছেলের বাড়িতে গিয়ে ঘুমোনোও যা, পার্কে ঘুমনোও তাই। বরং এই ঘুমের মধ্যে একটা প্রেমিক প্রেমিক ভাব থাকে। ঘটু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কোনও কোনও দিন স্বপ্ন দেখে। অচিরা আর সে হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। অচিরা গান করছে— মেঘ বলেছে যাব যাব। ঘটু খুব আবেগ দিয়ে গুনগুনিয়ে গলা মেলাতে যায়। গলা মেলে না। বিগড়োনো মাইকের মতো 'ঘড় ঘড়' আওয়াজ বেরোতে থাকে। অচিরা ধমক লাগায়—'এই চুপ কর, চুপ কর দেখি। ভুল সুরে গান গাইবে না একদম।'

ঘুমের মধ্যেই ঘটু চুপ করে যায়।

শুধু গান নয়, নিজের নাম নিয়েও ঘটু সেদিন অচিরার কাছে বিরাট ধমক খেল। ধমকেই ঘটনা শেষ হল না। ঘটনা এগোল আরও অনেক দূর। একেবারে ভয়ঙ্কর দিকে। শেষ পর্যন্ত।

ঘটু শুনলেই বোঝা যায়, এটা ডাকনাম। নিশ্চয় অন্য কোনও নাম আছে। স্কুল-কলেজের নাম। চাকরি পেলে অফিসের নাম। বিয়ের সময় পুরুত ঠাকুর যে নাম উচ্চারণ করবেন সেই নাম। তাকে বলে ভাল নাম। আমাদের ঘটুর ক্ষেত্রেও ঘটনা তা-ই। তারও আর একটা নাম আছে। কিন্তু সেই নাম ভাল নাম নয়। ঘটুর থেকেও খারাপ নাম। সেই নাম নিয়ে ছোটবেলা থেকে ঘটু লজ্জায় আছে। লজ্জা পাওয়ারই কথা। সেই নাম হল ঘটকেশ্বর। এই যুগে ঘটকেশ্বর কারও নাম হয়? ছেলেমেয়েদের কায়দা মার্কা নাম রাখাটাই এ যুগের ফ্যাশন। যে নাম যত কঠিন, সেই নাম তত ভাল। যার নামের মানে বলতে গিয়ে সবাই ঘেমে-নেয়ে একসা হয়, সে-ই হল আসল হিরো। সেই জায়গায় ঘটকেশ্বর। ছি ছি। স্কুলের বন্ধুরা ঘটুকে খেপাত। ঘুঁটে বলে ডাকত। বাড়ি ফিরে মায়ের কাছে ঘটু কত কান্নাকাটি করেছে। মা ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বলতেন, 'কিছু করা যাবে না রে বাবা, কিছু করা যাবে না। বাড়ির গুরুদেব নাম ঠিক করে দিয়েছেন। সেই নাম একমাত্র তিনিই রাখতে পারেন, তিনিই ফেলতে পারেন।'

ঘটু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলত, 'বাড়িব গুরুদেবকে বল আমার নাম ফেলে দিতে।'

মা বলল, 'আচ্ছা বলব। উনি এখন দেওঘরে। শীতে আসবেন। তখন বলব।'

বাবার কানে খবর গেল। ছেলে নাম বদলাতে চায়। রাগী মানুষ আরও খেপে গেলেন। বললেন, 'যার মাথায় ঘুঁটে তার ঘুঁটে নামে লজ্জা কীসের হে?

ছেলেকে কানে ধরে চড় দাও। নাম থেকে ঘুঁটে না সরিয়ে মাথা থেকে ঘুঁটে সরাতে বল।'

মা লুকিয়ে লুকিয়ে ঘটুকে বলল, 'তুই চিন্তা করিস না। গুরুদেব এলেই আমি বলব। যা এখন পড়তে বস। বাবা রাগ করবে।'

শীত পড়ার মুখে গুরুদেব মারা গেলেন। ঘটুর নাম আর বদলানো হল না।

অচিরা এই ঘটনা শুনল। শুনে বিরাট খেপে গেল।

'আমাকে যদি বিয়ে করতে চাও এই নাম বদলাও।'

ঘটু অসহায় ভাবে বলল, 'বিয়ের সঙ্গে নাম বদলানোর কী আছে? বিয়ের পরে মেয়েদের পদবি বদলায়। বিয়ের জন্য ছেলেদের নাম বদলাবার কথা শুনিনি তো কখনও।'

'থামো দেখি। ঘটকেশ্বর নামে কারও সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না। তোমাদের গুরুদেব মারা গেছেন বলে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে?'

'কী করে বদলাব অচিরা? জন্মের পর বিচ্ছিরি অসুখে পড়েছিলাম। যায় যায় অবস্থা। হেঁচকি তুলছি। এমন সময় গুরুদেব ঘটকেশ্বর নামে এক কবিরাজের ওষুধ এনে খাইয়ে দিলেন। আমি বেঁচে গেলাম। গুরুদেব বললেন, ছেলের নাম রাখো ঘটকেশ্বর কবিবাজ। তা হলে ছেলে আর কোনও দিন বড় অসুখে পড়বে না। পড়লেও কোনও সমস্যা নেই। নামের মধ্যেই ডাক্তার রইল। অসুখ নিজে থেকে সারবে। বাবা কবিরাজে রাজি হল না। তখন শুধু ঘটকেশ্বর।'

'চুপ। একদম চুপ। তোমার গুরুদেব নাম দেওয়ার কে? নাম দেবেন আমার গুরুদেব।'

'তোমার গুরুদেব আছেন! তিনি আবার কে রে বাবা!'

ঘটু ঘাবড়ে যায়। নিজের নাম-কাণ্ডের পর গুরুদেব শুনলেই তার ভয় ভয় করে।

অচিরা ভুরু কুঁচকে বলল, 'আমার গুরুদেব কে বুঝতে পারছ না! উনিই তো আমার নাম রেখেছেন।'

'তাই বুঝি! বাঃ। ভারী সুন্দর নাম রেখেছেন। এরকম নাম, সুন্দর নাম কখনও শুনিনি। তোমার গুরুদেবকে আমার প্রণাম জানিও।'

অচিরা হেসে বলল, 'আচ্ছা জানাব। অচিরা নামটা শোনোনি আগে কখনও?'

ঘটু ঠোঁট উল্টে বলল, 'কই না তো!'

অচিরা মুখের হাসি মুছে ঠোঁটের কোণে হাসল। বলল, 'এলাকে চেনো? হৈমন্তী? দামিনী? মৃন্ময়ী? চেনো এদের?'

ঘটু বলল, 'কই না তো! তোমাদের কলেজে পড়ে বুঝি? কেমন জানি পুরনো পুরনো নাম। তাই না? মনে হচ্ছে ফিটন গাড়ি চেপে ঘুরতে বেরিয়েছে। হা হা।'

অচিরা এবার হাসি মুছে গম্ভীর হল। বলল, 'বোকার মতো হেসো না। সুচরিতা? বিমলা? বিনোদিনী? কমলা? এদের জানো না? নামগুলো চেনা ঠেকছে না?'

ঘটু উৎসাহ নিয়ে বলল, 'কমলাকে চিনি। কমলা আমার ছোট মাসির বাড়িতে রান্না করে। ঝালের হাত বেশি।'

অচিরা বিস্ফারিত চোখে বলে, 'কমলা রান্না করে! তুমি ষোড়শী বলে কারও কথা শুনেছ? ললিতা? রাজলক্ষ্মী? সুরমা? মৃণাল?'

গড়গড়িয়ে বলতে থাকে অচিরা।

ঘটু নার্ভাস গলায় বলে, 'উরি বাবা, এত মেয়ের নাম বলছ কেন? আমি এদের চিনব কী করে? আমি তো মেয়েদের স্কুল-কলেজে পড়িনি। আমার কেমন ভয় করছে অচিরা! কোনও গোলমাল হয়নি তো?

অচিরা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে সামনে দাঁড়ানো ভ্যাবলা মুখের যুবকটির দিকে। বিড়বিড় করে বলল, 'নলিনী বলে কারও কথা শুনেছ? সৌদামিনী? রতন?'

ঘটু হেসে ঘাড় নাড়ল। বলল, 'রতন শুনেছি। আমাদের পাড়ায় সাইকেল সারানোর দোকান আছে। হারামি ছেলে। চেন ঠিক করতে করতে টিউবে পিন মেরে দেয়। তখন টিউবও ঠিক করতে হয়।'

অচিরা কখনও পার্কের বেঞ্চে বসে না। এই পথে কলেজের বহু মেয়ের যাতায়াত আছে। শুধু মেয়ে নয়, টিচাররাও শর্টকাট করে। দেখে ফেললে কেলেঙ্কারি। তবু অচিরা আজ ধপ করে বেঞ্চে বসে পড়ল। ঘটুও পাশে বসে পড়ে। নরম গলা করে বলে, 'এই সব নামই কি তোমার গুরুদেবের দেওয়া অচিরা? যাই বল, এই নামও ঘটকেশ্বরের মতো সেকেলে কিন্তু।'

অচিরার কান্না পাচ্ছে। কলেজ পড়া ফুটফুটে মেয়ের প্রেমিক হতে গেলে রবীন্দ্রনাথের লেখা গল্প-উপন্যাস গাঁক গাঁক করে পড়তে হবে আর ঠোঁটের গোড়ায় চরিত্রদের নাম মুখস্থ রাখতে হবে, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। কিন্তু যে মেয়ের নাম অচিরা এবং যার সঙ্গে আলাপ খোদ পঁচিশে বৈশাখে, তার সঙ্গে জীবন কাটাতে হলে দু-একটা জিনিস তো জানতেই হবে। এ ছেলে তো বিরাট হাঁদা! সত্যি ঘুঁটে। একটা তো দূরের কথা, আধখানাও জানে না। রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছে কিনা সন্দেহ হচ্ছে। অথবা শুনলেও নিশ্চয় ভুলে গেছে। হায়রে! এত গল্প-উপন্যাসের একটাও উল্টে দেখেনি! অথচ স্কুলে পড়েছে।

কলেজও পাস করেছে। তবু একজনকেও চিনতে পারল না! ভয়ঙ্কর! হরিবল! বাঙালিই তো? না হলেই বা কী এসে যায়? আজকাল জাপানি ছেলেমেয়েরাও রবীন্দ্রনাথের কবিতা বলে। সেদিন টিভিতেই দেখাচ্ছিল—কলকাতায় এসেছে চীনা শিল্পপতিরা, শান্তিনিকেতনে গেছে বেড়াতে। সেখানে ছাত্রদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান ধরেছে—কোটোবারো ভেবেচিনু আপোনা বুলিয়া, টোমারো চরোনে ডিব রিডয়ো কুলিয়া...। আহা! সেই গান শুনে বাবা মুগ্ধ! মা মুগ্ধ! ছোটকাকা মুগ্ধ! দিদুর চোখে জল। বাবা গদ্গদ গলায় বলল—'দেখ দেখ, চেয়ে দেখ একবার। এমনি একটা জাতি এত বড় নয় না। নিজের ভাষা হয়, নিজের দেশ নয়, অথচ কত আবেগ দেখেছিস!'

সেই বাড়িতে এই ছেলেকে জামাই করে নিয়ে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। যতই দুঃখ হোক, নিজের মনকে দ্রুত শক্ত করল অচিরা। ইতি টানতে হবে এখানেই। দরকার হলে চোখের জল দু'ফোঁটা পড়বে। পড়লে পড়বে।

ঘটু বলল, 'আরে বাবা, গুরুদেবটা কে সেটা তো বলবে? তোমার বন্ধুদের এত নাম দিয়েছেন। ঠিক আছে বলতে হবে না, তুমি একদিন আমাকে ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে চল। তিনি চার-পাঁচটা নাম বলবেন। তুমি তার থেকে একটা আমার জন্য বেছে দেবে। কোর্টে গিয়ে সেই নাম নিয়ে নিলেই হবে।'

অচিরা কঠিন চোখে ঘটুর দিকে তাকিয়ে রইল দীর্ঘক্ষণ। তার পর লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'থাক, তার দরকার নেই। তোমার সঙ্গে কথা আছে ঘটু। আমার কলেজ ছুটি পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করবে।'

বিবাহের ক্ষেত্রে মিউচুয়াল সেপারেশন যেমন হয়, ঘটু-অচিরার প্রেমের ক্ষেত্রেও সেই ব্যবস্থা হল। অচিরাই করল। তবে করল একটু অন্যরকমভাবে।

রবীন্দ্রনাথের ছোঁয়া দিয়ে। সে বলল, 'পঁচিশে বৈশাখ দিয়ে যা শুরু হয়েছিল, বাইশে শ্রাবণেই তা শেষ করা ভাল ঘটু।'

ঘটু ঘাড় গুঁজে বসে আছে। তার ঘুম ঘুম পাচ্ছে। সেই সকাল থেকে টানা ধকল চলছে। সত্যি কথা বলতে কী, সে এখনও জানে না, ঠিক কোন অপরাধে অচিরা তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। শুধু বুঝতে পারছে, নাম নিয়ে একটা কোনও গোলমাল হয়েছে। নিজের বাপ-মায়ের ওপর রাগ হচ্ছে ঘটুর। বিড়বিড় করে বলল, 'তুমি যা ভাল বুঝবে অচিরা। যেমন বলবে।'

অচিরা লম্বা করে নাক টানল। ভেতরে একটা কান্না কান্না ভাব।

'রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে আমাদের প্রেম হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুদিনেই আমরা সেই প্রেমের ইতি টানব।'

'টানব।'

'পরশু বাইশে শ্রাবণ। লেবুতলার ফাংশনে আমার গান আছে। তুমি আসবে।

সেখানেই আমাদের শেষ দেখা হবে। এর পর তুমি আর পাঁচটা বেকার ছেলের মতো মহানন্দে পড়ে পড়ে ঘুমোতে পারবে। ভোরবেলা উঠতে হবে না।'

ঘটু বলল, 'আচ্ছা ঘুমোব।'

আজ সেই বাইশে শ্রাবণ। ঘটু চলেছে লেবুতলা। চলেছে রিকশায়। পায়ের কাছে মাইকের চোঙা। আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে আছে। ঝিরঝিরে বৃষ্টিও পড়ছে। বিশু ঘটুকে একটা ভাঙা ছাতা দিয়েছে। তার জন্য দেয়নি। মাইক-লাইটের জন্য দিয়েছে। মানুষ ভিজুক। যন্ত্রপাতি যেন না ভেজে। ঘটু সেই ছাতা খুলে চোঙার ওপর ধরে আছে। তার মন খারাপ। অচিরা আজ তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মন খারাপ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

মাইক-টাইক নিয়ে ঘটুকে রিকশা থেকে নামতে দেখে অচিরা চমকে উঠল। ভিড় থেকে সরে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'আবার তুমি এসেছ!'

ঘটু আকাশ থেকে পড়ল। নিচু স্বরে বলল, 'সে কী, তুমিই তো আসতে বললে। বললে না?'

'তোমাকে আসতে বলেছি। এ সব লটঘট নিয়ে আসতে বলেছি?'

'বিশুর লোকের টানাটানি। একা সব অর্ডার সামলাতে পারছে না। আমাকে অনেক করে বলল, তুই বাঁচা। আমি ভাবলাম যাচ্ছি যখন নিয়েই যাই...।

অচিরা চাপা গলায় ধমক দিল। বলল, 'চোপ। খালি বাজে কথা। আজ যদি পঁচিশে বৈশাখের মতো তোমার মাইকে গোলমাল হয়েছে, মজা বুঝিয়ে ছাড়ব। সেদিন শুধু ধমক দিয়েছিলাম, আজ গলা টিপে ধরব।'

অচিরাকে আজকে বেশি সুন্দর লাগছে। মেঘ রঙের শাড়ি পরেছে। এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর যেরকম রঙ হয় মেঘের। সঙ্গে সাদা মুক্তোর মালা, সাদা দুল। চোখে যেন কী লাগিয়েছে। মনে হচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটা পড়েছে। মুছতে ভুলে গেছে। অদ্ভুত না?

মন খারাপের মধ্যেও অচিরার এত রাগ দেখে ঘটু ফিক করে হেসে ফেলল। শান্ত গলায় বলল, 'বাইশে শ্রাবণ এত রাগারাগি করতে নেই অচিরা।'

অচিরার গা চিড়বিড়িয়ে উঠল। চোখ পাকিয়ে বলল, 'চোপ। বেশি বাইশে শ্রাবণ দেখায়, বিরাট পণ্ডিত এসেছেন। রবি ঠাকুরের কিস্যু জানে না...। বড় বড় কথা...।'

ঘটু এক পা সরে এল। নিচু গলায় চোখ বড় বড় করে বলল, 'কে বলল কিছু জানি না? একটা গান জানি। ভেবেছিলাম তোমাকে আজ গাইতে বলব। কিন্তু তোমার যা মেজাজ দেখছি সাহস হচ্ছে না।'

অচিরা থতমত খেয়ে গেল। এই ছেলে রবীন্দ্রসঙ্গীত জেনে এসেছে! হয় রসিকতা করছে, নয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কোনটা? মাথা খারাপ হলে ঠিক

আছে। প্রেমিকা ছেড়ে চলে যাচ্ছে, সাময়িক মাথা খারাপ হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। কিন্তু রসিকতা করলে বুঝতে হবে সাহস বেড়েছে। ছেড়ে চলে যাওয়ার আগেও ধমক দরকার।

'কীভাবে গান জানলে? রেডিওতে শুনেছ?' বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলল অচিরা।

'না, নিজেই বেছেছি। কাল রাতে বড়দির গীতবিতান ঝেড়ে নিয়ে রাত জেগে বাছলাম।'

অচিরা সামান্য হাসল। বলল, 'ভাগ্যিস গীতবিতান কী সেটা অন্তত জানো। তা কার গান বাছলে?'

ঘটু খুবই অবাক হল। এ আবার কী প্রশ্ন।

'কেন তোমার জন্য। তুমি গাইবে। বললাম তো।'

'আমি গাইব। কোন গান?'

ঘটু গলা আরও নামিয়ে গান বলল। অচিরা চমকে ওঠে। হাঁদাটা বলে কী!

পঁচিশে বৈশাখের মতো বাইশে শ্রাবণের অনুষ্ঠানে মাইকের সমস্যা হল না। সমস্যা হল অন্য। অচিরা যখন গান শুরু করল, বৃষ্টি নামল অঝোরে। তার মধ্যেই অচিরা ঘটুর বেছে আনা গান গাইতে থাকল—

'আমার যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে/ তারি ছায়া পড়েছে শ্রাবণ গগনতলে...।'

গান এত ভাল হল যে সবাই বৃষ্টির কথা ভুলেই গেল। ভিজেই গান শুনতে লাগল। সব থেকে বেশি ভিজল মাইকম্যান ঘটু। কাল কী হবে কেউ বলতে পারে না। শুধু আমি পারি। কাল সকাল ছ'টা বেজে পনেরো মিনিটের মধ্যে আমাদের ঘটু হৃষীকেশ পার্কের কোনায় চলে আসবে। বাইশে শ্রাবণের বৃষ্টিতে বিচ্ছিরিরকম ভেজার কারণে তার ঠাণ্ডা লেগেছে। সে ঘন ঘন হাঁচছে। অচিরা তার সামনে এসে রাগী রাগী গলায় বলবে, 'এই যে ঘটুবাবু, দয়া করে একটু দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলুন তো। হাঁচি খুব ছোঁয়াচে রোগ।'

কালান্তরের গল্পকথা

পৃথ্বীরাজ সেন

সকাল হয়েছে। ঘুমটা ভেঙে গেল হেমনলিনীর। কাল সারারাত ভালোভাবে ঘুম হয়নি তার। হবে কেমন করে?

আজ স্নানযাত্রা, ঠাকুর দালানে আজ পণ্ডিতমশাই আসবেন। আজই কুমোর আসবে কুমোরপাড়া থেকে। আনুষ্ঠানিকভাবে দেবী প্রতিমার মূর্তি তৈরির শুভ সূচনা।

কাল সারাদিন দারুণ ব্যস্ত থাকতে হয়েছে হেমনলিনীকে। একা হাতে সব কিছু সামলাতে হয়েছে তাকে। তারপর যখন ঝুপ করে শেষ বিকেলের আলো অন্ধকারের ওড়নায় ঢাকল তার মলিন মুখখানি, আকাশের প্রেক্ষাপটে একটি দুটি করে অনেকগুলি তারা জেগে উঠল, মিটমিট করে তাকিয়ে থাকল পৃথিবীবাসী মানুষের দিকে, তখনও হেমনলিনীর হাতের কাজ শেষ হয়নি।

মুখরা শাশুড়ি সব সময় তাকে গঞ্জনা করে, পান থেকে চুন খসলেই সর্বনাশ। কথার ফুলঝুরি ছোটে তার মুখে। বেচারি হেমনলিনী, সবে মাত্র আঠারো বছরে পা রেখেছে সে, আর এখনই তার ঝক্কিঝামেলা সামলাবে কেমন করে?

তবুও সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয় তাকে। চোরবাগানের এই মিত্র বাড়ি, বিরাট দালান, কপাট, সবকিছু আছে এখানে অথচ সেখানে তার বেড়ে ওঠা, সেই মাতলা নদীর তীরে, সুন্দরবনের এক চিলতে অরণ্য আবাস, সেখানেই কেটে গিয়েছে তার শৈশব দিন। তারপর? বিধাতার চক্রান্তে মিত্র বাড়ির বউ হিসাবে শহর কলকাতায় পা রাখা। হুম্না-হুম্না শব্দে পালকি, রাত আকাশে জেগে ওঠা একটি দুটি সাঁঝবাতি, দিনগুলি কি রূপকথার গল্প শোনায় তাকে?

না, আনমনে গালে হাত দিয়ে অতীতের স্মৃতিমন্থন করার মতো সময় কোথায় হেমনলিনীর? সব সময় তাকে এক আবর্তনে ঘুরতে হয়। মাথার ওপর হাজার কাজের বোঝা, গুরুজনদের সদা-সতর্ক দৃষ্টি নাঃ, হাঁফ ধরে যায় হেমনলিনীর মাঝে মধ্যে একা ঝুল বারান্দায় এসে দাঁড়ায় সে। বকম্ বকম্ করতে থাকা পায়রাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে মাঝদুপুর, মানুষেব চোখে নিদ্রা নেমেছে, তবুও ঘুম নেই হেমনলিনীর চোখের তারায়।

কোথা থেকে কী যেন হয়ে গেল। এক্কা দোক্কা খেলার বয়েস, গোল্লাছুটের আসর, চড়ক ডাঙার উৎসব, শিটনিঝরা শরৎ সকাল—সব কিছু আজ দূর অতীতে মুখ বেখেই বিয়ের পর দেখতে দেখতে দুটি বছর কেটে গেল, সেদিনের ষোড়শী আজ অষ্টাদশী, মাত্র দু-বছর স্বামী সংসর্গ করারও বিন্দুমাত্র সুযোগ হয়নি তার। কী এক অদ্ভুত নিয়মে এখানে নব-বিবাহিতাদের আলাদা ঘরে রাখা হয়।

সহবত শেখানো হয় তাদের। তারপর শুভদিনে পাঠানো হয় স্বামীর কাছে।

হেমনলিনীর মা যথেষ্ট সুশিক্ষিতা, তখনকার দিনের তুলনায়, সে চেয়েছিল মেয়েকে শিক্ষিতা করে তুলতে, যাতে হেমনলিনীকে পুরুষশাসিত সমাজে সব সময় মুখ নীচু করে থাকতে না হয়।

বিয়ের যোগাযোগটা অভাবিত। কোথায় মিত্র বাড়ি, আর কোথায় তারা। অর্থে, বৈভবে, আভিজাত্যে কোথাও কোনো মিল নেই। কোনো একজন ঘটকালি করেছিল, হেমনলিনীর তখন চেহারা মুখটি দুর্গা প্রতিমার মতো। ষোলো বছরের উপছে পড়া যৌবন। তা দেখে খুশি হয়েছিলেন মিত্রমশাই। দিগম্বর মিত্র, এককথায় রাজি হয়েছিলেন বিয়ে দিতে।

চোখ বন্ধ করলে সব কিছু স্পষ্ট জেগে ওঠে হেমনলিনীর মনের পাতায়। হুম্‌না-হুম্‌না শব্দে পালকির দল পৌঁছে গিয়েছিল তাদের গ্রামের বাড়িতে। সকলের চোখে মুখে সে কী বিস্ময়। এত হিরে জহরত এত মণিমাণিক্য, কোনো কিছু কি আগে দেখেছে তারা?

তারপর? হেমনলিনীর মা মানতে পারেনি এই বিয়ের আসর, সব কিছু ত্যাগ করে কোথায় যে চলে গেল, যাবার আগে শেষবারের মতো দেখা হয়নি হেমনলিনীর সঙ্গে। জীবনে আর কখনো হবে কি? বেচারি হেমনলিনী তার হদিস রাখে না। সে জানে যে, তার সামনে যে পথ পড়ে আছে, সেখানে শুধুই কাঁটার আক্রমণ। সামান্য ভুল হলেই চাবুক নেমে আসবে পিঠের ওপর, কথার বিষ তীরে নীল হতে হবে তাকে।

তবুও সে চেষ্টা করে পরিবর্তিত এই পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে। তবুও মাঝে মধ্যে মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। যখন মধ্য দিনে দূর থেকে কে যেন চিৎকার করে বলে—কুলপি বরফ, কুলপি বরফ, আহা ছোটোবেলার দিনগুলির কথা কি মনে পড়ে যায়।

বকম্-বকম্ পায়রাগুলো তার হাত থেকে গমের দানা খুঁটে খেত। সে এক ভারি সুন্দর শান্ত সমাহিত জীবনযাত্রা। আর আজ এখানে? ভালোলাগে না, ভালো লাগে না এই অন্ধকারার মধ্যে বসে থাকতে। নিশ্ছিদ্র সুড়ঙ্গ পথের শেষে একটু করে আশার আলো কোনোদিন দেখতে পাবে কি সে?

নাঃ একা একা ভাববার মতো অবসর নেই তার। শুরু হয়ে গেছে, শুরু হয়ে গেছে শাশুড়ি মার চিলচিৎকার। সকাল থেকেই দাপিয়ে ঘুরে বেড়ায় সে। দারুণ প্রতিপত্তি তার। চার ছেলে আর এক অবিবাহিতা মেয়েকে নিয়ে তাঁর জমজমাট সংসার। দুই মেয়েকে পার করা হয়েছে, তিন নম্বরটি ঘাড়ের ওপর চেপে বসে আছে। কুরূপা এবং ঝগড়াটে। সে হল রাধারানী। সব সময় বউদির পেছনে লাগাটাই তার একমাত্র স্বভাব।

ভাগ্যিস বড়ো বউ আছে সৌদামিনী, সে না থাকলে এই বাড়িটা একেবারে শ্মশানপুরী বলে মনে হত হেমনলিনীর কাছে। তার স্বামী শশাঙ্ক, সওদাগরি অফিসে কনিষ্ঠ কেরানি, সবে মাত্র বয়স তার বাইশের কোঠা ছুঁয়েছে। এখনও জাগেনি পৌরুষ। মায়ের আঁচল ধরা লক্ষ্মী খোকা। তার ব্যবহারে মাঝে মধ্যে দারুণ কষ্ট পায় হেমনলিনী। যে স্বামীকে সম্বল করেই এখানে আসা, সেই স্বামী যদি প্রতি পদে পদে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে কাকে আর ভরসা করবে হেমনলিনী? পরামর্শ করার মতো মানুষ কোথায়? অপমানিত হয়ে বাবা ফিরে গেছে। আর আসবে এমন সম্ভাবনা নেই। অগত্যা হেমনলিনী দীর্ঘশ্বাস চেপে ফেলে। একটুকরো সোনালি রোদ্দুর জানালা দিয়ে এসে পড়েছে খাটের ওপর, আকাশে বর্ষণক্লান্ত মেঘেদের চিহ্নমাত্র নেই। আজ স্নানযাত্রা। মা বলত এদিন দু-এক পশলা বৃষ্টি হবেই। দহনদগ্ধা বসুন্ধরা শান্ত হবে। কিন্তু বৃষ্টি কোথায়?

কাত্যায়নীর চিল চিৎকার শোনা যাচ্ছে—বলি ও মেজবউ, ঘুম ভাঙল নাকি? বড়ো লোকের বেটি ? এখনও শুয়ে শুয়ে কার স্বপ্ন দেখছ? উঠে পড়ো, গতরটা নাড়াতে হবে তো? এখুনি পুরুতমশায় আসবেন। তুমি কি চোখের মাথা খেয়ে বসে আছো নাকি?

হেমনলিনী ভাবে, ভগবান একটুকরো চিনি কেন দেয়নি শাশুড়ি মায়ের মুখের ভেতর। সব সময় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। মানুষকে ঠেস দেওয়া। না, এসব ভেবে আর কী লাভ? অতএব উঠে পড়তে হয় হেমনলিনীকে। অতি দ্রুত স্নান ঘরে ঢুকতে হয়। আজ দিনটা একেবারে অন্যরকম। গত বছরের কথা মনে পড়ে যায় তার কোথায় কী যেন ভুল হয়ে গিয়েছিল, কী যেন ছুঁয়ে ফেলেছিল হেমনলিনী, সঙ্গে সঙ্গে কাত্যায়নীর সে কী বকুনি। একহাট লোকের সামনে। মা-বাবা কী শিক্ষে দিয়েছে, তা তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছি। জংলি ভূত একটা। সুন্দরবনের গাঁয়েতে ছিল ভালো, কেন যে কত্রী ঠাকুরণের কথা শুনলাম? আমার মাথা চিবিয়ে খাবে, ছেলেটাকেও পথের ভিখিরি করে দেবে, এ আমি বলে রাখছি।

অতএব হেমনলিনীকে আর একটু বেশি সতর্ক হতেই হবে। আজ আর কোনো অন্যায় কাজ করবে না সে। আজ তার একটু অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে যে. সে জানে. কোন্ কাজ কেমনভাবে করতে হয়।

পাটভাঙা শান্তিপুরী ডুরে পাড় শাড়ি পরল সে। চওড়া করে সিঁদুর আঁকল সিঁথিতে। চকিতে মুখখানা দেখল আয়নাতে। আহ্, বেশ ভালোই দেখাচ্ছে তাকে। রাতজাগা কালিমা লেগে আছে কি তার চোখের তারায়? তখনই হঠাৎ শশাঙ্কের কথা মনে পড়ে গেল হেমনলিনীর। হঠাৎ কখন পান দেবার ছলে চকিতে দেখা হয় তার সঙ্গে অথবা চায়ের কাপ। আঙুলে আঙুলে সামান্য ছোঁয়া। শরীরের

ভেতর আগুন জ্বলে কি?

পুরুতমশাই এসে গেছেন। চণ্ডীমণ্ডপ পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে। যে কুমোর ঠাকুরের গায়ে প্রথম মাটি লাগাবে, সেও এসে হাজির হয়েছে। ওই তো, পাড়াপড়শিরা ভিড় জমিয়েছে। বাতাসে পুজো পুজো পরিবেশ কি? এখনও শরৎকাল আসতে অনেক বাকি। কিন্তু আজ থেকেই তার আগমনবার্তা ধ্বনিত হবে। মা আসছেন, তিনদিনের জন্য বাপের বাড়িতে।

আর তখনই সেই মাতলা নদীর কথা মনে পড়ে যায় হেমনলিনীর। সোঁদা গন্ধ এসে তার মনকে আচ্ছন্ন করে, সেও কি বাপেরবাড়ি যেতে পারবে? সে স্বপ্ন সফল হবে না তার কোনোদিন। তাকে এই অন্ধকূপেই পড়ে থাকতে হবে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। এটাই বোধহয় তার ভবিতব্য।

ঘুম ভাঙেনি রাধারানির, পাশ ফিরে হাই তুলল সে। ঢুলুঢুলু চোখে তাকাল আকাশের দিকে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার, আজ তো স্নানযাত্রা। অভ্যাসবশত হাতটা পাশে রাখল। মেজোবউ উঠেছে তো? নাকি এখনই ধাক্কা দিতে হবে তাকে। জায়গাটা খালি, আনন্দের হাসি হাসল রাধারানি। সে জানে, তার বিয়ে নিয়ে সকলেই চিন্তা করছে। দু-একবার আসনপিঁড়ি হয়ে বসতে হয়েছে তাকে, তবুও পছন্দ হয়নি। তার যা স্বভাব, ঝগড়ুটে স্বভাবের ছবি ধরা পড়েছে তার চোখের তারায়। লোকে দেখলেই ভয়ে পালিয়ে যায়। না, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয় রাধারানি। সে জানে, পায়ের ওপর পা দিয়ে জীবনটা তার বেশ ভালোভাবেই কেটে যাবে।

চারভাই পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে। সওদাগরি অফিস স্নানযাত্রায় ছুটি নেই। তাড়া আছে শশাঙ্কের। বড়ো ভাই ছোট্ট ব্যবসা করে, অজিত সংসারের সকলের মাথায় ছাতা ধরে আছে। ভারি ভালো স্বভাব, মেজোবউকে বিশেষ প্রশ্রয় দেয়, সে জানে, মেজোবউ হল একটুকরো আগুন আঁচ। তার মধ্যে ছাই চাপা একটা সূর্য লুকিয়ে আছে। হঠাৎ কখন প্রহেলিকা ভেদ করে উদিত হবে পুব আকাশে। সকাল গড়িয়ে দুপুর, ব্রাহ্মণভোজন শেষ হয়ে গেছে। আত্মীয়দের সমাগম হয়েছে দেখার মতো। তাদের খাওয়া-দাওয়ার তদারকি করছে কাত্যায়নী। বার বার আদেশ করছে দুই বউকে। সৌদামিনী ভারি লক্ষ্মী মেয়ে, সাত চড়ে রা কাটে না। গলা অবদি ঘোমটা টানা। জুলজুল করে তাকিয়ে আছে।

কিন্তু হেমনলিনী সে এত নিয়মনীতি মানবে কেন? এইজন্যই কি মা তাকে পিদিমতলায় শিক্ষে দিয়েছে? হাতের কাজ সেলাই-ফোঁড়াই সব কিছু পারে সে। অতএব আবার তাকে বেশখানিকটা বকুনি গিলতে হল। কোথায় কী যেন ভুল করে ফেলেছে। গুরুজনদের উপযুক্ত সম্মান দেখায়নি। হেমনলিনী জানে এসব কাত্যায়নির নিত্য নতুন ফিকির। মানুষকে অপমান করার একটা উপায়। কী আর

করা যায়? বাড়িটা গমগম করছে আত্মীয়-পরিজনদের ভিড়ে। আজ আর একলা থাকার সামান্য সময়টুকু পাবে না হেমনলিনী।

বিকেল হতে না হতেই তাকে পোশাকি রান্নাঘরে ঢুকতে হবে। কচুরি বেগুনি ভাজায় সাহায্য করতে হবে। তৈরি হবে ক্ষীরের চমচম আর চন্দ্রপুলি। পাচকরা তৈরি হয়ে বসে আছে। সেখানেও হাত লাগাতে হবে বৈকি। বিয়ের আগে এসব কিছুই জানত না হেমনলিনী। প্রজাপতির সাথে এক্কা-দোক্কা খেলত। ভাব ছিল ছোট্ট বেড়ালছানার সঙ্গে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে একা একা বাইরে চলে আসত। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত অরণ্যানী ঝিম ধরে আছে অন্ধকারের বুকে। গভীর-গভীরতর জঙ্গল থেকে হাড় হিম করা শব্দ ছুটে আসছে। শ্বাপদ শয়তানদের ঘুম ভেঙে গেছে। অথচ হেমনলিনী এসব আরণ্যক পরিবেশকে মোটেই ভয় পায় না। তার কেবলই মনে হয়, মানুষ হল পৃথিবীর সব থেকে ভয়ংকর দস্যু। মানুষের মনের ভেতর এতটুকু ভালোবাসা নেই। দয়া মমতা উধাও, মানুষ নিজের স্বার্থে কী না করতে পারে, অথচ এমন একটা সুন্দর মুখোশ পরে থাকে যে, লোকে তার আসল উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারে না।

এখানে শহর কলকাতার এই মিত্র বাড়িতে এসে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হয়েছে তার কাছে।

সাঁঝবাতি জ্বলে উঠেছে। টিমটিমে আলোয় ভৌতিক প্রতিচ্ছায়া। খাবার-দাবার, গল্প-গুজব, আড্ডা সব কিছু এগিয়ে চলেছে তরতরিয়ে। এই না হলে জীবন! আহ্, হেমনলিনী ভাবে। এখানে টাকার কোনো চিন্তা নেই। প্রজাদের শোষণ করা অর্থ, তাতে কী? ঈশ্বর আমাকে জমিদার করে পাঠিয়েছে, লুণ্ঠন করার জন্য। আমি তো চোখ বন্ধ করে তাই করব, নয় কি? আমি কেন তোমার মতো হাত পেতে দাঁড়াব? আমি কেন গরিব মানুষদের সমব্যথী হব? এসব করা কি আমাকে মানায়?

রাতের বয়স বাড়ছে, টিকটিক শব্দ করতে করতে এগিয়ে চলেছে গ্র্যান্ডফাদার ঘড়িটা। ক্লান্তি এসে ভর করেছে হেমনলিনীর ওপর। বারবার সৌদামিনী বলছে মেজো, তোকে আর দায়িত্ব নিতে হবে না। সেই কোন্ সকালে উঠেছিস, দুপুরে তো ভালো করে খাসনি, আমার কথা শোন বোন, দু-মুঠো খা, খেয়ে দোর দে। কাল সকালে তো আবার উঠতে হবে।

হেমনলিনী জানে, সে চলে গেলে বড়ো বউকে সব কাজ একা হাতে করতে হবে। সাত মাসের পোয়াতি। পেটটা ফুলে উঠেছে। ভালো করে বসতে পারে না। এত ঝক্কি-ঝামেলা সে পারবে কেমন করে?

নিঝুম রাত। একফালি চাঁদ উঠেছে কি? শীর্ণ চাঁদ? জানলার সামনে এসে দাঁড়াল হেমনলিনী। চোখ বন্ধ করল, একী? মা? তোমার মুখ এত মলিন কেন?

তোমার চোখের তারায় এত বিষণ্ণতা? তুমি ভালো আছো তো মা?

মা হাসল সেই হাসির মধ্যে একটা অদ্ভুত আনন্দ ঝরে পড়ছে। মা বলল—শোনো হেম, তোকে আমি সেইভাবে মানুষ করেছি। পৃথিবীতে কখনো অন্যায়ের সাথে আপোস করবি না। মাথা উঁচু করে বাঁচার চেষ্টা করবি কেমন? আর, যখনই মন খারাপ হবে, আমার কথা মনে করবি, তখন দেখবি, তোর মনের আকাশ থেকে সব অন্ধকার দূরে হারিয়ে গেছে।

হেমনলিনী চোখ খুলল, সত্যিই তো, আগের থেকে আরও বেশি ভালো হয়েছে মনটা তার। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল শোবার ঘরের দিকে। ইতিমধ্যে সেখানে বিছানা করে শুয়ে পড়েছে শাশুড়ি মা। ঘুমের কোলে কোথায় পৌঁছে গেছে রাধারানি। অতএব তাকে এবার শুতে যেতে হবে। শোবার আগে শেষবারের মতো মায়ের কথা ভাবল হেমনলিনী। সত্যিই, মায়ের কথা ভাবলেই তার মনে নূতন আশার আলো জ্বলে ওঠে। মা, তুমি দেখো, একদিন আমি সব বিপদ জয় করব। তোমার হেম কখনোই জীবনযুদ্ধে হারবে না।

* * *

ফোনটা কানে ধরা ছিল—লাইলাক পাখি টুইটুই শব্দে ঘোষণা করল সকাল সাতটা—প্রিয়াঙ্কা হাই তুলল। ঘুম এখনও লেগে রয়েছে তার চোখের তারায়। আর তখনই বেয়াড়া সেলফোনটা আর্তনাদ করতে থাকে।

ভ্রূ দুটিতে কুঞ্চন জেগেছে প্রিয়াঙ্কার। রাগ ক্রোধ, উদ্বেগ, আকুলতা সব কিছু বেরিয়ে আসতে চাইছে একসঙ্গে। সে কোনো রকমে ফোনটা কানে লাগাল। অন্য কানে ঢোকানো আছে ওয়াকির নব। সেখানে এখন ক্যাটরিনা আহা, শ্রেয়ার উদাত্ত গান ... কীরে শম্পা, সাতসকালে ঘুম ভাঙালি কেন? ও বল, না, আজ আমি বিজি। আজ আর কোনো মালটি প্লেক্সে যেতে পারব না। কী বললি, ক্যাবলা ছেলেটা আসবে? ঈশান? না বাবা, ওর সঙ্গে ডেট করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার। তুই যদি ওকেই ভালোবাসতে চাস, বাসিস। আই ডোন্ট বি ফর দ্যাট ...

সেল ফোনটা নামিয়ে দিল প্রিয়াঙ্কা। সঙ্গে সঙ্গে সেটা অফ করে দিল। গুরুত্বপূর্ণ ফোনটা এইমাত্র মুঠোবন্দি হয়ে গেছে তার। তার মানে ঈশান—এত শয়তান তুই? পেটে পেটে বদমাইশি? তুই কি আমাকে ডিচ করতে চাস? কী আছে ওই হাঁদা গঙ্গারাম শম্পার মধ্যে, যা আমার নেই?

রাগে ফুঁসতে থাকে প্রিয়াঙ্কা। তারপর একটানে নবটা খুলে দেয় কান থেকে। নাহ, এখন তাকে সাওনাবাথে ঢুকতেই হবে। মিনিট তিরিশ সেখানে বসে থাকবে সে। অ্যারোমাটিক জলে স্নান করবে। মগের ভেতর জমে থাকা ভিসুভিয়াসের আগুন আঁচ। ঠান্ডা জলে তাকে শান্ত করতে হবে তাকে। তারপর

সে ভাববে ঈশানকে কী শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। ঈশানের কথা ভাবলেই সমস্ত শরীরটা চনমন করে ওঠে প্রিয়াঙ্কার। যথেষ্ট ট্যালি আছে ছেলেটার। একসঙ্গে দশটা মেয়েকে এভাবে নাচাচ্ছে কী করে?

প্রিয়াঙ্কা আঠারো, সবে মাত্র প্লাস টু পাশ করেছে। মাস কমিউনিকেশনে, ফার্স্ট ইয়ার, যাদবপুর। ইচ্ছে আছে স্টেটসে চলে যাবে। জার্নালিস্ট হবে। সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে। কাঁধে ক্যামেরা আর হাতে একটা পেনরাইব নিয়ে।

প্রিয়াঙ্কার বাবা শহর কলকাতার এক নামকরা ব্যবহারজীবী। হাইকোর্ট পাড়ায় নিজস্ব চেম্বার আছে। যুক্তির তোড়ে জজসাহেবের মাথা পর্যন্ত ঘুরিয়ে দিতে পারে। প্রিয়াঙ্কা তার একমাত্র মেয়ে। শহর কলকাতার উপকণ্ঠে নিউআলিপুরে সাজানো বারশো স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট। বছরে দুবার নিয়ম করে বিদেশে বেড়াতে যায় তার বাবা, সঙ্গে মেয়েকে নিয়ে যায়। প্রিয়াঙ্কাকে অসম্ভব ভালোবাসে এবং মা সমাজসেবিকা, ইন্দিরা, মেয়ে অন্ত প্রাণ। বাবা আর মায়ের মিলিত প্রচেষ্টা, প্রিয়াঙ্কা একদিন মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠবে।

নাহ, ওয়াড্রোবটার দিকে তাকাল প্রিয়াঙ্কা। শেষপর্যন্ত একটা বাস্টকালার লো কাট জিনস পছন্দ করল সে। সেইসঙ্গে স্লিভলেসটপ। পেটের বেশ খানিকটা উন্মুক্ত। নিতম্বের খাঁজ দেখা যাচ্ছে। এটাই হল শহর কলকাতার লেটেস্ট ড্রেস। একহাতে একটা ব্যাঙ্গেল ঝোলায়, অন্য হাতে ছোট্ট হাত ঘড়ি। মাকে বলল—টা টা গুড বাই, মা, আমি ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে আসছি।

মা বলল, সেলফ ড্রাইভে যাবি, নাকি ড্রাইভারকে ডাকব?

উড়ন্ত চুমু মায়ের দিকে ছুঁড়ে দিতে দিতে প্রিয়াঙ্কা বলে—না না মা, এখন আর গাড়ি বের করব না। এই ভেঞ্চারটা একেবারে পার্সোন্যাল কনফিডেনশিয়াল। নাঃ থ্যাঙ্কস, আমি সব কথাই জানাব তোমায়, তৈরি আছি ...

লিফটে আঙুল ছোঁয়াল প্রিয়াঙ্কা। এগারোতলা। অতি দ্রুত নীচে নামছে লিফট। শহর কলকাতা, আষাঢ় দিবস। আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই, প্রিয়াঙ্কা জানেই না, আজ স্নানযাত্রা।

নিউআলিপুর ব্যস্ত শহরের এক অভিজাত এলাকা—হাত তুলে ক্যাব থামাল প্রিয়াঙ্কা। বলল—সোজা আয়রন সাইড রোড। একটুবাদেই ঈশানের মুণ্ডটা চিবিয়ে খাবে সে। শয়তানি শম্পা ভেবেছে কি? আমার ঘাড়ের ওপর চেপে বসবে? ইউ আর ডটার অব এইচ। আয়, আমি তোর গুমোর ভাঙছি।

একঘণ্টা পর পরিবেশ পালটে গেছে একেবারে। ডালহাউসি ক্লাব, উলটোদিকের ডেকচেয়ারে দুজনে বসেছে। প্রিয়াঙ্কার চোখের জল এখন শুকিয়ে গেছে। না, ঈশানটা একেবারে ক্যাবলা কার্তিক, কোনো কিছুই না ভেবে শম্পার সাথে ডেট করতে গেছে। চোখের জল এবং মুখের কথায় তাকে বশ করতে

বেশি সময় নেয়নি প্রিয়াঙ্কা। ভেঞ্চারটা এখানেই শেষ হয়ে গেছে। এখন আধঘণ্টার ছোট্ট একটা রিসেস নেবে প্রিয়াঙ্কা। আজ ক্লাস বাঙ্ক করলে কেমন হয়? কোথায় যাওয়া যেতে পারে? ভ্যাপসা গরমে এই দুপুরে?

চোখে মুন গ্লাস লাগিয়ে? কেন? মনটা বিন্দাস হলে সকলে মিলে একবার নলবন ঘুরে আসবে। সেখানে সারবন্দি ছোট্ট ছোট্ট কটেজ। আহ্, মাঝদুপুরের নরম রোদ খেলা করবে। সেখানে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরবে। টালা-টালা বলে নাচবে। এই তো গুরু মসতির জীবন, এই জীবনে যা আনন্দ, দুহাতে লুফে নিতে হবে। তারপর ...

শেষ বিকেলের ক্লান্ত রোদ, অবসন্ন প্রিয়াঙ্কা শুয়ে আছে ঈশানের কোলে মাথা রেখে। শরীরের ব্যাপারে কোনো ট্যাবু নেই তার। সব সময় তৈরি থাকে সে। সে জানে ঈশ্বরের এমন অবদান, তাকে অযথা নষ্ট করতে নেই। প্রতিটি প্রহরকে ভালোবাসায় সম্পৃক্ত করতে হয়। তাইতো, ঈশানকেই সে আজ বেছে নিয়েছে তার পার্টনার হিসাবে। আজ ঈশান কাল কৌস্তভ, পরশু অন্য কেউ ... এভাবেই জীবন এক বহতা নদীর মতো সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। সেখানে কোনো পিছুটান? না ...

অল্প একটু ড্রাঙ্ক হয়েছে আজ সকালে। এবার বাড়ি ফিরতে হবে। তার আগে ঘণ্টাখানেক ভিক্টোরিয়ায় চক্কর দিতে হবে। কালো পরীটার দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করতে হবে ভালোবাসার শপথ। লেট আস ফাইট টু গেদার ... লেট আস গো টু গেদার ... লেট আস প্লাস টুগেদার .... এটাই তো আধুনিক জীবনের মূলমন্ত্র।

রাত-আকাশে চিলতে চাঁদের হাসি—সোঁদা গন্ধ বাতাস—এগারো তলার ফ্ল্যাট—নীল আলো জ্বলছে। বাপি ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত পোশাকে নিমেষে ঢাকল প্রিয়াঙ্কা। অবাক চোখে তাকাল আকাশের দিকে। তারারা তাকিয়ে আছে তার দিকে। অশ্রুত কোনো গল্প শুনবে বলে। প্রিয়াঙ্কা ভাবল—এই যে চলমান জীবন, পারতে পারবে এত টাকার হাতছানি, জীবনটাকে জ্যাকপটের বাজি করে উড়িয়ে দেওয়া—সব শেষ হলে কী থাকে? অ্যালকোহলিক শূন্যতা? নিকোটিনের গন্ধমাখা সর্বনাশা প্রহরের ডাক। না, প্রিয়াঙ্কা আর ভাবতে পারছে না। মনে হচ্ছে কোনো কিছু তাকে গ্রাস করছে—এমন এক অন্ধকার যার কোনো শেষ নেই। আজ বাদে কাল যৌবন সূর্য ডুবে যাবে। ফুরিয়ে যাবে প্রিয়াঙ্কা, আর তখন? আর তখন কেউ কি তার দিকে তাকাবে এমন করে?

না, এবার বোধহয় প্রিয়াঙ্কাকে একটু ঘুমোতে হবে। এমন ঘুম যা চট করে ভাঙবে না। ঘুমই হল তার এসব দুঃখ-জ্বালা-যন্ত্রণার একমাত্র উপশম। ঘুমের সাথে [illegible] না পাতালে তার মনটা আরও বেশি বিক্ষিপ্ত হবে। অনেকগুলি মুখ, মুখের ছবি মিছিল করে এগিয়ে যাবে তার মনের রাজপথ দিয়ে।

পরিকল্পিত খুন

পরশ দত্ত

'কাকু'— একদম কানের পাশে চিৎকারটা শুনে চমকে উঠেছিলাম। সবে স্টলিটা এক্স-রে মেশিনে পাস করিয়েছে। চেকইন কাউন্টারগুলোর দিকে পা বাড়াবার আগেই। প্রচণ্ড মেকআপ করা মুখটা চিনতে অসুবিধা হয়নি। টুকুন। প্রবালদার মেয়ে। আমাদের প্রবালদা। শান্তিনিকেতনের।

'হোয়াট আ কোয়েন্সিডেন্স। আজ সকালেই বাপির সঙ্গে ফোনে তোমার কথা হচ্ছিল। তুমি কোথায়?'

'হায়দ্রাবাদ। ফ্লাইট ডিলেড আছে মনে হয়। তুমি?' আগে তুই বলতাম। টুকুনের হাবভাব চেহারা সব দেখে আর ভরসা হোল না। কেমন যেন অচেনা হয়ে গেছে মেয়েটা।

'আমি ডেলি। ক্যাপিটাল হাঃ হাঃ। একটা মাল্টিন্যাশনাল ইন্টারভিউ-এ ডেকেছে। সব কিছু ঠিকমত লেগে গেলে বাইরে পাঠাবে ট্রেনিং-এ। তারপর— লাইফ বিন্দাস। গ্রেট না?'

'নিশ্চয়ই। অল দ্য বেস্ট।' যদিও বিন্দাস কথাটার মানে বুঝলাম না। কিন্তু ওকে আর ঘাটাতে সাহস হোল না। ইতিমধ্যেই আমরা অন্য যাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মেয়েটাকে এই মুহূর্তে কাটাতে চাইছিলাম।

'থ্যাঙ্কস্। সি ইউ লেটার। চিয়া'। হাত নেড়ে প্রায় লাফাতে লাফাতে এয়ারপোর্টের ভিড়ে হারিয়ে গেল। টুকুন। আমাদের কত আদরের টুকুন। কত বয়স হবে এখন ওর? হিসাব করে দেখলাম উনিশ কি কুড়ি। দেখে আরও বড় মনে হয়। প্যান্ট আর ছোট কুর্তা, থুড়ি কুর্তি গায়ে। পায়ে প্রায় ইঞ্চি চারেকের হিলতোলা জুতোয় বেশ লম্বা লাগছে। ছোট করে কাটা চুল। বয়কাট বলে বোধ হয়। বেশ সপ্রতিভ হয়েছে। চেহারায়, হাবভাবে কোথাও কোনও শান্তিনিকেতনি ছাপ রাখেনি। একদম বলিউড মার্কা চেহারা বানিয়ে ফেলেছে মেয়েটা।

চেকইন করে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়েছিল। ফ্লাইট ডিলেড থাকার কারণে। প্রচুর ভিড়। এই এক ঝামেলা হয়েছে আজকাল দমদম এয়ারপোর্টে। লাউঞ্জে বসে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে—এত ভিড়! বাংলা খবরের কাগজ কিনে প্রায় পুরোটা পড়ে ফেলেছি, এমন সময় সিকিউরিটি চেক-এর জন্য ডাক এলো। এবার ছাড়বে প্লেন। এই ভিড়ের রাজ্য থেকে নিস্তার।

প্লেনে বসে মনে পড়ল টুকুনের কথা। কেমন হয়ে গেছে মেয়েটা। অথচ কি ছিল, মিষ্টি সপ্রতিভ একটা বাচ্চা। কলেজের সিনিয়ার দাদা প্রবালদার মেয়ে।

কলেজ পাশ করে যখন ম্যানেজমেন্ট পড়ার জন্য তোড়জোড় করছি, প্রবালদা ততদিনে এম এ পাশ করে থিসিসটাও প্রায় শেষ করে ফেলেছে। ইতিহাসে। প্রবালদা ছিল আমাদের দৈনিক আড্ডার মধ্যমণি। আমার ফ্রেন্ড, ফিলজফার ও গাইড। পিএইচ ডি করে প্রবালদা যখন বিশ্বভারতীর অধ্যাপনায় ঢুকলো আমি তখন ম্যানেজমেন্ট কোর্সের দ্বিতীয় বর্ষে। ধীরে ধীরে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ কমে আসতে লাগল প্রবালদার। প্রবালদা বিয়ে করেছিলেন বিশ্বভারতীর পাঠভবনের শিক্ষিকা তনিমাদিকে। অনেক পরে জেনেছি। আমার বিয়ের সময়।

পড়াশুনার পাট চুকিয়ে চাকরিতে ঢুকে পড়লাম। মোটামুটি ভাল চাকরি। কয়েক বছরে একটু উন্নতিও হোল। মনীষার সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় উদ্দেশ্যহীন ঘোরা, রেস্তোরাঁর কেবিনের আধা নিরিবিলিতে ঘনিষ্ঠ হবার ব্যর্থ চেষ্টা আর পোষাচ্ছিল না। এবার বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমাদের দুজনের বাড়িতেই সম্পর্কটার কথা সবাই জানত। বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি শুনে দু-বাড়িতেই আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। সেই সময়, বিয়ে করতে গিয়ে আবার প্রবালদার মুখোমুখি। বিয়ের আসরে আবিষ্কার করলাম যে প্রবালদার স্ত্রী তনিমাদি মনীষাদের দূরসম্পর্কের আত্মীয়া। সম্পর্কে মনীষার মাসি হন। পুরোন ঘনিষ্ঠতা সেদিন থেকেই আবার ঝালিয়ে নেওয়া শুরু হোল।

বিয়ের পর প্রায়ই শান্তিনিকেতন যেতাম। প্রবালদার অভিভাবকসুলভ হুকুম, "দেখো হে বাপু, দাদা বল আর যাই বল, সম্পর্কে তোমার শ্বশুর হই। শান্তিনিকেতনে আমার বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকা চলবে না।"

আমরাও মাঝে মাঝে সপ্তাহান্তের শনি-রবি দুটো দিন বেশ কাটাতাম প্রবালদার রতনপল্লীর বাড়িতে। তনিমাদির আতিথেয়তায় আতিশয্য ছিল না। যেটা ছিল, সেটা কিছু বেশি পরিমাণেই ছিল। আন্তরিকতা। আর প্রবালদার বৈঠকী আড্ডার পরিচয় তো সেই কলেজ জীবন থেকেই পেয়েছি। আমরা কয়েকটি ছেলে শুধু প্রবালদার গুণগ্রাহী ছিলাম না, অতি অনুগত শিষ্য হয়ে উঠেছিলাম। এবার ধীরে ধীরে মনীষাও প্রবালদার আড্ডার নেশায় জড়িয়ে পড়ে ওর ভক্ত হয়ে উঠল।

প্রবালদার ছোট সংসার। স্বামী-স্ত্রী ও ছোট্ট টুকুন। পাঠভবনের ক্লাস সিক্সের ছাত্রী টুকুন। খুব শান্ত স্বভাবের মেয়ে। নিজের পড়াশুনা, গল্পের বই, ছবি আঁকা, গান—এই সব নিয়েই ছিল ওর জগৎ। এগারো বছর বয়সের তুলনায় ফ্রকপড়া ফুটফুটে টুকুন যেন একটু বেশি গম্ভীর—পরিণত ছিল। দেখে তাই মনে হোত। আমরা তখন প্রতিমাসেই শান্তিনিকেতনে উইকএন্ড কাটাই। ইতিমধ্যে কখন যেন আমরা প্রবলদার পরিবারের সদস্য হয়ে পড়েছি। প্রবালদা চিরদিনই দিলখোলা আড্ডাবাজ মানুষ। আর তনিমাদি ছিলেন টিপিকাল শিক্ষয়িত্রী। একটু কড়া ধাতের।

মাস্টারি করতে করতে দুনিয়ার সবাইকেই নিজের ছাত্রছাত্রী মনে করতেন। শাসন করতেন। ভালওবাসতেন। ওর শাসনে কলেজ অধ্যাপক প্রবালদাও বেশ তটস্থ থাকতেন। আমরা স্বামী-স্ত্রী শান্তিনিকেতনে প্রতিমাসে কয়েকটা দিন তনিমাদির নিয়ন্ত্রণেই থাকতাম। বেলা এগারটার মধ্যে স্নান করতে হোত। চরম অনভ্যাস সত্ত্বেও রোজ সকালে এক গ্লাস দুধ খেতে হোত। কেবল একটা ছাড় ছিল। রাত দশটার পরিবর্তে আমাদের রাত সাড়ে বারটা অবধি আড্ডা মারার অনুমতি ছিল। অবশ্য তনিমাদি নিজে সে আড্ডায় নিয়মিত যোগ দিতেন।

তনিমাদির এত নিয়মের বেড়াজাল থাকলেও টুকুনকে কখনও শাসন করার প্রয়োজন হোত না। কেননা মিষ্টি স্বভাবের টুকুন বাড়ির সব নিয়ম মেনে চলত এবং নিজের কাজে কখনও ফাঁকি দিত না। চাপা স্বভাবের টুকুনকে আমরা দুজনেই খুব ভালবাসতাম। এমন সভ্যভদ্র বাধ্য মেয়ে। মনীষা প্রায়ই বলত, "আমাদের একটা মেয়ে যেন হয়। টুকুনের মত মেয়েই আমার চাই।"

সেবার বসন্ত উৎসবে গিয়ে দেখলাম আমাদের আদরের টুকুন যেন আরও গম্ভীর, আরও পরিণত হয়ে উঠেছে। প্রথমদিন রাতে শুতে যাবার আগে টুকুন দুটো চাদর নিয়ে হাজির। বলল, "এবার ঠান্ডাটা এখনও একটু একটু রয়েই গেছে। শেষ রাতের দিকে চাদর লাগতে পারে, তাই...!" আমরা দুজনেই হেসে উঠেছিলাম। মনীষা বলে উঠেছিল, "ও তনিমাদি, দেখুন আপনার মেয়ে কত বড় হয়ে গেছে। আমাদের জন্য চাদর নিয়ে এসেছে।" আমরা দুজনেই খুব খুশি হয়েছিলাম। তনিমাদিও খুশি খুশি মুখে বললেন, "বাড়িতে এসব টুকিটাকি কাজ এই বয়স থেকেই অভ্যেস করতে হয়। ও আজকাল আমায় অনেক কাজেই হেল্প করে বাড়িতে।"

"ওমা তাই" টুকুনের গাল টিপে আদর করে মনীষা বলে "লক্ষ্মী মেয়ে আমাদের।"

"বড হ'চ্ছে তো। বুদ্ধিসুদ্ধিও হ'চ্ছে ধীরে ধীরে।" তনিমাদির গলায় গর্বিতা মায়ের সুর।

সেবার ছুটি নিয়েছিলাম বেশ কয়েকদিন। থেকে গেলাম ওখানেই। আমরা ছুটিতে অন্য কোথাও না গিয়ে শান্তিনিকেতনেই থাকলাম বলে প্রবালদারাও মনে হোল বেশ খুশি হয়েছেন। মনীষা আবার খুব বেশি ঘুরতে ভালবাসে না। ছুটি নিয়ে কোথাও একটা জায়গায় স্থির হয়ে বিশ্রাম করাই ওর ইচ্ছা।

শ্যামবাটী ছাড়িয়ে পুবদিকে ক্যানালের পাড়ে সেদিন বিকেলে মনীষা আর আমি বসেছিলাম। তখনও ক্যানালের দুধারে এখনকার মত কুৎসিত বাড়িঘর তৈরি হয়নি। প্রান্তিক স্টেশনের লাগোয়া টাউনশিপের কল্পনাই তখন কারো মাথায় বোধকরি ছিল না। এখন যেমন এদিকটায় এলেই মন হয় বিশ্বকবির চৌহদ্দির

মধ্যে ব্যবসায়ীরা বেশ জাঁকিয়ে বসে পড়েছে। তখন তো এমন ছিল না। তখন ক্যানালের পাড়ে দাঁড়িয়ে নজরে পড়ত উত্তরদিকে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, মাঝে মাঝে তালগাছ, কয়েকটি কুটির। ছবির মত। আরেক দিকে রতনপল্লীর দিকটায় রেললাইনের পাড় বরাবর খোয়াই ছিল। আমরা নবদম্পতি এই খোয়াই-এর দিকটায় ক্যানালের পাড়ে বসে বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুরকে সাক্ষী রেখে কত অবান্তর বকম বকম করেছি। যে বয়সের যা রীতি আর কি!

একটা ভাজকরা কাগজ হাওয়ায় উড়ছিল মাঝে মাঝে। আমার পায়ের কাছে এসে চটির ফাঁকে আটকে রইল কাগজটা। সাদা রুলটানা খাতার কাগজ। কেন জানি না কৌতূহল হোল, হাতে করে কাগজটা তুলতে যাচ্ছি। অমনি মনীষা তার স্বভাবসিদ্ধ চেঁচামেচি জুড়ে দিল। নোংরায় হাত দেওয়া বাজে স্বভাবটা তোমার গেল না। কত জীবাণু থাকতে পারে ওই কাগজটায়। কি দরকার নোংরা কাগজে হাত দেবার। আগের জন্মে তুমি নিশ্চয়ই কাগজকুড়ানী ছিলে।

মনীষা ভীতু সম্প্রদায়ভুক্ত। ওর বদ্ধমূল ধারণা যে পৃথিবীর যত গুণ্ডা, খুনে, বদমাইশ, চোর, ডাকাত, বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ, গণ্ডার, সাপ, বিছে, পোকামাকড়, সংক্রমণ, ব্যাক্টেরিয়া, অ্যামিবা, ভাইরাস সবাই একসঙ্গে তক্কে তক্কে রয়েছে, আমি তাদের টারগেট। আমি তাদের শত্রু। সুযোগ পেলেই তারা আমাকে খতম করে দেবে। কাগজটা হাতে নিয়ে ভাঁজ খুলতে খুলতে মনীষাকে তার ভীতু স্বভাবের জন্য কিছু একটা বলতে গিয়েও পারলাম না। কাগজটা পড়ে চমকে উঠলাম।

গোটা গোটা অক্ষরে স্কুলের বাচ্চাদের মত হাতের লেখা, খুব স্পষ্ট। "বাড়িতে মা-বাবা সবাই সব জেনে গেছে। কারা যেন আমাদের দেখে সব বলে দিয়েছে। মা-বাবা প্রচণ্ড বকুনি দিয়েছে। মা কেঁদে কেঁদে আমাকে চড় মেরেছে। তুমি আর আমাদের বাড়ির দিকে এসো না। আমরা সোনাঝুরি বনের কাছে দেখা করব। লিখে জানিয়ে দেবো। আমি তোমাকে খুব ভালবাসি। ইতি—টুকুন।"

"সর্বনাশ। এটা পড়ে দেখো।" প্রায় চিৎকার করে উঠলাম আমি।

"কি এটা, দেখি"! সন্তর্পণে আমার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে মনীষা পড়তে লাগল। একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরোল ওর মুখ থেকে। আমরা দুজনেই হতবাক। এটা তো প্রেমপত্র। টুকুনের লেখা। ওইটুকু মেয়ে টুকুন প্রেম করছে। আমি ভাবতেই পারছি না। যে টুকুনের এখন পুতুলখেলার বয়স সে কিনা প্রেমপত্র লিখছে। বুঝতে পারছিলাম না হাসব না রাগ করব, নাকি ব্যাপারটাকে অবজ্ঞা করব।

মনীষা প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, "আমাদের কিন্তু প্রবালদাকে আর তনিমাদিকে জানানো উচিত। কাগজটাও ওদের দেখানো উচিত।"

"তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? এটাকে এত সিরিয়াসলি নেবার কোনও

মানে হয়। ওইটুকু মেয়ে প্রেমের কি বোঝে যে প্রেম করবে? কোথাও কিছু পড়েছে অথবা কাউকে দেখে শখ হয়েছে, তাই লিখেছে। এটাকে এত গুরুত্ব দেবার কোনও মানেই হয় না।" আমি বললাম।

"সেকি কথা। এতবড় একটা ব্যাপার আমরা জানব আর তনিমাদিদের জানাবো না? সেটা কি বন্ধুর মত কাজ হবে?"—মনীষার যুক্তিও ফেলে দেবার মত নয়।

"এই লেখাটা তো টুকুনের নাও হতে পারে। পৃথিবীতে আর কোনও টুকুন কি নেই?" আমি বললাম।

"আমি জানি। টুকুনের হাতের লেখা আমি দেখেছি, আমি চিনি। এটা ওরই।"

"তা হলেও আমরা—"

"না না। কোনও কথা শুনবো না আমি। এমন একটা ব্যাপার জানার পরেও তনিমাদিদের না জানালে খুব অন্যায় হবে। পরে এই নিয়ে বড় অশান্তির ঘটনা ঘটলে, ওরা তো বলতে পারবেন আমরা সব কিছু জেনেও কেন ওদের জানাইনি। গোড়াতেই সাবধান করে দিলে ওরা ব্যাপারটা ঠিক সময়মত হ্যান্ডেল করতে পারতেন।"

"ভেবে দেখো। একটা উড়ো কাগজের ওপর ভিত্তি করে—"

"হোক উড়ো কাগজ। আমাদের সাবধান করতেই হবে। ওরা আমাদের এত ভালবাসেন, এত কাছের ভাবেন, ওদের কাছে জেনেশুনে এটা চেপে রাখা ঠিক হবে না।" কাগজটা ঝেড়েঝুড়ে ব্যাগে রাখল মনীষা।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আমরা আড্ডায় বসেছি। সাড়ে দশটা বেজে গেছে। আমরা চারজন। টুকুন ঘুমিয়ে পড়েছে। মনীষা ওর ব্যাগ থেকে কাগজটা বার করে কথাটা তুলবে ভাবছে, এমন সময় প্রবালদা গম্ভীর মুখে বলে উঠলেন, "তোমাদের একটা কথা বলব। আমাদের পরিবারের বিষয়। আমরা একটা অদ্ভুত সমস্যায় পড়েছি। কি করা উচিত সে বিষয়ে তোমাদের মতামত চাই।" ততক্ষণে মনীষা কাগজটা ব্যাগ থেকে বার করে ফেলেছে। আমি ওর হাত থেকে ভাঁজকরা কাগজটা নিয়ে প্রবালদার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, "আপনি নিশ্চয়ই এটার কথাই বলবেন।"

প্রবালদা কাগজটায় চোখ বুলিয়ে সেটা তনিমাদির হাতে দিয়ে বললেন, "ঠিক তাই। এটা তোমরা কোথায় পেলে?"

"ক্যানালের ধারে পড়েছিল। রাস্তার হাওয়ায় উড়ে এসে আমার পায়েব কাছে এসে পড়েছিল।"

ততক্ষণে তনিমাদি চিঠিটা পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছেন। কাঁদতে

কাঁদতে বললেন, "কি বিচ্ছিরি ব্যাপার বলো তো। বারো বছর কমপ্লিট হয়নি, সেই মেয়ে কিনা প্রেম করছে। ওর তো সব যাবে। এই মেয়েকে নিয়ে কি করবো আমি।"

প্রবালদা শান্ত গলায় তনীমাদিকে শান্ত হতে বললেন তারপর সমস্ত ঘটনাটা আমাদের কাছে বিস্তারিত বললেন। টুকুন প্রেম করছে ওখানকারই একটি ছেলের সঙ্গে। ছেলেটির নাম বিনয়। শ্যামবাটির ওদিকে ওদের বাড়ি। পাঠভবনে টুকুনের চেয়ে দু'ক্লাস ওপরে পড়ে। অনেকেই নাকি সন্ধের অন্ধকারে এখানে ওখানে ওদের ঘনিষ্ঠ হতে দেখেছে। প্রবালদা শেষে বললেন, "প্রেম কি সেটা ওরা কতটা জানে আমি জানি না। তবে অনেকেই ওদের আড়ালে-আবডালে চুমুটুমু খেতে দেখেছে।"

"আঃ, তোমার মুখের কি কোনও আগল নেই।" তনিমাদি ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

"ঠিক বলছি আমি। নিজের মেয়ে বলে তোমার গায়ে লাগছে। বুঝুক না বুঝুক একটা প্রেম প্রেম খেলা যে ওরা খেলছে তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই।"

"আপনারা জানলেন কি করে?" তনিমাদিকে জিজ্ঞাসা করল মনীষা।

জবাব দিলেন প্রবালদা, "ওই যে বললাম। আমাদের কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব ওদের এসব দেখে ফেলেছে। সাধারণত কেউ ছেলেমেয়েদের প্রেম করা নিয়ে এখানে মাথা ঘামায় না। যেহেতু ওরা খুবই ছোট তাই আমাকে বলে দিয়েছে।"

"আপনারা টুকুনকে কিছু বলেননি?" মনীষা জিজ্ঞাসা করেছিল।

"বলেছি। ও অস্বীকার করেনি। আর আজ তো তোমাদের কুড়িয়ে পাওয়া কাগজটাই সব কিছু প্রমাণ করে দিল।"—তনিমাদি বললেন।

"প্রমাণের কথা আসছে কি করে? টুকুন কি কিছু অস্বীকার করেছে? ও তো সবটাই খুব সহজভাবে স্বীকার করে নিয়েছে"—প্রবালদা রাগত স্বরে বকলেন তনিমাদিকে।

"কি বলেছে টুকুন?"—আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

উত্তেজিত হয়ে তনিমাদি উত্তরে অনেক কিছু বলতে গিয়ে কোনও কথাই ঠিকমত বলতে পারলেন না। কেবল "ছোট্ট মেয়েটা", "অবুঝ", "পাকা ছেলে" ইত্যাদি কয়েকটি শব্দ অবান্তর ভাবে বলে শব্দ করে কেঁদে উঠলেন।

শান্তস্বরে প্রবালদা তখন বললেন, "টুকুনকে জিজ্ঞাসা করতে সে খুব শান্তভাবে বলেছে যে বিনয় নামক ছেলেটিকে সে ভালবাসে। ভালাবাসার অর্থ কি তাও সে নাকি জানে। সে বলেছে তুমি যেমন মাকে ভালবাস, আমিও সে রকম বিনয়কে ভালবাসি। সে বড় হয়ে বিনয়কে বিয়ে করবে। তাকে যখন বললাম এইটুকু বয়সে এসব করাটা উচিত নয় সে তখন আমায় বললে, ভালবাসার আবার বয়স হয় নাকি? এখন ওরা ছোট আছে। এখন ওরা নাকি

ঠিক করেছে মন দিয়ে পড়াশুনা করে ঠিকমত বড় হবে। তারপর বিয়ে করে একসঙ্গে থাকবে। আমি তো ভাবতেই পারছি না এসব কথা ওরা এ বয়সে শিখল কি করে।"

"টিভি চ্যানেলগুলিই সর্বনাশ করেছে এদের সবার।" মনীষা তার সিদ্ধান্ত জানাল স্পষ্ট করে।

তনিমাদি বারবার বলতে লাগলেন, "তোমরা আমার মেয়েটাকে এখান থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও ভর্তি করার ব্যবস্থা করে দাও। এখানে থাকলে ওকে মানুষ করা যাবে না। এগারো-বারো বছর বয়সে প্রেম। ওফ আমি ভাবতেই পারছি না।"

অনেক রকম কথাবার্তা চলছিল। প্রবালদা, তনিমাদি, মনীষা নানা দুঃখবিলাপ এসব করছিল। কোনও কথাই যেন আমার কানে যাচ্ছিল না। তখন থেকে আমি ভাবছিলাম, মেয়েটার দোষ কোথায়। ওর এগারো বছর বয়সটাই কি যত দোষের? এগারো না হয়ে টুকুন যদি আজ উনিশ হত তাহলে তো আমরা এই প্রেমকেই অন্য চোখে দেখতাম। কেবল টুকুনের বয়সটা কয়েক বছর কম বলেই এমন সুন্দর প্রেমটা অশোভন হয়ে যাবে? কি জানি, আমার মাথাটা কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল। আমাদের ঠাকুমা-দিদিমাদের অনেকের তো এগারো-বারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছে। তারা কি অশোভন ছিলেন? মানসিক পরিণতি থাকলেই তো প্রেম জন্মায়। কারো যদি এগারো-বারো বছর বয়সে পরিণত মানসিকতা জন্মে যায় তাহলে তার প্রেমে পড়ায় দোষ কোথায়? এগারো-বারো বছরে সেই ম্যাচিওরিটি হয়েছে বলেই তো টুকুন প্রকাশ্যে বলতে পারছে যে তার জীবনে প্রেম এসেছে। সে তো কোনও কিছুই লুকোবার চেষ্টা করেনি। তার এই ম্যাচিওরিটি হয়ে যাওয়াই কি অপরাধ?

ওরা তিনজন প্ল্যান করছিল কোথায় টুকুনকে ভর্তি করা যায়। প্রবালদার এক বান্ধবী কার্শিয়াং-এর কনভেন্টের শিক্ষিকা। সেখানেও চেষ্টা করার কথা উঠলো। এসব পরিকল্পনায় আমার কোনও আগ্রহ ছিল না। তবে আমি কোনও পরিকল্পনার বিরোধিতাও করিনি। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম, চারটে আধবুড়ো মানুষ আমরা, কেমন এক হয়ে একটা প্রেমকে গলা টিপে হত্যা করার চক্রান্ত করছি। আমরা হত্যাকারী।

পরদিন কে যেন এসে খবর দিল যে, বিনয় নামক ছেলেটির বাড়িতে সব জানাজানি হওয়ায় সেখানেও চরম অশান্তি হয়েছে। সেখানে বিনয়কে তার জ্যাঠামশাই খড়মপেটা করেছেন। তার এক কাকা প্রায় জোর করে বিনয়কে মশাগ্রাম না কোথায় যেন, ওদের দেশের বাড়িতে নিয়ে গেছেন। অন্তত কিছুদিনের জন্য। বিনয়ের বাবা নাকি বলে বেড়াচ্ছে যে তার বাচ্চা ছেলেটার মাথা খেয়ে

নিয়েছে প্রবালদার পুঁচকে মেয়েটা। পুঁচকে হলে কি হবে, মেয়েটা একদম জন্মপাকা।

অনেক জল্পনা-কল্পনা করে দুদিন বাদে আমরা কলকাতা ফিরে এলাম। কলকাতায় দৈনিক ব্যস্ততার মধ্যে টুকুনকে নিয়ে বিশেষ ভাবার সময় রইল না। সত্যিকথা বলতে কি যেভাবে টুকুন-বিনয় দুটিকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস চলছিল সেটা আমি মন থেকে মেনে নিতে পারিনি। তাই পেশাগত ব্যস্ততার অজুহাতে নিজের বিবেকের কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে থাকছিলাম। মাঝে মাঝে রাতে খাবার টেবিলে টুকুনকে নিয়ে আমার আর মনীষার মধ্যে বেশ ঝগড়া লেগে যেত। আমি টুকুনের প্রেম করার পক্ষে। মনীষা কিছুতেই এই প্রেম মেনে নেবে না। ওর ধারণা কারো হৃদয়ে এই বয়সে প্রেমের অনুভূতি আসা সম্ভবই নয়। ওর মতে টুকুন খুব পাকা মেয়ে। শান্তিনিকেতনে কিছু বড় ছেলেমেয়েদের দেখাদেখি ও প্রেম করতে শিখেছে। এই বয়সে ছেলেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া নোংরামির সামিল। এই প্রেম টুকুনের সর্বনাশ করবে। ওর লেখাপড়া ডকে উঠবে।

আমার সঙ্গে মনীষার মতের অমিল। আমি মনে করি টুকুনের প্রেম নিষ্পাপ প্রেম। আমাদের উচিত ওকে সঠিক পথে প্রেম করতে সাহায্য করা। ওর মন আঘাত পেয়ে যাতে অবসাদে না ভোগে সেটা আমাদের দেখা উচিত। ওর প্রেমে বাধা দিয়ে ওর অবসাদ আসতে পারে, সেক্ষেত্রে ওর পড়াশুনা ও অন্য বিষয়ে ক্ষতি হয়ে যাবে। জীবনে পরিপূর্ণতা ওর কিছু আগেই এসেছে। সেটাকে মেনে নিয়ে ওর জীবনটাকে ফুলের মত ফুটতে দেওয়া আমাদের কর্তব্য।

এই নিয়ে ঝগড়ার কোনও শেষ হয় না। শেষ পর্যন্ত মনীষা বলে "মেয়ের বাবা-মা যা চাইবে সেটাই তো হবে না কি? যাদের মেয়ে তারা যদি মেয়েকে প্রেম করতে বাধা দেয় তাহলে সেই মেয়েকে ফুলের মত ফোটাবার তুমি কে? বিশেষ করে মেয়ে যখন মাত্র এগারো, আঠারো নয়। তোমার ইচ্ছে হয় তুমি আবার নতুন করে ফুলের মত ফোটো, কেউ বাধা দেবে না।" এরপর একগাল হেসে সেদিনের মত ঝগড়ার ইতি টানা ছাড়া উপায় থাকে না।

বেশ কয়েক মাস শান্তিনিকেতনে যাওয়া হয়নি। এর মধ্যে প্রবালদার চিঠি এলো। টুকুনকে ওরা কার্শিয়াং-এর কনভেন্টেই ভর্তি করেছেন। আমরা এর মধ্যে না যাওয়াতে কিছুটা অভিমান করেছেন প্রবালদা।

চার মাস পর আবার গেলাম। তনীমাদি সবিস্তারে বললেন কনভেন্টের খবরাখবর। সেখানকার পরিবেশ, ডিসিপ্লিন, পড়াশুনা, খেলাধুলা, নাচগান সবই খুব উঁচু দরের আর উচ্চস্তরের। ওরা পয়সা যেমন নেয় তেমনই মেয়েদের চৌকস বানিয়ে দেয়। টুকুন পিয়ানো শিখছে। তোমার দাদাকে বলেছি এবার বাড়িতে একটা পিয়ানো কিনতে হবে। ছুটিতে এসে টুকুন বাজাবে।"

অবাক হয়ে শুনছিলাম রবীন্দ্র সংস্কৃতিতে বাচ্চাদের মানুষ করার দায়িত্বপ্রাপ্তা শিক্ষয়িত্রী কেমন সাবলীলভাবে বিজাতীয় প্রথায় বস্তুবাদী পৃথিবীর নাগরিক তৈরি করার কারখানার গুণকীর্তন করে চলেছেন। তনিমাদিকে মনে মনে খুব শ্রদ্ধা করতাম। কড়া ধাতের আদর্শ শিক্ষয়িত্রী ভাবতাম। সেই ছবিটা কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসছিল। সেবার শান্তিনিকেতনে একদিন থেকেই 'কলকাতায় খুব জরুরি কাজ আছে'—এই অছিলায় পালিয়ে এলাম।

এরপর অনেকদিন শান্তিনিকেতনে যাইনি। শুনেছি খোয়াই ভেঙে ফেলে সেখানে আধুনিক আবাসন নির্মাণ হয়েছে। কংক্রিটের জঙ্গল। ক্যানালের পাড় থেকে আদিগন্ত সবুজ মাঠ নাকি আর দেখা যায় না। সেখানে ঝাঁ-চক্চকে বাড়ি-ঘর হয়েছে। গরুর গাড়ির ক্যাঁচক্যাঁচানির পরিবর্তে নতুন মডেলের আধুনিক গাড়ির হর্ন শোনা যায় সেখানে। শান্তিনিকেতন আজকাল মডার্ন সিটিতে পরিণত হচ্ছে। রাগে দুঃখে শান্তিনিকেতনের পথে আর পা বাড়াইনা। এই শান্তিনিকেতন আমার জন্য নয়। এ শান্তিনিকেতনে দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, অবনঠাকুর, রামকিংকর, বিনোদবিহারী, শান্তিদেবরা কেউ নেই। এই শান্তিনিকেতনে নেই এলসহার্স্ট। পিয়ারসরা। প্রবালদাও আর ডাকেননি।

বছর দুই কেটে গেছে। সেদিন রবিবার। সকালে বাজার যাবার আগে দাড়ি কামাবার তোড়জোড় করছি। এমন সময় কলিংবেল। দরজা খুলেই কি আশ্চর্য। হাসিমুখে দাঁড়িয়ে প্রবালদা। একটু যেন বুড়োটে লাগছে প্রবালদাকে। চুলের রং প্রায় সম্পূর্ণ সাদা। চেহারাটাও অনেকটা ঝরে গেছে। কিন্তু হাসিটা সেই আগের মতই আছে।

"আরে কি আশ্চর্য। প্রবালদা। আসুন, ভেতরে আসুন। আর টুকুনও আছে দেখছি। কত বড় হয়ে গেছিস, টুকুন। আয় আয়।" আমার অভ্যর্থনার চেঁচামেচিতে মনীষা টের পেয়ে গেছে। এগিয়ে এসে আপ্যায়নের ভার নিজের হাতে তুলে নিয়ে আমায় নিশ্চিন্ত করল।

এবার প্রবালদার বলার পালা, "শোন, এই দার্জিলিং মেল থেকে নামলাম। আজ এবেলা তোমাদের এখানে থাকব, খাবো। বিকেলে বিশ্বভারতী ধরে বাড়ি যাব। টুকুন প্রায় দুবছর পর শান্তিনিকেতনে যাচ্ছে। তোমাদের তনিমাদি ওর পথ চেয়ে বসে আছে।" প্রবালদার স্বভাবসিদ্ধ কথা বলার ঢং অনেকদিন বাদে শুনে খুব ভাল লাগল।

কেমন বদলে গেছে টুকুনটা। আগের মত আর গম্ভীর নেই। খুব হাসিখুশি, খুব চপল। কিছুটা বাচাল হয়েছে। কথার মধ্যে বাংলার চেয়ে ইংরাজির ভাগই বেশি। চেহারাটাও পাল্টে গেছে। মোটা হয়েছে বেশ। তেরো বছরের তুলনায় অনেক বড় লাগে দেখতে। সেই শিশু টুকুন আর নেই। কেমন যুবতী যুবতী

ভাব এসে গেছে ওর মধ্যে। মেলাতে পারছিলাম না। প্রায় দু'বছর পর ও শান্তিনিকেতন যাচ্ছে। এর আগে ছুটিগুলোতে ও কলকাতায় মামার বাড়িতে কাটাতো। প্রবালদারা তখন কলকাতায় যেতেন। এতদিন পর শান্তিনিকেতনে যাওয়া নিয়ে টুকুনের কোনও উৎসাহই দেখলাম না। ও তো জন্ম থেকেই শান্তিনিকেতনে মানুষ। যেখানে যাওয়ার ব্যাপারে ওর কোনও উৎসাহই নেই। ওর কথায়, ওই পচা গ্রামে বেশিদিন থাকার কথা ও ভাবতেই পারে না। কদিন পরেই ও কলকাতায় পালিয়ে আসতে চায়।

বিনয় প্রসঙ্গ আমরা কেউ তুলব না এটাই স্বাভাবিক। তুলিওনি। প্রবালদা জানালেন টুকুন পড়াশুনায় কত ভাল হয়েছে। কত কি শিখেছে ও। বিশেষ করে, ইংরাজি কথোপকথনে খুব চোস্ত হয়ে গেছে। অবাক হয়ে দেখছিলাম। মেয়েটা স্মার্ট হয়ে গেছে।

টুকুন স্নান করতে ঢুকলে প্রবালদা সেই সুযোগে বললেন 'তোমাদের সুখবরটা জানিয়ে রাখি। ওর ঘাড় থেকে ওই প্রেমের ভূতটা নেমে গেছে। এখন ও নিজের কেরিয়ার আর ভবিষ্যত ছাড়া কিছু নিয়ে ভাবতেই চায় না।"

"সত্যি? এটা তো খুব ভাল খবর"—মনীষার গলায় আনন্দের ঢেউ।

"ও আমাকে কাল রাতে ট্রেনে বলেছে, I have been a fool to indulge in such rubbish at this age. আমার এখন নিজেকে তৈরি করতে হবে। অনেক কিছু করতে হবে।"

শুনে আনন্দিত স্বরে মনীষা বলে উঠল "সেদিন আপনারা খুব ভাল ডিসিশন্ নিয়েছিলেন। ওকে কার্শিয়াং-এ ভর্তি করে আপনারা ..."

আমি আর শুনতে পায়নি সেদিন। আমি দেখছিলাম আমরা, সমাজের কিছু প্রতিষ্ঠিত শক্তিধর মানুষ প্ল্যান করে একটি অসহায়, নিরপরাধ, শক্তিহীন নিষ্পাপ শিশুকে কিভাবে খুন করলাম। গত দুবছরের টুকরো ছবিগুলো চলচ্চিত্রের মত আমার চোখের সামনে পর পর ভেসে উঠতে লাগল। চলমান সেই ছবি দেখছিলাম। কখন যেন সম্বিৎ ফিরে এলো টুকুনের কথায়। আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলল "দিস ইস ফর ইউ, কাকু", একটা আফটার শেভ লোশন। আমি মিথ্যে গলায় বলে উঠলাম "ওয়াণ্ডারফুল। থ্যাঙ্ক ইউ মাই চাইল্ড।" আরও কি যেন টুকুন বলছিল, এখন আর মনে নেই।

হায়দ্রাবাদে ল্যাণ্ড করার জন্য প্লেনটা নিচের দিকে নামছে। টুকুনের গলা শুনতে পাচ্ছি। এয়ারহোস্টেস বলে চলেছে " ... প্যাসেঞ্জারস্ আর রিকোয়েস্টেড টু ফাস্‌ন্ দ্য সিট্ বেল্ট্স্ ...."।

ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে

দেবব্রত মল্লিক

যে কোনোভাবেই শুরু করা যেতে পারে। এটা সকাল হতে পারে কিংবা বিকেল। যদি রাত হয় তাহলেও কিছু করার নেই। দিনে রাতে যে কোনো সময় হোক তাতে কিছু আসে যায় না মানসীর। কেননা মনে মনে সবকিছুর জন্যই প্রস্তুত। প্রথম প্রথম ভাবতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। মন থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। কিন্তু যা ঘটবে তা'তো ঘটবেই। এই ঘটনা ঘটা এবং না ঘটা কোনো কিছুর ওপরই মানুষের হাত নেই।

মানসীর মনে আছে স্কুলে পড়ার সময় ইংরিজিতে একটা প্রবন্ধ পড়েছিল। বিষয় প্রকৃতি এবং বিজ্ঞান। লেখক বিজ্ঞানের অগ্রগতির কথা বলেছেন। মানুষ ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারে। কিন্তু এত কিছু করতে পারলেও একটা জায়গায় তার হাত-পা বাঁধা। প্রকৃতির কাছে সে চিরকাল শিশুই থাকবে। কেননা প্রকৃতির শক্তি কীভাবে কাজ করে এবং তার ব্যাপকতা—এই ব্যাখ্যা আজো পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞানীর কাছে স্পষ্ট নয়।

আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কাজের সুবিধা এবং তাকে তরান্বিত করার জন্য নানান ধরনের কৌশল অবলম্বন করে থাকি। চেষ্টা করা হয় প্রযুক্তি বিদ্যার আরো সহজতর প্রণয়ন। যতদিন যাচ্ছে তার রকম পাল্টাচ্ছে। তার ধরন পাল্টাচ্ছে। অবশ্যই খেয়াল রাখতে হয় সেই পরিবেশ এবং পরিস্থিতির কথা।

মানসী বুঝতে পারে। এবং এই বুঝতে পারা থেকেই হয়তো ইচ্ছে। মেয়ে সুমনাকে বিজ্ঞান পড়াবে। এ কথা মেয়েকেও বলেছে। সুমনা তখন ফাইভ কিংবা সিক্সে পড়ে। মাকে ও একদিন প্রশ্ন করে বসলো। আমাকে বিজ্ঞান পড়াবে কেন?

বড় হয়ে অনেক কিছু জানতে পারবে? মানসী মেয়েকে বোঝায়। ইচ্ছে করলে কোনো বিষয়ে গবেষণা করে সেই বিষয়ে হাতেকলমে অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে পারবে।

তাহলে তো খুব মজা হবে? হাততালি দিয়ে উঠেছিল সুমনা। মেয়ের পড়াশোনার ব্যাপার নিয়ে সুবীরের মত একটু অন্য ধরনের। কাউকে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। একজন ছাত্র পড়তে পড়তে স্বাভাবিক ভাবে এগিয়ে গেলে ভালো।

সুবীরের ধ্যান ধারণার সঙ্গে মানসীও একমত। তবে ওর বিশ্বাস ছোট অবস্থায় একজন শিশুর মন থাকে নরম মাটির ডেলার মতো। খুশি মতো তাকে যে আকৃতি দেওয়া হবে, সেই আকৃতিতেই তাকে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।

হয়তো অনেকটাই তাই। তা না হলে মেয়ে সুমনা অনেকটা পথ এগিয়ে

গবেষণা করছে। শাখা : বিজ্ঞান। মানসীর মনে মনে এরকমই চাওয়া ছিল। সফল। অর্থাৎ ওর ভাবনার সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতিকে অনেকটাই মেলাতে পেরেছে।

জানালাটা পুরো হাট করে খোলা ছিল। দক্ষিণ দিকের এই জানালাটা কেউ বন্ধ করতে চায় না। একটু হাওয়া থাকলেই হু হু করে হাওয়া ঢোকে। অনেক সময় ঘরের ফ্যানই চালাতে হয় না। সকাল থেকে মানসী এপাশে আসার একদম সুযোগ পায়নি। বৃষ্টির ছাঁটে জানলার ভেতরে অনেক দূর পর্যন্ত ভিজে গেছে।

বাড়ি থেকে প্রথম বেরিয়ে গেছে মেয়ে, সুমনা তারপর ওর বাবা। সুবীর আজকাল একটু দেরি করে অফিসে যায়। আগের তুলনায় বেশ দেরি। কেননা ওর অফিসটা এখন কাছে চলে এসেছে এবং একবার বাসে উঠলে পৌঁছে যাওয়া যায়।

মানসীকে দিনভর প্রায় একা একাই থাকতে হয়। মেয়ে বাবা বেরিয়ে যাওয়ার পর দীর্ঘ অবকাশ। প্রায় কিছুই করার থাকে না। ঘরের কত কী আর গুছোবে। ওয়ার্ডরোব আলমারি খাটের বক্স কোনো কিছুই বাদ থাকে না। মাঝে মাঝে সবকিছু নামিয়ে আবার সবকিছু গুছিয়ে রাখে। তাতে কিন্তু ভেতরের জিনিসগুলো ভালো থাকে। পোকা কিংবা অন্য কোনো জিনিস থাকলে নাড়াচাড়া পড়লে আর থাকতে পারে না।

ভালো করে রোদ উঠলে একদিন জামাকাপড়গুলো নামিয়ে রোদ খাইয়ে নেবে। অবশ্য এখনকার রোদের কোনো স্থিরতা নেই। এই আছে আবার দেখতে দেখতে বৃষ্টি। এ সমস্ত কিছুই মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

কখনো কখনো আবার এমনও হয়েছে রোদও আছে আবার বৃষ্টিও। ছোটবেলায় এরকম হলে মানসীর মনে আছে চিৎকার করে গান ধরতো। অদ্ভুত অদ্ভুত সে সব গানের কথা। হয়তো বিশেষ কোনো অর্থ নেই কিন্তু অন্য ধরনের এক মাদকতা আছে।

বৃষ্টির রেশ শেষ হতে না হতেই আকাশ জুড়ে দেখা দিত রামধনু। কী বিচিত্র রং আর তার বিন্যাস। কে যেন নীল আকাশের ওপর তুলি দিয়ে এঁকে রেখেছে সাত রঙা ওই ধনু। আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মানসীর নানা ধরনের কথা মনে হত। যেন এক রূপকথার রাজ্যে এসে হাজির হয়েছে। এখানে সবকিছুই হাজির আবার কোনো কিছু নেই। একটা মায়াবি মায়াবি গন্ধ বাতাসে। মনে তারই রেশ।

মানসী ছোটবেলায় ঠাকুমার কাছে অনেক গল্প শুনেছে। দারুণ মজার মজার গল্প বলতো ঠাকুমা। সুর করে অভিনয় করে কী বলার ঢঙ্। তখনো ঠাকুমার গল্পের সেই শব্দগুলো মানসীর কানে বাজতে থাকে। আচ্ছা ঠাকুমা, তুমি কত গল্প জানো?

এত্তো। ঠাকুমা দু-হাত তুলে সংখ্যা বোঝাতে চেষ্টা করত।

আমিও তোমার মতো বড় হয়ে গল্প বলতে পারবো?

কেন পারবে না?

আমার কী সব গল্প মনে থাকবে?

কেন মনে থাকবে না? আমার কী করে মনে আছে?

মানসী এ কথার কোনো উত্তর দিতে পারেনি। চুপ করে ছিল। মুখ কালো করে চুপ করে বসেছিল।

ঠাকুমা কাঁথায় ফোঁড় দিচ্ছিল। মানসী কোনো কথা বলছে না দেখে চশমার ফাঁক দিয়ে ওর দিকে তাকায়। হেসে ইশারা করে নাতনিকে কাছে ডাকে। তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, দূর পাগলি! এত গল্প কী কারো মনে থাকে?

কেন, তোমার তো আছে?

আমারও সব মনে নেই? ঠাকুমা নাতনিকে প্রবোধ দেন।

তাহলে?

যেটুকু মনে আছে সেটুকু দিয়ে বলা শুরু করে শেষে মনে না পড়া জায়গাগুলো বানিয়ে জুড়ে দি।

মানসী হো হো করে হেসে ওঠে। ঠাকুমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, সত্যি তুমি পারোও।

এই ভাবেই তো সব কিছু পারতে হয়। ঠাকুমা সেদিন মানসীকে বুঝিয়ে ছিল, পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী মানিয়ে চলা এক বিরাট কাজ। এইভাবে যে চলতে জানে তার কোনো অসুবিধা হয় না। সে মুশকিলে পড়ে না। কেন না সব অবস্থাকে সামাল দিতে সে প্রস্তুত।

দুপুরে খাওয়া দাওয়া সেরে ঠাকুমা রোজই কাঁথা সেলাই করতে বসে। রঙিন সুতো দিয়ে কাঁথার ওপর এঁকে চলেছে ফুল লতা পাতা পাখি। কাঁথার চারদিকটা আগে সেরে নিয়েছে ঠাকুমা। এটাই নাকি নিয়ম। বরং বলা যায় সুবিধা। কেননা চারদিকটা এঁটে দিলে আঁকা বাঁকা হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

ঠাকুমা তোমার আর কতদিন লাগবে শেষ করতে?

সময় বলা মুশকিল।

তবুও।

পাঁচ মাস লাগতে পারে আবার পাঁচ বছরও হতে পারে।

সে কী? মানসী অবাক হয়ে তাকায় ঠাকুমার মুখের দিকে।

অবাক হওয়ার কিছুই নেই। ঠাকুমা বেহালায় গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়ামের কথা তোলে। ওই মিউজিয়ামে মূলত কাঁথাই রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে অন্যান্য কিছু। গুরুসদয় দত্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ঘুরে ঘুরে কাঁথাগুলো সংগ্রহ করে এনেছেন। হাতের কাজের নমুনা দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। যেমনি সূক্ষ্ম কাজ তেমনি বাহারি রঙের মেলা।

ঠাকুমা তুমি কবে দেখে এসেছো ওই প্রদর্শনশালা।

অনেকদিন আগে।

আমায় একবার দেখিয়ে আনবে?

আমি কী আর নিয়ে যেতে পারবো? তোমার বাবাকে বলবো নিয়ে যাওয়ার জন্য। পারলে সে সময় আমি আর একবার ঘুরে আসবো।

তুমি গেলে খুব ভালো হবে? মানসী খুব খুশি হয়।

ঠাকুমার কাঁথায় ফোঁড় দেওয়া তখন চলছিল। সবুজ সুতো দিয়ে লতার পাতা ভরা হচ্ছে। হঠাৎ সেলাই থামিয়ে ঠাকুমা বলে উঠল, একটা কাঁথার নাম আছে তিন পুরুষের কাঁথা।

তার মানে?

তিন পুরুষ ধরে তৈরি হয়েছে কাঁথাটি। মা করতে শুরু করেছে কাঁথা তারপর তার মেয়ে ধরেছে এবং শেষে সম্পূর্ণ করেছে আবার তার মেয়ে।

মেয়ে।

আশ্চর্য!

মিউজিয়াম ঘুরে দেখলে আরো আশ্চর্য হবে।

বড় হওয়ার পর মানসী ঘুরে দেখে এসেছে মিউজিয়াম। দারুণ লেগেছে। ইচ্ছে ছিল মেয়ে সুমনাকেও দেখিয়ে আনবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা পারেনি।

আকাশে ততক্ষণ কালো খণ্ড খণ্ড মেঘের খুবই আনাগোনা ছিল। হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেল অন্য কোথাও অন্য কোনোখানে। এখন সম্পূর্ণ আকাশ নীল। পরিষ্কার। অন্তত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

মানসী মনে মনে স্থির করে নিল বিকেলের দিকে একবার বেরুবে। টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস কেনার আছে। এর আগেও দু-একবার ঠিক করে রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত আর হয়ে ওঠেনি। মানসী দেখেছে অনেক ভাবনা, চিন্তা অনেক পরিকল্পনার নীট ফল শূন্য হয়ে দাঁড়ায়। আবার হুটহাট করে বেরিয়ে পড়লে, সময়ে হয়ে যায় কাজ।

অবশ্য জরুরি কাজের ক্ষেত্রে কোনো যুক্তি ধোপে টেকে না। কেননা সেখানে প্রয়োজনের সত্যি নির্ধারণ করে দেয়। আমি কতটুকু চাই এবং কীভাবে চাই। সেটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়।

মেয়ে সুমনা বিজ্ঞানের যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করছে—এটা মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে মা'রও চাওয়া ছিল। এখন গবেষণার ফলের জন্য অপেক্ষা। তবে সেদিন সুমনা মাকে বলেছিল, আমার এই সবের পেছনের দর্শনটা জানতে ইচ্ছে করে।

সেই শুরু হওয়ার গল্পটা।

বসুন্ধরার জন্য

অজন্তা সিনহা

সমুদ্র তীরবর্তী এই ছোট শহরে ঋষি এসেছে দিন তিনেক। খুব নির্জন এই ডেস্টিনেশনের ঠিকানা তাকে দিয়েছিল নির্মল। অনেক ছোটবেলার এই বন্ধুকে মাঝে কয়েক বছর হারিয়ে ফেলেছিল সে। হারিয়েছিল আরও অনেক কিছুই। সেই সব তিক্ততা, জ্বালা, বিদ্বেষের কথা এখন এই মুহূর্তে—স্বর্গীয় এই সূর্যাস্তের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতে চায় না ঋষি। কিন্তু নির্মলের কথা ভাবতেই হবে। সব থেকে সংকটের মুহূর্তে নির্মল তাকে খুঁজে না নিলে, এই মহার্ঘ দৃশ্য—এই অপরূপ নির্জনবাস তার ভাগ্যে কখনওই জুটত না।

জায়গাটা অনেকটাই চেনা হয়ে গেছে এখন—তাই ভোর ভোরই এদিক-ওদিক ঘুরতে বেরিয়ে পড়ে আজকাল ঋষি। অদ্ভুত, ঘুমটা ভেঙেও যায় কেমন আপনা থেকেই—নো অ্যালার্ম, নো ডাকাডাকি, হইচই। জীবন সত্যি খুব অবাক করা এক অনুভব—কখন কী ঘটবে কিছুই বলা যায় না।

তার বড় হয়ে ওঠা—দ্রুতগতির রুটিনে অভ্যস্ত হয়ে পড়া— কেরিয়ার, প্রেম এবং সাফল্য—জীবনের কর্পোরেটাইজেশন বোধহয় একেই বলে। তারপর অতৃপ্ত প্রেম থেকে অধরা সুখ নিয়ে কলকাতা ছেড়ে এতদূরে পাড়ি। চাকরিটা ছেড়েই আসতে চাইছিল—মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সেটা আর পারল না! কিন্তু অফিসে কেমন করে আবার যাবে ঋষি? স্মৃতির তিক্ত-বিষন্নতা সেখানে সর্বত্র ছড়ানো। অফিস দুরস্থান, সেক্টর ফাইভে আবার যাবে ভাবলেই রক্ত এখনও গরম হয়ে যায় ঋষির। নাঃ, এসব ভাববে না সে এখন। মন ভাল করা ঠাণ্ডা বাতাস, দিনের প্রথম সূর্যের নরম আলো মাখা এই সকাল এক্ষুনি দূষিত হয়ে উঠবে অতীতের দিকে তাকালে।

কাল রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছে এখানে। বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো বাতাস। সমুদ্রের চেহারাটা চোখে না দেখেও অনুভব করতে পারছিল ঋষি। গেস্ট হাউসের জানালা দিয়ে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও খ্যাপা সমুদ্রের মাতামাতি—মাতামাতিটা তার বুকের মধ্যে যেন জোর করে ঢুকে পড়তে চাইছিল! নিজেকে অতি কষ্টে শান্ত করেছে ঋষি। মাকে মনে করে। নির্মলের কথা ভেবে।

মন ধীরে ধীরে বশে এসেছে। আর তারপরই এক পবিত্র সকালের মুখোমুখি সে। আকাশ একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার। আসন্ন শরতের বীণা বাজছে বাতাসে বাতাসে। তখন সে জানে না এই অমল প্রভাতের থেকেও মহৎ কিছু অপেক্ষা করে আছে তার জন্য।

তার এখনকার নিয়ম মতোই হাঁটতে বেরিয়েছে ঋষি। আজ একটু অন্যদিকে তার গতিমুখ। ইচ্ছে করেই অজানাকে জানার নেশায় উল্টোপথে হাঁটে সে। তার ইচ্ছে, না কি নিয়তির—কে জানে? যেতে যেতে অনেকটা দূর চলে এসেছে ঋষি। পথ-ঘাট নির্জনতর ক্রমশ। তারপর হঠাৎই সামনে সেই অনন্য বিস্ময়। সূর্য তখন সবে তার পুরো শরীর নিয়ে দেখা দিয়েছে—আলোয় উত্তাপের ছিটেফোঁটাও নেই। সেই আলো সরাসরি গিয়ে যেখানে পড়েছে—সেখানে ছোট্ট এক বাড়ি। ছবিতে দেখা 'কুঁড়েঘর' কথাটা হঠাৎই মাথায় এল ঋষির। সমুদ্র এখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে। তবু টের পাওয়া যায় তার উচ্ছ্বাস। আর সেই উচ্ছ্বাস হঠাৎই অচিন দেশের বার্তা পাঠাল ঋষির বিস্মিত স্তব্ধতায়। যে বাড়িটি তাকে অবাক করেছিল, সেই বাড়িরই সামনের বাগানে এসে দাঁড়ালো এক মেয়ে। হাতে আঁকশি। কিছু বাহারি গাছ রয়েছে বাগানটায়। মেয়েটি আঁকশি দিয়ে সেই সব গাছের শুকনো পাতাদের টেনে আনছিল। কিছুক্ষণ মেয়েটিকে দেখবার পর ঋষি কোথাও কিছু একটা অস্বাচ্ছন্দ্য টের পায়, তখনই তার পাশ দিয়ে চলে যায় এক ভ্যান রিকশা। চালকের তীব্র হর্ন তার জন্যই। অন্যমনস্ক ঋষি চমকে ওঠে। তার মুখ থেকে অজান্তেই কোনও শব্দ বোধহয় বেরিয়ে আসে। আর মেয়েটি 'কে, কে' ওখানে বলে আর্ত অভিব্যক্ত হয়। সে যে চোখে দেখতে পায় না, সেটা তখন স্পষ্টতই বুঝতে পারে ঋষি। গর্জন তেলে মাখা দুর্গা ঠাকুরের মতো মুখ, চোখ দুটিও প্রতিমার মতোই, শুধু কেমন করে ঈশ্বর সেখানে দৃষ্টিদান করতে ভুলে গেছেন।

এই সব ঘটনার মধ্যেই ভ্যান থেকে একজন প্রৌঢ় নামেন। তাকে দেখেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে। হতভম্ব ঋষি কি করবে ঠিক করতে না পেরে ভ্যানচালককে দাঁড়াতে বলে এবং ভ্যানে উঠে বসে।

গেস্টহাউসে পৌঁছানোর পর চা এবং ব্রেকফাস্টের পালা। যন্ত্রের মতোই সবই ঘটে যায়। হঠাৎই মনে পড়ে, আজ মাকে একটা ফোন করতেই হবে। নির্মলকেও। এখানে আসার পর এই প্রথম তার এই ইচ্ছেটা হয়। কেন?

প্রশ্নের উত্তর নিজের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতেই ঋষি ডায়াল করে বাড়ির নম্বর। ওপারে মা! স্বাভাবিকভাবেই দারুণ উৎকণ্ঠিত—

'কি রে? এর আগে আর ফোন করতে পারলি না তুই? চিন্তায় আমার দমবন্ধ হওয়ার জোগাড়!'

'চিন্তা আবার কী? পৌঁছে তো খবর দিয়েই ছিলাম। আর এর মধ্যে কিছু হলেও জানতে পারতে। এটা নির্মলের বন্ধুর গেস্টহাউস।'

'বাজে বকিস না তো। তোর যত কুকথা। নির্মল কাল এসেছিল। বলছিল, তোর সঙ্গে কথা না হলেও, তুই ভাল আছিস সে খবর পেয়েছে। নির্মলের কাছে জানার পর একটু শান্তি। ওকেও একটা ফোন করিস।

'দেখছো তো? বললাম না খবর পেয়ে যাবেই। না মা, আর চিন্তা কোর না। আমি ভাল আছি। আরও একটু ভাল হওয়ার সময় দাও। তারপরই ফিরে আসব।'

ওপাশে সাড়া নেই। মানে মা এখন আঁচলে জল মুছছেন। তবু গলায় কান্নাকে আসতে দেবেন না। যদি সে টের পেয়ে যায়।

'মা। মন খারাপ কোর না। বললাম তো ভাল আছি ।'

'না। মন খারাপ করছি না। তবে চিন্তা তো থাকবেই বল। যাই হোক, সাবধানে থাকিস। তাড়াহুড়ো নেই। মন ঠিক হলেই ফিরে আয়। নির্মলকে ফোনটা করে নিস।'

মায়ের ফোনটা কাটার সঙ্গে সঙ্গে আবার মেয়েটির কথা মনে পড়ে যায় ঋষির। শুধু মেয়েটি কেন? পুরো পরিবেশটাই। অমন নির্জন এক অঞ্চলে, অমন এক মেয়ে, প্রবীণ মানুষটাই বা কে? খুব ইচ্ছে করছিল, মাকে বলে মেয়েটির কথা—কিন্তু নাঃ, মা আবার কী ভেবে নেবে। এক্ষুনি কোনও জটিলতায় যাওয়ার মানে হয়না।

প্রথম দিনের পর অনেকগুলো দিন কেটে গেছে। একটু একটু করে এই নির্জন, ছোট্ট শহর, সমুদ্রের অকৃপণ উচ্ছ্বাস আর নাম না জানা সেই মেয়েকে ঘিরে অদ্ভুত এক মগ্নতায় ডুবে গেছে ঋষি। হাঁটতে হাঁটতে দিনের যে কোনো সময় চলে আসে সে এই দিকটায়। ইচ্ছে করেই শুধু সকালে আসাটা বাদ দিয়েছে সে, ভয়ে, যদি ওরা সন্দেহ করে! এর ফলে অনেক সময়ই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয় না তার। মানে মেয়েটিকে দেখতে পায় না সে। মেয়েটি আর কেমন করে দেখবে তাকে? তবে বুঝতে পারে। তার উপস্থিতি মেয়েটির অভিব্যক্তি বদলে দেয়—দেখেছে ঋষি, সেখানে ভয় ও আগ্রহ দুইই মিশে থাকে। এরই মধ্যে ভ্যানচালকদের কাছ থেকে কিছু কিছু খবর সংগ্রহ করেছে ঋষি। মেয়েটির বাবা এখানকার রিটায়ার্ড পোস্টমাস্টার। আগে ওরা শহরের একেবারে মধ্যিখানেই ছিল। রিটায়ারমেন্টের পর মেয়েকে নিয়ে এই দিকটায়, ছোট বাড়িটা করে চলে এসেছেন। এলাকার সবাই প্রায় ওদের চেনে। মেয়েটিকে ছোট থেকে বড় হতে দেখেছে।

এই সব খবর কেন নিচ্ছে, তা জানে না ঋষি। এর মধ্যে নির্মলের সঙ্গে কথা হয়েছে। নির্মল পুরনো কথা তোলেনি। নির্মল এমনিতেই স্বল্পভাষী। নির্বিরোধীও। উষসীর সঙ্গে তার প্রেম-বিয়ে-বিচ্ছেদ—বসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে উষসীর প্রমোশন এবং অফিসের করিডোরে, ক্যান্টিনের আনাচে-কানাচে সহকর্মীদের জটলায় তার আলোচনা—শেষ পর্যন্ত বিরাট পার্টি দিয়ে বসের উষসীকে বিয়ের

ঘোষণা, তাও তাদের বিচ্ছেদের একমাসের মধ্যেই। ঋষি বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত, মায়ের উষসীকে বোঝাবার চেষ্টা করে অপমানিত হওয়া। বার বার সেই সব স্মৃতি, তারপর একদিন সারা রাত বাড়ি না ফেরা। ভোরবেলা কোনও একটি পার্কে তাকে আবিষ্কার করেছিল নির্মল। তার শৈশবের সাথী, সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে যাকে ফেলে সে এগিয়ে গিয়েছিল অনেক দূর—যেখানে উষসীর বাড়ানো হাতের অমোঘ ইশারায় পুরনো পৃথিবীর সব কিছু ছাড়তে প্রস্তুত হয়ে পড়েছিল ঋষি। পুরনো সেই পৃথিবীর নির্মলই বাঁচালো তাকে। বাড়িতে মায়ের তখন পাগল পাগল অবস্থা। নির্মলের সঙ্গে তাকে দেখে সেই না ভোলা রাতের শেষের সকালেও অবাক হয়ে গিয়েছিল মা। হিসাব মেলাতে পারছিল না। তারপর সব কিছু দ্রুত পাল্টালো। নির্মলই মাকে বোঝাল, তাকেও রাজি করালো কলকাতা ছেড়ে এখানে আসবার ব্যাপারে। ভাগ্যিস সে রাজি হয়েছিল। না হলে...?

নাহলে কি? এর উত্তরটা এখনও অজানা ঋষির। শুধু কারওকে দেখেই যে মনের মধ্যে এমন অনির্বচনীয় আনন্দ হতে পারে, সেটা জীবনে এর আগে কখনও অনুভব করেনি ঋষি। কলকাতায় জন্ম, বদলে যাওয়া শহরের পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়েই তারও জীবন বদলালো। যাদবপুর থেকে সল্টলেকে, সেক্টর ফাইভের ঝাঁ চকচকে জীবনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে নিতে কখন যে সে অপরিচয়ের অন্ধকারে হারিয়ে যেতে বসেছিল, সেটা বুঝতে বুঝতেই উষসীর পর্ব—যা শেষ হল চূড়ান্ত গ্লানির মধ্য দিয়ে।

এই সব ভাবনা আজকাল আর তাকে মর্মাহত করে না। কলকাতায় এবার ফিরতে পারবে ঋষি। গোধূলির আলো মাখা আকাশ দেখতে দেখতে এমনটা ভাবছে সে, হঠাৎই কারোর ডাকে সম্বিৎ ফেরে ঋষির। কিছুটা চমকে পিছন ফিরে তাকিয়েই দেখে সেই প্রবীণকে। বেশ কিছুটা সন্দেহ, বিরক্তি, আশঙ্কার ছায়া ওঁর মুখে।

'আপনাকে প্রায়ই দেখি। এখানে নতুন এসেছেন বুঝি?'

'আপনি বলবেন না প্লিজ। আমি আপনার থেকে বয়সে অনেক ছোট। নতুন, মানে, বেড়াতে এসেছি।'

'হুঁ। থাকেন কোথায়?'

'কলকাতায়। আপনাদের এই জায়গাটা ভারি সুন্দর।'

বলতে বলতেই ভদ্রলোকের মুখে কিছু পরিবর্তনের ছায়া লক্ষ্য করে ঋষি। কি যেন বলেন নিম্নস্বরে, যেখান থেকে চেনা 'কলকাতা' শব্দটুকু ছাড়া আর কিছুই উদ্ধার করতে পারে না ঋষি।

তারপরই হঠাৎ ভদ্রলোক কেমন এক রূঢ় স্বরেই বলে ওঠেন—'দেখুন, এটা আমার রাস্তা নয়। বাড়িটুকুই আমার। আপনাকে রাস্তায় হাঁটতে দেওয়ার

ক্ষেত্রে আমি বাধা দিতে পারি না। তবু একটা কথা স্পষ্ট বলি, আমার অন্ধ মেয়েকে অসহায় ভাববেন না কিন্তু। আর আমাকেও নয়। বৃদ্ধ হলেও অশক্ত নই।'

বলেই হন হন করে হেঁটে বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়েন। ঋষি একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই থাকে। তারপর সূর্য পুরোপুরি সমুদ্রের জলে ডুব দেওয়ার আগে ফেরার পথ ধরে। একটু পরই অন্ধকার হয়ে যাবে। নির্জন এই শান্তির আশ্রয় তার কাছে যতই আপন হোক, এরা তাকে অপরিচিতই ভাববে, স্বাভাবিক তো সেটাই!

বাসস্টাণ্ডে আসাটা সেই প্রথম দিন। মানে যেদিন সে কলকাতা থেকে এখানে এসেছিল। এর মধ্যে একমাস কেটে গেছে। আসা হয়নি আর। আজ মা আর নির্মল আসছে। মায়ের বাসে আসতে কষ্ট হবে বলে, গাড়ির ব্যাবস্থা করেছে নির্মল। মাকে নিয়ে এখানে আসার প্ল্যানটা নির্মলেরই। ওর যুক্তি ছিল, মাসিমার উপর দিয়েও তো অনেক ঝড় গেছে, ওঁরও একটু চেঞ্জের দরকার। ঋষির মনে ধরে যুক্তিটা। এখান থেকে বাস ওঠাবার পালা এবার তার। তার আগে কয়েকটা দিন তিনজনে মিলে এখানে কাটিয়ে যাওয়াটা ভালই লাগবে। ফেরার কথা ভাবলেই মেয়েটিকে মনে পড়ে যায় বেশি করে। সেদিনের পর আর যায়নি ঋষি ওই বাড়ির কাছাকাছি। তীব্র ইচ্ছা হলেও যায়নি। মনে হয়েছে, মানুষের এমনিতেই নানা কষ্ট-যন্ত্রণা। সেটা বাড়িয়ে তোলার কোনও মানে হয় না। নির্মলকে অবশ্য বলেছে সে। মানে তার খুশি, উচ্ছ্বাস, আবেগ থেকে নির্মলই আন্দাজ করে প্রথমে, পরে বাকিটা জেনে নেয়। একটু ইয়ারকিও মারে। তবে ওইটুকুই।

ওইটুকু যে নয় ব্যাপারটা, সেটা বোঝা যায় মায়ের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর। সমুদ্রপাড়ের এই খুশির বাতাস নির্মল কলকাতায় মায়ের কাছেও যে পাঠিয়ে দিয়েছে, সেটা জেনে প্রথমে বেশ রেগে যায় ঋষি।

'তোর এই লাগানো স্বভাবটা আর গেল না নির্মল। যতদিন স্কুলে পড়েছি তোর এই স্বভাবের জন্য আমাকে মায়ের কাছে মারধোর খেতে হয়েছে। এই এখন, এই বুড়ো বয়সেও...!'

নির্মল হাসতে হাসতে বলে—'দেখেছেন মাসিমা? রেগে যাচ্ছে, কিন্তু গলায় রাগ নেই। আমি না হয় বদলাইনি। তুইই বা কোথায় বদলেছিস? মনে মনে আহ্লাদের কদমফুল ফুটছে, আর মুখে অস্বীকার? আমি তো যেটা ঘটনা, সেটাই মাসিমাকে বলেছি। তুই বল, তুই প্রেমে পড়িসনি?'

'প্রেমে পড়াটা একটা সস্তা ব্যাপার নির্মল। আই হেট টু ফল ইন লাভ

এগেন!' মুহূর্তে পরিবেশটা থমথমে হয়ে ওঠে। কারণটা বুঝেই হাল ধরেন মা—'তোরা ঝগড়া ছাড়বি? এরপর বেলা হলে আমি আর বেরোতে পারব না। অনেক কাজ বাকি রয়েছে। নির্মল চল তো। ঋষি তুই লাগেজগুলো ঠিকঠাক রাখ। খাবারের ব্যবস্থাও কর। আমরা একঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসছি।'

'মানে? কোথায় যাবে তোমরা? আর এখানে কি-ই বা চেন তুমি'?

'আমি চিনি না। কিন্তু নির্মল চেনে। তুই আর দেরি করাস না আমাদের'। গাড়িটা নিয়ে মা ও নির্মল চলে যাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ঋষি। অবাক লাগে তার। কী করতে চাইছে মা, কিছুই বুঝতে পারে না। এরই মধ্যে দেখা গেস্টহাউসের ম্যানেজারের সঙ্গে, ইনি নিশ্চয়ই জানবেন। কিছু প্রশ্ন করতেই একগাল হেসে ছেলেটি যা বলল, তার মর্মটি উদ্ধার করতে গিয়ে প্রায় খাবি খাবার যোগাড় ঋষির—না কি তার জন্য পাত্রী দেখতে এসেছেন মা এখানে। এর বাইরে অবশ্য আর কিছুই বলতে পারে না সে।

আর একটা পবিত্র সকাল। চোখ খুলে এমনটাই মনে হয় ঋষির। সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে নতজানু হতে ইচ্ছে করে তার। একটু পরেই আশীর্বাদের সাজসরঞ্জাম নিয়ে বসুন্ধরার বাড়িতে যাবে মা। নির্মলও যাবে সঙ্গে। হ্যাঁ। বসুন্ধরাই। অপরিচিতা ধরা দিয়েছে নামে। মা গিয়ে কোনও রাখ-ঢাক না রেখেই কথা বলেন বসুন্ধরার বাবার সঙ্গে। ভদ্রলোক প্রথমে কিছুটা নিমরাজি ছিলেন। তাঁর কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা এর মধ্যেই হয়ে গেছে মেয়ের বিয়ে বাবদ। বেশির ভাগই কলকাতা থেকে আসা ট্যুরিস্ট। প্রতিশ্রুতি দিয়েছে অনেকেই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাখেনি। মা-হারা অন্ধ মেয়েকে বার বার গ্লানির মধ্যে ফেলে, একসময় সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন, বসুন্ধরার বিয়ের চেষ্টা আর করবেন না তিনি।

মায়ের অনুনয়ে সেই সিদ্ধান্ত বদলেছেন। আর তারপর থেকেই বদলে গেছে পটে আঁকা ছবির মতো সেই কুঁড়ে ঘরের বাতাস। এইসবই শুনেছে ঋষি—মা এবং নির্মলের কাছে; বসুন্ধরার সঙ্গে তার এখনও দেখা হয়নি। মা বলেছেন, একেবারে বিয়ের আসরেই দেখাটা হবে। প্রতিবাদ করেনি ঋষি।

শুধু নির্মলের সঙ্গে বসুন্ধরার কথা হয়েছে জেনে, নিজের আবেগকে আর ধরে রাখতে পারেনি। একান্তে টেনে নিয়ে এসেছে গেস্টহাউসের পিছনের বাগানে। মা এখন নানা কাজে ব্যস্ত। বিয়েটা একেবারে সেরেই যাবেন তিনি। কোথাও কোনও ত্রুটি যেন না থাকে। মায়ের ডান হাত হয়েছে ম্যানেজারের বউ।

নির্মলের সিগারেটে সুখটান বলে দেয়, সময়টা সত্যি সুখের! উৎসাহে ছটফটে ঋষি প্রশ্ন করেই বসে—'কি কথা হল, বল না?'

'কি আবার?'

'প্লিজ বল'—

হেসে ফেলে নির্মল। তারপর বলে, 'আমি খুব অবাক হয়ে গেছিলাম জানিস, বসুন্ধরার তোর সম্পর্কে ধারণাটা শুনে। ওতো তোকে দেখেইনি। মানে দেখার মত প্রশ্নই নেই। কিন্তু তুই ক'দিন ওদের বাড়ির কাছে গেছিস, সেটা টো টো বলে দিল, মানে তুই যা বলেছিলি, আমি তার সঙ্গে মেলালাম!'

'তাই?' বিস্ময় চেপে রাখতে পারে না ঋষি। খুশিও।

'শুধু তাই নয়, তুই কেমন স্বভাবের, তুই যে ভাল ছিলি না, এটাও ও কেমন নিজের মতো করে বুঝে গিয়েছিল আগেই। ওর বাবাকে নাকি বলেওছিল সে কথা।'

এবার বাস্তবিকই হতভম্ব হয় ঋষি। 'এটা কেমন করে হয় রে?'

'হয়। ওদের অনুভবশক্তি আমাদের থেকে অনেক প্রখর হয় রে! আর তাছাড়া নিয়তি। যেমন করে সেই সকালে আমার বাড়ির কাছের পার্কে পেয়ে গেলাম তোকে। আর কোথাও না গিয়ে তুই ওখানেই এসেছিলি কেন বল? তেমন করেই বসুন্ধরার তোকে বুঝে নেওয়া, বুঝেছ নাকি চ্যাপ?'

নির্মলের কথায় হাসে ঋষি। হাসিটায় বেশ বোকা বোকা দেখাচ্ছে তাকে, জেনেও। মনের খুশিটা প্রকাশ করার ইচ্ছেটাকে চাপতে চায় না সে। ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করে বসুন্ধরার সামনে। নিজেকে সংযত করে তারপর। অপেক্ষা করে। মহৎ কিছুর জন্য অপেক্ষা করতে শিখে গেছে ঋষি এখন।

পিঙ্কি

কৌশিক ঘোষ

সপ্তাহে তিনদিন মেয়েটি এই গলির মধ্যে যাতায়াত করে। গলি না বলে একে অন্ধকূপ বলাই ভাল। কিন্তু রাস্তার এ মোড় থেকে ও মোড়ে যেতে হলে এই গলির জুড়ি মেলা ভার। এই গলির সামনের দিকেই সকাল আর বিকেলে—একেবারে নিয়ম করে বসে তিন বন্ধুর আড্ডা। তিন বন্ধু মানে জয়দীপ, শংকর আর সঞ্জয়। তিনজনই পাড়ার ছেলে। পড়াশোনার পালা শেষ করে তারা তিনজনই এখন শিক্ষিত বেকারত্বের খাতায় নাম লিখিয়েছে। আড্ডাটা এতদিন মূলত ছিল রাজনীতি এবং সমাজনীতিকেন্দ্রিক। কিন্তু গত তিনমাস ধরে মেয়েটির যাতায়াতের ফলে আলোচ্য বিষয়েরও পরিবর্তন শুরু হয়েছে।

মেয়েটির বয়স বছর তিরিশের কাছাকাছি হবে। সোম, বুধ এবং শুক্রবার ঠিক বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ মেয়েটি হনহনিয়ে চলে যায়। একটা চাপা সেন্টের গন্ধ কেমন যেন কিছুক্ষণ বাতাসে ভেসে থাকে। শহরের এত গ্যাস, চোখ-জ্বালানো ধোঁয়া সমস্তকে উপেক্ষা করে এই সেন্টের গন্ধ কেমন যেন শরীরের রক্তে ঘন্টাখানেক ধরে থিতিয়ে থাকে। তারপর আসতে আসতে মিলিয়ে যেত। ছিপছিপে গড়নের এই মেয়েটিকে নিয়ে তিনজনই অনেকসময় বিরূপ মন্তব্য করেছে। আবার তিনজনই একসঙ্গে তা নিয়ে মজা করেছে। কিন্তু ময়েটি কোথায় যায়, তা নিয়ে এখনও ধন্দে রয়েছে এই তিন বন্ধুর। একদিন জয়দীপ বলেই ফেলল, মেয়েটি বোধহয় বেলঘরিয়ায় থাকে। একদিন তাকে নাকি সে বাস থেকে নামতে দেখেছে। শংকর ও সঞ্জয় চুপ করে থাকে। বেলঘরিয়ায় যদি থেকেই থাকে তাতে কোনও অন্যায় নেই। কিন্তু শ্যামবাজারে কোথায় আসে তা ধোঁয়াশায় রয়েই গেল। জয়দীপ একবার প্রস্তাব দিয়েছিল, মেয়েটির পেছন পেছন গিয়ে সমস্ত খবরাখবর নিয়ে তাকে প্রশ্ন করেই বসবে তার সম্বন্ধে। শংকর আর সঞ্জয় একসাথে বলে উঠল—তা হবে না। মেয়েটি এতে খারাপ ভাবতে পারে।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই তারা তিনজনই মেয়েটির সম্বন্ধে ভাবতে আরম্ভ করে। এবার ওদের আলোচ্য বিষয় হল, যে তিনদিন মেয়েটি আসে না, সেই তিনদিন মেয়েটি কোথায় যায়? নাকি বাড়িতেই থাকে। প্রথমে তিনজনই বলত, তারা মেয়েটিকে নিয়ে কে কি ভেবেছে। তারপরে এমন এক অভ্যাসে দাঁড়াল, যে তারা নিজেরা মেয়েটিকে নিয়ে কী ভাবছে তা আর কেউ কাউকে বলে না। প্রত্যেকেই মেয়েটিকে নিয়ে নিজস্ব একটা জগৎ কল্পনা করে সেই নিয়ে শুরু হয় সকাল। শেষ হয় রাত্রি।

জয়দীপ মনে মনে ভাবে, মেয়েটি যদি কালো না হয়ে একটু ফর্সা হত,

তাহলে কী সুন্দর নাই তাকে দেখতে হত। পায়ের গোছ পর্যন্ত চুল থাকলেও, শুধু শ্যামলা রঙের জন্যেই মেয়েটি কোথায় যেন তার কাছে স্পর্শ করে অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবে, অদৃশ্য বা হবেই কেন। সবাইকে কী ফর্সা হতে হবে এমন তো কোথাও লেখা নেই। মাথার চুল, চোখের ভুরু কেমন অদ্ভুত সুন্দর—মেঘভারে বৃষ্টিধারার এক ক্ষীণ আশা সব সময় যেন জিইয়ে রাখে। শংকর ভাবে ঠিক উল্টো। পৃথিবীতে এই ধরনের ছিপছিপে মেয়ের জন্যই যেন ভগবান সৃষ্টি করেছেন শ্যামলা রং। তার মনে হয়, সে যদি কোনদিন কোন সময়ে মেয়েটিকে প্রশ্ন করতে পারে, তাহলে সে এটাই সোচ্চারে জানাবে; তোমার মত মেয়ের জন্যই এই রং মানায়। আর যদি কোন কারণে মেয়েটিকে ভালোবাসতে হয়, তাহলে বলবে,—আমি তোমায় ভালোবেসেছি রংয়ের জন্য। সঞ্জয় ভাবে মেয়েটির বাড়ির লোক কি নিষ্ঠুর। এই ভরা সমর্থ মেয়েকে কী করে বাড়ির লোক ছেড়ে দিতে পারে একা? মেয়েটিকে যদি কেউ অপহরণ করে নিয়ে যায় তাহলে কী হবে? শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে রোজ ষণ্ডামার্কা যে পাঁচজন লোক আড্ডা মারে তারা যদি একদিন সবাই মেয়েটির পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকে নিয়ে পালায়, তাহলে সে কী করবে? সঞ্জয় চোখ বন্ধ করে ভেবেছিল, সে দৌড়বে? আরও লোক ডাকার চেষ্টা করবে? কিছু করতে না পারলে নিদেনপক্ষে একটা ভাঙা বোতল ছুঁড়ে তাদের মারবে। কেউ আহত হলে পুলিশেও যাবে।

সেদিন ঘটনাটা ঘটল অন্যরকম। দুপুর থেকে তুমুল বৃষ্টি। ঘন্টা দু'য়েক হয়ে যাওয়ার পরও বৃষ্টি থামার ইঙ্গিত নেই। রাস্তায় জল থৈ থৈ। আজ মেয়েটির সাথে তিনজনের দেখা হওয়ার দিন। সাড়ে পাঁচটায় ঘড়ির কাঁটা ধরেই মেয়েটি যায়। তাই আর দেরি না করে ভিজতে ভিজতে তিনজনেই পাঁচটার মধ্যে হাজির। বলা যায় না, বৃষ্টির দিন, মেয়েটি যদি আগে চলে যায়। গলির মুখটায় প্রায় এক হাঁটু জল। সওয়া পাঁচটা নাগাদ একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক গেলেন, জল কলকল শব্দে ছপাৎ ছপাৎ করে আওয়াজ করে। চারিদিকে জল ছিটকে পড়ল। একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস তিনদিক থেকে এসে আটকে রইল গলির বাঁকে। তারপর কেউ আসে না। সাড়ে পাঁচটা কখন পার হয়ে গেল। অবশেষে পৌনে ছ'টা নাগাদ গলির মুখে দেখা মিলল সেই মেয়েটির। অন্যদিনের মত চলার গতি আজ আরও মন্থর। জলেই যেন আটকে আছে তার গতি। গলি পেরিয়ে বড় রাস্তায় উঠতে যাবে, এমন সময় সঞ্জয় বলে উঠল—আপনি তো আবুড়িসুবড়ি ভিজছেন। আমার ছাতা আছে। একটু এগিয়ে দিই। মেয়েটি স্বাভাবিকভাবেই হকচকিয়ে গেল, বলল—প্রয়োজন নেই। গলার স্বর মিষ্টি হলেও তা যেন কোথায় কেঁপে তিক্ত হয়ে গেল। বর্ষণক্লান্ত ভেজা কাকের মত কর্কশ সেই স্বর। সেদিনের ঘটনার এখানেই ইতি।

জয়দীপ, শংকর, সঞ্জয়কে খুব বকাবকি করল। তাদের মতে, সঞ্জয় যা করেছে তা নিছক অসভ্যতা। কিন্তু এরপর থেকে মেয়েটি সপ্রতিভ হয়ে উঠল আরও। এরপর থেকে ওই গলি দিয়ে যখনই সে চলে যায়, তখনই আড়চোখে সে দেখে নেয় এই তিনজনকে। মুখে একটা অদ্ভুত হাসির ছটা। এবার অন্যরকম একটা ঘটনা ঘটল।

সঞ্জয় কাউকে না বলে একদিন দাঁড়িয়ে রইল বড় রাস্তার উল্টোদিকের ফুটপাতে। মেয়েটি যথারীতি সময়ে এল। রাস্তা পেরোতেই সঞ্জয়ের সঙ্গে চোখাচোখি তার। এবার নিজেই মেয়েটি হাসল। তারপর ইশারা করে ডান হাত দিয়ে ডাকল। মেয়েটি ফুটপাত ধরে গ্রে স্ট্রিট হয়ে বি কে পাল অ্যাভিনিউ হয়ে প্রায় তিন কিলোমিটার পথ হেঁটে ঢুকল দর্জিপাড়ায়। সঞ্জয়ের এবার বুক কাঁপছে। কলকাতার ছেলে। সুতরাং এ পাড়ার মাহাত্ম্য সে জানে। কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে মেয়েটি দাঁড়িয়ে পড়ল। বেশ খানিকটা দূরত্ব রেখে সঞ্জয়। এবার সঞ্জয় নিজেই মেয়েটির কাছে এল। হঠাৎ মেয়েটি ব্লাউজের ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা কাগজের গোলা বার করে ছুঁড়ে দিল সঞ্জয়ের দিকে। হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে কাগজের বল গিয়ে পড়ল রাস্তার অন্যদিকে। সঞ্জয় চোখ ফেরাতেই মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল। সঞ্জয় কাগজটি কুড়িয়ে যা দেখল একটা চিঠির বয়ান।—'আমার নাম পিঙ্কি। আমি যৌনকর্মী। আমার এক মেয়ে থাকে ভূপেন বোস অ্যাভিনিউতে। তাকে আমি একজনের কাছে রেখেছি। যাতে সে এই পরিবেশ থেকে দূরে থাকে। আপনারা আমায় ভুলে যান। না হলে আমরা সবাই কষ্ট পাব।'

সঞ্জয়ের মনটা খারাপ হয়ে গেল। মেয়েটি যে যৌনকর্মী তা জানার জন্য নয়, চিঠিতে মেয়েটি বহুবচন ব্যবহার করল কী করে তা সঞ্জয় বুঝতে পারল না। মেয়েটির না হয় একাধিক পুরুষসঙ্গী থাকতে পারে। তিন বন্ধুর কী তাহলে এক নারীতেই আকর্ষণ! অন্য দুজনকে চিঠিটা পড়াতে তারা দু'জনেই ফিসফিস করে কী বলল। সত্যিই যা চাওয়া যায়, তা পাওয়া যায় না। কাচের অ্যাকোরিয়ামের মধ্যে মাছ ঘোরাফেরা করে, ধরতে গেলে পালিয়ে যায়। ঠিক তেমনই পিঙ্কিও যেন ফসকে গেল।

তিনজনের কী ইচ্ছে ছিল তা অবশ্য আজও বোঝা যায়নি। কেউ কারুর কাছে জানতেও চায়নি। মেয়েটি কিন্তু তারপর থেকে গলি দিয়ে আর যায় না। ওদের আড্ডাও এখন বন্ধ।

সুচিতা

অমরনাথ চক্রবর্তী

(১)

অফিসের কাজের চাপই হোক আর পয়সা খরচের ভয়ই হোক আমার বড় একটা কোথাও বেড়াতে যাবার সুযোগ ঘটেনি। কিন্তু সেবার যেতেই হল। বন্ধুর বিয়ে। বাড়ি বর্ধমান। বিয়ে উপলক্ষেই যেতে হয়েছিল।

ভূগোলে পড়েছিলাম বীরভূম, বাঁকুড়ার মাটি লাল। বর্ধমান বাঁকুড়ার ঠিক আগেই, তাই বর্ধমানেরও কিছু কিছু অঞ্চলের মাটিও লাল। আর এই লাল মাটির দেশে অনেক অজানা রোমহর্ষক কাহিনি আছে। তারই একটি লিখতে বসেছি।

আগেই বলেছি বন্ধুর বিয়ে উপলক্ষে যাওয়া। বন্ধুর নাম স্বপন সরকার। বর্ধমানের নিগন গ্রামেই স্বপনদের বাড়ি।

বর্দ্ধমান জেলায় পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধান উৎপন্ন হয় বলেই প্রতিটি মানুষেরই সচ্ছল অবস্থা। অভাব নেই বললেই চলে।

কথা ছিল স্বপন আর আমি ধর্মতলা বাস গুমটি থেকে কলকাতা-কাটোয়ার গাড়ি ধরব। আগের দিনই টিকিট কেটে নিয়ে গেছে স্বপন।

কথামত দুজনই সকালে বাসগুমটির কাছে দাঁড়িয়ে আছি। বাস কখন ছাড়বে তার অপেক্ষায়।

হঠাৎ দুটো ছেলে এসে বলল, দাদা আপনারা কোথায় যাবেন?

স্বপন বলল, বর্ধমান, কাটোয়া।

ছেলে দুটি আমাদের একটা সুন্দর গাড়ি দেখিয়ে বলল, আমাদের ওই বাসটা যাবে।

স্বপন বলল, না না, আমরা অন্য বাসে যাব।

ছেলে দুটি আবার আবদার করে বলল, চলুন না!

আমি স্বপনকে বললাম, চল না, ভাল সিট দেখে এই বাসে বসে যাই।

স্বপন বলল, অন্য বাসের টিকিট কাটা আছে।

আমি সকাল সকাল মজা করার জন্য স্বপনকে বললাম, কেন মিথ্যা কথা বলছিস। চল ওদের বাসে গিয়ে উঠে পড়ি।

ছেলে দুটো সুযোগ পেয়ে গেল। বলল, দাদা কম ভাড়ায় নিয়ে যাব।

স্বপন বলল, কেন মিছি-মিছি আমাদের পেছনে ছুটছেন, আমাদের টিকিট সত্যিই কাটা হয়ে গেছে। আমাদের পেছনে না ছুটে বরং অন্য খদ্দের দেখুন, কাজ হবে। অগত্যা তারা চলে গেল।

সকাল সাতটা তিরিশ। আমি আর স্বপন কলকাতা-কাটোয়া গাড়িতে পাশাপাশি বসে আছি। গাড়ি সাতটা চল্লিশে ছাড়বে।

যথাসময়ে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। হাওড়া পেরিয়েই গাড়ি জি.টি. রোডে পৌঁছে গেছে।

অগ্রহায়ণ মাস, শীতের সকাল, ঘাসের আগায় তখনও শিশির রয়েছে। রাস্তার দু-ধারেই শুধু ধান গাছ। যেদিকেই তাকাই শুধু সবুজ আর সবুজ।

চাষ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। কিন্তু স্বপন গ্রামের ছেলে। ওর আছে। ও বলল, এই যে গাছগুলো দেখছিস, এটাকে বলে 'আমন ধান'। আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ধান কাটা আরম্ভ হয়ে যাবে। কিন্তু এখন যেদিকে তাকাবি সেদিকেই শুধু ধান গাছ। সবুজ আর সবুজ।

গাড়ি জোরে ছুটছে, হাওয়া বইছে। ধান গাছগুলো ঢেউয়ের মতো একটার ওপরে একটা পড়ছে আর চুম্বন দিয়ে আবার সোজা হয়ে যাচ্ছে।

সময় কিন্তু বসে নেই। সে ঠিক নিজের মত করে এগিয়ে চলেছে। কখন যে দশটা বেজে গেছে বুঝিনি। আর বুঝবই বা কি করে, ঘরপোড়া গরু। বাইরে বেরিয়েছি। গ্রামের সৌন্দর্য দেখতেই ব্যস্ত। সময়ের কথা মনেও নেই, আর খিদে তো ভুলেই গেছি।

স্বপন বলল, গাড়ি বলগনা পেরিয়ে গেছে। এবার নামতে হবে। তৈরি হয়ে নে।

নামার জন্য যখন তৈরি হচ্ছি, তখন হঠাৎ দেখি বাসের মধ্যেই দু-তিনটে ছেলে 'হো' 'হো' করে হেসে উঠল। কিছুই বুঝলাম না। বোঝার জন্য যখন এদিক-এদিক তাকাচ্ছি তখন দেখলাম রাস্তার ধারে একটা মাঝবয়সী মেয়ে, হাতে একটা কঞ্চিতে একটা লাল কাপড় বেঁধে, উন্মাদের মত 'লাল সেলাম', 'লাল সেলাম' বলতে বলতে ছুটছে। আমিও ওই ছেলেদের মত হেসে উঠে বাসের ভেতরে তাকাতেই দেখলাম একজন রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছছে।

অনুমান করলাম ওই মহিলা হয়তো ভদ্রলোকের পরিচিত কেউ হবে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। নিজেকে অপরাধী মনে হল। আত্মতৃপ্তির জন্য ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে বললাম, মনে কিছু করবেন না। না বুঝে হাসাটা সত্যিই আমার অন্যায় হয়ে গেছে।

ভদ্রলোক বললেন, না না, আপনার কোন অন্যায় নেই। ভাগ্যের পরিহাসই আজ ওকে উন্মাদ করেছে। আর এর জন্য দায়ী আমিই। তাই আজও নিজেকে ক্ষমা করতে পারিনি।

আমি বললাম, তাহলে ওই উন্মাদিনী মহিলা কি আপনার পরিচিত।

হ্যাঁ, পরিচিত, তবে আমার নিজের কেউ নয়।

আমি বললাম, আপনার কেউ নয়? অথচ ওর জন্য আপনি আজও নিজেকে ক্ষমা করতে পারেননি। ওর ওই দশা দেখে আপনার চোখে জল ঝরতে লাগল। যদি মনে কিছু না করেন তবে একটা কথা বলব।

ভদ্রলোক বললেন, বলুন।

আমি বললাম, এর পেছনে কি কোন ঘটনা আছে। যা আজও আপনাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

ভদ্রলোক বললেন, সে এক ইতিহাস। সবাই ওকে পাগলি বলে। কিন্তু কেন পাগলি হয়েছে তা কেউ জানে না। জানতে চায়ও না। জানলে হয়তো ওকে আর কেউ পাগলি বলত না, ওকে দেখে আর কেউ হাসত না। বলেই হাঁউ হাঁউ করে কেঁদে ফেললেন।

এমন কিছু ঘটনা নিজের অজান্তে ঘটে যায় তার মাসুল সারা জীবন দিতে হয়। ওই উন্মাদিনীর প্রতি নিজেরই অজান্তে, মনের মধ্যে একটা মায়া অনুভব করলাম। বিষয়টা জানার আগ্রহে ও একই সঙ্গে কৌতূহলে।

অবোধের মত নাছোড়বান্দা হয়ে ভদ্রলোককে বললাম, আমাকে ওর সম্বন্ধে যতটা জানেন তাই বলুন।

ভদ্রলোক বিহ্বল হয়ে বললেন, শুনবেন।

আমি বললাম, হ্যাঁ। আমি নিশ্চয়ই শুনবো।

সে অনেক বড় কাহিনি। সময় লাগবে। বাসে বসে বলা যাবে না।

বললাম আরনার বড়ি গেলে...

তিনি বললেন, আপনি আসবেন আমার বাড়ি? যদি আসেন তবে অন্তত আপনাকে বলে মনটা কিছুটা হালকা হবে। কথা দিচ্ছেন আপনি আসবেন?

বললাম, কাল নিশ্চয়ই আমি আপনার বাড়ি যাব, আমি ওনার নাম-ঠিকানা সব কিছু নিয়ে স্টপেজ আসতে বাস থেকে নেমে গেলাম।

(২)

গ্রামের আল ধরে দুই বন্ধু চলেছি। আমার ভারাক্রান্ত মন। অজানাকে জানার আগ্রহ, আর স্বপনের মনে ঘরে ফেরার আনন্দ। সাথে যৌবনের পরম তৃপ্তিলাভের সন্ধিক্ষণ বিবাহের আনন্দ।

স্বপন নিজের আনন্দের উচ্ছ্বাসকে আটকাতে না পেরে কখনও গুনগুন করে গান করছে, আবার মাঝে মাঝে আমায় বলছে, কি রে চুপচাপ আছিস, আমাদের গ্রাম কি তোর ভাল লাগছে না। আবার তারই মধ্যে চেঁচিয়ে আবৃত্তি করতে আরম্ভ করে দিল।

শস্য শ্যামলা রূপসী বঙ্গে
সোনা ঝরা রোদ্দুর
ধানভরা শীষ নাচে তালে তালে দেখি
চোখ যায় যদ্দুর।

স্বপনদের বাড়ি পৌঁছতেই মাসিমা অর্থাৎ স্বপনের মা অনেকদিন পর ছেলেকে দেখে ছুটে এসেই ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বললেন ওরে খোকা এসেছে। বাবুকে ডাক। বাবু অর্থাৎ স্বপনের বাবা।

পরিচয়ের পালা শেষ করে আমি আর স্বপন ওদের বাড়ির দোতলার একটি ঘরে বসেছি। আমি চুপ করে বসে আছি। আমাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে স্বপন বলল, হ্যাঁরে তোর কি হয়েছে বল তো। সেই থেকে চুপচাপ আছিস। মনে মনে কি যেন ভাবছিস। কোন কথা বলছিস না। সত্যি করে বল তো আমাদের গ্রাম কি তোর ভাল লাগছে না?

আমি বললাম, তুই মিছিমিছি ভুল ভাবছিস। তোদের গ্রামটা সত্যিই খুব সুন্দর। বিশ্বাস কর আমি একবর্ণও মিথ্যা বলছি না। এই প্রাকৃতিক দৃশ্য যে দেখবে তারই ভাল লাগবে। আর তুই তো জানিস আমি গ্রাম ভালবাসি।

স্বপন বলল, তবে চুপচাপ বসে আছিস কেন, কোন কথা বলছিস না।

আমি পরিবেশটা হালকা করার জন্য বললাম, সত্যি বলতে কি তোরও বিয়ে হয়ে গেল। একে একে বন্ধুদের মধ্যে সবারই বিয়ে হয়ে গেল। আমার কোন হিল্লে হল না। এমন কোন মেয়ে আজও দেখলাম না যে আমার গলায় মালা পরায়।

হিংসা করছিস। চিন্তা করিস না চেষ্টা কর, তোরও হবে।

ঠিক বলেছিস, তোর থেকেই শিক্ষাটা নিতে হবে। কি করলে অন্তত একটা মেয়েও যাতে আমার গলায় মালা পরাতে রাজি হয়।

ভয় নেই। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি, তারপর তোকে সব শিখিয়ে দেবো।

সত্যি বলছিস, ভুল শেখাবি না তো?

স্বপন এবার সিরিয়াস হয়েই বলল, সত্যি করে বল তো তুই ওই উন্মাদ মহিলার ব্যাপারে কিছু ভাবছিস।

আমি বললাম, সে তো কালকে গিয়েই সব জানতে পারবো। মিছিমিছি এখন থেকে ওর জন্য চিন্তা করে কোন লাভ আছে।

স্বপন একটু আক্ষেপের সুরে বলল, তা ভাল, কাল সকাল সকাল চলে যাস, কেননা এই জন্যই তো এসেছিস।

রাগ করিস না। আমার সত্যিই খুব কৌতূহল। কি এমন ঘটনা যে একটা ভাল মেয়েকে উন্মাদে পরিণত করল।

রাগ করছি না, মন থেকেই বলছি, তুই কালই যাস। যদি পারিস তো একটা গল্প লিখিস। তবু আমাদের গ্রামটার নাম তোর গল্পের বইতে স্থান পাবে।

আমি বললাম, বললি ভাল। আমি লিখব গল্প। আর সেই গল্প লোকে পড়বে। তুই তো জানিস আমি গল্প লেখায় কেমন ওস্তাদ। আমার গল্প যদি সত্যিই ছাপা হয় তবে আর যাইহোক তা কেউ পড়বে না। ওটা দিয়ে হয় ঠোঙা বানাবে নয়তো উনান জ্বালাবে।

এরই মধ্যে স্বপনের ছোট বোন চা নিয়ে এলে স্বপন বলল, ওই চা এসে গেছে। নে খেয়ে নে। একটু বিশ্রাম কর। তারপর না হয় গল্প লেখার ছকটা তৈরি করিস।

পরের দিন সকালবেলায় স্বপন ওদের বাড়ির একটা লোক দিয়ে আমাকে বাসে তুলে দিয়ে ওই ভদ্রলোকের বাড়িতে পাঠাল।

আমি ওই ভদ্রলোকের বাড়ি যেতেই ভদ্রলোক অবাক।

আরে সত্যি সত্যি আপনি চলে এসেছেন।

আমি বললাম, ঘটনাটা জানার জন্য মনটা খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আপনার কাছে না আসা অবধি মনটা ছটফট করছিল। তাই না এসে পারলাম না।

ভালই করেছেন। আসুন আসুন ভেতরে আসুন, বলে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গেলেন। বসতে বলেই বললেন, আপনি কাগজের লোক ননতো।

আরে না না, আমি কাগজের লোক হতে যাবো কেন, আপনি নির্ভয়ে আমাকে সব বলতে পারেন।

ভদ্রলোক বললেন সত্যি বলতে কি, কাগজের লোককে আমি খুব ভয় কবি। ওরা মিথ্যাকে এমনভাবে লেখে যেন সত্যি আবার সত্যিকে মিথ্যা প্রমাণিত করে দিতে সময় লাগে না। আর এই খবর পড়েই পাঠকের দল নাচতে থাকে।

আমি বললাম, কাগজের লোককে আপনার এত ভয়?

ভদ্রলোক বললেন, আমি যে কথাগুলো বলব তা আমাদের পার্টির সাংগঠনিক বিষয়ের অনেক গোপন কথা। যা বাইরে প্রকাশ পাওয়াটা ঠিক নয়।

আমি আবার অভয় দিয়ে বললাম, আমি আর আপনি ছাড়া আর কেউই এই ঘটনা জানতে পারবে না।

উনিশশো ষাট সাল থেকে আমি কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী।

প্রতি বছরই পার্টির জেলাভিত্তিক মিটিং হতো। সেখানে বিভিন্ন গ্রামের নেতারা নিজের নিজের গ্রামে পার্টি সংগঠনের অগ্রগতির কথা তুলে ধরত।

সাতষট্টি সালে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময় জেলা সম্মেলনে প্রত্যেক গ্রামের নেতাই নিজের নিজের গ্রামের পার্টির অগ্রগতির কথা বলার পর আমি আঁমাদের

গ্রামের পার্টিসংগঠনের অগ্রগতির কথা বলতে পারলাম না। কেননা বাস্তবিকই কোন অগ্রগতি হয়নি। তাই মনক্ষুণ্ণ অবস্থায় বসে ছিলাম।

আমার পাশে বসে ছিলেন বদ্রু মিঞা। বললেন, কারণটা কি, এতদিনেও আপনি আপনার গ্রামে জোরদার সংগঠন করতে পারলেন না।

আমি বললাম, আমাদের গ্রামে সৌমিত্র বলে একটা ছেলে আছে। সৌমিত্র সরকার, বাপ-মরা বিধবা মায়ের লেখাপড়া জানা একমাত্র ছেলে। কোন পার্টি-পলিটিকস পছন্দ করে না, কিন্তু গ্রামের প্রতিটি উন্নয়নমূলক কাজে ওর জুড়ি মেলা ভার।

আমাদের গ্রামে একটাও স্কুল ছিল না। গ্রামের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া করার জন্য পাশের গ্রামে পড়তে যেত। এতে অনেক অসুবিধা হত। আর এই অসুবিধার জন্য অনেকে লেখাপড়া করার সুয়োগ হারাত।

একদিন সৌমিত্র গ্রামে স্কুল করার জন্য এগিয়ে এল। স্কুল করার জন্য নিজেদের জায়গা দিয়ে দিল। স্কুলবাড়ি তৈরি করার জন্য চাঁদা তোলা আরম্ভ হয়ে গেল। প্রত্যেকেই স্বতঃস্ফুর্তভাবে এগিয়ে এল। স্কুলবাড়ি তৈরি হয়ে গেল। বি.ডি.ও স্যারকে দিয়ে স্কুলের জন্য সরকারি অনুমোদনও আদায় করে নিল। পড়াবার জন্য গ্রামের শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা এগিয়ে এল। স্কুল আরম্ভ হয়ে গেল। লেখাপড়া করার জন্য গ্রামের ছেলে-মেয়েদের যে পাশের গ্রামে যেতে হত সেটা বন্ধ হয়ে গেল।

এইরকম নানা উন্নয়নমুখী কাজের জন্য সৌমিত্রকে গ্রামের সকলেই খুব ভালবাসতো। এমনকি ও যেটা পছন্দ করে গ্রামের প্রত্যেকে সেটাই চাইতো ও যেহেতু পার্টি-পলিটিক্স পছন্দ করে না। গ্রামের সকলেই পার্টি-পলিটিকস পছন্দ করে না।

সব কথা শোনার পর বদ্রু মিঞা বলল, এতকাল ধরে পার্টি করছ আর একরত্তি একটা ছেলেকে বস করতে পারছ না।

আমি বললাম, সেরকম কেউ নেই যে ওকে বোঝায়। হাতে গুনে আট-দশজন আছে যারা মাঝে মধ্যেই পার্টি অফিসে আসে। তবে সুচিতা বলে একটি মেয়ে আমার কাছে আজকাল প্রতিদিনই আসছে। সুচিতা কমিউনিস্ট আদর্শে খুব বিশ্বাসী। পার্টির প্রতি যথেষ্ট আনুগত্য আছে। বাচনভঙ্গি খুব সুন্দর, দেখতেও সুন্দর।

আমার কথার মাঝেই বদ্রু মিঞা বলল, সুনির্মলবাবু আপনার হাতে তুরুপের তাস রয়েছে। আর আপনি সেই তাসটাকে কাজে লাগাতে পারছেন না। সুচিতাকে ব্যবহার করুন। সৌমিত্র বস মেনে যাবে।

আমি অবাক হয়ে বদ্রু মিঞার দিকে তাকিয়ে।

বক্রু মিঞা বলল, বুঝতে পারলেন না তো।

আরে সুচিতাকে সৌমিত্রর পেছনে লেলিয়ে দিন। সে ভালবাসা দিয়ে সৌমিত্রকে বস করবে। তারপর আস্তে আস্তে পার্টিতে টেনে নেবে।

আমি বললাম, রাজনীতির মধ্যে প্রেম? কি বলছেন?

বক্রু মিঞা বলল, অন্যায়টা কোথায়? স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা মনে পড়ে। জাফর পুলিশের তাড়া খেয়ে বেশ্যার বাড়ি ঢুকে রাত্রি কাটিয়েছিল। ওকি সোহাগ করে ওই বেশ্যার সঙ্গে রাত্রি কাটিয়েছিল না পুলিশের হাতে যাতে না ধরা পড়ে তার জন্য। আর সেই সময় যদি জাফর পুলিশের হাতে ধরা পড়ত তখন আমাদের সব প্ল্যান ভেস্তে যেত। কমিউনিস্ট আন্দোলনকে সুদৃঢ় করতে গেলে এরকম অন্যায় পদক্ষেপ তো নিতেই হবে।

আমি দেখলাম বক্রু মিঞার কথায় অনেকেই সায় দিল। আর সেই হল কাল। যে জন্য আজ ওই উন্মাদিনী রাস্তার একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত ছুটে বেড়ায়।

আমি বুঝলাম ভদ্রলোকের ভাল নাম সুনির্মল আর ওই উন্মাদ মহিলাই সুচিতা।

আমি বললাম, তারপর।

সুনির্মল বাবু বললেন, আপনি কি সত্যিই শুনবেন। বিরক্তবোধ করবেন না তো।

আপনি বলুন। আমি শুনছি। বললাম।

(৩)

একদিন সন্ধ্যার সময় পার্টি অফিসে বসে আছি, সুচিতা এসে বলল দাদা কাল কাটোয়ায় মিটিং আছে যাবে না?

আমি বললাম, পাঁচ-সাতজন গেলে ভাল হবে না, বেশ কিছু লোক নিয়ে যেতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু আমাদের গ্রাম থেকে বেশি লোক নিয়ে যাবার সুযোগই নেই। তাই ভাবছি কি করি।

সুচিতা বলল, সত্যি দাদা, আমাদের গ্রামে পার্টির সংগঠনকে কিছুতেই শক্তিশালী করতে পারছি না। কেউ পার্টি নিয়ে মাথা ঘামায় না। ভোটের সময় যখন যেদিকে হাওয়া সেইদিকেই ভোট দেয়। কিন্তু ক্যাডারভিত্তিক যে ভোট সেটা আমরা পাই না। আমার মনে হয় আমরা এখানে ঠিকমত এগোতে পারছি না।

আমি বললাম, সৌমিত্রকে যদি আমরা পার্টিতে টানতে পারি তবে ওর সঙ্গে ওর বন্ধুরাও চলে আসবে।

সুচিতা বলল, কিন্তু সৌমিত্রকে টানাটাই তো মুশকিল।

আমি বললাম, সুচিতা তুমিই পারো। হ্যাঁ একমাত্র তুমিই পারো সৌমিত্রকে পার্টিতে টানতে।

সুচিতা বলল, দাদা তুমি সত্যিই আজ খুব ভুলভাল বকছ।

আমি বললাম, কোন ভুল বকছি না। শোন তুমি ওর স্কুলে পড়াতে আরম্ভ কর। পড়ানোটা লোক দেখানো। সৌমিত্রকে পার্টিতে টানাটাই তোমার উদ্দেশ্য।

সৌমিত্র যুবক। অল্প বয়সে বাবাকে হারিয়েছে। মায়ের ভালবাসা ছাড়া কিছুই পায়নি। তুমি ওকে ভালবাসা দিয়ে বস কর। তারপর আস্তে আস্তে পার্টিতে টেনে নেবে। একবার লালছাপ মেরে দিতে পারলে কোনদিনের জন্য ও আর অন্য রঙ চিনবে না।

সুচিতা বলল, দাদা একি বলছ?

আমি বললাম, তুমি তো শুধু ভালবাসার অভিনয় করবে। তোমার জানা উচিত, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় জেলে বন্দীদের খবর পাচার করার জন্য তখনকার মতো সমাজে বিধবারা সধবার মত হাতে শাঁখা, নোয়া, কপালে সিঁদুরের টিপ পরে বন্দীর বউ সেজে জেলে যেত। যা ভাবাই অসম্ভব ছিল।

সুচিতা বলল, দাদা তুমি আমাকে এ ভার দিও না। আমি যদি অভিনয় করতে করতে সত্যিই জড়িয়ে পড়ি।

আমি বললাম, ক্ষতির কিছু নেই তো, সৌমিত্র লেখাপড়া জানা ভদ্র পরিবারের ছেলে।

সুচিতা উদ্বেগের সঙ্গে বলল, না না, দাদা আমাকে এ ভার দিও না। আমি পারব না।

আমি ওকে বললাম, যদি সত্যিই পার্টিকে ভালবাস তবে পার্টির স্বার্থে তোমার এ ভার নেওয়া উচিত।

(৪)

শুরু হল সুচিতার নতুন অধ্যায়, সৌমিত্র যে স্কুলে পড়ায় সেই স্কুলে পড়াতে আরম্ভ করল। সুচিতার লক্ষ ছিল সৌমিত্রকে পার্টিতে টানা। আর এই জন্যই ও সব সময়ই সৌমিত্রর সঙ্গী হয়ে কাজ করত।

এইভাবে কিছুদিন চলার পর সুচিতার প্রতি সৌমিত্রর টান পড়ে গেল। সৌমিত্র সুচিতার প্রতি মোহগ্রস্ত হতে লাগল। সৌমিত্রর মনে ভালবাসার সঞ্চার হল।

গ্রামের ব্যাপার, বোঝেন তো। অনেকে কটু মন্তব্যও করতে লাগল। লেখাপড়া হচ্ছে না প্রেম হচ্ছে।

সুচিতা ইচ্ছা করেই মাঝে মধ্যে সৌমিত্রকে একা ফেলে স্ট্রিটকর্নারে যেত।

সৌমিত্র সুচিতাকে না দেখতে পেয়ে পরের দিন সুচিতাকে অভিমান করে বলত কাল কোথায় গিয়েছিলে যে তোমাকে কোথাও দেখতে পেলাম না। আমি তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেলাম।

সুচিতা বলত, পার্টি মিটিং ছিল। তাই যেতে হয়েছিল। তুমি যাবে কি যাবেনা, তাই না বলে একা একা চলে গিয়েছিলাম।

দু-চারবার এরকম হবার পর থেকে সৌমিত্রই সুচিতার সঙ্গে পার্টি মিটিং-এ যেতে লাগল। সৌমিত্রর সঙ্গে সঙ্গে ওর বন্ধুরাও পার্টির মিটিং-এ মিছিলে যেতে লাগল। গ্রামের মধ্যে পার্টির সংগঠন জোরদার হতে লাগল।

সৌমিত্র মার্ক্স, লেনিন, এ্যাঞ্জেলসের আত্মজীবনী পড়া শুরু করল। বামপন্থী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হল। এখন আর সুচিতাকে মনে করিয়ে দিতে হয় না যে কোথায় কোথায় মিটিং ছিল আছে। সৌমিত্র নিজেই সুচিতা বলার আগেই তৈরি হয়ে আসত।

উনিশো আটষট্টি সাল। সারা বাংলায় বামপন্থী আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। বাংলা জুড়ে মিছিল, মিটিং হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এই বামপন্থী আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেছে। কাটোয়ার কাশিরাম দাস কলেজের কাছে স্ট্রিট কর্ণার ছিল। প্রচুর লোক জড়ো হয়েছিল। সুচিতা বক্তৃতা দিচ্ছিল। পাশেই সৌমিত্র বসেছিল। হঠাৎ কয়েকজন দুষ্কৃতী ইট মেরে সুচিতার মাথা ফাটিয়ে দেয়। সুচিতা মাথায় হাত দিয়েই বসে পড়ে। এই দেখে সৌমিত্র আর থাকতে পারেনি ও লাউড স্পিকারের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে আরম্ভ করল :

'বন্ধুগণ, আপনারা প্রত্যক্ষ করলেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য অত্যাচার শুরু করে দিয়েছে। আমাদের ক্যাডারের মাথা ফাটিয়ে দিল। ওরা জানে না ভয় দেখিয়ে আন্দোলনকে স্তব্ধ করা যায় না। গণতান্ত্রিক দেশে আন্দোলন করার অধিকার সবার আছে। ওরা মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে। কিন্তু গণতান্ত্রিক রীতি-নীতিকে ভয় পায়। ওরা জোর করে অধিকার বজায় রাখতে চায়। কিন্তু জোর করে কোনদিনই ক্ষমতা ধরে রাখা যায় না। এটা ভারতবর্ষ। এদেশের মানুষ চিরকাল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এসেছে। খুন করে আন্দোলন থামানো যায় না। ওরা জানে না, একটা ক্যাডারের রক্ত যে মাটিতে পরে সেই মাটিতে একশ ক্যাডার জন্ম নেয়। ওরা কাপুরুষ। ওরা পেছন থেকে আঘাত করে। সামনে এসে প্রতিবাদ করার সাহস নেই। আমাদের লড়াই বাঁচার লড়াই। ভয় পেলে চলবে না। মৃত্যুর ভয়ে আন্দোলনকে থামানো চলবে না। মনে রাখবেন আমরাই একদিন এতবড় ব্রিটিশ সরকারকে দেশ থেকে তাড়িয়েছি। ভয় পেয়ে অন্যায়কে কোনদিন প্রশ্রয় দেব না। আপনারাই শক্তির উৎস। আপনারাই জয়ের প্রতীক। আসুন আমরা সকলে মিলে প্রতিজ্ঞা করি,

বর্ধমানের লাল মাটি যদি আমাদের রক্তে আরও লাল হয় তাতেও আমরা ভয় পেয়ে আন্দোলন থামাব না। আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবই। জয় আমাদের হবেই হবে।

সৌমিত্রর সেই জ্বালাময়ী ভাষণ আমার আজও মনে আছে। মনে মনে সেদিন সুচিতাকে সাবাস জানিয়ে ছিলাম। অনুভব করেছিলাম মেয়েটার মধ্যে পার্টির প্রতি আনুগত্য অপরিসীম। একটা ভিন্ন মতাবলম্বীকে কমিউনিস্ট আদর্শে অনুপ্রাণিত করার জন্য তিল তিল করে নিজের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়েছিল।

(৫)

উনিশো সত্তর সাল। সারা বাংলা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য খুনের রাজনীতি চলছে। বিভিন্ন জায়গায় বহু ছেলে খুন হচ্ছে। আমাদের গ্রামেও তার ছাপ পড়ল। আমরা ভয়ে ভয়ে রাজনীতি করছি। কখন কি হয় এই ভয়ে সবাই সজাগ হয়ে চলাফেরা করছি।

একদিন রাত্রিরে সৌমিত্রর মা সৌমিত্র কোথায় গেছে খোঁজ নেবার জন্য আমার বাড়িতে এল। আমি কিছুই জানি না। তাই ওর মাকে বললাম, হয়তো আশেপাশে কোথাও গেছে, ঠিক চলে আসবে। আমার কথামত ওর মা চলে গেল।

আমার মনে সন্দেহ হল। কারণ বেশ কিছুদিন ধরেই পার্টির অনেকেই সৌমিত্র আর সুচিতার এই ভাব-ভালবাসা ভাল চোখে দেখছে না। আমি সুচিতাকে দিয়ে সৌমিত্রকে পার্টিতে আনতে গিয়ে, দুজনকেই পার্টি হারাতে বসেছে। ভাবলাম, এদের মধ্যে যদি বিচ্ছেদ ঘটানো যায়, তবে সুচিতা আবার আগের মতো সক্রিয়ভাবে পার্টি করবে। আর সৌমিত্র...

তাই ওই রাত্রিতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে সৌমিত্র কোথায় গেছে জানার জন্য সুচিতাদের বাড়ি গেলাম। সুচিতাও বলল, ও কিছুই জানে না। শুধু বিকালে পার্টির মিটিং-এর লিফলেট গোপনে বিলি করার জন্য দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে ছিল। লিফলেট বিলি করার পর সৌমিত্র একজনের সঙ্গে দেখা করার জন্য চলে গেছিল, আর আমি বাড়ি চলে আসি।

সন্দেহটা আরও বেড়ে গেল। কিন্তু রাত্রে কিছু করার নেই বলে বাড়ি ফিরে এলাম।

সৌমিত্র আর বাড়ি ফিরল না। পরের দিন সৌমিত্রর ক্ষতবিক্ষত দেহটা একটা পুকুরপাড়ে দেখা গেল।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন করার জন্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্য বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তানকে বিসর্জন দিতে হল। বলতে পারেন গণতান্ত্রিক

দেশে রাজনীতি করার জন্য যারা বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তানকে কেড়ে নিল তাদের কি আখ্যা দেওয়া উচিত?

পুলিস এসে সৌমিত্রর দেহটা তুলে নিয়ে গেল।

আমরা সবাই পার্টি অফিসে জড়ো হয়েছি। সবার মধ্যেই শোকের ছায়া। সুচিতার কি কান্না, দেখা যায় না। ও কাঁদতে কাঁদতে বলছে, দাদা একি হল। আমার জন্যই ওর মৃত্যু হল।

পরের দিন পার্টিঅফিসে, সুচিতা, আমি ছাড়াও আরও তিন-চারজন ছিল। প্রত্যেকের মধ্যেই একটা শোকের ছায়া। আমি সৌমিত্রর মায়ের কথা ভাবছি। সৌমিত্রর মায়ের কি হবে। অল্প বয়সে স্বামীকে হারিয়েছে, তারপর ছেলেকেও হারাল। কি নিয়ে বাকি জীবন কাটাবেন। এমন সময় বেলা বলে এক মহিলা কমরেড আমাকে বলল, দাদা সৌমিত্রকে যারা খুন করল তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কি কিছুই করার নেই। কিছু না বললে ওরা তো একে একে আমাদের সব ক্যাডারকেই শেষ করে দেবে। আমরা কি চুপ করে বসে থাকব। এর কোন প্রতিবাদ হবে না।

আমি কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে আছি। বেলা আবার বলল, যারা সৌমিত্রদাকে খুন করল তাদের কি কোন শাস্তি হবে না। আমরা কি তবে এইভাবেই শুধু মার খেয়ে যাব। তুমি সুচিতাদির দিকটা কি একবারও ভেবে দেখেছো, সৌমিত্রদার মায়ের কথাটাও কি ভেবে দেখেছো।

আমি আর থাকতে পারলাম না। বুকের ভিতরটা হু হু করে উঠল। বললাম, সৌমিত্রর জন্য আমারও খুব কষ্ট হয়। কিন্তু কি করব। আমাদের করারই বা আছে কি। খুনের প্রতিশোধ কোনদিন খুন দিয়ে হয় না। সৌমিত্রর জন্য শুধু দুফোঁটা চোখের জল ফেলা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই। আমরা কমিউনিস্ট। কমিউনিস্টদের মৃত্যু হয় না। আমরা জানি এক কমরেডের মৃত্যু হলে হাজার কমরেড জন্ম নেয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য বহু কমরেডের মৃত্যু হয়েছে। তার হিসাব অনেকেই জানে না। আজ সৌমিত্র নেই, কিন্তু সৌমিত্রর এই আত্মবলিদান আমাদের আদর্শ হয়ে থাকবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যে প্রাণ সৌমিত্র উৎসর্গ করে গেল তা কোনোদিনই মুছে যাবে না।

সুচিতা চুপচাপ একা বসে আছে দেখে ওকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ওর কাছে গেলাম। বললাম, ভেঙে পড়ো না। যা হবার তো হয়েই গেছে। আর তো ফিরে আসবে না। নিজেকে শক্ত কর, মন থেকে সমস্ত মুছে ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে শুরু কর।

হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ ঘটে গেল। সুচিতা উন্মাদের মত চেঁচিয়ে বলে উঠল, আবার নতুন করে, আবার নতুন করে। এবার কাকে, এবার কাকে, বল, দাদা

বল, এবার কাকে।

আমি বললাম, সুচিতা শান্ত হও।

সুচিতা কিন্তু আর কোনদিনের জন্য শান্ত হলনা। ও এবার কাকে, এবার কাকে বলতে বলতে ছুটে পার্টি অফিস থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপর ...

তারপর, গতকাল যা দেখলেন।

সুনির্মলবাবু আর কোন কথা বলতে পারলেন না। চোখ দুটো দিয়ে শুধু টপটপ করে জল ঝরতে থাকল। আমি কিছু না বলে আস্তে আস্তে ওনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম।

আমি সুনির্মলবাবুকে কথা দিয়েছিলাম, এই ঘটনা কোনদিন কাউকে জানাবো না। কিন্তু সেই কথা আমি আর রাখতে পারলাম না।

সতী-সাবিত্রীর দেশ ভারতবর্ষ, এদেশের মেয়েরা কোনদিনই ছলনা করতে জানে না। ওদের অন্তরে অসীম মায়া। তাই অপরের কথামত ছলনা করতে গিয়েও বিবেকের দংশনে নিজেকে বলি দেয়। এদেশের মহান নারীরা, দুর্ভিক্ষের মধ্যেও ক্ষুধার জ্বালা ভুলে গিয়ে নিজের মুখের গ্রাস অন্য ক্ষুধার্তের মুখে তুলে দিয়ে নিজে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সেই দেশে জন্মগ্রহণ করে আমি গর্ব অনুভব করি। আমার জন্মদায়িনী মাও তাদের মধ্যে একজন। সেই দেশের মেয়ে সুচিতা। ওর এই আত্মবলিদান আমার মনে আজও দাগ কেটে আছে।

হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বাস্তবোচিত ব্যাখ্যা—(৪)

মৃত্যুঞ্জয় সিংহ রায়

মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধটা কী?

প্রতিটি মানুষের অন্তরের মধ্যে ষড়রিপুর সঙ্গে মনের যে অহরহ দ্বন্দ্ব চলছে সেই দ্বন্দ্বটাকেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হিসাবে দেখানো হয়েছে। মহর্ষি ব্যাসদেব এই দ্বন্দ্বটাকেই কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ নামে এক রূপক কাহিনীর মাধ্যমে মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। একদিকে অধর্মের প্রতীক কৌরবপক্ষের ষড়রিপুর দাস দুর্যোধনাদি এবং অপরপক্ষে ধর্মের প্রতীক পঞ্চপাণ্ডব বিবেকরূপ কৃষ্ণ এবং মনরূপ অর্জুন ইত্যাদি। অর্থাৎ সত্য-ন্যায় ও ধর্মের সহিত অসত্য ও অন্যায়-অধর্মের দ্বন্দ্ব। এই দুয়ের মধ্যে মানুষ কোন পথে যাবে এই নিয়ে মন দ্বিধাগ্রস্ত। তাই বিবেক মানুষের মনকে কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায়, কোনটা ধর্ম; কোনটা অধর্ম সেইটাই বোঝাবার চেষ্টা করেছেন তার অমৃতবাণীর দ্বারা। সেই বাণীই হচ্ছে গীতা। এখানে কুরুক্ষেত্রকে দেখানো হয়েছে মানবদেহের প্রতীক হিসাবে, কৃষ্ণকে বিবেকের প্রতীক এবং অর্জুনকে মনের প্রতীক হিসাবে দেখানো হয়েছে।

'গীতা কি?'

মহর্ষি ব্যাসদেব রচিত হিন্দুদের একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। গীতা হচ্ছে মহাভারতের একটি বিশেষ অধ্যায় যাকে বলা হয় সর্বশাস্ত্রের নির্যাস। গীতা যেমন সর্বশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র তেমনি মানুষও হচ্ছে সর্বজীবের শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষ মাত্রই কমবেশি ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তাই মহর্ষি ব্যাসদেব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি নিয়ন্তা সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়ে গীতার শ্লোকগুলি ব্যক্ত করিয়েছেন যাতে যুগ যুগ ধরে মানুষ তার মেধাশক্তির দ্বারা সেই শ্লোকগুলির মর্মার্থ অনুধাবন ও অনুসরণ করে মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে পারে।

গীতার কভারপেজে একটি ছবির দ্বারা গীতার গূঢ় অর্থটার প্রকাশ করা হয়েছে। গীতার কভারপেজে থাকে একটি অশ্ববাহিত রথে অর্জুন গাণ্ডীব ত্যাগ করে বিষাদবদনে চিন্তারত। আর কৃষ্ণ রথের সারথিরূপে একহাতে অশ্বের লাগামদুটি ধরে এবং আর এক হাতে একটি চাবুক লইয়া অর্জুনকে বিষাদ ত্যাগ করিয়া কর্মযোগী হতে উপদেশ দিচ্ছেন। এখানে রথটাকে দেখানো হয়েছে মানব শরীরের প্রতীক হিসাবে। কৃষ্ণ হচ্ছেন সেই মানব শরীরের মধ্যস্থিত বিবেক আর অর্জুন হচ্ছেন রথী মানবদেহের মন বা হৃদয়স্বরূপ। রথটাকে পরিচালনা করছে অশ্বের চারিটি পা আর সারথির দুটি হস্ত। অর্থাৎ হাত ও পা মিলে ছয়জনে রথটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আর লাগামদুটি ধরে রথটিকে পরিচালনা করছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। অনুরূপভাবে মানব শরীরকেও পরিচালনা করছে ষড়রিপু।

ষড়রিপুর তাড়নাতেই মানুষ কর্ম করছে তা সে সৎ কর্মই হউক আর অসৎকর্মই হউক। সারথি যেমন অশ্বের লাগামদুটি ধরে রথটিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে সেইরূপ মানুষের শরীরের মধ্যেও বিবেক নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসরূপ লাগামদুটির দ্বারা ষড়রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন যাতে মনরূপ অর্জুনকে ষড়রিপু বিপথগামী করতে না পারে। ষড়রিপুকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই বিবেক মনকে সৎ উপদেশ দিয়ে সৎ কাজে লিপ্ত হবার প্রেরণা দিচ্ছেন, যাতে মানুষ ষড়রিপুর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে নরকগামী না হয়। তাই বলছি সত্যাশ্রয়ীগণ পুরোপুরি ষড়রিপুর দাস না হয়ে বিবেকের শাসন মেনে চলো। একমাত্র বিবেকই তোমায় সত্যের ও ধর্মের পথে নিয়ে যাবে। কিন্তু সেই বিবেকের টুঁটি টিপে তুমি যদি লাগামছাড়া ভোগবিলাসে গা ভাসিয়ে দাও তাহলে তোমার দুর্গতির শেষ থাকবে না।

তাহলে ষড়রিপুর হাত হতে মুক্তির পথটা কী?

যোগ ও প্রাণায়ামের দ্বারা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে পারলেই মানুষের লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা ধীরে ধীরে কমবে এবং ভোগজনিত জরা-ব্যাধি হতে মুক্তি পাবে। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অর্জুনকে উদ্দেশ করে বলেছেন—"সখা, ভোগী না হয়ে বিষাদ ত্যাগ করে কর্মযোগী হও। যোগীরাই একমাত্র ত্যাগী এবং সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে পারেন, বিপদকালেও তারা কখনও বিষণ্ণ হন না।" তাহলে আমরা গীতায় কি দেখছি? গীতা হচ্ছে এক যোগসন্দেশ। এই যোগসন্দেশের যোগী হচ্ছেন আমাদের দেহস্থিত বিবেকরূপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি আমাদের অন্তরের মধ্যে বসে আমাদেরকে সদাই সৎপথে চলার উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। সেই উপদেশ কেউ শুনছে আবার অনেকে শুনছেও না। যারা শুনছে বা বিবেকের নির্দেশ মানছে তারা সুখসাগরে ভাসছে আর যারা মানছে না বা শুনছে না তারা দুঃখসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে, নানান দুর্গতি ভোগ করছে। তাই প্রতিটি মানবদেহই হচ্ছে মন্দির-মসজিদ বা গির্জাস্বরূপ। আর এই দেহের মধ্যেই বসে আছেন বিবেকরূপ ঈশ্বর যাঁকে কেউ ডাকে কৃষ্ণ বলে, কেউ ডাকে আল্লা বলে আবার কেউবা ডাকে গড বলে। তাই মানুষকে আঘাত মানেই দেহস্থিত ভগবানকেই আঘাত করা। এই হুঁশ বা বোধশক্তিটা যাদের মধ্যে আছে তারাই প্রকৃত মান + হুশ = মানুষ।

আজ ষড়রিপুর তাড়নায় এক রাষ্ট্র আর এর রাষ্ট্রের উপর দাদাগিরি বা কর্তৃত্ব করতে চাইছে। এরই প্রলোভনে পড়ে পারমাণবিক শক্তিকে অস্ত্র করে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি পৃথিবীকে ধ্বংস করার মহাযজ্ঞে মেতে উঠেছে। তাই আজ প্রতিটি পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রকে চিন্তা করতে হবে এই মহাশক্তিকে তারা কোন কাজে লাগাবে? মন্দির-মসজিদ-গির্জা ধ্বংস না মানবকল্যাণে?

গীতায় আরো একটি শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বলেছেন—"স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম ভয়াবহঃ।" এই শ্লোকটির আমরা আক্ষরিক মানে করি এইভাবে যে, স্বধর্ম মানে নিজের ধর্ম, যেমন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-ইসলাম ইত্যাদি। আর পরধর্ম মানে নিজের ধর্ম ছাড়া অন্য যে সব ধর্ম আছে তাকে কিন্তু এর বাস্তবোচিত ব্যাখ্যাটি হল—স্বধর্ম বলতে মানুষ জন্মাবার পর হতে মানুষের সহজাত যে দুটি প্রধান ধর্ম মন ও প্রাণ যারা আমৃত্যু ফলের আশা না করে কর্ম করে যায় তাকে বোঝানো হয়েছে অর্থাৎ মনের সঙ্গে প্রাণের অচ্ছেদ্য বন্ধনে, যে বন্ধনটা একমাত্র শিশুকালেই থাকে। একটা মানুষের মধ্যে যদি এই বন্ধনটা চিরকাল থেকে যায় তাহলে তার মধ্যে কোনো পাপ প্রবেশ করতে পারে না। সারা জীবনটাই সে শিশুসুলভ থাকে যেমন, রামকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য ইত্যাদি। মনের সঙ্গে প্রাণের মেলবন্ধনই হচ্ছে স্বধর্ম। আর পরধর্ম হচ্ছে পরবর্তী ধর্ম অর্থাৎ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি হবার পর যে ধর্মটা মানবশরীরে আশ্রয় নেয় অর্থাৎ ষড়রিপু। ষড়রিপু মানুষের মনকে সদাই ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। মনকে প্রাণের সঙ্গে এক হতে দেয় না। ষড়ঋতু যেমন প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছে সেইরূপ ষড়রিপুও মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ষড়রিপু না থাকলে মানুষ কর্মযোগী হতে পারত না, সে কর্মবিমুখ জড়পদার্থে পরিণত হত, তাই মানবজীবনে এর যেমন উপকারিতা আছে তেমনি আবার অপকারিতাও আছে। তাই মানুষ যদি অতিরিক্তভাবে ষড়রিপুর দাস হয়ে পড়ে তাহলে কামনা-বাসনা-লোভ-পরশ্রীকাতরতা মানুষকে পাপ পথে টেনে নিয়ে যায় এবং নানান দুর্গতি ভোগ করায় এবং শরীরটাকে নানান রোগের আস্তাকুঁড়েয় পরিণত করে। তাই পরধর্মকে বলা হয়েছে ভয়াবহ।

অন্যদিকে মানুষ যদি কামনা-বাসনা শূন্য হয়ে অর্থাৎ ষড়রিপু মোহমুক্ত হয়ে মনকে প্রাণবায়ুর সাথে যুক্ত করতে পারে তাহলে সে ধীর স্থির ও শান্তভাব লাভ করে মানুষের যে শ্রেষ্ঠ চাওয়া সেই পরমেশ্বরের করুণা লাভ করতে পারে এবং মানবজন্ম সার্থক করে তুলতে পারে তার কৃষ্ণপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে। তাই বিবেক ষড়রিপুর দাসত্ব হতে মনকে মুক্ত করার জন্য উপদেশাবলির চাবুক হস্তে বসে আছেন এবং মনকে অমৃতবাণী শুনিয়ে যাচ্ছেন। অর্থাৎ বিবেকই হচ্ছে আমাদের অর্থাৎ মানুষের পথপ্রদর্শক। তাই বিবেকের অনুশাসন মেনে চলতে গিয়ে যদি মৃত্যুও হয় সেটাও সুখকর। তাই গীতায় বলা হয়েছে, "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ"।

আমাদের সমাজে দু-ধরনের লোক দেখা যায়। এক হচ্ছে সৎলোক। এরা সব সময় সৎপথে চলে ও সত্য কথা বলে। আর এক ধরনের লোক হচ্ছে অসৎ লোক, এরা সব সময় অসৎপথে চলে এবং অসৎ চিন্তা ও অসৎ কর্ম করে। এরা সবসময় চায় সৎলোকের সর্বনাশ করে ছল-চাতুরির দ্বারা লুটেপুটে নিয়ে ভোগসর্বস্ব হতে। সৎলোকেদের অসৎপথে পরিচালিত করে সমাজটাকে

নোংরামিতে ভরিয়ে তুলতে। এটাই এদের ধ্যান ও জ্ঞান। এদের কাছে ভোগই জীবন। কিন্তু ভোগই যে দুর্ভোগের কারণ সেটা এরা বুঝতে পারে জীবনের শেষপ্রান্তে এসে। তাই সৎলোকেরা চায় অসৎ লোকেদের কাছ হতে দূরে সরে থাকতে, কারণ অসৎ লোকেরা চায় ভোগ ও বিলাসিতায় ভরা ভোগ সাম্রাজ্যে বাস করতে। আর সৎ লোকেরা চায় ভোগবিলাসবর্জিত এক স্বচ্ছ আধ্যাত্মিক জগতে থেকে সর্বলোকের মঙ্গল সাধন করতে।

মানুষের মনটা হচ্ছে স্বচ্ছ জলের মতো আয়নাস্বরূপ যার মধ্যে স্বরূপ দেখা যায়। তাই মনকে সৎপথে পরিচালিত করে প্রাণের সঙ্গে মিলন ঘটানোই মানব ধর্ম। কিন্তু ষড়রিপু মনকে প্রাণের সঙ্গে এক হতে দিতে চায় না। তাই ষড়রিপু হচ্ছে মনের শত্রু, যেমন সৎলোকের শত্রু অসৎলোক। অসৎ লোকেরা যেমন সমাজের জঞ্জাল তেমনি ষড়রিপু হচ্ছে মনের জঞ্জাল। আমাদের প্রাণই হচ্ছে ঈশ্বর আর মন হচ্ছে তার পূজারি। পূজারি চায় ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হয়ে তাঁর করুণা লাভ করতে আর ষড়রিপু চায় মানুষকে বিপথগামী করে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে। আর এই দুয়ের মধ্যিখানে বসে আছেন বিবেকরূপ কৃষ্ণ, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস রূপ দুটি লাগাম হাতে উপদেশাবলির চাবুক মেরে মনকে সংযত করতে। যোগ ও প্রাণায়ামের দ্বারা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসকে সংযত করতে পারলেই মন সংযত হবে এবং ঈশ্বরমুখী হবে। মানবমনের এই চিত্রটাই আদিকালের মুনিঋষিদের ধ্যাননেত্রে উদ্ভাসিত হয়েছিল, এরই প্রতিফলন ঘটেছে গীতার কভারপেজে। এককথায় বলা যায় ষড়রিপুকে সংযত করে মানবজীবনকে কিভাবে ভগবৎমুখী করা যায় তারই নির্দেশিকা এই গীতা। গীতা এমনই এক পরম রহস্যময় গ্রন্থ যার গূঢ় অর্থ ও গভীরতা অপরিমিত। এর যতই গভীরে প্রবেশ করা যায় ততই নিত্যনতুন অর্থ উৎঘাটিত হয়। গীতার বাণী মানে মানুষের বিবেকের বাণী, কৃষ্ণের বাণী। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ বাণী দিয়েছেন তা সমগ্র মানবজাতির জন্য। এই বাণী কোন বিশেষ বর্ণ বা ধর্মের জন্য নয়। তাই গীতা পাঠে ধর্ম-বর্ণ বা লিঙ্গভেদের কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই।

উপসংহারে বলা যায়, যদি আমরা সমস্ত ধর্মশাস্ত্রকে দুধের সাগর বলে মনে করি তাহলে গীতা হচ্ছে সর্বশাস্ত্রের সারাৎসার ননীস্বরূপ। মানুষ আজও সেই দুগ্ধসাগরে হাঁসের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে তার আসল রসটুকু আস্বাদনের জন্য।

অয়নান্ত

রবীন্দ্রনাথ বাগ

আজকের সমাজে, অধিকাংশ পরিবারে সন্তানদের মানসিকতা বোঝার ক্ষমতা এক কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিচ্ছিন্ন মানসিক সমস্যার টানাপোড়েনে মা-বাবার সাথে সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত বহু ছেলে-মেয়েদের সম্পর্ক মাঝেমধ্যে এমন জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে যার দরুন বহু পরিবারে সুখ-শান্তি বিলুপ্ত হতে বসেছে। এই অবস্থা আজ যেরূপ, আজ থেকে বছর ত্রিশ আগেও ঠিক এমনিই ছিল।

যদিও আমি কোন মনোবিদ ডাক্তার নই, তবু আমার একান্তই ব্যক্তিগত অভিমত যে এই অবস্থার সূচনার জন্য আমরা সকলেই অল্পবিস্তর দায়ী। সন্তানের অন্যায়-জেদকে প্রশ্রয় দেওয়া—পাশ্চাত্য-সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে ছেলেমেয়ে পরস্পরকে অবাধ স্বাধীনতার মাধ্যমে মেলামেশার সুযোগ করে দেওয়া এবং সর্বোপরি হঠাৎ করে বড়লোক হবার আকাঙ্ক্ষা আজকের যুব সমাজকে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে। এই স্বপ্ন যখন বাস্তবে রূপায়িত হয় না তখন তাদের জীবনে নেমে আসে হতাশা ও অস্থিরতা যা পরে এক মানসিক ব্যাধিতে পরিণত হয়ে তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। আজও যখন আশেপাশে ছেলে-মেয়েদের মানসিক বা পারিবারিক সমস্যার কথা শুনতে পাই তখন স্মৃতির মানসপটে ভেসে ওঠে আজ থেকে ঠিক তেত্রিশ বছর আগেকার এক হতভাগিনী মেয়ের বিচিত্র করুণ কাহিনী—যাকে পারিনি আজও ভুলতে। সেই মেয়েটির স্মৃতির প্রতি ভালবাসা জানিয়ে কিছু ঘটনা, কিছু দিনলিপি সাজিয়ে গল্প আকারে প্রকাশ করতে চেষ্টা করলাম। জানি না আমি কতটা সফল হতে পেরেছি সেটা বিবেচনা করবে পাঠকগণ।

(১)

ডক্টর শম্পা সেনগুপ্ত—এমনই এক বিচিত্র চরিত্রের যুবতী। উচ্ছল প্রাণবন্ত, জেদি কিছুটা অস্থিরমতী, লোক-লজ্জার ভয়ডরহীন দিল্লির এক মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। ওরা চার ভাই বোন। শম্পার দিদির নাম "রাত্রি", ওর ভায়েরা ছোট—বড়টি সুশোভন, ছোটটি স্নেহাশিস। ওদের বাবা চাকুরি করতেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিদ্যুৎ বিভাগে। সেই সময় দিল্লির তিমারপুরে সরকারি আবাসনে ওরা সপরিবারে থাকতো। শম্পা এবং ওর পরিবারের সাথে আমার আলাপ আমার এক সহকর্মীর মারফত ১৯৭৬ সালের কাশ্মীরি গেট দুর্গাপুজোর প্যাণ্ডেলে। আমার বেশ মনে আছে প্রথম আলাপেই বলেছিল আমি কিন্তু "আপনি টাপনি" বলতে পারবো না। আমি তোমাকে তুমি বলবো কেমন! বলেছিল আমার কোন দাদা নেই আজ থেকে তুমিই আমার দাদা। 'সে' দাদা—"ম্যায় তুমহে ইসি নাম পুকারুঙ্গি" ঠিক

হ্যায় না।" সেই হলো শুরু।

ছোটখাটো দেখতে—শম্পা ছিল খুব সুন্দরী, অসম্ভব ফর্সা এবং স্মার্ট ও মনটা ছিল তার অসম্ভব সরল ও খোলামেলা। যার জন্য বহু সময়ে বহু ছেলে ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রায়ই শম্পা বলতো—দাদা আমি কিন্তু ছেলেদের পটাতে ওস্তাদ। তারপর শোনাত কেমন করে ও ছেলেদের সাথে মেশে। মেয়েদের নানান গোপন কথা আমাকে না শুনিয়ে ও যেন স্বস্তি পেতো না। মেয়েরা যে এইভাবে খোলাখুলি কথা বলতে পারে তা শম্পাকে দেখে প্রথম বিশ্বাস হলো। সেই সময় ও একটি বাঙালি ছেলের সাথে চুটিয়ে প্রেম করছে এবং সেই প্রেম স্কুল পড়াকালীন শুরু। ছেলেটি কাজ করতো কেরানির পদে অবশ্য চাকরিটা ছিল সরকারি। ধীরে ধীরে দেখি সেই প্রেমে ভাটা পড়ছে। একদিন সে নিজেই আমাকে বললো, জানো দাদা ও এক সামান্য ক্লার্কের চাকরি করে মাইনে ভয়ানক কম আর শম্পার জীবনের ধ্যানজ্ঞান ছিল—অফুরন্ত অর্থ। ও প্রায়ই বলতো দাদা, ইস্ দুনিয়া মে সব কিছু হ্যায় প্যায়সা — Money is everything. সেই বাঙালি ছেলেটি বহুদিন শম্পার জন্য অপেক্ষা করেছিল কিন্তু শম্পা পিছনে তাকিয়ে চলার মেয়ে ছিল না।

অন্যদিকে, শম্পার দিদি রাত্রির চরিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। শান্ত, মিতভাষী এবং বুঝদার। ইংরাজি ও হিন্দি ভাষায় পারদর্শী দুই বোনই। রাত্রি যখন বি.এস.সি পাশ করে, তখন ওর ইচ্ছা ছিল এম.এ-তে ভর্তি হওয়ার কিন্তু ও মা-বাবার আর্থিক সঙ্গতির কথা ভেবে একটি বেসরকারি সংস্থায় "রিশেপসনিস্টের" পদে চাকুরি শুরু করে। এর কয়েক বছর পর শম্পাও সসম্মানে স্কুলের গণ্ডি পার হয়ে যায়। দুচোখে তখন তার রঙিন স্বপ্ন ডাক্তারি পড়বে। বাড়ির লোকেরাও ওকে বোঝায় যে ডাক্তারি পড়ার খরচ প্রচুর তার ওপর হোস্টেলে থাকতে হবে সুতরাং অন্য কোন বিষয় নিয়ে কলেজে ভর্তি হয়ে যাও কিন্তু ওর সেই একজেদ পড়তে হলে মেডিকেল পড়বো নাহলে পড়বই না। ও কিছুতেই নিজেদের পরিবারের আর্থিক অবস্থার কথা বুঝতে চাইতো না। এইখানেই তফাত দুই বোনের চরিত্রের। অবশেষে শম্পার জেদের কাছে পরাজিত হয়ে ওর বাবা শম্পাকে মিরাটের মেডিকেল কলেজে ভর্তি করে দেন। অবশ্য এটাও ঠিক যে ও অসম্ভব মেধাবী ছাত্রী ছিল সেই জন্য মা-বাবার সব থেকে আদরের ও স্নেহের প্রার্থী ছিল। শুরু হলো ওর জীবনের এক নতুন অধ্যায়। শুরু হলো লাগামহীন হোস্টেলের উদ্দাম জীবনযাত্রা।

মাত্র কুড়ি বছরের সদ্য যৌবন উত্তীর্ণা শম্পা কোথা থেকে পেয়েছিল এমন সাহসি মনোভাব তা ভগবানই বলতে পারবেন। যেমন তার মনটা ছিল নরম তেমনিই ছিল দিলদরিয়া। ওই সময় ওর বাবা ওকে মোটা হাতখরচা দিতো।

ওনার সেই সময় আর্থিক অবস্থার খানিকটা উন্নতি হয়েছে কারণ তিনিও সেইসময় অফিসে একটি প্রোমোশন পেয়েছেন। শম্পার পার্সে সব সময় বেশ টাকা-পয়সা থাকতো। দিল্লির জুন মাসের দুপুর। প্রচণ্ড "লু" চলছে, কার সাধ্য বাইরে বেরোয়, আমিও সেদিন অফিস যাইনি। ওই দুপুরে আমাদের কাশ্মীরি গেটের বাড়িতে শম্পা এসে হাজির। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি ব্যাপার এত গরমে। দেখলাম ও উত্তরটা এড়িয়ে গেলো। আমিও আর বেশি কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেলাম না। আমার বউদি ওকে ঘোলের শরবত এনে দিলো, খেয়েই উঠে পড়লো বললো আমাকে বাসস্ট্যান্ডে ছেড়ে আসতে। সুতরাং অত গরমে চললাম শম্পাকে বাসে উঠিয়ে দিতে।

সত্তর দশকে কাশ্মীরি গেটের বাসস্টান্ড যেতে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডও পড়তো এবং তার পিছনে ছিল এক অভিজাত শীততাপনিয়ন্ত্রিত রেস্তোরাঁ, নাম ছিল "কার্লটন রেস্টোরেন্ট"। ছোটবেলায় স্কুল থাকতে আমরা প্রতিদিন ওর সামনে দিয়ে মাঠে খেলতে যেতাম, দেখতাম বড়লোকের ছেলেমেয়েরা গাড়িতে করে এসে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে দরজা খোলা হলে মধুর সংগীত ভেসে আসতো। শুনতাম রাত্রে নাকি ক্যাবারে ডান্স হয়। যাই হোক সামনে দিয়ে যাবার সময় শম্পারানির ইচ্ছা হলো ওই রেস্তোরাঁতে কিছু খাবে।

মাসের শেষ আমার পকেট গড়ের মাঠ। লজ্জায় শম্পাকে জানালাম আমার সঙ্গতির কথা এবং বললাম শম্পা খেতে অনেক টাকা লাগবে যে। ও বললো— দাদা ডোন্ট ওরি। ম্যায় হুঁ না, ফিক মত করো, চলো অন্দর চলতে হে। বলতে দ্বিধা নেই সেই প্রথম ওর দৌলতে এক শীততাপনিয়ন্ত্রিত হোটেলে খেলাম। বেশ মনে আছে—শম্পা মেনু দেখে আনিয়েছিল দুটো এগফ্রাই সঙ্গে চিজ্ স্যান্ডুইচ—চিকেন শিককাবাব এবং অরেঞ্জ জুস। বিল হলো দুশো টাকা। সঙ্গে সঙ্গে পার্স থেকে টাকা বার করে বেয়ারার টিপসও দিয়েদিল। আলো অন্ধকারে মধুর সংগীতের মধ্যে খাওয়া আমার কাছে যেন স্বর্গপ্রাপ্তি। যে দৃপ্ত পদক্ষেপে শম্পা সেই অভিজাত হোটেলে ঢুকেছিল সেদিন মনে হয়েছিল ও এমনি হোটেল রেস্তোরাতে আসা-যাওয়া করতে অভ্যস্ত, আমার মতো হাঁদা গঙ্গারাম নয়। যখন ও মিরাটের বাস ধরলো তখন বাজে প্রায় চারটে। পরে জেনেছিলাম আমাকে ওই রেস্তোরাতে খাওয়াবে বলেই নাকি পাগলি মেয়েটা দুপুর রোদে জুন মাসের গরমে মিরাট থেকে দিল্লিতে ছুটে এসেছিল। আমি নাকি কোনো সময়ে আসতে যেতে শম্পাকে বলেছিলাম যে আমি কখনও এয়ার-কন্ডিশন রেস্তোরাতে খাইনি। ও সত্যিই আমাকে নিজের দাদা বলেই ভাবতো, নাহলে কেউ কখনও দুপুররোদে মিরাট থেকে দিল্লি ছুটে আসতে পারে।

শম্পাদের বাড়িতে বাঙালি সংস্কৃতির প্রচলন ছিল না। সকলেই হিন্দিতে

কথা বলতো আর আমাদের বাড়ি ছিল পাক্কা বাঙালি বাড়ি। আমি মা বা দিদিরা সকলেই বাংলাতেই কথাবার্তা বলতাম সুতরাং প্রথমদিকে শম্পার কথা বলতে ভারি অসুবিধা হতো। ওর ভাঙাভাঙা হিন্দি মেশানো বাংলা ভাষা শুনতে বেশ ভালোই লাগতো। শেষে আমার মা ও দিদিরা ওকে বললো শম্পা তুমি হিন্দিতে কথা বলো আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। শম্পা ছিল ভয়ানক অস্থিরমতী মেয়ে তার ওপর জেদি। হঠাৎ হঠাৎ এমন সব কাণ্ড করতো যা ভাবাই যায় না। এই আমাদের বাড়ি এলো বললো রাত্রে খাবো—মাসিমা তুমি মাংস রাঁধো। আমি ছুটলাম বাজারে মাংস কিনতে যখন বাজার থেকে ফিরলাম দেখি শম্পা মিরাট ফিরে গেছে, বলে গেছে কি একটা জরুরি কাজ মনে পড়ে গেছে। কিন্তু ওর সরলতার কাছে আমি হেরে যেতাম, রাগ করতে পারতাম না।

শম্পা চিরদিনই পড়াশুনায় ভাল তাই ভাল ফলাফল করে মেডিকেলে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করলো। তখন থেকেই জেদ করতো আমাকে ও হোস্টেলে নিয়ে নিজের কলেজের বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে আলাপ করিয়ে দেবে। আমি নিজেই এড়িয়ে যেতাম কারণ আমার স্বভাবই বড়ই অন্তর্মুখী তারপর মেয়েদের সাথে কথা বলতে আমার কুণ্ঠাই বোধ হতো, যদিও আমি কো-এডুকেশনে পড়া ছেলে। তাই এক রবিবার রওনা দিলাম শম্পার হোস্টেলের উদ্দেশে মিরাটে। সঙ্গে নিলাম শম্পার কিছু ফরমাশ অনুযায়ী জিনিসপত্র এবং অবশ্যই ওর প্রিয় মিষ্টি জিলিপি। অবশ্য উত্তর ভারতে এর নাম "জলেবি"। সকাল দশটার সময় হোস্টেলের গেটে পৌঁছে গেলাম। মেয়েদের হোস্টেল সুতরাং বিনা অনুমতিতে ভিতরে ঢোকা নিষিদ্ধ। সুতরাং রিশেপসন থেকে ফোন করে ওর অপেক্ষায় বসে রইলাম।

কিছু বাদে হইহই করতে করতে পাঁচ-ছয়জন বান্ধবীর সাথে আমার প্রিয় —"শম্পা" এসে হাজির। ভারি সুন্দর দেখতে লাগছিল শম্পাকে। টকটকে লাল রঙের নাইটির মধ্যে দিয়ে ওর ভরা যৌবন প্রস্ফুটিত হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। মনে হলো স্বর্গের কোন অপ্সরা শাপগ্রস্তা হয়ে মর্ত্যে আমার সামনে অবতরণ করলো। চিরদিন যাকে ছোট বোন হিসাবেই দেখেছি—তার এই অপরূপ দেহবল্লরী দেখে লজ্জায় মাথা নীচু করেই রইলাম। অবশ্য শম্পার সেইদিকে দেখলাম কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ও আমাকে হোস্টেলে দেখে আনন্দের আতিশয্যে সব লোকলজ্জা ভুলে সকলের সামনেই জড়িয়ে ধরে, আদরে, সোহাগে মুখে চুম্বন করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। এমনই ছিল ভালবাসা প্রকাশ করার ধরন সেই পাগলি মেয়েটির। যাই হোক কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে সে ও তার বান্ধবীরা আমাকে নিয়ে ঢুকলো হোস্টেলের অন্দরমহলে। অবশ্য তার আগেই আমার সঙ্গে আনা জলেবির প্যাকেট ও এবং ওর বান্ধবীরা সকলে মিলে খেয়ে শেষ করেছে।

আমার দিকে তাকিয়ে শম্পা মুচকি মুচকি হাসছে, বললো এই জন্যেই তো দাদা তুমি সকলের থেকে আলাদা। হাত ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কলেজ ও হোস্টেল দেখাল। একটি ছেলেকে ডেকে ম্যাটিনি শোয়ের সিনেমার টিকিট আনতে বললে। বেশ কিছুক্ষণ ও বা ওর বান্ধবীরা গল্প করলো আমার সাথে কিন্তু আড্ডা জমলো না কারণ—এক আমি একদম কথাবার্তা বলতে পারি না, দ্বিতীয়ত বয়েসের একটা ব্যবধান থেকেই যায়। শম্পার সাথে ওর হোস্টেলেই লাঞ্চ সারলাম তারপর প্রায় গোটা ১৪ কিংবা ১৫ জনের বন্ধু-বান্ধবীদের দল নিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চললো সিনেমা দেখতে। সেই সময়কার রোমান্টিক হিট সিনেমা "ভিগি রাত" অশোককুমার মীনা কুমারী ও প্রদীপকুমার। ওই সিনেমা দেখতে গিয়ে শম্পার চরিত্রের আরেকটা দিক দেখতে পেলাম। সেই মুহূর্তে শুরু হলো সিনেমার সেই বিখ্যাত গান—"দিল—যো নহা, কেহা সকা—বহি রাজে দিল"—শম্পা ও তার বন্ধু-বান্ধবীরা পাল্লা দিয়ে সেই গান গাইতে লাগলো আর তার মাঝে মাঝে—অশ্লীল বাক্যালাপ ও ঘন ঘন মুখে সিটি বাজাতে লাগলো। যদি না সেদিন ওদের সাথে সিনেমা দেখতে যেতাম আমি কোন দিনও জানতে পারতাম না যে যুবতী মেয়েরাও ওইভাবে ছেলেদের মতন অশ্লীল হাসি-ঠাট্টা করতে পারে। ভাবছিলাম এরাই হবে আগামী দিনের হবু ডাক্তার।

এরপরও বহুবার দেখাসাক্ষাতের জন্য শম্পার হোস্টেলে গিয়েছি কিন্তু প্রথমবারের অভিজ্ঞতা আজও ভুলতে পারিনি। আজও সেই সুখস্মৃতি আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। মাঝে মাঝে যেন সে আমার কানের কাছে গুনগুন করে, বলে দেখলে তো দাদা আমি কি রকম মেয়ে।

আরেকটি ঘটনার কথা মনে আছে—সে যে সত্যিই অস্থিরমতী এবং দুঃসাহসিক ছিল তারই একটা নমুনা জানাই। তখন শম্পা তৃতীয় বর্ষের মেডিকেলের ছাত্রী। পড়াশুনার প্রচণ্ড চাপ সুতরাং আমাদের কাশ্মীরি গেটের বাড়িতে প্রায় মাস দুই অনুপস্থিত। ও পড়াশুনোয় কখনই ফাঁকি দেয়নি। তখন ঘরে ঘরে মোবাইল ফোন আসেনি আর আমাদের বাড়িতে সেই সময় কোন টেলিফোন ছিল না সুতরাং অনেকদিন শম্পার কোন খবরাখবর পাইনি। তার ওপর সেই বছর অসম্ভব বৃষ্টি এবং বন্যার দরুন দিল্লি ও মিরাটের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। প্রধানত রেল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। দিনটা ছিল রবিবার। তিন-চারদিন আগে দিল্লিতে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়ে গেছে তখনও শম্পা আমাদের পাশে আসেনি। ঝোড়ো বৃষ্টি বইছে সকাল থেকে। কোন রকমে বাজার করে ঘরে এসে বসেছি। হ্যাঁ একটা কথা বলা দরকার যে ওই সময় কাশ্মীরি গেট দিল্লির একটি বাঙালি পাড়া বলেই গণ্য হতো এবং বেশীরভাগ বাঙালীর বাড়িতে রবিবার খাওয়া মানে—'মাংস ভাত' কব্জি ডুবিয়ে খাওয়া। বৃষ্টি অবিরাম গতিতে

বর্ষণ করে চলেছে।

আমার মা ভয়ানক ভাল আমিষ রান্না করতে পারতেন এবং দিল্লির বহু অংশে ওনার হাতে রান্না করা মাংসের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল এবং প্রতি রবিবারই কোন না কোন অতিথি মাংস না খেয়ে যেতো না। বাড়ির রান্নাঘরটা ছিল সদরদরজার পাশে সুতরাং সেই রবিবারও মা মাংস রাঁধছিলেন আর তার সুগন্ধ ম ম করে বাইরে ছড়িয়ে পড়ছিল। সকাল তখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে হঠাৎ খুব জোরে তিন-চারবার কড়ানাড়ার শব্দ। ভাবলাম এত দুর্যোগের মধ্যে আবার কোন অতিথি এলো। তারপরেই শুনতে পেলাম সেই পরিচিতি বাংলা-হিন্দিতে মেশানো মিষ্টি ডাক—আরে, ভাই দাদা। দরওয়াজা তো খোলো—দিদি ম্যায়, ভিগ রহী হুঁ—আরে এ যে শম্পার গলা—তাড়াতাড়ি দরজা খুললাম—ওকে দেখে আমি তো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে চেয়ে রইলাম—সে এক অনন্য রূপে ধরা দিল। বৃষ্টির ফোঁটাগুলো ঠিক ভোরবেলায় ঝরে পড়া শিউলি ফুল হয়ে ওর খোলা চুলের মধ্যে যেন পড়ে রয়েছে। সালোয়ার কামিজ তার শরীরে লেপটে আর মাটি ও কাদায় মাখামাখি হয়ে তাকে এক মোহময়ী করে তুলেছে—হঠাৎই মুখ থেকে কবিগুরুর কয়েকটা লাইন মুখে এসে গেলো—

"আজি ঝরো, ঝরো মুখর বাদল দিনে/জানিনে, জানিনে/কিছুতে কেন যে মন লাগে না/এই চঞ্চল সজল পবনে বেগে, উদভ্রান্ত মেঘে মন চায়/মন চায় ওই বলাকার পথখানি নিতে চিনে/মেঘমল্লার সারা দিনমান/বাজে ঝরণার গান।।" সেই একবারই দেখেছিলাম শম্পাকে আর পাঁচটা বাঙালি মেয়েদের মতন লজ্জায় মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকতে।

পরক্ষণে সে চিরাচরিত প্রথায় হাঁকডাক শুরু করলো। দাদা গানা বন্ধ করো। দিদি মুঝে পহনে কে লিয়ে শাড়ি দো। মাসিমা আমি কিন্তু মাংস খেয়ে যাবো, বাইরে থেকেই আমি মাংসের খুশবু পেয়েছি। দুপুরে ভাত মাংস খাওয়ার পর ও দিদিদের সাথে জমিয়ে আড্ডা দিতে শুরু করলো। বৃষ্টি অবিরাম ধারায় বয়ে চলেছে তার ওপর ঝোড়ো হাওয়া, রাস্তা জনমানবহীন, আমি শেষমেশ থাকতে না পেরে অন্য ঘরে গিয়ে শম্পাকে বললাম কি ব্যাপার বলো তো—এত ঝড়-বৃষ্টি বাস-ট্রেন বন্ধ, সেখানে তুমি মিরাট থেকে দিল্লি এলে কোন সাহসে?

শম্পা তখন বললো জানো দাদা আজ ভোরবেলা থেকে তোমাদের সকলকার কথা না জানি কেন ভয়ানক মনে পড়ছিল তাই সঙ্গে সঙ্গে কলেজের এক বন্ধুকে বললাম সে নিজেই মোটরে করে মিরাট থেকে গাজিয়াবাদ ছেড়ে দিয়ে গেলো। ওখান থেকে ভিজতে ভিজতে মাইল তিনেক হেঁটে এসে দিল্লির বাস ধরলাম। পরমুহূর্তে বাচ্চা মেয়ের মতন আমার মায়ের কোলে শুয়ে পড়ে বললো, বলো না মাসী আমি কি কিছু অন্যায় করেছি। এমন সরল মনের

মেয়েকে কে না ভালবেসে থাকতে পারে।

সকলে মিলে বর্ষার বিকেলে জমিয়ে আদা-চা ও মায়ের হাতে তৈরি পেঁয়াজি খাওয়া হলো, বৃষ্টির বেগটা তখন খানিকটা কমেছে, মা বললো শম্পা এইবেলা বৃষ্টিটা একটু কমেছে, তিমারপুরে মা-বাবার কাছ থেকে ঘুরে এসো, দাদা তোমাকে ছাতা নিয়ে বাসে বসিয়ে দিয়ে আসবেখন। ওমা, শম্পা দেখি বেশ উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠলো—না-না, মা-বাবার সাথে এখন আমি দেখা করতে যাবো না। আমি খালি তোমাদের সাথে দেখা করতে এসেছিলাম আমাকে গাজিয়াবাদে ছেড়ে দিয়ে এসো। অগত্যার গতি ছাতা নিয়ে বোনটিকে ছাড়তে চললাম কখনো বাসে কখনো বা জলকাদায় হেটে দিল্লির বর্ডার পার করে যখন গাজিয়াবাদ থেকে মিরাটের বাসে শম্পাকে তুলে দিলাম তখন রাত আটটা বাজে। এই ঘটনাকে আমি শম্পার দুঃসাহস বলবো নাকি তার অদম্য জেদ। নাকি নিছক আন্তরিক ভালবাসার টান।

আমি আগেও উল্লেখ করেছি শম্পা চিরদিনই একটু খামখেয়ালি ও অবুঝ মেয়ে। একবার কোন ব্যাপার ওর মাথায় ঢুকে গেলে যতক্ষণ না তার সমাধান সে করতে পারছে ততক্ষণ সে চুপ করে বসে থাকার মেয়ে নয়। সেই ঘটনার কথা মনে হলে আজও বুকের মাঝে শিহরন জেগে ওঠে। আমার প্রিয় বড়দির বিয়ে ঠিক হলো কলকাতায়। ততদিনে আমার বাবা মারা গেছেন। সুতরাং বিবাহের সব দায়-দায়িত্ব আমার মাথার ওপর। বিয়ের আনুষঙ্গিক জোগাড়যন্ত্র করতে মা ও দুই দিদিকে দিন দশেক আগেই কলকাতায় পাঠিয়ে দিলাম। কিছু দরকারী অফিসের কাজ থাকায় আমি বিয়ের তিনদিন আগে যাওয়া স্থির করলাম। বিয়ের ব্যাপারটা শম্পাকে আগেই জানিয়ে ছিলাম ও খুশিও হয়েছিল। যাই হউক দিদিরা চলে যাওয়াতে দিনের বেলা তো খাওয়া-দাওয়ার কোন ব্যাপার ছিল না, রাত্রে আমার প্রতিবেশী একান্ত আপনজন আমার বাল্যবন্ধু গৌতমের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করতাম। এখানে কিছু কথা না জানালে আমার আত্মীয়সম প্রতিবেশীদের প্রতি অবিচার করা হবে।

আমার জ্ঞান হওয়া থেকে আমি ও গৌতম একই সাথে বড় হয়েছি, একই স্কুলে পড়েছি, একই ক্লাবের হয়ে ফুটবলও খেলেছি। ওরা চার ভাই ও চার বোন ছিল। সকলেই ছিল আমার বড়। ওদের পরিবার চিরদিন আপদে-বিপদে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে গৌতম ও তার স্ত্রী এবং গৌতমের বড়দা ও বৌদি যাকে আমি নিজের মামি বলেই মনে করি আজও। ওনাদের সাহায্য না পেলে হয়ত জীবনের এতটা দুর আসা সম্ভবপর হতো না।

সেদিন অফিস থেকে আমার অফিসারকে বলে বেলা ১১টা নাগাদ বাড়ি এসে গেছি গোছ-গাছ করবো বলে, কারণ পরের দিন সকাল ৮টার সময় আমার

কলকাতার ট্রেন। সুটকেশ গুছিয়ে নিচ্ছি, ঠিক সেই সময় দরজায় জোরে জোরে কড়ানাড়ার শব্দ। দরজা খুলতেই আমি হতবাক। শম্পা কাঁধে বড় একটি ব্যাগ ঝুলিয়ে মিটিমিটি হাসছে। কি দাদা খুব অবাক হয়ে গেছো তাই না? আমি বললাম কি ব্যাপার বলো তো! কোথায় চললে তুমি? শম্পা বললো আমার বড় দিদির বিয়েটা দেখতে ইচ্ছে করছে তাই ঠিক করেছি আমিও তোমার সাথে দিদির বিয়েতে কলকাতায় যাবো। আমি বললাম তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, এখন তো ট্রেনের বার্থ পাওয়া মুশকিল। ও সে সব শুনতে নারাজ বললো, আমাকে একখানা বিনা রিজার্ভের টিকিট কেটে দাও আমি তোমার সঙ্গে বসে বসে কলকাতা চলে যাবো। নিরুপায় হয়ে পাশের বাড়ি থেকে বন্ধুর বৌদিকে ডেকে আনলাম। মামি অনেক বোঝাল কিন্তু শম্পা কিছুতেই বুঝতে চায়না, শেষে কান্নাকাটি শুরু করাতে মামি বললো—খোকা শোন, চেষ্টা করে দেখ যদি রিজার্ভ বার্থ পেয়ে যাস তাহলে সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে যা। অগতির গতি শম্পাকে নিয়ে দিল্লি স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হলাম। ঈশ্বর যাহার সহায় হন সেখানে কারুর কিছু করার থাকে না। সৌভাগ্যবশত একটা বার্থ আমারই বগিতে পেয়ে গেলাম আমার বার্থের ঠিক সামনের বার্থে। সে কি খুশি শম্পা।

স্থির হয়ে বাড়িতে এসে বললাম দেখো শম্পা, দশ-বারো দিনের জন্য আমার সাথে কলকাতায় যাচ্ছো এটা বাড়িতে জানাও এবং মা-বাবার অনুমতি নিয়ে নিও কিন্তু ও বললো কাউকে জানাবার প্রয়োজন নেই, শুধু তুমি দিদিকে খবরটা দিয়ে দিও। রাত্রিকে ফোনে ওর অফিসে জানিয়ে দিলাম ও বিকেলে এলো। দুই বোনে না জানি কি কথাবার্তা হলো যাবার আগে রাত্রি বলে গেলো তোমার সাথে ও যাচ্ছে তাই আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। ফিরলে আমাকে জানিও। রাত্রে শম্পা কোথায় শোবে সে নিয়ে আরেক সমস্যা হলো। আমি বললাম শম্পা তুমি রাত্রে বন্ধুর বৌদির কাছে শুতে যেও, কারণ একটা যুবতী মেয়ের পক্ষে একটা পুরুষ মানুষের সাথে একলা রাত কাটানো ঠিক নয়, আমাকে তো সমাজে থাকতে হবে। ওর সেই বেপরোয়া জেদ রাত্রে আমি তোমার কাছেই শোব। আবার আমি মামির শরণাপন্ন হলাম। মামি ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে শম্পাই বলে উঠলো— দ্যাখো তো মামী। দাদার সাথে শোয়া কি অন্যায় বলো তো? মামি তো হেসে বাঁচে না, অবস্থা দেখে মামি বললো ঠিক আছে খোকা, বোনকে নিয়ে তুই একই ঘরে শুতে যা, আমি গুরুজন বলছি এতে কোন অন্যায় নেই। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম তার পানে। কতখানি মানুষকে বিশ্বাস করলে তবেই এই কথাগুলি বলা যায়।

শুয়ে শুয়ে শম্পা শুরু করলো হোস্টেলের বন্ধু-বান্ধবীদের নানা গোপন কথা। জানালো সে নিয়েছে ওই বয়সেই মদ ও মাদকদ্রব্যের স্বাদ। আমি তো

এক ছাপোষা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। একটি মেয়ে যে অকপটে একটি ছেলের সামনে এভাবে কথা বলতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে, আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে বললে কি দাদা ভয় পেয়ে গেলে নাকি, ভাবছো নিশ্চয়ই শম্পা কতটা খারাপ মেয়ে। আমি বললাম মহারানি এবার শুয়ে পড়ুন, রাত অনেব হলো, কাল সকালেই ট্রেন মনে আছে তো। যতই ওকে কাছ থেকে দেখেছি ততই ওর মনের সরলতার দিকটাই প্রকাশ পেয়েছে। জানি না ও আমার মধ্যে কি এমন গুণ দেখেছিল যার দরুন আমার কাছে মনের অর্গল খুলে দিত।

ওকে নিয়ে কলকাতায় পৌঁছলাম। আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে যা ঘটে থাকে—কে এই সুন্দরী মেয়ে একা একা এক পুরুষের সাথে চলে এলো। বহু কষ্টে সকলকে বুঝিয়ে ছিলাম কিংবা এও বলা যেতে পারে শম্পার মধুর ব্যবহারে ও সকল আত্মীয়স্বজনের মন জয় করে ফেলেছিল। সমস্ত বিয়ে বাড়িতে সকলকার চোখ ওর দিকেই ছিল। ওর মিশুকে স্বভাবের দরুন মনে হচ্ছিল ও যেন তাদের জন্ম-জন্মান্তরের চেনা। আমার বহু আত্মীয় ওকে বাড়ির বউ করার জন্য আগ্রহ দেখিয়েছিল। আমার কাছে শুনে শম্পার সেকি হাসি। দাদা আমিও তাহলে বউ হওয়ার যোগ্য কি বলো? দেখলাম এই বিয়েবাড়িতে এসে এ যেন এক নতুন শম্পা। শান্তশিষ্ট লাজুক মধ্যবিত্ত ঘরের এক নতুন মেয়ে।

দিদির বিয়ের মাসখানেক পর এক সকালে শম্পা একটি ছেলেকে নিয়ে আমার বাড়িতে হাজির। আমার বড়দিও এসে রয়েছে। বললো, মাসিমা তোমার হাতে আলুর পরোটা ও চা খাবো, সেই ভোরবেলা বেরিয়েছি কিছুই খাইনি। তারপর ছেলেটার সাথে আমাদের সকলকার পরিচয় করে দিল—দাদা এ হচ্ছে সন্দীপ মালহোত্রা, আমরা একই সাথে পড়ি, ও আমার খুব ভাল বন্ধু। লক্ষ করলাম ছেলেটির চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে একটু অস্বাভাবিক। বুঝতে পারলাম মাদকাসক্ত। একটু পায়েরও দোষ রয়েছে। খুঁড়িয়ে হাঁটে। যাই হউক চা-জলখাবার খাবার পর শম্পা আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললো যে সন্দীপ খুব ভাল ছেলে কিন্তু "ড্রাগঅ্যাডিক্ট"। দাদা আমি কলেজে শপথ নিয়েছি আমার ভালবাসা দিয়ে ওকে এই ভয়ঙ্কর নেশা থেকে মুক্ত করাবোই। তুমি বলো আমি কিছু কি ভুল কাজ করেছি।

আমি বলেছিলাম শম্পা এইসব কাহিনী সিনেমাতে হয়। তুমি যতটা সহজ ভাবছো সেটা অত সহজ নয়। কে বলতে পারে . বা এটার কি কোন গ্যারান্টি আছে যে নেশা থেকে মুক্ত হয়ে সন্দীপ তোমারই সাথে জীবন কাটাবে। আমি বলি কি এই ব্যাপারে খোলাখুলি মা-বাবা দিদির সাথে কথা বলো, ওনারা যেটা বলবেন সেইরকম করো। শম্পা বললো, বাড়িতে বলেছি কেউ আমার কাজে সাহায্য করতে ইচ্ছুক নয় এবং সকলেই আমার againest-এ, কিন্তু আমি যেটা

ভাল মনে করেছি সেটাই আমি করবো। হয়ত সেদিন আমার কথায় শম্পা মনে ব্যথাই পেয়ে থাকবে কিন্তু যখন সে বুঝতে পারলো তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

আসলে সন্দীপ মালহোত্রা দিল্লির এক ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র সন্তান। বাবার অঢেল পয়সা আর আমি জানি ওই টাকাপয়সাই শম্পাকে আকর্ষণ করেছিল। অনেক বুঝিয়েছি দেখো শম্পা, টাকাটাই এই পৃথিবীতে শেষ কথা নয়—জানই তো একটা প্রবাদ বাক্য—"সুখ চিত্তে—বিত্তে নয়।" যাই হউক শম্পা সন্দীপকে নিয়ে মাঝেমধ্যে আমার কাছে আসতো কখনো বা বই কেনার অজুহাতে কখনো বা জামাকাপড় কিনতে আর আমাকে জোর করে সাথে নিত ওদের প্রেমের রাস্তায় অভিভাবকের ভূমিকা পালন করতে। সত্যিকারের বলতে গেলে ওই সময় শম্পা কিছুটা Infatuation তে ভুগছিল।

এইভাবেই বয়ে যেতে থাকে শম্পার জীবনযাত্রা। ডাক্তারির ফাইনাল ইয়ারে পড়ার চাপের দরুন শম্পা বাড়িতে আসা-যাওয়া কিছুটা কমিয়ে দিয়েছিল। শুনলাম একটু বেশি অস্থিরমতী হয়ে উঠেছে। একদিন দেখা হতে ও বললো, দাদা তুমি সেদিন ঠিক কথাই বলেছিলে। আমি আমার আন্তরিক ভালবাসা দিয়ে সন্দীপকে নোংরা নেশা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করেছি কিন্তু দেখছি ও আমাকে ইদানীং এড়িয়ে চলছে। পরে ওর দিদি রাত্রির কাছে শুনেছিলাম শম্পা কিছুদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছে এবং একাকিত্ব থেকে মুক্তির আশায় মাঝেমধ্যে নিষিদ্ধ ড্রাগ সেবন করছে। মা-বাবা কিছুদিনের জন্য হোস্টেল থেকে শম্পাকে তিমারপুরের বাড়িতে নিয়ে আসে এবং কয়েকদিনের মধ্যে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। যথারীতি শম্পা সসম্মানে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করে এবং ওই সন্দীপ ছেলেটিও পাশ করে বাবার পয়সার জোরে দিল্লিতে একটি আধুনিক চিকিৎসাকেন্দ্র খুলে বসে। শম্পাও মোহন নগরের একটি সরকারি হাসপাতালে—"ইনটারনশিপ" হিসাবে যোগ দেয়। অচিরেই শম্পার হাতযশের দরুন তার নাম ডাক্তারি জগতে ছড়িয়ে পড়ে, যদিও ছিল সে তখন সামান্য ট্রেনি ডাক্তার।

শম্পার যতই চারিত্রিক দোষ থাকুক ও কিন্তু নিজের প্রফেশনে অত্যন্ত সৎ ও ডেডিকেটেড এবং ওর পেশেন্ট বা রুগীরা ওকে ভগবানের মতন বিশ্বাস করতো। আমার বড়দিকেও এই বিশ্বাস করতে দেখেছি। আমার বড়দির বেশি বয়েসে বিবাহ হওয়ার দরুন ও যখন সন্তানসম্ভবা হলো তখন কিছু স্ত্রীজনিত সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং কলকাতা এবং দিল্লির সকল ডাক্তার বলেছিল যে প্রসবের সময় মা কিংবা শিশুর যে কোন একজনের মৃত্যু হতে পারে। আমরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু দিদির স্থির বিশ্বাস ছিল যে ডাক্তার হিসাবে শম্পা এসে যদি ওকে দেখে তাহলে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে। দিদির জেদাজেদিতে শম্পাকে খবর

দিলাম ও তখন নিজের কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত মানুষ। যাই হউক আমার খবর পাওয়া মাত্র ডাক্তার শম্পা সেনগুপ্ত এসে হাজির। ঘর থেকে সকলকে চলে যেতে বলে এবং ব্যাগ থেকে অ্যাপ্রন ও গ্লাভস বার করে পড়ে নেয় তারপর তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে প্রায় ৪৫ মিনিট। তারপর বাইরে এসে মা ও দিদিকে বলে এই সপ্তাহে ডেলিভারি হবে। ভয়ের কোন কারণ নেই আর হ্যাঁ, দিদি তোমার মেয়ে হবে দেখে নিও। আর আশ্চর্যের ব্যাপার তার ঠিক তিনদিন পর দিদির স্বাভাবিক প্রসব হয় এবং একটি সুন্দর ফুটফুটে মেয়ের জন্ম দেয়। আজ সেই মেয়ে এক সুন্দরী আধুনিক যুবতী অর্থাৎ আমার ভাগ্নি—শাশ্বতী একটি বিদেশি কোম্পনিতে উচ্চপদে কার্যরতা। মাঝেমধ্যে যখন শম্পার কথা আলোচনা হয় আমার ভাগনির চোখও ভিজে ওঠে। আজ পৃথিবীতে সকলেই নিজের নিজের কার্যক্ষেত্রে বিরাজমান, নেই আজ শুধু ডাঃ শম্পা সেনগুপ্ত, রয়ে গেছে আমার চারপাশে তার ফেলে যাওয়া সুখস্মৃতি।

সময় কারুর জন্য অপেক্ষা করে না। সে চলমান, বয়ে চলে আপন গতিতে। সুতরাং ইতিমধ্যে শম্পার বড়দি রাত্রির বিয়ে হয় খুব ধূমধামের সাথে আর সেই বিয়েতে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শম্পা কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এত খুশি এর আগে আমি শম্পাকে দেখিনি। এই বিয়ে উপলক্ষ্যে যেন জীবনশৈলীতে শম্পা যেন রাতারাতি অনেক বড় হয়ে গেলো। তখন ওদের পরিবারে সুখের হাওয়া বইছে। ওই সময় ওর ভাই সুশোভন দিল্লির মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয় এবং শম্পার ইনটারনশিপ শেষ হয়ে যায় এবং নিজের যোগ্যতায় গাজিয়াবাদে একটি সরকারি হাসপাতালে গাইনোকলজিস্ট হিসাবে যোগদান করে। মনে আছে সেই চাকরিতে যোগ দেবার আগের রাত্রে ও আমার কাছে এসে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিয়েছিল। মনে মনেই ঈশ্বরকে বলেছিলাম, হে ঠাকুর এবার যেন ওর জীবনধারা সঠিক খাতে বয়। সব সুখেরই পিছনে থাকে দুঃখ বেদনা। জানি না হয়ত শম্পার ভাগ্যলক্ষ্মী সেদিন অলক্ষ্যে হেসে থাকবেন। হাসপাতালের চাকরিতে যোগ দিয়ে ও খুব খুশি। বাড়ি থেকে রোজ হাসপাতালে যেতো। সময়মতন কখন বা দেরিও হতো ফিরতে এটাই ডাক্তারদের জীবনশৈলী।

খুব শীঘ্রই নিজের সহজাত গুণে ও অন্যান্য ডাক্তারদের এবং রুগীদের প্রতি সহানুভূতি বা সহমর্মিতা প্রকাশ করা তাকে অচিরেই সাফল্যের শিখরে তুলে দিল। ওর বাড়ির সকলেই এই উন্নিতিতে খুব খুশি হয়েছিল। একবছর সরকারি হাসপাতালে চাকুরি করার পর ও অবশেষে একটি নামকরা বেসরকারি নার্সিংহোমে গাইনোকলজিস্ট হিসাবে যোগদান করে এবং সেখানে শম্পা বহু জটিল অস্ত্রোপ্রচার করে অনেক ক্ষেত্রে মা ও বাচ্চার দুজনকারই প্রাণ বাঁচিয়ে সুস্থ করে তাদের বাড়ি পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল। ওইখানেই একটি অবাঙালি ছেলের সাথে শম্পার পরিচয়

হয়। নার্সিংহোমের কাছের একটি ব্যাঙ্কে ছেলেটি কাজ করতো। ছেলেটির নাম দীপক অগ্নিহোত্রী। শিক্ষিত ভদ্র এবং ছেলেটির মা-বাবা কেহই জীবিত ছিল না, সংসারে সে ছিল একা। সেই সময় শম্পা আবার সেই মানসিক অবসাদের শিকার হয়। চেষ্টা করে মাঝে মাঝে নিজের পুরানো সেই কলেজের বন্ধু সন্দীপ মালহোত্রাকে ফোন করার। কিন্তু সে তখন শম্পাকে কোন পাত্তাই দিতে চায় না এবং অবশেষে একদিন ছেলেটির মা -বাবা শম্পাকে পরিষ্কার বলে দেয় টেলিফোন না করতে কারণ সন্দীপের খুব শীঘ্র বিয়ে। এতে শম্পা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে, সকলেই ওকে নানানভাবে বোঝাবার চেষ্টা করে। আমি নিজে ওকে বাড়িতে ডেকে এনে অনেক বুঝিয়েছিলাম—শম্পা জীবনটাতো এখন সবে শুরু এখনই এভাবে কেন ভেঙে পড়ছো সোনা। তুমি দেখবে সন্দীপের থেকেও আরও ভাল ছেলে তুমি তোমার জীবনে পাবে সুতরাং কষ্ট পেও না। শম্পা সুখের পর দুঃখ আসতে বাধ্য এটাই সংসারের নিয়ম। আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গীতা তুমি হয়তো পড়োনি, গীতার সাংখ্যযোগের পঞ্চদশ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

"মাত্রা স্পর্শাস্তু কৌন্তেয়—শীতোষ্ণ-সুখদুঃখদাঃ
আগমা পাহিনোহ—নিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষ স্ব ভারত।।"

অর্থাৎ জীবনের প্রকৃত কাজকর্ম সম্পাদন করতে হলে মানুষকে সহনশীলতার মাধ্যমে বুঝতে হবে। সুখদুঃখ কেবল ইন্দ্রিয়ের বিকার মাত্র। শীতের পর যেমন গ্রীষ্ম আসে তেমনই পর্যায়ক্রমে সুখ ও দুঃখ আসে। সত্যকে উপলব্ধি করে দুঃখে কিংবা সুখে অবিচলিত থাকাই মানুষের কর্তব্য।

এত কিছু বলার পর শম্পা খানিকটা সামলে উঠেছিল এবং আবার নিয়মিত নার্সিংহোমে নিজের কাজের জগতে ফিরে গিয়েছিল। অবস্থা অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে আসছিল। অলক্ষ্যে ও কিন্তু নিজের মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তির আশায় দীপক অগ্নিহোত্রীর প্রতি আকর্ষিত হতে থাকে এবং অচিরেই ওর খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। দীপক তাকে স্বপ্ন দেখাতে থাকে।—শম্পাও তৈরি করতে পারে নিজের স্বপ্নের নার্সিংহোম এবং তার ব্যবস্থা সে নিজের ব্যাঙ্কের মাধ্যমে করিয়ে দেবে। শুনলাম শম্পার সাথে ওর মা-বাবার মন কষাকষি শুরু হয়েছে এই বিষয় নিয়ে। দেখলাম আমাকেও এড়িয়ে চলে। এক শীতের বিকেলে হঠাৎ শম্পা আমাকে অফিসে ফোন করে বাড়িতে আসতে বলে। এখানে একটা কথা জানাতে চাই—আমি কখনই কারুর বাড়ি খালি হাতে যাই না, সুতরাং ফোনেতে বললো আমি জানি তুমি কিছু খাবার জিনিস আনবে, আজ আমি বলছি যাই কিছু আনো একটু বেশি করে এনো দাদা।

যখন তিমারপুরে শম্পাদের কোয়ার্টারে পৌছালাম তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। ওদের পরিবারের সকলেই ড্রইংরুমে বসে আছে এবং একটি অচেনা

ছেলেও সেখানে শম্পার পাশে বসে আছে। শম্পার মা-বাবাও আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। বললেন শম্পা তোমার জন্য বসে আছে। ওর আজ রাতে নার্সিংহোমে ডিউটি। শম্পাই আমার সাথে ছেলেটির আলাপ করিয়ে দিল। বললো দাদা এ হচ্ছে দীপক অগ্নিহোত্রী। সরকারি ব্যাঙ্কে চাকরি করে, আমি যেই নার্সিংহোমে কাজ করছি তার কাছেই ও থাকে। ছেলেটি উঠে এসে আমাকে প্রণাম করলো। ছেলেটিকে আমার ভালোই লাগলো। দীপকও ফর্সা শম্পার মতনই বেঁটে এবং ধীরস্থির ও নম্র। ও ভাঙা ভাঙা বাংলায় বললো—শম্পার কাছে আমি আপনার কথা এত শুনেছি যে আমি আপনাকে না চিনলেও আগে থেকেই চিনে বসে আছি।

শম্পার সব থেকে বড় দুর্বলতা ছিল ওর সাথে কেউ যদি দুটো মিষ্টি করে কথা বলে এবং বড়লোকিয়ানা জাহির করে তাহলেই তার প্রতি শম্পা অনায়াসে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং দীপকের সাথে মেলামেশায় ও বুঝেছিল ও ব্যাঙ্কে চাকুরি করে। সংসারে একা। শ্বশুর-শাশুরির ঝামেলা নেই। পয়সাকড়ি আছে এবং সর্বোপরি দীপক ওকে বুঝিয়েছিল নার্সিহোম তৈরি করতে যত টাকা লাগে ও সেটা ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পাইয়ে দেবে। এই নতুন সম্পর্কের কারণে অযথাই মা-মেয়েতে সংঘাত শুরু হয়। মাঝেমধ্যে তা তুমুল আকার ধারণ করতো। আমার এক সহকর্মী ওদেরই প্রতিবেশী ছিল তার কাছে মাঝে মাঝে ঝগড়া-বিবাদের কথা জানতে পারতাম। আমার নীরব দর্শকের ভূমিকা ছাড়া আর কিছু করা বা বলা সম্ভব ছিল। যতই হউক শম্পা প্রাপ্তবয়স্কা এক নামী ডাক্তার।

বর্ষাকাল অফিসে কাজে ব্যস্ত। বেলা তখন ১১টা বাজে। অফিসে শম্পার দিদি রাত্রির ফোন—ওর মায়ের আশঙ্কাজনক অবস্থা এবং শম্পা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। ছুটলাম আমি ওদের বাড়ি। গিয়ে দেখি ওদের দোতলার ফ্ল্যাটে বেশ ভিড়। রাত্রির সাথে দেখা হওয়াতে জানতে পারলাম আজ আবার একটু শম্পার সাথে মায়ের ঝগড়া হয়েছিল এবং শম্পা চিঠি লিখে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। বলে গেছে আমি দীপক অগ্নিহোত্রীকে ভালবাসি ওকে বিয়ে করবো। পাড়া-প্রতিবেশী জানতে পেরে সকলে উৎসুক নয়নে বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছে। শম্পার মা-বাবাকে কলোনিতে সকলেই সম্মান করতো সেই সম্মান আজ ধুলোয় মিশে গেছে। এই লজ্জার হাত থেকে মুক্তি পেতে ওর মা আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু ওদের প্রতিবেশী এক ডাক্তারের সেবায় উনি শেষ যাত্রা প্রাণে বেঁচে যান কিন্তু সাময়িক মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। কিন্তু যে আঘাত শম্পার মা ও বাবা মানসিকভাবে পেলেন তা কিন্তু কোনদিনই ওনাদের মন থেকে মুছে যায়নি। যদিও সময়ের সাথে সাথে জীবনযাত্রা আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে এবং ওনাদের "মনের ঘায়ে" প্রলেপ পড়তে শুরু করে।

ঘটনার দুইদিন পর দীপক নিজে টেলিফোনে শম্পার মা-বাবাকে জানিয়ে দেয় যে শম্পা ওর কাছে রয়েছে এবং ওরা আর্যসমাজ মতে বিয়েও করেছে এবং ওরা তাঁদের আশীর্বাদ চায়। শুনেছিলাম সেই মুহূর্তে শম্পার বাবা কোনো কথার জবাব টেলিফোনে দেননি।

এরপর শম্পা আমার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করে এবং ওদের নতুন সংসার দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। এটা ১৯৮১ সালের ঘটনা। আমি এক রবিবার ওদের বিবাহিত জীবনের নতুন ঘর-সংসার দেখতে গিয়েছিলাম। ওরা দুইজনেই মহাসমারোহে আমাকে অভ্যর্থনা করে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়ায়। একটা জিনিস আমি সেদিন উপলব্ধি করলাম—এত কিছু কাণ্ড হওয়ার পরও শম্পার মনে কোনরকম অনুতপ্ত ভাবলেশমাত্র নেই। ওকে বললাম ওর মায়ের মানসিক অবস্থা ভাল নয়, শয্যাশায়ী কিন্তু সেই কথায় শম্পা কর্ণপাতও করলো না। কতখানি স্বার্থপর হতে পারে আজকের ছেলে-মেয়েরা তারই একটা নিদর্শন পেলাম শম্পার ব্যবহারে। ধীরে ধীরে ওদের সাংসারিক জীবনযাত্রা উন্নতির সোপানে উঠতে থাকে। ডাক্তার হিসাবে নিজের পাড়ায় ওর প্রচুর নামযশ খ্যাতি বাড়তে থাকে। সর্বোপরি গরিব-দুঃখী রুগীদের বিশেষ মনোযোগ ও সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করতো এটাই ওর উন্নতির প্রধান কারণ। বিবাহের পর শম্পার জীবনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ও কৃপাদৃষ্টি উত্তরোত্তর ছাপ ফেলতে থাকে। ও একটি সুন্দর মিষ্টি মেয়ের জন্ম দেয়। অবশেষে ওর স্বপ্নের নার্সিংহোম "শুশ্রূষা" গড়ে ওঠে। খুব ধুমধামের সাথে নার্সিংহোমের উদ্বোধন অনুষ্ঠান করা হয়। শম্পা ও দীপক তখন শম্পার মা-বাবা, রাত্রি ও তাব শ্বশুরবারির পরিজনদের নিমন্ত্রণ করেছিল। আমিও বাদ যাইনি, ততদিনে শম্পার মা-বাবার মনের ক্ষোভ অনেকাংশে দূর হয়েছে এবং মেয়েকে ক্ষমাও করেছেন যা প্রতিটি পরিবারে হয়ে থাকে। ও মনপ্রাণ দিয়ে নার্সিংহোমের উন্নতির জন্য দিনরাত কাজে ডুবে যেতে থাকে। ততদিনে আমিও স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘোরতর সংসারী। তেমনভাবে আর শম্পার খোঁজখবর পাই না। উৎসব-পার্বণে মাঝেমধ্যে শম্পার সাথে দেখা হতো। কিন্তু বছর দুয়েক পরে অনুভব করলাম—না জানি কোথায় শম্পার জীবনের কোন সূক্ষ্ম তার ছিঁড়ে গেছে। আমার বিয়ের অ্যালব্যামে বিয়ের ফটো দেখতে দেখতে মাঝেমধ্যেই ও দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়তো আর বলতো দাদা আমার বিয়ের কোন ফটো বা অ্যালব্যাম নেই। এও বলতো যতই হউক মেয়েদের মুকুট আর ছেলেদের টোপর মাথায় বিয়ের একটা আলাদা আনন্দ তাই না দাদা? চুপ করে শুনতাম, বলার তো কিছু ছিল না।

ধীরে ধীরে ওর নামযশ ডাক্তারি জগৎ পার করে সমাজে বিভিন্ন মহলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। নামীদামী লোকদের বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু হয়।

সেখানে পুলিশ মহলের উচ্চপদস্থ অফিসার থেকে বড়বড় প্রমোটার বা রাজনৈতিক নেতারাও বাদ যায় না। দীপক ছিল অতি চালাক ছেলে, সে এই উচ্চমহলে শম্পার জানাশুনোকে কাজে লাগিয়ে ধীরে ধীরে জমি কেনাবেচার ব্যবসা শুরু করে। এদিকে প্রখ্যাত ডাক্তার হওয়ার দরুন নানান মিটিং সেমিনার অথবা নীরোগ হওয়ার পর বহু বড়লোক রুগীরা শম্পাকে প্রায়ই রাত্রে ডিনারের নিমন্ত্রণ করতে থাকে আর সেজন্য প্রায়ই বাড়িতে ফিরতে রাত হতে থাকে কারণ শম্পা কোনদিন কোন পেশেন্টকে বিনা চিকিৎসায় ফিরতে দেয়নি। আজও আমরা নারী স্বাধীনতা নিয়ে যতই সমাজে চেঁচামেচি করি না কেন—নারীর উন্নতি পুরুষরা কোনদিনই সহ্য করতে পারে না। এইখানে সেই একই অবস্থার সূচনা হলো। স্বামী- মহারাজের শুরু হলো সন্দেহবাতিক। ধীরে ধীরে ওদের দুজনের সম্পর্ক খারাপ হতে লাগলো। শম্পা প্রায়ই ওর দিদি রাত্রির কাছে দুঃখ করতো, বলতো দীপক আমাকে সাথে নিয়ে কোন বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে যায় না। সিনেমা দেখা তো দূরের কথা। সেই সময় দিল্লিতে প্রত্যেক পুজোপ্যাণ্ডেলে নিজের নিজের পাড়ায় সকলেই স্বামী-পুত্র কন্যা নিয়ে ঠাকুর দেখতে আসতো কিন্তু স্বামীসহ শম্পাকে কোনদিনই কোন পুজোপ্যাণ্ডেলে আমরা দেখিনি, কারণ পুজোর সময় ছুটি নিয়ে আমি স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে তিনদিনই দিল্লির বহু পুজোপ্যাণ্ডেলে ঘুরতাম। শম্পার মা- বাবাও বহু অনুযোগ করেছেন কিন্তু দীপকের পরিষ্কার জবাব—"বৌয়ের" পিছন পিছন ল্যাজ হয়ে ঘোরা আমার স্বভাব নয়।

শুরু হলো শম্পার জীবনে মানসিক অবসাদ। সেই সময় প্রয়োজন ছিল দীপকের আন্তরিক ভালবাসা ও সহানুভূতি কিন্তু দীপক ছেলেটি ছিল স্বার্থপর। বিনা স্বার্থে ও কোন কাজই করতো না। ইমোশন অর্থাৎ আবেগপ্রবণ বলে যে মানুষের মধ্যে একটা নার্ভ কাজ করে সেটা কিন্তু দীপকের মধ্যে একেবারেই ছিল না। রাত্রির বিয়ে এক সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে হয়েছিল, সেখানে সুখ-দুঃখ, আবেগপ্রবণতা, হাসি-কান্না সবই ছিল। এটাই তখন ভয়ানকভাবে শম্পার জীবনে প্রভাব বিস্তার করলো। মাঝেমধ্যেই দীপককে উদ্দেশ করে আমাদের সামনেই বলতো—"তুম মুঝে কহি ভি ঘুমানে ইয়া কিসিকে ঘর নেহি লেকে যাতে হো—অর দেখো মেরি দিদিকো ওনকে পাস এতনে প্যায়সে ভি নেহি হ্যায়, লেকিন ওনকে পরিবার সব যগহ্ যাতে রহতে হ্যায়, ওর এক তুম হো যো কি অপনে বিবিকো কহি ভি লেকে নেই যাতে, ম্যায় তো বহুত বড়ি গলতি কিয়া হ্যায় উসিকা ফল ভুগত রহি হুঁ"।

প্রথম মেয়ে জন্মাবার দুই বছর পর ওর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। সেই সন্তান নির্ধারিত সময়ের আগেই পৃথিবীর আলো দেখে সুতরাং ছেলেটি খুবই দুর্বল ছিল জন্মগত। শম্পার পক্ষে ওই সন্তানকে মানুষ করা সম্ভবপর

ছিলনা, অতএব ওর মা বাবাই সেই গুরুদায়িত্ব বহন করেন। ওই ছেলেটি জন্মাবার পর ওর "শুশ্রূষা নার্সিংহোম" উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করতে থাকে। মা লক্ষ্মীর প্রচণ্ড আশীর্বাদ লাভ করে কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল ধরতে শুরু করে। প্রায়ই দিন নার্সিংহোমের দায়িত্ব জুনিয়র ডাক্তারের ওপর আর নার্সদের ওপর ছেড়ে কখন দিল্লিতে মা-বাবার কাছে কখনও বা নিজের ঘরে গিয়ে ঘুমের ইঞ্জেকশন নিয়ে ঘুমিয়ে থাকতো। মেয়ের দিকেও তেমন নজর দিত না সে থাকতো আয়ার কাছে। এইভাবেই কেটে গেলো ওদের বিবাহিত জীবনের দশটা বছর। ক্রমশই দেখতাম ওর মানসিক অবস্থা খারাপের দিকে এগোচ্ছে। দিনে রাত্রে প্রায়ই সময় নিষিদ্ধ নানান ধরনের ওষুধ ইঞ্জেকশন শরীরে ঢুকিয়ে ঘুমের তলায় তলিয়ে যেতো। মা-বাবা ওর দিদি-ভাইয়েরা সকলেই ওকে বহুভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু পরিবর্তে ও প্রকাশ্যে ঝগড়া ও চেঁচামেচি করতো। শেষ পর্যন্ত ওর মা-বাবা-ভাইদের মন ওর প্রতি বিতৃষ্ণায় ভরে ওঠে এবং প্রায়ই ওর ভাইদের বলতে শুনেছি যে ওর বোন শম্পা এক কথায় পাগল হয়ে গেছে। শেষদিকে আমার বাড়ি আসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিল কারণ ও জানতো আমার মা ছোড়দি বা আমি ওর এই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা দেখলে হয়ত বাড়িতে ঢুকতেই দেব না।

নিষিদ্ধ মাদক বা ঘুমের ওষুধ নিয়মিত নেওয়ার দরুন তার চোখগুলি হয়েছিল ঘোলাটে। চোখের নিচে কালো ছোপ—শরীর শীর্ণকায় হয়ে পড়েছিল। আমি কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম অমঙ্গলের মেঘ ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। আমার করার কিছুই ছিল না, বিয়ের আগে শম্পাকে যেভাবে বোঝাতাম বা খোলাখুলি কথা বলতাম বিয়ের পর তো আর সেভাবে বলা যায় না কারণ ওদের স্বামী-স্ত্রীর ভুল বোঝাবুঝি—"ইগোর" লড়াই। শম্পার চাহিদা ছিল আর পাঁচটা স্বামীদের মতন ওর স্বামীও যেন একটু আন্তরিক সহানুভূতি বা ভালোবাসা অন্তত মুখে প্রকাশ করুক কিন্তু শম্পা সেটাও পাইনি। জীবনের শেষদিকেও এত বেশি নেশায় বুঁদ হতো যে কি করছি কোথায় যাচ্ছি তার কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না।

একটা ঘটনার কথা বলি—সে বছর ভাইফোঁটা ছিল নভেম্বর মাসে প্রথম সপ্তাহে। দিল্লিতে রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। রাত তখন প্রায় নটা বাজে। দেখি দরজার সামনে একটি 'অটো' এসে দাঁড়াল আর ভিতর থেকে শম্পা নামছে। চোখ ঘোলাটে দৃষ্টি অস্বাভাবিক। আলুথালু বেশে বললো বাড়িতে নিশ্চয়ই আজ মাংস হয়েছে, আমি খেয়ে যাবো। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম শম্পা মেয়েকে আনোনি। ও বললো না ও, তো আয়ার কাছে গাজিয়াবাদে রয়েছে। শম্পা ঘরে ঢোকা পর্যন্ত কি রকম যেন অস্থির করছে তারপর বললো—দাদা তোমার কোন জানা ওষুধের দোকান আছে। আমি বললাম আমাকে নাম বলো

এনে দিচ্ছি। না এমনি তোমাকে ওরা দেবে না। আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলো। গেলাম পাড়ার এক ওষুধের দোকানে সেখানে। দোকানের মালিককে নিজের পরিচয় দিয়ে ফিসফিস করে কি বললো দোকানি সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ দিয়ে দিল। বাড়ি এসে বললো মাসিমা আমাকে খাবার দাও আমি একটু বাথরুম থেকে আসছি। নিজের পার্স নিয়ে শম্পাকে তড়িঘড়ি বাথরুমে ঢুকতে দেখলাম। প্রায় দশ মিনিট পর সে বাইরে বেরোল। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে যখন বললো সে বাড়ি যাবে ঘড়িতে বাজে তখন রাত সাড়ে দশটা। আমি বললাম এত রাতে যাবে কিভাবে? ও বললো "অটোওয়ালা" বাইরে অপেক্ষা করছে। যেভাবে এসেছিল, ঠিক সেইভাবে দুর্বার গতিতে শম্পা ফিরে গেলো নিজের মা-বাবার তিমারপুরের বাসায়। ওই শেষবার আমার বাড়িতে শম্পার আসা।

এর ঠিক তিনমাস পর শম্পার বাবা এক মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মারা যান। এটা ১৯৯০ সালের ঘটনা। সেই সময় কিন্তু ও সপরিবারে নিজের মায়ের কাছে এসে থেকেছিল এবং নিষ্ঠার সঙ্গে অশৌচের কাজ বা শ্রাদ্ধশান্তি পালন করেছিল। নিয়মভঙ্গের দিন আত্মীয়-পরিজনদের নিজের হাতে মাছের কালিয়া রান্না করে খাইয়েছিল। আমার সাথে ও বা ওর স্বামীর অনেক কথাই হয়েছিল এবং বলেছিল দাদা, বাবা চলে গেলো আমার ওপর অভিমান করে, কারণ আমি নিজেকে শোধরাতে পারিনি বলে। তুমি কিন্তু দাদা আমাদের পরিবারকে একটু দেখো। শম্পাকে দেখে মনে হয়েছিল মানসিক দিক থেকে বাবার মৃত্যুতে ভেঙে পড়লেও চোখমুখের দীপ্ততা আবার যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। খুব ভাল লেগেছিল ওকে সেই বছর আটেক আগেকার পুরানো শম্পাকে দেখে। দীপকও রীতিমত গুরুদায়িত্ব নিয়ে শ্বশুরবাড়ির শ্রাদ্ধশান্তির কাজ ভালোভাবে পালন করেছিল। কষ্ট হতো ওর মায়ের জন্য। বেচারা মা যখন একটু মানসিক ও আর্থিক সুখশান্তির মুখ দেখতে পেলেন সেই সময় চলে গেলো তার জীবনসঙ্গী। আর যতই ওপরে শম্পার প্রতি মমতা ভালবাসা দেখান না কেন আমি তো জানি, বাড়ি থেকে পালিয়ে শম্পার বিয়ে মন থেকে কোনদিনই মানতে পারেনি। সেই নিয়ে বুকের মধ্যে একটা কাঁটা চিরদিন তাকে খোঁচাতে থাকে, আজও।

প্রায় মাস তিনেক পর শম্পার মায়ের কাছে গিয়েছিলাম খোঁজখবর নিতে, শুনলাম আবার শুরু হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর সংঘাত। যা নাকি মাঝেমধ্যেই প্রলয় আকার ধারণ করছে। তিনি নিজেও কিছুদিন গিয়ে শম্পার বাড়িতে থেকে এসেছেন কিন্তু থামাতে পারেননি তাদের এই স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া। নানা কথা শুনতে হয়েছে—নার্সদের ও আয়ার কাছ থেকে—ভালভাবে নাকি মেয়ে বা ছেলেকে দেখাশুনোও করে না। সব কিছুই নার্স বা আয়ারাই করে কারণ ওরা সকলেই কিন্তু ওদের ডাক্তার দিদিকে ভালবাসে। আপদে বিপদে সব সময় শম্পা যে ওদের

প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিত। এইভাবে শেষ হয়ে গেলো বছরটা।

সালটা ১৯৯১, সে বছর মে মাসে প্রচণ্ড গরম পড়েছে। "গরম লু" বইছে বাড়ির বাইরে যাওয়া প্রচণ্ড মুশকিল কিন্তু আমাদের চাকুরি তো করতেই হবে। দিনটা ছিল ২১শে মে। রোজকার মতন সেদিনও প্রায় বিকেল ৫টায় সময় বাড়ি ফিরেছি। তখনও অফিসের জামাকাপড় ছাড়া হয়নি। বাড়ির টেলিফোনটা বেজে উঠলো। ততদিনে আমার বাড়িতে ফোন এসে গেছে। রাত্রি কাঁদতে কাঁদতে ফোনে জানাল আজ দুপুর প্রায় ১টা নাগাদ শম্পা সকলকার মায়া-মমতা ভালবাসার বন্ধন কাটিয়ে অমৃতলোকে প্রস্থান করেছে। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম—কি করবো, কি বলবো ভেবে পেলাম না। চোখ থেকে ঝরঝর করে জল পড়তে শুরু হলো। মনে আসতে লাগলো অতীতের বহু সুখস্মৃতি—তার ভালবাসায় ভরা "দাদা" ডাক আর কোনদিনই শুনতে পাবো না। সেই যে বিছানায় বসে গিয়েছিলাম হয়ত উঠতাম না কিন্তু আমার স্ত্রী ও মায়ের অনুরোধে যেতে হলো শম্পার বাড়ি।

ওদের বাড়ি যখন পৌছালাম তখন সূর্যদেব অস্ত যাইনি। বাড়ির ড্রইংরুমে শুয়ে যেন শম্পা ঘুমোচ্ছে—মুখে কিন্তু মুচকি হাসি লেগে রয়েছে। মনে হলো এই বুঝি উঠে বসে বলবে, আরে দাদা, কখন এলে? আমার জিলাপি এনেছো।

শুনলাম আজ সকালে এবং দুপুরে দুবার স্বামী-স্ত্রীতে প্রচণ্ড বাদ-বিবাদ হয়েছিল। তবুও কয়েকটা জরুরি প্রসবের কেস করেছিল। তারপর দুপুর ১২টা সাড়ে বারোটা নাগাদ আবার নাকি দীপকের সাথে কথা কাটাকাটি হয়েছিল এবং দীপকও নাকি দুইদিন ধরে অফিস যায়নি। তারপর মেয়ে স্কুল থেকে আসে ওর সাথে কয়েকটা কথা বলেই শম্পা নার্সকে বলে ম্যাঁয় মরনে যা রহি হুঁ এবং নিজের বেডরুমে ঢুকে যায় । প্রথমে নার্সরা বা কাজের লোকেরা ভেবেছিল রোজ যেমন ডাক্তারদিদি নাটক করে তেমনি হয়ত নিজের ঘরে ঘুমাচ্ছে। যখন প্রায় দুঘন্টা দরজা খোলেনি তখন সকলে ভয় পেয়ে চেঁচামেচি শুরু করে এবং দীপককে ডেকে আনে। ওরা অন্য দরজা দিয়ে ঢুকে দেখে শম্পা সকলকে ফাঁকি দিয়ে চিরতরে ঘুমের দেশে চলে গেছে। বিছানায় ওর পাশে পাওয়া গেল অনেক ঘুমের ওষুধের র‍্যাপার। তা প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশটা ট্যাবলেট খেয়েছিল।

দীপক কিংবা রাত্রিকে কি বলে সান্ত্বনা দেবো ভেবে পেলাম না। জানি একহাতে কখনও তালি বাজে না।

কাঁদতে কাঁদতে ওর দিদি রাত্রি জানালো—কিভাবে বোনটা আমার নিজের জীবনটা শেষ করেছে—তা একবার নিজের চোখে দেখো। ঘর থেকে সকলকে বাইরে যেতে বললো আর মৃত শম্পার অনাবৃত শরীরটা পাল্টে দেখালো এক বীভৎস দৃশ্য। দেখলাম শম্পার কোমর থেকে নিতম্ব পর্যন্ত রক্তাক্ত ঘায়ে ঢেকে

গেছে। বহু জায়গায় সুঁচ ফোটানোর নির্মম দাগ। মনে হচ্ছিল সে যেন ঘুমিয়ে আছে—মুখে লেগে আছে সেই মুচকি হাসি—যেন এইমাত্র সে বলে উঠবে, দাদা, ম্যাঁয় চলতি হুঁ—আউর কভি ভি তুমহারে পাস আকর জিদ নাহি করুঙ্গি। ওর শরীর স্পর্শ করে বসে রইলাম। চোখের জলে ভেসে যেতে লাগলো আমার অতীত ও বর্তমান। দীপকের ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। ও বলছে দাদা, শম্পাকে তো এবার শ্মশানে নিয়ে যেতে হয়। হায়রে ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস, আজ ডাঃ শম্পা অগ্নিহোত্রীকে আমাকে নিয়ে যেতে হবে কাঁধ দিয়ে মহাশ্মশানের পথে। শম্পার মুখাগ্নি সেরে চিতার দিকে তাকিয়ে দীপক কান্নায় ভেঙে পড়লো দেখলাম তার বিবেক অন্তর-আত্মা জেগে উঠেছে। সজল নয়নে দীপক হাতজোড় করে চিতায় শায়িত শম্পাকে বলছে—যাবার আগে আমাকে ক্ষমা করে দিও, আমি স্বীকার করছি আমি তোমাকে অবহেলা, অপমান করেছি, মিথ্যে তোমাকে সন্দেহ করেছি হয়ত এর অনেক বেশি কষ্ট আমাকে ভবিষ্যতে ভুগতে হবে।

মনে মনে ভাবলাম দীপক এই স্বীকারোক্তি যদি কিছুদিন আগেও জানাতো হয়ত শম্পার এই করুণ পরিণতি হতো না। মাত্র ৩৩ বছরে নিভে গেলো এই প্রতিভাময়ী ডাঃ শম্পা অগ্নিহোত্রীর জীবনদীপ। তাকে ভোলা যাবে না, ভুলতে আমি পারবো না। সে যে একদিকে আমার কাছে বায়না করতো নিজের মেয়ের মতন। জেদ করতো ছোট বোনের মতন আবার বন্ধুর মতন মিশে গোপন কথা আমার সঙ্গে ভাগ করতো। এই লেখার মধ্যেই শম্পা তোমাকে চিরদিন আমরা মনে রাখবো।

শেফালী যখন শীলা

আশুতোষ মণ্ডল

সকালবেলায় বাবার ব্যস্ততা দেখে শেফালী জিজ্ঞাসা করল—বাবা তুমি কোথায় যাবে?

তোর একটা সম্বন্ধের ব্যাপারে কথা বলতে ; তোর রামু কাকুই খবরটা দিল। পুণ্যনগরের কালিদাস নাকি একটা ছেলের সন্ধান এনেছে, এখন গেলে দেখাও হয়ে যাবে। এর আগে নাকি ওরা তোকে দেখেছে, ওদের খুব পছন্দ হয়েছে, এখন আমরা রাজি হলেই হয়ে যাবে। এও বলেছে দাবি-দাওয়া কিছু নেই, এমন হলে তো ভালোই হয়।

শেফালীর মা রান্নাঘর থেকে সব শুনে বলল, ছেলেটার বাড়ি কোথায়? কি করে?

—ওরা যা বলল ছেলেটা বাইরে থেকে এসেছে, লরির ড্রাইভার। মাসে প্রায় দশ-বারো হাজার টাকা রোজগার আছে।

—বাড়িতে কে কে আছে?

—তা কি করে বলবো, আগে যাই, ছেলেটাকে দেখি, কথা বলি, তারপর সব জানা যাবে।

—একাই যাবে নাকি?

—একা যাবো কেন, রামুকে সঙ্গে নিয়েই যাবো। ওর সঙ্গেই তো কালিদাসের ভালো পরিচয়। একা গেলে হবে না।

মতিলাল মেয়ের কাছে কিছুই লুকায় না, যেখানে যা হয় সব বলে। মেয়েও তেমনি বাবা অন্ত প্রাণ, বাবাই যেন বন্ধু। সব কিছু বলবে, গল্প করে। যেমন সেই ছোটবেলায় করতো, বড় হয়েও কিছুই বদলায়নি।

এদিকে রামু নিজেই মতিলালকে ডেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

শেফালীর ভিতর যেন একটা ঢেউ খেলে গেল, পা থেকে মাথা অবধি। মনের মধ্যে বেশ একটা স্বপ্ন ছিল, শ্বশুরবাড়ি, স্বামী, ননদ, শাশুরী, শ্বশুর, দেওর আরো কত লোকজন সবাইকে নিয়ে বেশ বড় একটা সংসার। ভালোই তো একটা গতি হবে। আজ না হয় কাল পরের বাড়ি যেতেই হবে। সে যতই গরিব হোক, না হয় শাশুড়ি, বকা, ননদের মুখ ঝামটা, তবু তো নিজের সংসার। সারাদিন পরে স্বামী বাড়ি ফিরলে তো একটু শান্তি পাবো। এই সব কথা ভাবতে ভাবতে সেই ছোট্টবেলার পুতুলখেলার কথা মনে পড়লো। বর-বউ আর তাদের ছোট্ট মনা, নিয়ে কত খেলেছি। একসময় নিজের কোলেও একটা ছোট্ট মনা আসবে, তখন আর নিশ্চয় কষ্ট থাকবে না, নিজেই না হয় কিছু একটা কাজ করে দুচার

পয়সা রোজগার করতে পারবো, আর যদি বর নিজেই ভালো রোজগার করে তাহলে তো কোন কথাই নেই, দিব্যি চলে যাবে। আমাদের মত কষ্ট করতে হবে না। এমন সময় রান্নাঘর থেকে মায়ের ডাক, শেফালী কোথায় গেলি?

এক সময়ে শেফালীর ঘোর ভেঙে বলল, যাচ্ছি, বলে মায়ের কাছে গিয়ে বসলো।

মাথায় হাত বুলিয়ে মা বলল দেখ, তোর বাবা কয়দিন ধরেই বলছিল তোর বিয়ের কথা, জানিস তো তোর বিয়ের জন্য বেচারির কত চিন্তা, পাড়ার লোকেও নানা কথা বলে, এখন তো তুই অনেক বড় হয়েছিস, তোর বিয়েটা দিতে পারলে আমরাও তো দায়মুক্ত হই।

আমাকে যে বিয়ে দেবে টাকা-পয়সা পাবে কোথা?

সে তোকে চিন্তা করতে হবে না, জোগাড় হয়ে যাবে, দুধের গাইটাকে বেচে দেব বলেছিল তোর বাবা। আমার হাতের আর কানের জিনিসটা তোর জন্যই। আমার বিয়ের সময় তোর বড় মামার দেওয়া, তাই কষ্টের সময়ও বেচতে চাইনি। আমি ছোট বলে আমাকে খুব ভালোবাসতো। আর বলেছিল তোর মেয়ে হলে ওকে দিয়ে দিবি। একদম খাঁটি গিনি সোনার। শেফালী মাকে জড়িয়ে ধরে বলল ছেলেটার বাড়ি তো ভিন দেশে, ভিন জাতের, নিশ্চয় অন্য ভাষায় কথা বলে। শেফালির মা একটু চুপ থেকে বলল তাতে কি আছে ওরাও তো মানুষ, ওদের তো মা-বাবা ভাই-বোন ঘর-সংসার ছেলে-পুলে সব আছে। আস্তে আস্তে ঠিক মানিয়ে নিতে পারবি। দেখ কথা বলতে বলতে কত বেলা হয়ে গেল, এখন যা ঘরদোরগুলি লেপে মুছে পরিষ্কার কর।

শেফালী কাজ করতে করতে ভাবছে এই অভাবের সংসার, রাস্তার পাশে দুটি চালা ঘর, কোন্‌দিন সরকারি লোক এসে তুলে দেয় কে জানে, তবু তো এটাই আমার জন্মস্থান। এই তুলসিতলা, ফুলগাছ আমার বন্ধুর মত সমবয়সি, বিয়ে হলে অন্তত বাড়ি না থাক দুজনে একটা কিছু করতে পারবো। যাইহোক কয়েক মাস আগে শিউলিদি, ময়নাদির তো বিহারি ছেলের সঙ্গে বিয়ে হল, কই তারা তো ভালোই আছে শুনি। হয়তো অনেক দূর বলে বাড়ি আসে না। আর অত দূর থেকে আসতে যেতেও অনেক টাকা খরচ। আমারও না হয় ওদের মতই বিহারি ছেলের সঙ্গে বিয়ে হবে। ওরা নাকি বাঙালি মেয়েদের খুব ভালোবাসে, তাই অত দূর থেকে এসে বিয়ে করে নিয়ে যায়, ওদের দেশে কি মেয়ের অভাব আছে? এমন কথা সারাদিন মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে শেফালীর।

এদিকে তত সময়ে মতিলাল আর রামু মেয়ের বিয়ের পাকা কথা দিয়ে উপরি কিছু পাওনাও নিয়ে এসেছে, যা আগে কল্পনাও করতে পারেনি। আজই

রাত নয়টার লগ্নে বিয়ে। সেই হিসাবেই জোগারাদি। বিয়ের বাজারের জন্য বেশি কিছু করতে হবে না ওরাই সব নিয়ে আসবে, আমাদের শুধু পুরুতমশাইকে বলা, আর কয়েকজন, খাওয়ার ব্যবস্থা, ব্যস! গড়গড় করে শেফালীর বাবা আরো বলতে লাগলো, ছেলের ছুটি বেশি নেই। বড় মাফিকের কাজ করে, নিজেই লরির ড্রাইভার, বড় বড় লরি চালায়, দেশ-বিদেশে যায়, যা বলেছিলাম মাসে অনেক রোজগার। প্রায় দশ-পনেরো হাজার টাকা, ভাবা যায়। ছেলে দেখতে ভালোই আমাদের দেখামাত্রই হাঁটু গেড়ে পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করলো, বেশ ভক্তিশ্রদ্ধা আছে, ছেলে খুব ভদ্র। বাড়ি বিহারে, মা নেই, বাবা আর দাদা-বৌদি। সেও বাঙালি মেয়েই বিয়ে করেছে। তাই বাবার ইচ্ছে ছোট ছেলের বাঙালি মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার। তাই ওর বাবাই বিশ হাজার টাকা দিয়ে পাঠিয়েছে, যেখান থেকে হোক একটা ভদ্র ঘরের বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে হবে, উনি নাকি অসুস্থ, বিছানায় পড়ে আছে, আজ মরে তো কাল মরে এমন অবস্থা, তাই তাড়াতাড়ি করছে। সব বিষয়াদি দুই ছেলের নামে লিখে দিয়েছে। এরপর বিয়ের তারিখও নেই আর ছেলের হাতে সময়ও নেই, তাই রাজি হয়ে গেলাম। কালই চলে যাবে হাওড়া থেকে ট্রেন ধরবে।

—শেফালীর মা বলল হ্যাঁগো, তাহলে মেয়েটা ভালোই থাকবে, এত টাকা মাইনে পায়!

—তাই তো বলেছে, আমি যখন বললাম হঠাৎ করে বিয়ে, আমাকে তো কিছু টাকা-পয়সা জোগাড় করতে হবে। অন্তত বিয়ের খরচাটার জন্য কয়দিন সময় হলে, বলতে না বলতে অমনি ছেলে বলল তার দরকার নেই, বাবা আমাকে টাকা দিয়ে পাঠিয়েছে এই নিন দশ হাজার টাকা, যা খরচা করার করবেন, আর যা হাতে থাকে তা প্রণামী হিসাবে দিলাম। সাধা লক্ষ্মী ফেলতে নেই, তাই না করতে পারলাম না, সবাই মিলে বলল এমন সুযোগ দুবার আসে না। যেন সোনার টুকরো ছেলে। কি বলো শেফালীর মা!

এদিকে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। কমবেশি জোগাড়াদি করা হল। পাড়ার বয়স্ক দু-চারজনকে বিয়ের সময় থাকার জন্য মতিলাল দুপুরেই বলে এসেছে।

শেফালীর সকালে গায়ে হলুদ না হয়ে বিকেলেই সব কিছু হল, আশেপাশের সবাই হাতে হাত মিলিয়ে বিয়ে গোছগাছ করতে ব্যস্ত।

রাত নটা বাজল, ছেলে একটা মারুতি গাড়ি করে বিয়ে করতে এলো। সঙ্গে মাত্র তিনজন ছেলের দাদা আর মামা-মামি। সবই তো নিজেদের লোক, শঙ্খ বাজিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে বর-কনেকে ছাঁদনাতলায় এনে হিন্দুদের বিয়ের রীতিনীতি মেনেই বিয়ে একপ্রকার সম্পন্ন হল। মামা-মামির খুব তাড়া আজ রাতেই বেরিয়ে পড়বে, তা না হলে কোনমতেই চলবে না। কারণ ছেলের বাবা

অসুস্থ, তাই।

মতিলাল আর বাধা দিতে পারলো না কারণ হাতে করে এতগুলি টাকা নিয়েছে। ওরাই বিয়ের ব্যবস্থা করলো ওদের মতামতেই চলতে হবে। মেয়েটাকে তো উদ্ধার করলো। কত বড় বোঝা ছিল আজ নিজেকে অনেকটা মুক্ত মনে হচ্ছে।

বর-কনে সকলকে নমস্কার করে আশীর্বাদ নিয়ে মারুতি কারে উঠে পড়লো, গাড়ি ছেড়ে দিলো। জানালা দিয়ে তাকিয়ে শেফালীর দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো, গাড়িটাও ছেড়ে দিল।

চেনা রাস্তা ছেড়ে এবার গাড়িটি অচেনা বড় রাস্তা ধরলো, বড় বড় গাড়িগুলিকে ওভারটেক করে দ্রুতগতিতে ছুটছে। চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার, বড় বড় গাছপালা, শুধু বড় গাড়ির হেডলাইট ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

রাত তখন গভীর, বড় রাস্তার পাশে একটা হোটেলের সামনে এসে গাড়িটি দাঁড়ালো। আমার গয়নাগাঁটি আর ওর শোলার মুকুট ব্যাগে ভরে নিয়ে অতি সাবধানে হোটেলের একটা ঘরে নিয়ে আমাকে বসালো। এক মহিলা এসে হাতমুখ ভালো করে সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে বলল পাশে বাথরুম দেখিয়ে দিয়ে, একটা সাধারণ শাড়ি দিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি বদলে নাও এখনি বেরোতে হবে। আমি তাই করলাম। তখনো বুঝিনি। সব কিছু যেন আমাকে অবাক করে দিল পাশের ঘরে টাকাপয়সার হিসাব। বেশ কয়েকজনের নিচু স্বরে কথা শুনলাম। তখনি বুঝতে পারলাম এটা তো বিয়ে নয়, আমি বিক্রি হয়েছি। বাবা আমাকে দশ হাজার টাকার বিনিময়ে বেচে দিয়েছে।

যারা আমাকে বিয়ে দিয়ে নিয়ে গেল তারা চলে গেলো, অন্য দুজন লোক এই রাতেই একটা খালি লরিতে তুলে নিলো। আমি এখন বাড়ির পশুদের মত বিক্রি হয়ে গেছি, মনকে শক্ত করা ছাড়া উপায় নেই। লরির মধ্যে বিচুলির গদি, সেখানেই আমার ফুলশয্যা, আকাশের তারাগুলি ফুল হয়ে, চলন্ত লরির ঝাকুনি যেন ঝুলন্ত বারান্দায় দোলনার ন্যায় দোল খাচ্ছি, বাংলা মদের গন্ধই যেন ফুলের গন্ধ হিসাবে মনে হতে লাগল। আজ যেন আমি দ্রৌপদীর মতো, তাঁর পাঁচটি বর ছিল, আমার চার-চারটি বরের সঙ্গে ফুলসজ্জার রাত কাটছে। লরির ড্রাইভার, খালাসি আর এই দুজন লোক। এ ভাবেই নতুন জীবনের রাত কেটে, ভোরে সূর্যের আভায় যখন পুবদিক লাল হয়ে উঠলো আমার সমস্ত স্বপ্ন মুছে গিয়ে তখন আমি এক অন্য জগতের নারী। প্রাণহীন রঙিন প্রজাপতি, লাজ-লজ্জা ঘৃণা সব একাকার হয়ে একটা শ্যাওলা জমানো পিচ্ছিল পাথরে পরিণত হলাম। নিজের প্রতি কোন বিতৃষ্ণা রইলো না, যে আমাকে জন্ম দিয়েছে সেই পিতৃদেবের হাতেই তো আমার এই পরিণতি। তাই জোর করিনি, বাধাও দিইনি, পালাতেও

চেষ্টা করিনি, সব অত্যাচার মেনে নিয়েছি।

এই ভোরেই আর একটা হোটেলে আমাকে নামানো হল। সেখানে এক মহিলা সাবান শ্যাম্পু দিয়ে নিজে হাতে স্নান করালো, সারা রাতের [illegible]তে আমার গায়ে জোর ছিল না, ফ্যানের হাওয়ায় চুল শুকিয়ে নতুন শালোয়ার কামিজ পরিয়ে এক গ্লাস গরম দুধ একটা ট্যাবলেট দিয়ে বলল খেয়ে শুয়ে পড়।

দেওয়ালের ঘড়িতে তখন বেলা বারোটা বাজে, আমাকে উঠিয়ে দিল একটা চকচকে সুন্দর গাড়িতে এক মধ্যবয়স্কা সাজগোজ করা সুন্দরী ভদ্রবেশী মহিলার পাশে।

মহিলাটি জিজ্ঞাসা করল—তোমার নাম কি?

বললাম 'শেফালী'।

—আজ থেকে তোমার নাম 'শীলা'।

শান্ত গলায় ড্রাইভারকে বলল, চলো—

কালচক্র

প্রশান্তকুমার রায়

বর্তমান ঝাড়খণ্ডের দক্ষিণে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত এক গ্রামের নাম তিনকুঠিয়া। এই গ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবার ও সমাজপতিদের দাপটে অন্য যে সব মুষ্টিমেয় আদিবাসী শ্রেণীর লোক বাস করে তাদের প্রায় অচ্ছুৎ হয়েই দিনযাপন করতে হয়। এখানে সাঁওতাল ও মুণ্ডা জাতীয় আদিবাসী লোকেরা ব্রাহ্মণদের পদলেহন করে কোনওরকমে বেঁচে থাকে। এখানকার সমাজপতিদের কথায় এরা সমাজের আবর্জনা। গ্রামের একদিকে এদের স্থান, এদের ছায়া মাড়ালে ব্রাহ্মণ ও সমাজপতিদের জাত যায়। এদের ছোঁয়া জলও কোনও উচ্চবর্ণের লোক গ্রহণ করে না। তথাকথিত ব্রাহ্মণদের জমিতে এরা চাষ করে। কখনও সামান্য কিছু পারিশ্রমিক পায় কখনও বা পূর্বপুরুষের ঋণ শোধ করতেই যায়। এরা ঘরে কিছু পশুপালন করে। বাকি সময়ে শহরে গিয়ে কিছু রোজগার করে নিজেদের সংসার কোনও মতে চালায়। এদের নিজস্ব জমিজমা বলতে কিছুই নেই। সবই প্রায় ব্রাহ্মণ ও সমাজপতিদের দখলে চলে গেছে। এদের দুর্দশা লাঘব করার জন্য কেউ এগিয়ে আসে না।

এই গ্রামে ব্রাহ্মণসমাজ পরিচালিত একটি দুর্গামন্দির আছে। নামেই শুধু মন্দির। মাটির পাঁচিলের উপরে খড়ের ছাউনি দেওয়া ছোট একটি মন্দির। এই মন্দিরে দুর্গাপূজার সময়ে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন নিম্নবর্ণের লোকের প্রবেশ নিষেধ। স্বভাবতই আদিবাসীদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা মন্দিরের বাইরে ঘুরে.ঘুরে উৎসব উপভোগ করে। যদি কেউ মন্দিরের চৌহদ্দির ভিতরে প্রবেশ করে তাহলে তাদের শাস্তির বিধানও তথাকথিত সমাজপতিদের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

এই গ্রামের একক সাঁওতাল পরিবারের ছেলে কানু হাঁসদা তার মাকে নিয়ে গ্রামের এক কোণে সাঁওতাল পল্লিতে বসবাস করে। কানুর বয়স বছর আটেক হবে। জন্মাবার পরই বাবাকে হারিয়ে বহু কষ্টে নিজেদের পৈতৃক ভিটাতে আর পাঁচজন প্রতিবেশীর সঙ্গে দিনাতিপাত করে। মামারা মাঝে মাঝে এদের সাহায্য করে, আর সেই সাহায্যেই এদের কোনও রকমে দিন গুজরান হয়। কানু সারাদিন জঙ্গলের কাঠকুটো কুড়িয়ে এনে মাকে দিলে মা সেগুলো এদিক ওদিক বিক্রি করে দু'পয়সা রোজগার করে। কানুর পড়াশুনা করবার ইচ্ছা থাকলেও এখানে আদিবাসী ছেলেমেয়েদের পড়বার কোনও সুয়োগ না থাকাতে কানুরও পড়াশুনা হয় না। দুর্গাপূজায় গ্রামের পূজামণ্ডপের বাইরেই অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে বিসর্জনের দিন মাকে নিয়ে দূর থেকেই প্রতিমা দর্শনের অপেক্ষায় থাকে। মনে মনে ভাবে, ঈশ্বর যখন আমাদের সৃষ্টি করেছেন তখন হয়ত একদিন ঠিকই

মন্দিরে ঢুকে আমাদের প্রতিমা দর্শনের সুযোগ আসবে। কিন্তু এই গ্রামে আদৌ সে সুযোগ আসবে কিনা কানুর শিশুসুলভ মন সে কথা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। প্রতি বছরই ভাবে হয়ত সামনের বছর সুযোগ আসবে। কিন্তু আসে না। এইভাবেই দিন বছর পার হয়ে যায়। ব্রাহ্মণ ও সমাজপতিদের দাপটও গ্রামে দিন দিন বেড়েই যায়।

এভাবে চলতে চলতে এক বছর দুর্গাষ্টমীর দিন পূজামণ্ডপের উঠানে দুপুরবেলা ভোগ খাওয়া চলছিল। সেখানে গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের, ব্রাহ্মণ ও সমাজের উচ্চবর্ণের লোকেদের অবারিত দ্বার। অনেকেই আসছে। ভোগ খাচ্ছে আবার চলে যাচ্ছে। কানু ও তার সঙ্গীরা বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখছে আর ভাবছে কবে আসবে সেই দিন, যেদিন আমরাও ওদের সঙ্গে একসঙ্গে ভিতরে গিয়ে প্রতিমা দর্শন করবো ও ভোগ খাব। এইকথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ ওর মনে এক বিশেষ ধরনের চঞ্চলতা এলে ও আর স্থির থাকতে না পেরে চুপিসাড়ে মন্দির চত্বরে ঢুকে পড়ল। কিন্তু এত লোকের মাঝে কারও না কারও নজরে পড়েই গেল। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটা ধুন্ধুমার কাণ্ড বেধে গেল, কেউ কেউ কানুকে ধরে চিৎকার চেঁচামেচি করে একটু-আধটু মারধর করলো। সমাজপতি ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা গেল গেল রবে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে দৌড়োদৌড়ি শুরু করে দিল। কেউ কেউ বলল, মন্দির অপবিত্র হয়ে গেল। কেউ বলল, অচ্ছুৎ ছেলের মায়ের মন্দিরে প্রবেশ করায় মায়ের অভিশাপে গ্রাম রসাতলে চলে যাবে। কেউ বলতে থাকে, নীচুজাতের ছেলে হয়ে ছেলেটার এত সাহস! ওকে ভাল রকম শাস্তি দিয়ে এ গ্রাম থেকে তাড়িয়ে না দিলে গ্রামের সর্বনাশ হবে। যা হোক ওকে ধরে গ্রামের মুখিয়ার কাছে নিয়ে যাওয়া হলে গ্রামের মুখিয়াই শাস্তির বিধান ঘোষণা করল।

মুখিয়ার বিচারে কানুর মাথা নেড়া করে ঘোল ঢেলে চাবুক মারতে মারতে গ্রামের বাইরে বের করে দেবার কথা ঘোষণা করা হল।

কানু ও তার মা গ্রাম থেকে বের হয়ে কোথায় যাবে, কি করবে তা ভাবতে ভাবতে কানুর মা কানুর হাত ধরে রাঁচির পার্শ্ববর্তী বেতিয়া নামক এক গ্রামে নিজের ভাইদের কাছে যাওয়াই স্থির করল।

কানুর দুই মামা রাঁচি শহরের পাশে বেতিয়া নামে একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে বসবাস করে। অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল। ওই অঞ্চলে কানুর দুই মামা লক্ষ্মণ সোরেন ও মদন সোরেনের বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। দু'জনেই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার সুবাদে ওই সকল এলাকায় এককথায় লক্ষ্মণ সোরেন ও মদন সোরেনের নাম সকলেই জানে। আদিবাসী সমাজে ওরা দুইজনেই পূজনীয় ব্যক্তি।

কানু ও তার মা যখন ওদের বাড়িতে উঠল এবং তিনকুঠিয়া গ্রামের সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে ভাইদের কাছে বর্ণনা করল তখন ভাইরা ওদের নিজেদের কাছে

রেখে সময়মত উপযুক্ত জবাব দেবার প্রতিশ্রুতি দিল।

কানুকে মামারা প্রথমে অন্তত কিছুটা পড়াশুনা করাবার জন্য গ্রামেই একটি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিল। মাঝে মাঝে কানুকে নিয়ে মামারা একটু একটু রাজনীতির শিক্ষাও দিতে লাগল। কানুও ক্রমশ বড় হতে থাকল এবং একদিন মাধ্যমিক পাশও করল। রাজনীতি ও পড়াশুনা দুই-ই একসঙ্গে চলতে থাকল। সে যত বড় হতে থাকে বিগত দিনের অপমানের যোগ্য জবাব দেবার জন্য ততই তার মন চঞ্চল হতে থাকে। একদিন মামাদের কাছে নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করলে মামারা ওকে শান্ত হয়ে শুধু সময়ের অপেক্ষা করতে বলে।

এরপর কানু আর কিছু না বলে শুধু মামাদের কথামতই চলতে থাকে।

এভাবে আরও বেশ কিছু বছর কেটে যাবার পর কানু ক্রমশ নিজেকে একজন ঝানু রাজনীতিবিদ রূপে প্রমাণ করল। মামাদের মত কানুও এখন আদিবাসী সমাজের একজন শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠতে লাগল।

ধীরে ধীরে ঝাড়খণ্ডে নির্বাচনের সময় এগিয়ে এলো। আদিবাসী সমাজপার্টির হয়ে কানু নির্বাচনে লড়াই করবার টিকিট পেয়ে গেল। মামাদের সহযোগিতায় ও নিজের চেষ্টায় কানু এই নির্বাচনে বেশ ভাল ভোটেই জয়লাভ করল। নির্বাচনের পর রাজ্য সরকার গঠনের জন্য আদিবাসী সমাজপার্টির সমর্থন নিয়ে এক মোর্চা সরকার গঠন করার পরিকল্পনা হল। লক্ষ্মণ সোরেন ও মদন সোরেনের বিশেষ তৎপরতায় নির্দিষ্ট দিনে একটি জরুরি সভার মাধ্যমে আদিবাসী সমাজপার্টির সর্বসম্মত নেতা হিসাবে তরুণ কানু হাঁসদাকেই নির্বাচন করা হল। বিধানসভায় এক মোর্চা সরকার গঠন হবার পর গ্রামোন্নয়ন ও আদিবাসী সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ভার আদিবাসী সমাজ পার্টিকেই দেওয়া হল। তরুণ এম.এল.এ কানু হাঁসদাই উক্ত দপ্তরের দায়িত্ব নিয়ে মন্ত্রিসভায় শপথ নিল। নির্দিষ্ট দিনে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ হবার পর কানু হাঁসদা মা ও মামাদের প্রণাম করে প্রতিশোধ নেবার কথা জানতে চাইলে মামারা আরও সময়ের অপেক্ষা করতে বলল।

কানু হাঁসদা এখন রীতিমতো একজন সরকারি ব্যক্তিত্ব। তার আগে পিছনে নানারকম পাহারাদার ও জো-হুজুরের দল তাকে সবসময় ঘিরে থাকে। সে কিন্তু মামাদের পরামর্শ ছাড়া এক পা-ও চলে না।

সময় কারও জন্য অপেক্ষা করে না। সময়ের হাত ধরে কানুও এগিয়ে চলে। ক্রমশ কানু সরকারি কাজে পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে। এভাবে প্রায় বছর দুয়েক কেটে যাবার পর একদিন মামারা ওকে ডেকে গ্রামে দুইজন সরকারি অফিসার পাঠিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়ে আসতে বলে। মামাদের কথামত দুইজন অফিসার গ্রামে পাঠিয়ে কানু জানতে পারে যে গ্রামের অবস্থা যে রকম ছিল সে রকমই আছে। শুধু মুখিয়া ও সমাজপতিদের মধ্যে কিছু বয়স্ক লোক মারা গেছে। আদিবাসী বস্তির লোকেদেরও দুর্গতির শেষ নেই। বর্তমানে ব্রাহ্মণ পরিবারেরই একজন নতুন মুখিয়া হয়েছে। এরপর কানুর নির্দেশে একদিন একটি

সরকারি চিঠি নিয়ে একজন অফিসার নতুন মুখিয়াকে সেই চিঠির বক্তব্য পরিষ্কার করে বুঝান। তাতে লেখা আছে, বর্তমান সরকার এই গ্রামের উন্নতিকল্পে বেশ কিছু গঠনমূলক কাজ করতে ইচ্ছুক। যদি গ্রামের লোকেরা সহযোগিতা করে তা হলে যত শীঘ্র সম্ভব কাজ আরম্ভ করা যেতে পারে। প্রথমে জীর্ণ দুর্গামন্দির ভেঙে নতুন পাকা দুর্গামন্দির তৈরি করা হবে, জলের জন্য সেচের পরিকল্পনা নেওয়া হবে। সমস্ত মাটির ঘর ভেঙে সরকারি আবাসন তৈরি করা হবে, বেশ কিছু গভীর নলকূপ বসানো হবে, একটি প্রাইমারি বিদ্যালয় করা হবে এবং যত শীঘ্র সম্ভব গ্রামে বিজলির ব্যবস্থা করা হবে, গ্রামে পাকা রাস্তা তৈরি করা হবে। তবে গ্রামে কোনো জাতিভেদ প্রথা ও সমাজের নিম্নশ্রেণীর অধিবাসীদের কোনরূপ সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা করা হলে সমস্ত সরকারি কাজ বা পরিকল্পনা বন্ধ হয়ে যাবে। বর্তমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বর্ণবৈষম্য ও জাতিভেদের সৃষ্টিকারীকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। সকলেই মানুষ। সকল মানুষকে সমান অধিকার ও সামাজিক সম্মান দিতে হবে।

বক্তব্য মুখিয়াকে শোনানোর পর সেইদিন সন্ধেবেলায় গ্রামে এক জরুরি সভা বসানো হল। গ্রামের বয়স্ক লোকেরা সরকারি নীতির প্রতিবাদ করতে লাগল। গ্রামের যুবসমাজ পুরানো দিনের বর্ণবৈষম্য রীতি-রেওয়াজকে দূরে সরিয়ে গ্রামের উন্নতির জন্য সরকারি নীতির সমর্থন করলো। তাদের কথায় গ্রামের উন্নতিই আসল কথা। গ্রামের উন্নতিতে বাধা ঘটুক এমন কোনও কাজ তারা করতে দেবে না তা হলে আগামী প্রজন্মের কাছে তার কৈফিয়ত দিতে হবে।

গ্রামের যুবসমাজের চেঁচামেচিতে তথাকথিত সমাজপতিদের দল চুপচাপ পিছু হঠতে লাগল। এরপর সরকারি নিয়ম মেনে চলবার লিখিত অঙ্গীকারপত্রে সই করে মুখিয়া ও গ্রামের অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা সরকারি অফিসারকে দিয়ে দিল।

এরপর এক শুভদিন দেখে দুর্গামন্দিরের কাজ ও মাটির বাড়ির (অধিকাংশই প্রায় আদিবাসীদের) বদলে পাকা বাড়ির কাজ শুরু হয়ে গেল। ঠিক দুর্গাপূজার আগেই দুর্গামন্দিরের কাজ শেষও হয়ে গেল। এরপর গভীর নলকূপের কাজও শুরু হয়ে গেল। ঠিক হল দুর্গাপূজার মহাষষ্ঠীর দিন মন্ত্রীমহাশয় সদলবলে হাজির হয়ে মন্দিরের শুভ দ্বারোদঘাটন করবেন। গ্রামের ব্রাহ্মণ ও সমাজপতিদের নির্দেশে যুবক ও ছেলেছোকরার দল মহাউৎসাহে গ্রাম সাজাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ পরেই ছয়-সাতটা গাড়ির কনভয় রাস্তার ধুলো উড়িয়ে গ্রামে ঢুকলে গ্রামের মহিলারা ঘরে ঘরে শঙ্খ বাজিয়ে ও উলুর আওয়াজে মন্ত্রীকে স্বাগত জানাল। আদিবাসী লোকেরা সেজেগুজে দূরেই একদিকে দাঁড়িয়ে রইল। সমাজপতিরা দৌড়াদৌড়ি করে কে আগে মন্ত্রীর কাছে যাবে তাই নিয়ে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল। ছেলেছোকরার দল মন্ত্রীকে দেখবার জন্য হুড়োহুড়ি করতে লাগল। মন্ত্রীর আগমন গ্রামের সকলের জন্য যেন দেবতার আশীর্বাদ মনে হল।

সব গাড়ি এসে দুর্গামন্দিরের সামনে দাঁড়ালে প্রথমে কিছু সশস্ত্র পুলিশ গাড়ি থেকে নেমে চারদিক ঘিরে ফেলল। তারপর লক্ষ্মণ সোরেন ও মদন সোরেন নামল। তারপর কিছু সরকারি অফিসার ও সব শেষে কানু হাঁসদা গাড়ি থেকে নামলে বর্তমান মুখিয়া গলায় মালা পরিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে মন্ত্রীকে মন্দিরের দরজার কাছে নিয়ে গেল।

মাত্র দশ বৎসর বয়সে কানুকে গ্রামের তৎকালীন মুখিয়ার নির্দেশে মাথা নেড়া করে মাথায় ঘোল ঢেলে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের অত্যাচারে এক সময়ে কানু ও তার মাকে চোখের জল ফেলতে ফেলতে গ্রাম থেকে চলে যেতে হয়েছিল। দীর্ঘ বাইশ বছর পর কানুর চেহারার পরিবর্তন বা আদবকায়দার পরিবর্তন হওয়ার ফলে গ্রামের পুরানো প্রজন্মের কেউ কানুকে ঠিক চিনতে পারেনি। নতুন প্রজন্মের কারও চেনার কথাই নয়। আদিবাসী যুবক, যারা কানুর খেলার সাথী ছিল তারা ঠিকই ওকে চিনতে পেরেছিল, তাই তাদের চোখেমুখে খুশির ভাব লক্ষ করা গেল। যা হোক কেউ চিনুক বা না-চিনুক কানু উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণকে এক আসনে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলল।

মন্ত্রী কানু হাঁসদাকে গ্রামের মুখিয়া বা অন্য সমাজপতিরা খুব অভ্যর্থনা করে মন্দিরের প্রধান ফটকের কাছে নিয়ে গেল। মন্ত্রী মহাশয় মন্দিরের দ্বারোদঘাটন করে সদলবলে মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল এবং দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আদিবাসী লোকেদেরও মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করতে বলল। কেউ কোন প্রতিবাদ করতে পারল না। এরপর প্রধান পুরোহিত অনুমতি নিয়ে মহাষষ্ঠীর পূজা আরম্ভ করল। কানুকে কিছু বলতে বলা হলে কানু দু-এক কথায় নিজের বক্তব্য শেষ করল। শুধু বুঝিয়ে দিল, আজ থেকে এই মন্দির প্রত্যেকের জন্য খোলা থাকবে। সবারই প্রবেশাধিকার সমান। এখানে কোনও রকম বর্ণবৈষম্য নীতি চলবে না।

এরপর সকলে মিলে খুব ভক্তি সহকারে মা দুর্গাকে প্রণাম জানিয়ে মহাষষ্ঠীর অঞ্জলি দিয়ে সকলকে নিয়ে প্রসাদ খেয়ে আদিবাসী পাড়ার দিকে রওনা হল। ওখানে ওদের জন্য বাড়ি তৈরির কাজ কতটা এগোল তা দেখে ওদের সকলকে নতুন বস্ত্র ও কিছু নগদ টাকা সাহায্য দিয়ে ওদেরও এই গ্রামেরই মাথা উঁচু করে মানুষের মত বেঁচে থাকবার পরামর্শ দিয়ে গাড়িতে উঠে ধুলো উড়িয়ে কনভয়ের সঙ্গে চলে গেল।

বাড়িতে গিয়ে মাকে প্রণাম করে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে বলল, 'মা, আমি পেরেছি। মামাদের পরামর্শ মত কাজ করে পুরানো দিনের অপমানের মধুর প্রতিশোধ আজ আমি নিয়েছি। আশীর্বাদ কর, আগামী দিনে এ দেশের সর্বত্র জাতিভেদের নোংরা প্রথা উঠে গিয়ে সমাজের সকলে যেন মাথা উঁচু করে সমানভাবে বাঁচতে পারে। তবেই আমাদের দেশ উন্নতির পথে এগোবে।

কানুর মা কানুর মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে আনন্দে শুধু কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলল।

ঝরা পাতায় লেখা

অঞ্জনকুমার ঘোষ

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে অঘ্রান মাসের এক পড়ন্তবেলায় জমিদার নিশিকান্ত রায় কলকাতার শোভাবাজার ঘাট থেকে নদীপথে ফিরছেন নিজস্ব বাগানবাড়িতে যেটা ছিল বর্তমান চুঁচুঁড়ার কাছে গঙ্গার ধারে। ছলাৎ ছলাৎ করে জল কেটে চলল তার সুদৃশ্য ময়ুরকণ্ঠ বজরাটি। নদীপাড়ে অসংখ্য গাছপালা, ক্ষেত ও জঙ্গল। কয়েকটা ঘাটে কিছু স্নানার্থী গঙ্গায় স্নান করছে। মন্দিরের ঘণ্টার আওয়াজ ভেসে আসছে। কিছুদুর যাবার পর অন্ধকার নেমে এল। বজরায় রয়েছে খাবার-দাবার সহ নানারকম জিনিসপত্র আর আছে দুজন ক্রীতদাসী যাদের জমিদারবাবু ৩৫০ টাকায় কিনেছেন ওই ঘাটে দাসবাজার থেকে। ধবধবে সাদা ফতুয়া ও ধুতিপরিহিত জমিদারকে চমৎকার দেখাচ্ছিল। সঙ্গে ছিল তার বন্ধু রূপচাঁদ। খানিকক্ষণ গঙ্গার শোভা উপভোগ করে ওরা পা বাড়ালো এক সুন্দর সজ্জিত কক্ষের দিকে। সেটা ছিল ভাসমান বজরার দোতলায়। যাবার পথে নায়েবমশাই বসেছিলেন সিঁড়ির পাশে। তিনি গড়গড়া থেকে তামাক পান করছিলেন রূপোর নল দিয়ে আর তামাকের ভুরভুর আওয়াজ ও মিষ্টি গন্ধ চারদিক আমোদিত করছিল।

জমিদার—ওহে নায়েব মশাই শুনছেন?

নায়েব—বলুন কর্তা।

জমিদার—যমুনাকে বল ওই নতুন দুই দাসীকে স্নান করিয়ে, কাপড় পরিয়ে এখানে নিয়ে আসতে। ওদের সঙ্গে পরিচয় করে নেওয়া যাক।

নায়েব—যমুনা আছ? এই যমুনা?

যমুনা—কি বলছেন কর্তা?

নায়েব—তুমি তাড়াতাড়ি কর্তাবাবু যা বললেন তাই কর।

যথাসময়ে দুই ক্রীতদাসী ওদের কাছে এল খাস পরিচারিকা যমুনার সঙ্গে।

জমিদার—তোমাদের নাম কি?

একজন ক্রীতদাসী—আমি আছি সিরকা আর ওর নাম নুরমা।

জমিদার ওদের ফর্সা ও তন্বী চেহারা দেখে মনে মনে তুষ্ট হয়ে যমুনাকে দশ টাকা দিয়ে বললেন—এদের আদবকায়দা আর কাজ দু একদিনের মধ্যে শিখিয়ে দিও। এখন যাও।

রূপচাঁদ—বন্ধু, ওদের একটু দাঁড়াতে বল।

জমিদার—এসব কি বলছ? তোমার কি নেশা লেগেছে?

তখন রূপচাঁদ নিশিকান্তকে চুপি চুপি ইশারা করে বলল একটা বাঈজি নাচ

হয়ে যাক আর ওরাও একটু দেখুক।

জমিদার—(রূপচাঁদের দিকে তাকিয়ে) হয়ে যাক।

অতঃপর তবলচি ও সারেঙ্গীবাদককে ডাকা হল পাশের ঘর থেকে। তারা যন্ত্রসহ্ বাজনার সূচনা করতেই লক্ষ্ণৌ ঘরানার জমিদারের বাঈজি গান ধরল—

... ছমছম রাতিয়া হে মনবাসিয়া

... ইধার আওয়ত্ রহা ন যায় ...।

গানে মুগ্ধ হয়ে দুই বন্ধু দামী বেলজিয়াম গ্লাসে সুরা ঢালল আর বাঈজিকেও এক চুমুক দিল। জমিদার একটি মোহর বাঈজীর হাতে দিয়ে অনুরোধ করল আর একটা নাচ করার জন্য। নায়েবমশাই রূপোর থালায় রকমারি খাবার পাঠিয়ে দিল নাচের ঘরে।

ইতিমধ্যে রাতের অন্ধকার নেমে এল চারধারে। তীরভূমির কতকগুলি মাটির কুটিরের প্রদীপের ম্লান আলোকে ছাপিয়ে ক্ষীণ চাঁদের ছটা নদীর শোভাকে আরও মনোরম করে তুলল। তারপরেই একটা বড় মেঘ চাঁদকে আচ্ছন্ন করতেই অন্ধকার গাঢ় হল।

জমিদার—ওই দেখ দুই তীর কেমন অন্ধকার।

রূপচাঁদ—আরে এই এখানে আলোর জগৎ আর এই হচ্ছে বেহস্ত, অন্ধকারে তাকিয়ো না।

বাঈজীর মুদ্রা ও ভঙ্গিমায় অলঙ্কৃত নাচ আর সুমধুর গান শুনে জমিদার আরও কয়েকটি মোহর তাকে দিলে তার নৃত্য আরও লাস্যময় হয়ে উঠল।

হঠাৎ নায়েব বজরার একপাশ থেকে চিৎকার করে বলল—বদরু সব ঠিক আছে তো? বদরু সাড়া দিল না। বজরার নীচে দাঁড়িদের সঙ্গে থেকে বদরু জলের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিল, হঠাৎ ও কি? বিশ-পঁচিশটা কালো হাঁড়ি ভেসে যাচ্ছে বজরার পাশ দিয়ে।

বদরু (চেঁচিয়ে)—নায়েববাবু হুঁশিয়ার। ডাকাত পড়তে পারে। বলতে বলতেই কালো হাঁড়ি মাথায় ডাকাতগুলো একটার পর একটা জল থেকে বজরায় উঠে পড়ল আর আক্রমণ করল দাঁড়িদের। বজরার গতি স্তব্ধ হল।

নায়েব (পুনরায় চিৎকার করে)—ভোলা সর্দার? লাঠিয়ালদের নীচে ডাকো। ডাকাত পড়েছে। ডাকাত পড়েছে।

আওয়াজটা বজরার ওপরে জমিদারের কানে যেতেই তারা আতঙ্কিত ও সজাগ হল। রূপচাঁদ চারজন সড়কি হাতে সশস্ত্ররক্ষী নিজেদের কাছে রেখে দিয়ে আর সব রক্ষীদের নীচে পাঠিয়ে দিল। তুমুল হট্টগোল, চিৎকার ধ্বস্তাধ্বস্তি হতে লাগল। উভয়পক্ষে হতাহত হল কয়েকজন।

রূপচাঁদ—চলো নিশিকান্ত, এই লড়াই-এর ফাঁকে অন্ধকারে সাঁতরে আমরা নদীতীরে পৌঁছাই, তারপর যা হবার হবে। এর পরেই নায়েব, রূপচাঁদ ও নিশিকান্ত বজরার ওপরের সব আলো নিভিয়ে দিল। নীচে একটা কাতর আর্তনাদ শোনা গেল।

'আরে এ যে বদরুর আওয়াজ' 'আর দেরি নয়', বলে জমিদার বাঈজি সিরকি ও নুরমাকেও ডেকে নিয়ে দাঁড়ালো বজরার ধারে অন্ধকারে। অন্যদের জিজ্ঞাসা করল, তোমরা সাঁতার জানো?

সিরকি ও নুরমা—হ্যাঁ হুজুর।

'তবে এসো বলেই ওরা সকলে জলে ঝাঁপ মেরে অন্ধকার তীরের দিকে যেতে লাগল। এদিকে বজরার ডাকাতদল বেশ কিছুক্ষণ লড়াই-এর পর লাঠিয়াল ও রক্ষীদের বেঁধে ফেলে বজরাকে নিয়ে চলল যেদিকে যাচ্ছিল সেইদিকে।

সাঁতার কাটতে কাটতে নিশিকান্তর মনে হল একটা জেলেদের নৌকো সামনের দিক দিয়ে যাচ্ছে। নিশিকান্ত নৌকোর মাঝিকে ডেকে নিজের পরিচয় দিয়ে এক টঙ্কা তার হাতে দিয়ে নিজে উঠল আর বাকি সবাইকে হাত ধরে তুলতে লাগল। সিরকি ও নুরমা পরিবর্তিত পরিস্থিতি দেখে মুষড়ে পড়েছিল। এবার তারা একটু সাহস পেল। নৌকোটা ছোট থাকায় হেলেদুলে চলছিল। দূরে কয়েকটা হায়েনা ও শিয়াল জঙ্গলে ডেকে উঠতেই নুরমা ভয় পেল। তখন বাঈজী ওর পিঠে হাত রাখল।

রাতের তৃতীয় প্রহরে তারা গন্তব্যস্থানের দিকে আসতেই হঠাৎ জোয়ারের জলস্ফীতি হল আর নৌকোটা টালমাটাল করতে করতে কাত হয়ে গেল। ওরা আবার জলে পড়ল। সেইসময় সিরকি ও নুরমা পিছিয়ে পড়েছিল। অকস্মাৎ তার ঘূর্ণিজলে পড়ে চিৎকার করে উঠল। নিশিকান্ত ও রূপচাঁদ দেখল তারা ঘূর্ণীজলে ভেসে যাচ্ছে, তারা দু-একবার হাত তুলল, তারপর চলে গেল জলের তলায়। বাকিরা অতি কষ্টে তটভূমিতে পৌঁছলো। নিশিকান্ত জোরে চিৎকার করে ডাকতেই তার লোকজন লণ্ঠন ও লাঠি নিয়ে ছুটে এসে নিশিকান্ত ও অন্যান্যদের নিয়ে চলল উদ্যানগৃহে। ডাকাতরা বজরা নিয়ে কাছেই ছিল। ওরা লণ্ঠনের আলো দেখে সেদিকে দ্রুত আসতে লাগল কিন্তু জমিদার ও সঙ্গীদল তার আগেই ফটকের দরজা বন্ধ করে ক্লান্ত ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। মেঘ সরে গিয়ে চাঁদ যখন আবার উঁকি মারল বনের মধ্যে প্রাসাদসম গৃহটা নির্জন স্বপ্নের মত পড়ে রইল। একটু পরেই রাতের শেষে পশ্চিমের ঝড়ো হাওয়ায় দিগবিদিকের গাছপালা আন্দোলিত ও মর্মরিত হয়ে রাতকে বিদায় জানাতে লাগল।

বহ্নি জ্বালাও কৃষ্ণচূড়ায়

অমিয় কুমার নন্দী

গ্লোবালাইজেশনের ছোঁয়া। সর্বত্র পরিবর্তনের স্রোত।

কলকাতা শহরেরও আমূল পরিবর্তন শুরু হয়েছে। শুধু আকৃতিগত পরিবর্তন নয়—চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন হয়েছে সীমাহীন। নতুন নতুন রাস্তা, ফ্লাইওভার, অফিস কমপ্লেক্স, লজিস্টিক সেন্টার-ক্যাফেটেরিয়া-রিটেলশপ-বিগ বাজার, হৈ হৈ করে দৈনন্দিন জীবনের ওপর ছাপ ফেলেছে।

শহরের উত্তর থেকে দক্ষিণের পরিব্যাপ্তি ও আধুনিকীকরণের ছোঁয়া অনেক বেশি। মেট্রোরেল উত্তরে দমদম থেকে দক্ষিণে গড়িয়া অবধি ডানা মেলেছে।

আমাদের জীবনে এসেছে নানা নতুন নতুন জিনিস—মাল্টিপ্লেক্স, শপিংমল-সাইবারকাফে-ইন্টারনেট- কলসেন্টার-আইটি-মোবাইল। এছাড়া রয়েছে আইপড-ক্রেডিট কার্ড-ডেবিড কার্ড-এ-টি-এম, আরও কত কি! হাত বাড়ালেই স্বপ্নপূরণের হাতছানি।

রিয়েল এস্টেটের ব্যবসায় নেমে পড়েছে বড় বড় কোম্পানি থেকে মাঝারি ও ছোট কোম্পানিগুলো। অম্বুজা, সপৌজি পালানজি, পিয়ারলেস, মার্লিনের মতো নামি কোম্পানিরা ইস্টার্ন বাইপাস কিংবা নিউটাউন রাজার হাটে উচ্চবৃত্ত-মধ্যবিত্তদের জন্য ফ্ল্যাট তৈরি করেছে। এইসব এল-আইজি, এম্-আইজি ঝাঁ চকচকে ফ্ল্যাটগুলো ওয়েল প্রোটেকটেড্ এবং বাউন্ডারি দিয়ে ঘেরা। সেখানে রয়েছে সুইমিংপুল, জিমখানা, কনফারেন্স হল, কমিউনিটি হল, পার্ক—সব কিছু আধুনিক সুযোগ-সুবিধা গাড়ি রাখার জন্য কভার্ড, পার্কোম্যাট, ব্যাঙ্ক শর্তসাপেক্ষে লোন দিচ্ছে। কিছু কোম্পানি লটারির মাধ্যমে, কিছু কোম্পানি ডাইরেক্ট ডিস্ট্রিবিউট করছে।

বিপ্রতীপ কুহু'র ইন্সপিরেশনে অম্বুজা রিয়্যালিটিতে অ্যাপ্লাই করেছিল—অ্যাপ্লাই করেছিল পিয়ারলেস আবাসনে। কিন্তু তাদের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল না। লটারিতে উঠলো না নাম। অ্যাপ্লিকেশন মানি দুটো কোম্পানিই ফিরত দিয়ে দিলো। অবশেষে বিপ্রতীপ ডাইরেক্ট অ্যাপ্লাই করলো রাজারহাট-নিউটাউনের গ্রিনফিল্ড কম্প্লেক্স-এ পনেরোশো স্কোয়ার ফিটের এল-আইজি ফ্ল্যাটে। ব্যাঙ্ক লোনের ব্যবস্থাও হয়ে গেল। শুরু হয়ে গেল ই-এম-আই দেওয়া।

চারপাশের পরিবর্তনের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে তাকেও অনেক বদলাতে হলো। শৈশব আর কৈশোরের 'ইনট্রোভার্ট' বদনাম ঘুচিয়ে খোলস ছেড়ে, গুটি কেটে বেরিয়ে এলো মাথা উঁচু করে। সারা বিশ্বজুড়ে যে পরিবর্তনের স্রোত

তাকে মেনে নিলেও বিপ্রতীপ সেই পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে গেল না। সে এটা ভালোভাবে উপলব্ধি করেছে যে এই পরিবর্তনের সবটাই ভালো নয়। তার মধ্যে রয়েছে অনেক ক্ষতিকারক জিনিস যা মানব সভ্যতার পরিপন্থী। তবু মানব সভ্যতার উৎকর্ষ বাড়াতে গেলে আমাদের জীবনের মান বাড়াতে গেলে নতুন নতুন আবিষ্কারকে সাদরে গ্রহণ করতে হবে, দৈনন্দিন জীবনে তার ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠবে একটা সময়। সুদূর অস্ট্রেলিয়ায় রয়েছে কুহু। কত হাজার, মাইল দূরে। অথচ বিপ্রতীপ তার ইন্টারনেটে 'ওয়েভ ক্যাম' টেকনোলজির দৌলতে কুহুকে দেখতে পাচ্ছে তার সাথে কথা বলতে পারছে। কমপিউটারে লাগানো রয়েছে একটা ক্যামেরা একদিকে যার সাহায্যে পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছে আর একদিকে রয়েছে মাউথপিস, যার সাহায্যে ওরা কথা বলতে পারছে। তবু কুহু তার আকাঙ্ক্ষার কথা অকপটে চিঠি লিখে বিপ্রতীপকে জানিয়েছে—'রিপ্, দূর থেকে আমার আদর আর ভালোবাসা তোমার শরীর ছুঁতে পারছে না।, শুধু 'ওয়েভ ক্যামে'র সাহায্যে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি—কথা বলতে পারছি। কি যন্ত্রণা বলতো? তোমাকে বড্ড কষ্ট দিচ্ছি বিপ—কষ্ট পাচ্ছি আমি। একটা সুস্থ স্বাভাবিক পরিণত মানুষ আর কতদিন আমার এ অত্যাচার সহ্য করবে? তোমারও তো একটা ধৈর্য্যের সীমা আছে।' কুহুর কত সহজ-সরল স্বীকারোক্তি—'আর কতদিন আমাদের কামনা-বাসনাকে মনের অন্ধ কুঠুরিতে বন্দি করে রাখবো।' চিঠিতে একটা সুখবর দিয়েছে কুহু—তার পারফরম্যান্স রিভিউ মিটিংয়ে রিজোনাল হেড মিঃ হফম্যান তার পারফরম্যান্সের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে প্রেসিডেন্ট (পার্সোনাল)-এর কাছে কনফিডেন্সিয়াল লেটার পাঠিয়েছেন। খুব শীঘ্র প্রমোশন নিয়ে কুহু কলকাতায় আসছে—হয়তো আর মাস দুয়েক লাগবে।

বিপ্রতীপ প্রায়ই কমপিউটারের সামনে বসে 'ওয়েভক্যামের' সাহায্যে কুহু'র সাথে কথা বলে। তাকে দেখতে পায়—তার চলাফেরা অঙ্গভঙ্গি সবই পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে লক্ষ করে। তবুও তার চিঠিতে এক সহজ সরল স্বীকারোক্তি—'আর কতদিন আমাদের কামনা-বাসনাকে মনের অন্ধকুঠুরিতে বন্দি করে রাখবো?' নারী আর পুরুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক সহজাত কামনা-বাসনা আর মিলনের আকাঙ্ক্ষা—সেই কথাটা কত সহজভাবে বোল্ডভাবে বলে দিল কুহু। তার এই কথাটা বিপ্রতীপকে আজ সারাদিন ভাবিয়ে তুললো। রাতে শোবার সময় তার মনটা প্রথমে বিষাদে গেল ভরে, তার পাশে তো কুহু নেই। কিছুতেই ঘুম আসছিল না। ও সেই মুহূর্তে কুহুকে শারীরিকভাবে পেতে চাইল। পর মুহূর্তে তার ভাবনায় এল কুহু দু-মাস পরে আসছে। কেটে গেল তার বিষাদ, তার হৃদয়তন্ত্রীতে যেন মল্লার রাগ বেজে উঠলো এক অনাস্বাদিত আনন্দে। আসতে আসতে ঘুমে জুড়ে এল চোখের পাতা। ঘুমিয়ে পড়লো বিপ্রতীপ।

ঘুমের মধ্যে এতদিন পরে ও এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে। বাহিরে যেন প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে। সেই ঝড় বৃষ্টিতে দরজা খোলার আওয়াজ—স্পষ্ট কুহুর পায়ের শব্দ—তার নূপুরের নিক্কণ ধ্বনি পেলো শুনতে। তারপর তার পাশে যেন কুহু শুয়ে আছে—তার শরীরের উষ্ণতার ছোঁয়া অনুভব করলো। জানলা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট এসে যখন বিপ্রতীপের গায়ে লাগলো তখন তার ঘুম ভেঙে গেল। ও হাত বাড়িয়ে কুহুকে স্পর্শ করতে গেলো। ওর পাশে কুহু নেই-কেউ নেই। বিপ্রতীপ বুঝতে পারলো আজ ও কুহুকে স্বপ্নে দেখেছে। একটা সুখের অনুভূতি আর আবেশে ও আবার পড়লো ঘুমিয়ে।

খুব ভোরে বিপ্রতীপের ঘুম গেল ভেঙে। ও উঠে পড়ে হাতমুখ ধুয়ে চলে গেল কিচেনে। অনেকদিন পরে তৈরি করলো নিজের জন্য এক কাপ চা। চা-টা নিয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে বেতের চেয়ারে বসলো। ধরালো একটা সিগারেট। সচরাচর বাড়িতে সিগারেট খায় না বিপ্রতীপ। আজ আয়েস করে চায়ের সাথে দিল সিগারেটের সুখটান। টেনে নিল তার ডায়েরিটা—লিখলো একটা কবিতা। আদৌ সেটা কবিতা হয়ে উঠলো কিনা ও জানে না। তবু সেই লেখাটা শুধু সে কুহুকে পড়াবে—কুহু বিদেশ থেকে ফিরে এলে। বিপ্রতীপ লিখতে শুরু করলো তার মনের মধ্যে ভেসে বেড়ানো স্বপ্নের ছবিটা—যেটা কালরাত্রে দেখেছিল—সেটা হয়ে উঠলো একটা ভালোবাসার কবিতা শুধু নিজের জন্য—কুহুর জন্য—

'কাল রাতে ভাঙিয়ে দিলে ঘুম, যখন বৃষ্টি এসেছিল
অথচ তুমি ছিলে না পাশে কেউ ছিল না।
বাহিরে অঝোর ধারা, তুমুল ঝড়
স্পষ্ট তোমার পায়ের শব্দ নূপুরের নিক্কণ
দরজা খোলার আওয়াজ।

দোলাচলে পড়ি : স্বপ্নে তোমার উষ্ণতার ছোঁয়া
নাকি জাগরণে এসেছিলে তুমি!
ভিজে গেছে ঘর
দরজা খোলেনি
বৃষ্টি এসেছিলো
শুধু তুমি আসোনি।'

ডায়েরটা বন্ধ করে বিপ্রতীপ প্রাতঃকৃত করার জন্য টয়লেটে গেল। টয়লেট থেকে বের হয়ে জামাকাপড় পরে নিল—বাহিরে যাবার জন্য। আজকাল সকাল বেলা মর্নিংওয়াক শুরু করেছে। ইদানীং শরীরে মেদের কিছু আধিক্য লক্ষ করছে।

সে ফাস্টফুড জাঙ্ক ফুড শেষ কবে খেয়েছে মনে করতে পারলো না। ও-সব ধরনের খাবার তার একেবারেই পছন্দ নয়। তবু মধ্যবয়সি লোকেদের শরীরে বাড়তি কিছু মেদ জমা হয়। বাড়তি মেদ ঝরানোর একমাত্র পন্থা মর্নিংওয়াক করা। সিমলা স্ট্রিটে বিবেকানন্দের বাড়ির ছ-সাতটা বাড়ি পরেই তার বাড়ি। বিবেকানন্দের বাড়ির গা ঘেঁসে হরিপদ দত্ত লেনে যেকটা বাড়ি ছিল সব কটা বাড়ি ভেঙে নতুন স্মৃতিমন্দির তৈরি হয়েছে বিবেকানন্দের—বেশ কয়েক বছর হয়েছে। বিবেকানন্দ সোসাইটি উপযুক্ত কমপেনসেশন দিয়েছে তার জন্য বাড়ির মালিকদের। সেদিক থেকে বাড়িওয়ালাদের কোনো অভিযোগ-অনুযোগ নেই। বরঞ্চ এতবড় একটা মহৎ কাজে নিজেদের নিয়োজিত করার জন্য ভারতবাসী হিসাবে গর্বিত মনে করেছে—অবশ্য অর্থমূল্যের বিনিময়ে। ভাবলে অবাক লাগে হরিপদ দত্ত লেনের একটা বাড়িতে বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন্দ্রনাথ দত্তের জন্ম হয়েছিল—তখনও তিনি বিবেকানন্দ হননি। তারপর বড় হয়ে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আমেরিকা গিয়ে হিন্দু ধর্মের মহাসম্মেলনে অংশগ্রহণ করে পৃথিবী জয় করলেন। এ ইতিহাস তো সবারই জানা। বিপ্রতীপের ভাবতে গর্ব লাগে তার বাড়ির চার পাঁচটা বাড়ি পরে বিবেকান্দের মতো একজন মহামানবের জন্ম হয়েছিল। হরিপদ দত্ত লেনের সরু গলিটা শেষ হয়েছে বিধান সরণিতে। বিবেকানন্দের স্মৃতি মন্দিরের পাশেই বীর সন্ন্যাসীর মাথা উঁচু করা স্ট্যাচুটা যেন সারা ভারতবাসীকে অভয়মন্ত্র দান করছেন। বিধান সরণির ট্রাম লাইনের ধারে যেখানে স্ট্যাচুটা তৈরি হয়েছে সেখানে আগে ছিল বিখ্যাত 'চাচার দোকান'। চাচার দোকান এখন ট্রাম লাইন পেরিয়ে উল্টো ফুটপাতে। ফুটপাত দিয়ে হেঁটে গেলে পাওয়া যাবে চপ্-কাটলেট-এর মন মাতাল করা গন্ধ।

সিমলা স্ট্রিট থেকে গিরীশ পার্ক খুব বেশি হলে ছ থেকে সাত মিনিটের রাস্তা। কলকাতায় থাকলে বিপ্রতীপের ডিউটিই হচ্ছে খুব ভোরবেলা উঠে গিরীশ পার্কে গিয়ে মর্নিংওয়াক করা। প্রথমদিন থেকেই সে সঙ্গী পেয়ে গেল একজন ডাক্তার, একজন অ্যাডভোকেট আর একজন বিজনেসম্যান। তিনজনই মধ্যবয়স্ক —পঞ্চাশের মধ্যেই বয়স। প্রশান্ত বোস যিনি ডাক্তার, তিনি জেনারেল প্রাকটিস করেন বিডন স্ট্রিটে। বিডন স্ট্রিটেই বাড়ি। অ্যাডভোকেট অভ্রান্ত মাইতি থাকেন ছাতুবাবু বাজারের কাছে, সিটি সিভিল কোর্টে সিভিল প্রাকটিস করেন। প্রমোদ ধরের প্রিন্টিং-এর বিজনেস, থাকেন কাশী বোস লেনে। চারজনে বেশ জোরে হাঁটা শুরু করে পার্কটাকে পাক খেতে থাকে। জোরে না হাঁটলে ঘাম ঝরবে না, আর ঘাম না ঝরলে মেদ কমবে না। মেদ বর্জন করতে গেলে জোরেই হাঁটা দরকার—এ নিয়মটাকে চারজনে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। তাই হাঁটার সময় খুব একটা কথা বলা হয় না। কয়েকটা পাক দেবার পর তারা একটু ক্লান্ত হলে

পার্কের বেঞ্চে বসে। ভাঁড়ে চা খায় আর গল্পে মেতে ওঠে।

ডাক্তার-উকিল আর বিজনেসম্যান তিনজনই বিবাহিত এবং কারো পুত্র বা কারো বা কন্যা সন্তান আছে। বিপ্রতীপ এ ব্যাপারে একেবারে সাইলেন্স না থেকে স্পষ্টই বলে দেয় সেও বিবাহিত এবং তার স্ত্রী অস্ট্রেলিয়ায় চাকুরি করে—শীঘ্র কলকাতায় ফিরে আসছে। এ ব্যাপারে তাদের কৌতূহল থাকলেও এর বেশি একটা বাড়তি কথা বলে তাদের কৌতূহলকে আরও উশকে দেয়নি। একেবারে স্পেলবাউন্ড থাকে। মর্নিওয়াক শেষ করে বিপ্রতীপ বাড়ি ফিরে আসে। মণিমাসিকে বলে ব্রেকফাস্ট দিতে। আজ বাজার যাবার ইচ্ছেও নেই—তাই মণিমাসিকে বাজারের ভার দিয়ে দেয়।

দশ বছরের ওপর মণিমাসি রয়েছে, বিধবা বয়স্কা ভদ্রমহিলা—যার তিনকূলেও কেউ নেই। সন্তানাদি হয়নি। বাড়ির সব কাজই করে। বিপ্রতীপ তাকে যথেষ্ট সম্মান করে, মর্যাদা দেয়।

আজ বিপ্রতীপ বাড়িতে রয়েছে। অফিস মিটিং শুরু হবে বেলা তিনটেয়, শেষ হতে হতে দশটা বেজে যাবে। প্রথমে আর-এস-এম দের সাথে, তারপর এ-এস-এম দের সাথে সর্বশেষে এম-আর দের সাথে আলাদা আলাদ ভাবে। প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল ভাবে বক্তব্য শুনবে, কারো কোনো প্রিভেন্স আছে কিনা, কারো পারফর্মেন্স পুওর হলে তার কারণটা খুঁজে বের করে ডেভেলাপ্ করা। তার আন্ডারে চারজন আর-এস-এম, ষোলোজন এ-এস-এম এবং আটচল্লিশজন এম-আর। ইস্টার্ন জোনের জোনাল ম্যানেজার হিসাবে বিপ্রতীপের পোস্টটা যেমন সম্মানীয় তার দায়-দায়িত্বও অনেক।

বাড়িতে বসে বিপ্রতীপ অনেকক্ষণ ধরে হোমওয়ার্ক করলো মিটিং-এর জন্য। অফিসের সমস্ত দরকারি পেপার সাজিয়ে নিল ব্যাগে। লাঞ্চ খেয়ে বিপ্রতীপ বাড়ি থেকে বের হল ঠিক দুটোয়। ওর বাড়ি থেকে ট্যাক্সিতে বড়জোর বিশ মিনিট লাগবে বেলেঘাটার ফুলবাগানের মোড়ে আসতে। ফুলবাগানের মোড়ে যে বড় বাটার দোকান রয়েছে তার ঠিক পাশেই ওদের সেলস্ অফিস।

মিটিং শেষ হতে দশটা বেজে গেল। মাঝে ঘন্টাখানেক রিসেস আওয়ার ছিল। রিসেস আওয়ারে হাল্কা রিফ্রেশমেন্ট দেওয়া হয়, কফি সার্ভ করা হয়। রাত এগারোটার মধ্যে বিপ্রতীপ বাড়ি ফিরে এল মিটিং শেষ করে। ডিনার শেষ করে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। ধরাল একটা সিগারেট। রাতের আকাশের দিকে তাকায়—ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ ঘুরে বেড়াচ্ছে। চাপা পড়ে যায় মাঝে মাঝে চাঁদ। আকাশ ভরা তারা। মেঘের গায়ে লেগে আছে অদ্ভুত এক উজ্জ্বল ধূসরতা। বিপ্রতীপ অনেক দিন তাকায়নি রাতের আকাশের দিকে।

ঘরে ফিরে এসে বসলো কমপিউটার টেবিলে কুহুর সাথে কথা বলবে বলে।

সুইচ অন করলো কমপিউটারের। কথা বললো কুহুর সাথে ওয়েভক্যাম চালু করে। মনটা বেশ হালকা হালকা লাগছে। ও বন্ধ করলো কমপিউটারের সুইচ। বার করলো মোবাইল ফোন। সুইচ অন করে দেখে নিল মিসড্‌কল অ্যালার্টের লিস্ট। জানাশোনা কারোর ফোন নেই। ওয়েভ ক্যাম টেকনোলজি আসার ফলে কুহুর সাথে ফোনাফুনি অনেক কমে গেছে। অনেকগুলো অচেনা নম্বর মিসড্‌কল লিস্টে জমা পড়েছে। বিপ্রতীপ পুরো মিসড্‌কল লিস্ট ডিলিট করলো। ঠিক এই সময় একটা ফোন এল—রবীন্দ্রসঙ্গীতের নির্দিষ্ট চেনা সুরটা বেজে উঠলো অনেক দিন পর। অরিন্দমের ফোন।

—'কি ব্যাপার ডাক্তারবাবু, ফোন নেই কেন? নতুন কোনো রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি!'

ওদিকে অরিন্দমের গলা—'বিপদা তোমাকে একটা স্টান্ট দেবো বলে এতদিন চুপচাপ ছিলাম। বুদ্ধি শানাচ্ছিলাম কীভাবে ঘটনাগুলো বলবো তোমার কাছে।'

—'মোনালিসার রহস্য নিশ্চয়ই উদঘাটনের পথে?'

উনত্রিশ বছরের মোনালিসা পাল অরিন্দমের কাছে পেশেন্ট হয়ে এসেছিল। তাকে দেখে অরিন্দম একেবারে কাত। অরিন্দমের কথাতেই বলতে হয়—'যেমন অসাধারণ গ্লামারাস তেমনি ভলাপ্‌চিউয়াস। যে কোনো পুরুষের বুকে লাগিয়ে দেবে আগুন কিংবা তুলবে ঝড়। প্রফেসন্যালি হাইলি কোয়ালিফায়েড্‌, যোগমায়া দেবী কলেজের পার্টটাইম লেকচারার এবং অব্‌ভিয়াসলি আনম্যারেড এবং দাঁতের যন্ত্রণায় কাতর। একমাস আগে এসেছিল এই হতভাগ্য ডেন্টিস্ট-এর কাছে।

—'বিপদা কাল সন্ধেবেলা আমার বাড়িতে চলে এসো। বসবে চায়ের মজলিশ। ড্রিঙ্কস-এর নয় কিন্তু, প্লিজ দেরি করো না। অনেক কথা আছে। কাল শনিবার, ইভিনিংটা অফ রাখি চেম্বার।'

—অরিন্দম হঠাৎ স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে উঠলো নাকি? শরীরে কি মেদের আধিক্য হচ্ছে? যাক নো মোর ড্রিঙ্কস। থ্রি চিয়ার্স ফর টি পার্টি! আমার একটা সমস্যা হয়েছে অরিন্দম। সকালে উঠে দৌড়তে না হলেও মর্নিংওয়াক করতে হচ্ছে, বাড়তি মেদ ঝরানোর তাগিদে। আর দু-মাসের মধ্যে কুহু ফিরে আসছে, বুঝতেই পারছো ডাক্তার!

ও পাশ থেকে অরিন্দম হেসে ওঠে 'কুহুদি আসছে, তোমাকে সেলিব্রেড করতে হবে একটা বড় পার্টি দিয়ে, আমি কিন্তু ছাড়ছি না বিপদা'।

'এতদিন শরীরটাকে ঝরঝরে ফিটফাট করার কোনো তাগিদ অনুভব করনি। জমতে দিয়েছ মেদ। এবার ঠেলা সামলাও বাড়তি মেদের।'

—'অরিন্দম সময় খুব কম, মাত্র দু-মাস। এত দৌড়ঝাঁপ করি, তবুও দেখো

কী অনাসৃষ্টি! ওয়েভক্যামের ক্যামেরায় আমার চেহারা দেখে কুহু বার বার সাবধান করে দিয়েছে। বিপ্, ওয়েট কমাও। বয়স হচ্ছে, সুগার হাইপ্রেসার থেকে বাঁচতে হলে ওয়েট কমাও। সুগার হাইপ্রেসার থেকে বাঁচতে হলে ওয়েট কমাতেই হবে। তুমি চাও না একটা নিরোগ সুন্দর জীবন?' কুহুকে সেদিন থামিয়ে দিয়ে কথা দিয়েছিলাম ওয়েট কমাবোই, বাড়তি মেদ ঝরাবোই, এটা আমার প্রতিজ্ঞা।'

—বিপ্‌দা, তোমাকে দেখে আমার হিংসে হয়। তোমরা পরস্পরকে কত ভালোবাস! ভালোবাসা বোধহয় সব পারে। চনমনে মন আর ঝরঝরে শরীর নিয়ে বেঁচে থাকার মানেটাকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয় আমাদের। তোমাদের দুজনের যেন আমি আইডল ওয়ারশিপার হয়ে পড়েছি বিপ্‌দা। মোনালিসা উপাখ্যান যত এগোচ্ছে তত যেন তোমাদের ফলোয়ার হয়ে উঠেছি।

—অরিন্দম আমাদের এত ওপরে তুলো না। কখন মই কেড়ে নেবে কে বলতে পারে। 'মোনালিসার উপাখ্যান' খুব শীঘ্রই 'মধুরেণ সমাপেয়ৎ' হবে, ব্রাদার চিন্তা করো না। চালিয়ে যাও পানসি মাঝদরিয়ায়। ডোববার ভয় নেই। তুমি তো খুব দক্ষ সাঁতারু, মেনোলিসাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাও—উজানের হাওয়া লেগেছে, তোমার ভয় কি?

—বিপদা তোমরা যে রাস্তা দেখিয়েছ, সেই রাস্তা ধরেই এগিয়ে যাচ্ছি। দা-ভিঞ্চির 'মোনালিসা'র মতো ওর হাসিটা অত দুর্বোধ্য মনে হল না। বেশ হাসিখুশি। প্রাণবন্ত। তার চোখের তারায় রয়েছে নীরব সম্মতি, হাসিতে ঝরে পড়ছে যেন সেতারের মূর্ছনা। কুহুদি এই সময় থাকলে খুব ভালো হতো। কাজটা অনেক ইজি হয়ে যেতো।

—অরিন্দম কুহুকে পেতে গেলে এখনও দু-মাস। এই দু-মাসে কতটা ইম্প্রুভমেন্ট হবে দেখবো। দেখবো তুমি কতটা দক্ষ সাঁতারু। রবি ঠাকুরের কবিতাটা তোমার মনে নেই? 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে'...

—'একলাই চলতে হবে দেখছি' হাসতে থাকে অরিন্দম। বিপদা, ছাড়ছি তা হলে। কাল সন্ধেবেলা অবশ্যই আসছো—অনেক কথা আছে।

অরিন্দম আজ অনেক পরিণত ও প্রতিষ্ঠিত। হাজরার মোড়ে তার এ.সি চেম্বার। পাশেই বারোশো স্কোয়ার ফিটের সুসজ্জিত ফ্ল্যাট, তিনতলায়। পুরোনো ভাড়াবাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। দাদা বৌদি ও ভাইপোকে নিজের ফ্ল্যাটে এনে রেখেছে। বিপ্রতীপ যখন সন্ধেবেলায় অরিন্দেম ফ্ল্যাটে এসে পৌঁছল তখন আগেই একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। সকাল থেকেই আকাশ ছিল আংশিক মেঘলা। বৈশাখের আকাশে জলভরা মেঘের মিছিল বলে দিচ্ছিল বৃষ্টি আসছে। এদিন দিনভর ঝোড়ো হাওয়া চলছিলই। হাওয়াতে ছিল বৃষ্টি বৃষ্টি গন্ধ। মনে হচ্ছিল কাছে-পিঠে কোথাও যেন বৃষ্টি হচ্ছে। আনকভারড বারান্দাটা বৃষ্টি ভেজা। ওরা ডাইনিং

রুমে বসলো। অরিন্দম এ.সি চালু করে দিল। এসে গেল গরম চা, সাথে বিস্কিট, স্ন্যাক্স, চানাচুড়। চা আর স্ন্যাক্স খেতে খেতে জমে উঠলো আড্ডাটা। বিপ্রতীপ পকেট থেকে বার করলো সিগারেটের প্যাকেট। বাড়িয়ে দিলো অরিন্দমের দিকে। চা আর সিগারেটে টান দিয়ে অরিন্দম ওর মুড খুঁজে পেল। মনের সব কথা বলা যায় একমাত্র তার বিপ্‌দাকে।

অরিন্দম খুব নিখুঁতভাবে বর্ণনা দিয়ে চলেছে ওর চেম্বার, ওর কাজ আর যাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে ওর উচ্ছ্বাস, আবেগ—সেই মোনালিসা পালের।

প্রায় মাসখানেক আগে মোনালিসা এসেছিল। অরিন্দম এক্সরে করে বুঝতে পারে ওর একটা দাঁত খারাপ হয়েছে, তুলতে হবে আর দুটো দাঁতে রুটক্যান্যাল সিস্টেম, যেটা কতকগুলো সিটিং-এর মাধ্যমে করা হয়। সেই দিনই ওর ফি, পার সিটিং-এর কত খরচ ইত্যাদি বলেছিল। দাঁত তুলে ওষুধ লিখে দশদিন পরে আসতে বলে।

পাক্কা দশদিন পরে মোনালিসা পাল এসেছে। প্রথম দিনে পরে এসেছিল জিনস আর টপ। সেদিন জিনস আর অফ-হোয়াইট টপে মোনালিসাকে গর্জাস আর ভলাপ্‌চিউয়াস লাগছিল। ঠিক দশদিন পরে পরে এসেছিল শাড়ি। সি গ্রিন রঙা ক্রেপ। শাড়ির জমিতে সাদা আর গ্রিন রঙের বড় বড় এমব্রয়ডারি করা ফুল। পাড়ে আলাদা করে বসানো হয়েছে সিলভার টিস্যু আর ব্লু ব্রোকেডের পট্টি। একটা নরম, পেলব টাচ্ রয়েছে পুরো শাড়িতে। শাড়ির সাথে কম্বিনেশন করা ব্লাউজ। গলায় নবরত্ন সেট। ভিক্টোরিয়ান স্টাইলের নেকলেস। কানে ওই একই ডিজাইনের লম্বা দুল। হাতে সোনালি ও মিনের একটা চওড়া ধরনের চুড়ি। কাঁধ অবধি চুলে খোলা হাওয়ার ঢেউ খেলে যাচ্ছে। অরিন্দমের আজ মোনালিসা পালকে এক কথায় স্যুপার্ব লাগছিল। কাচ-ঘেরা এ.সি চেম্বারে মৃদুসুরে বেজে চলেছে রবিশঙ্করের সেতারের মূর্ছনা। আজকাল অনেক বড় ডেন্টিস্টের চেম্বারে রাখা থাকে মিউজিক সিস্টেম পেশেন্টের মন চাঙ্গা করার জন্য।

ইনস্টুমেন্টগুলো স্টেরিলাইজ করার জন্য অরিন্দম অটোক্লেভের সুইস অন করে। ডুবিয়ে দেয় সেগুলো অটোক্লেভের চৌকো স্টিলের পাত্রের জলে। বিভিন্ন নম্বরের স্টেরিলাইজড্ করা নিড্‌লগুলো বাক্সসমেত বার করে, যেগুলো ছিল ছোট কাচের র‍্যাকে। পরে নেয় সাদা রঙের টুপি আর মুখের মাস্ক। এ যেন অপারেশন করতে নামার আগে সার্জেন-এর প্রস্তুতি।

রুট ক্যান্যাল সিস্টেম অনেকটা যেন মেয়েদের এম্‌ব্রয়ডারি কাজের মতো সূক্ষ্ম সুন্দর সূচিকর্ম। বেশ ধৈর্য ধরে আর সময় ব্যয় করে করতে হয়।

অরিন্দম পার সিটিং-এ চার্জ নেয় দেড় হাজার টাকা। একটু আগে কাচের র‍্যাক থেকে যে স্টিলের বাক্সটা ও নামাল, তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন নম্বরের

স্টেরিলাইজড্ করা নিডল, সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম। সূক্ষ্মতার তারতম্য অনুসারে পর্যায়ক্রমে সাজানো। বাক্সটার ঢাকনিটা খুলে দেখে নিল সব ঠিক আছে কিনা।

প্রয়োজনীয় ইনস্ট্রুমেন্টগুলো ইতিমধ্যে স্টেরিলাইজড্ হয়ে গেছে। ও অটোক্লেভের সুইস অফ করে। 'ফরসেফ' দিয়ে একটা একটা করে তুলে ট্রেতে সেগুলো রাখলো। অরিন্দমের নির্দেশে মোনালিসা বিশেষ ধরনের চেয়ারটায় এসে বসে। গদি-মোড়া ডেন্টাল চেয়ারটায় লাগানো আছে এয়ার ভ্যাকুয়্যাম সিস্টেম। ইচ্ছেমতো চেয়ারটা নামানো যায় তোলা যায়, ঘোরানো যায় পেসেন্টের সুবিধা অনুসারে।

মোনালিসা মুখ ব্যাদান করে বসে আছে। মাথার ওপরে থাকা মুভেবল স্পটলাইটা অন করে নামিয়ে আনলো ঠিক মোনালিসার মুখ আর মুখগহ্বরের কাছে। এখন ওর দন্তকৌমদীর সারি অরিন্দম দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট। ও একটা সুইস অপারেট করার সাথে সাথে সরু স্টিলের নলের মধ্য দিয়ে পিচকারির মতো ফিনকি দিয়ে জলধারা বের হয়, ধুয়ে দেয় মোনালিসার দাঁতের খাঁজ, যে দাঁতটা রুট ক্যান্যাল করবে।

নির্দিষ্ট স্টিলের বাক্সটা থেকে নির্দিষ্ট নাম্বারের নিডল বার করে কাজ করে অরিন্দম। কাজ শেষ হলে পাশে রাখা ফাঁকা ট্রের ওপর রেখে দেয়। মোনালিসাকে গ্লাসে রাখা জল দিয়ে 'কুলি' করতে বলে। আবার অন্য একটা নাম্বারের নিডল বার করে দাঁতের মধ্যে সূক্ষ্ম কাজ করে, কাজ শেষ হলে একইভাবে ফাঁকা ট্রেতে রেখে দেয়। প্রত্যেকবার মোনালিসাকে 'কুলি' করতে বলে। এভাবে পর্যায়ক্রমে অনেকগুলো বিভিন্ন নম্বরের নিডল দিয়ে নির্দিষ্ট দাঁতের কাজ শেষ করলো যখন তখন ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় পার হয়ে গেছে।

অরিন্দম মাস্ক ও টুপি খুলে ফেললো। মোনালিসাকে অন্য একটা সাধারণ গদি-আঁটা চেয়ারে বসতে বলে।

তখন মিউজিক সিস্টেমে রবিশঙ্করের সেতারের মূর্ছনা শেষ হয়েছে, শুরু হয়েছে স্বর্ণালী দিনের স্বর্ণকণ্ঠী গায়ক হেমন্ত মুখার্জির 'মন কেমন করা' গানের সুর, খুব মৃদু সুরে।

মোনালিসা কাচের ঘরটা একবার জরিপ করে নিয়ে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালো অরিন্দমের দিকে—'আপনার রুচিকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। চেম্বারটা খুবই সুন্দর আর আপনার হাতটা খুব ভালো।'

এতগুলো কম্প্লিমেন্টস পেয়েও ও কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলো না। কৃত্রিম গাম্ভীর্য নিয়ে অন্য প্রশ্নান্তরে চলে গেল।

—যোগমায়া দেবী কলেজটা মর্নিং কলেজ না?

মোনালিসা ঘাড় নাড়ে—'এই তো সামনেই আমাদের কলেজ। হাজরার মোড় থেকে পাঁচ মিনিটের রাস্তা।'

—'কোন্ সাবজেক্টের লেকচারার?'

মোনালিসা হেসে ফেলে, বলে 'ইংলিশ' একটু থেমে বলে, 'লেকচারার নয় বলুন পার্টটাইম লেকচারার। এম. এ, এম ফিল করেও একটা ফুলটাইম লেকচারশিপ এখনও জোটেনি।'

অরিন্দম স্বান্ত্বনা দেয়—'জানেন তো বাংলায় 'সবুরে মেওয়া ফলে' বলে একটা কথা আছে। দিনক্ষণ সময় যখন আসবে ঠিকই হবে।'

'নেট, সেট পরীক্ষা দিয়েছিলেন?'

—'না। এখন পর্যন্ত দেওয়ার প্রস্তুতি নিইনি। অনেকদিন ধরে তো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, হচ্ছেটা কোথায়?' মোনালিসার কথায় হাতাশা ঝরে পড়ে।

এই 'না' হওয়ার কারণটা অরিন্দমের জানা নেই। তবু সে সমব্যথী হয়ে বলে 'গাছকে ফল পাকার সময়টা তো দিতেই হবে মিস পাল। দ্যাখেননি পাতা ঝরার পর সবুজের সমারোহ! ভাটা না শেষ হলে জোয়ার তো লাগবে না!' 'যাক অনেক কথা বলে ফেললাম, সরি'।

মোনালিসা বলে ওঠে—'না না আপনি ঠিকই বলেছেন। সময় না হলে কিছুই হবে না'।

এখন কেউ কোনো কথা বলছে না। দুজনেই স্পেলবাউন্ড।

অরিন্দম ওর প্রেসক্রিপশন প্যাডে খসখস করে তারিখ, পেশেন্টের নাম, বয়স আর ওষুধ লিখে দেয়। লিখতে ভুললো না পরিমাপ আর খাওয়ার পদ্ধতি। ভালো করে আবার বুঝিয়ে দিলো সেগুলো, সতর্ক করে দিল ঠিক সময় যেন খাওয়া হয়। সাতদিন পরে অবশ্যই আসতে হবে নেক্সট সিটিং-এর জন্য। এটা একটা কনটিনিউয়াস প্রসেস। আরও পাঁচটা সিটিং বাকি রইল।

মোনালিসা হ্যান্ডব্যাগ খুলে পেমেন্ট করে মৃদু হেসে বলে, 'কোনো অসুবিধা হলে ফোন করতে পারি?'

—'অবশ্যই অবশ্যই। মোবাইল নম্বর দেওয়া আছে প্যাডের ওপর। কোন দরকার লাগলে, কোনো অসুবিধা হলে ফোন করবেন।' অরিন্দম কাচের সুইং ডোর খুলে একপাশে দাঁড়ায়। ওকে যাবার রাস্তা করে দেয়। মোনালিসা 'আসি' বলে লঘু পায়ে এগোয়।

মোনালিসা যখন বেরিয়ে গেল একটা ঢেউ তুলে, পারফিউম-এর মৃদু সুগন্ধ ছড়িয়ে তখন অরিন্দমের মনে হল, 'মোনালিসা' তার হার্টথ্রব নেক্সট সিটিংগুলোতে নিজেকে যেন আরো বেশি করে মেলে দেবে।

তারপরের পাঁচটা সিটিং-এ সত্যি মোনালিসা নিজেকে মেলে ধরলো আরও

বেশি করে। বেলতলা রোডে তার বাড়ি। বাবা নেই। বিধবা মা আর ছোট বোনকে নিয়েই তাদের সংসার। বোন আশুতোষ কলেজের মর্নিং সেকশন অর্থাৎ যোগমায়া দেবী কলেজে ফাস্ট ইয়ার, ইংলিশ অনার্স নিয়ে পড়ে। বাবা ফায়ার ব্রিগেডের অফিসার ছিলেন। বেলতলা রোডে ছোট একটা বাড়ি সার্ভিস-এ থাকা অবস্থায় করেছিলেনে। একটা রোড অ্যাকসিডেন্টে মোনালিসার বাবা মারা যান। পাঁচটা সিটিং শেষ হবার পর মোনালিসার ছোট বোন অনুরাধাকে দাঁতের জন্য নিয়ে আসে, তার একটা দাঁতে রুট ক্যান্যাল সিস্টেম হবে। যথারীতি অনুরাধাকে নিয়ে মোনালিসা আসতে শুরু করে। দেখতে দেখতে তিনটে সিটিংও শেষ হয়। এবারে অরিন্দম বোঝাতে পেরেছে তার ইন্টারেস্টিং-এর কথা। স্বভাবতই তাদের দুজনের অরিন্দমদা হয়েছে সে। ফলে পয়সা নেয়নি, ফ্রি সার্ভিস দিয়েছে।

এতক্ষণ অরিন্দম মোনালিসার আখ্যান বলে গেলো তার বিপদাকে। বিপ্রতীপ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওকে 'বিশ্বের তাবড় তাবড় জ্ঞানীরা রহস্যময়ী মোনালিসার দুর্ভেদ্য হাসির ব্যাখ্যা করে উঠতে পারেনি, আর এত অল্প সময়ের মধ্যে কত সহজে 'জীবন্ত মোনালিসার' হাসির রহস্য উন্মোচন করার পথে এগিয়ে গেলে অরিন্দম। এটা একটা তোমার বিরাট অ্যাচিভমেন্ট বলতেই হবে।'

অরিন্দম এতদিন যে ভালোবাসার কোনো তাগিদ অনুভব করেনি, সকলের অজান্তে সেই ভালোবাসা তার দরজায় কড়া নেড়ে গেল। তাকে ফেরাবার শক্তি তার নেই। সে ফিরে পেয়েছে জীবনের ছন্দ, একটা ছন্দময় জীবন খুঁজে পেয়েছে নতুন করে তার দিশা।

মোনালিসার আখ্যান শেষ হতে আরও এক রাউন্ড চা এলো, চিপস্ এলো। ওরা দুজন দুটো সিগারেট ধরালো। বিপ্রতীপ মোনালিসাকে ফোন করতে বললো। অরিন্দমের মোবাইলে মোনালিসার নম্বর স্টোর করা আছে।

'অরিন্দম, মাঝে মাঝে ফোন করে যোগাযোগ রেখো তাতে ইন্টিমেসি হয়। কাছাকাছি কোথাও বেড়াবার প্রোগ্রাম করো ছুটির দিনগুলোতে। একদিন আমার বাড়িতে নিয়ে আসতে পারো।'—বলল বিপ্রতীপ।

অরিন্দম পাশের ঘরে গিয়ে মোনালিসাকে ফোন করলো এবং দশ মিনিট পর ফিরে এলো যখন তাকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। ও সামনে শনিবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিয়েছে মোনালিসার সাথে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মোনালিসা আখ্যান বেশ জোর কদমে এগোচ্ছে। বিপ্রতীপ অরিন্দমের সাথে রাতের ডিনার খেয়ে বাড়ি এলো। দশটা বেজে গেছে, মেট্রো সার্ভিস বন্ধ হয়ে গেছে। হাজরার মোড় থেকে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল।

টানা ট্যুর শুরু হয়ে গেল বিপ্রতীপের। এবার ট্যুর বিহারে। বিহারের পাটনার লোকাল হোটেলে উঠলো। ওখানের কনফারেন্স রুমে বিহারের পুরো সেলস

টিম নিয়ে মিটিং করলো। তাদের লাস্ট ইয়ারের টার্গেট থেকে এবারের টার্গেট টোয়েনটি পার্সেন্টি কোম্পানি বাড়ালো। তার সাথে ইনসেনটিভ্ও। ট্রাভেলিং অ্যালাউন্স, ডেইলি অ্যালাউন্স-এর স্টাকচারও অনেক পরিবর্তন করা হল, যতটা 'টিম' স্পিরিট বাড়ানো যায়, তাদের ইম্পেটাস্ করা যায় সে দিকে কোম্পানি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলো। কাজের একটা সুস্থ পরিবেশ আর প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে বিপ্রতীপের কোম্পানি তর তর করে এগিয়ে চলেছে।

উড়িশার ভুবনেশ্বরে গিয়ে সেখানকার সেলস্ টিমকেও একইভাবে কোম্পানির পলিসি, তাদের দায়বদ্ধতা বুঝিয়ে দিল। তাদের ইনসেনটিভ, ডেইলি অ্যালাউন্স, ট্রাভেলিং অ্যালাউন্সের টোটাল স্টাকচার যে শীঘ্র পরিবর্তন হচ্ছে, এসব কথা বলে তাদের কিছুটা নারিসমেন্ট করলো। টার্গেটের কথাও বলতে ভুললো না।

বেশ কিছুদিন বাহিরে ট্যুর করে এসে নর্থ বেঙ্গল ট্যুর করার জন্য প্রস্তুতি নিল। মাঝে কলকাতায় দু-চারদিন থাকার পর মুর্শিদাবাদ,মালদা, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, রায়গঞ্জ ও কুচবিহার অবধি ঘুরে এলো। সেলস্ টিমের সাথে ঘন ঘন মিটিং করলো লোকাল হোটেলে। তাদের সাথে ফিল্ডে গেল। এইভাবে টানা পনেরো দিন কাটিয়ে ফিরে এলো কলকাতায়। ইতিমধ্যে কুহুর সাথে অনেকবার ফোনাফুনি হয়েছে, ওয়েভক্যামে তাকে দেখেছে, কথা বলেছে। সুতরাং বিপ্রতীপ এখন দিলখুশ আছে।

কলকাতায় ফিরে এসে কুহুর চিঠি পেল। ওরা দুজনে মাঝে মাঝে চিঠি চালাচালি করে, যদিও ইন্টারনেটের যুগে চিঠিটা বড্ড প্রিমিটিভ। তবু ইন্টারনেটে মনের আদান-প্রদান করা যায় না, মোবাইলে ম্যাসেজ দিয়ে কতটা আর মনের দরজায় কড়া নাড়া যায়। সবটাই একটা কৃত্রিম মনে হয়। চিঠিতে অবাধে মনের পাতা উলটানো যায়, পড়া যায় মনের ভাষা। যে চিঠি লেখে সে শুধু পাতার ওপর কালো আঁচড় কাটে না, সে মনটাকে উজাড় করে দেয় আর একটা মনের কাছে। মোবাইল কিংবা ইন্টারনেটে কথা বলার একটা সীমাবদ্ধতা আছে। মনে হয় না চিঠি লেখাটা একেবারেই উঠে যাবে।

আজ সারাদিন ঘরের মধ্যেই বসে সময় কাটালো বিপ্রতীপ। ঘরের মধ্যে ডিভানে শুয়ে শুয়ে আয়েশ করে, পড়তে লাগল কুহুর চিঠিটা—'বিপ, একটা ম্যাগাজিনে পড়লাম 'অনার কিলিং' বলে একটা কথা। 'অনার কিলিং' অর্থাৎ সম্মানীয় হত্যা। সম্মানের সাথে হত্যা করা হচ্ছে দুটো নারী-পুরুষ, যারা সামাজিব অনুশাসন মানেনি, অন্য ধর্মে, অন্য বর্ণে বিয়ে করেছে, উচ্চবর্ণের যুবতী কোনো নিম্নবর্ণের যুবককে কিংবা নিম্নবর্ণের যুবক কোনো উচ্চবর্ণের যুবতীকে, সামাজিক নিয়ম রীতি-নীতিকে লঙ্ঘন করে। সুতরাং 'অনার কিলিং' করা হোক। উত্তরপ্রদেশ,

বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, চেন্নাই সর্বত্র চলছে 'অনার কিলিং'-এর ঢেউ। আমার মনে হয় বিপ, উনবিংশ শতাব্দীতে মনীষীরা জ্ঞানের দীপশিখা জ্বালিয়ে ছিলেন তখনকার সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে আজ একবিংশ শতাব্দীতে তার চেয়েও ভয়াবহ অন্ধকার নেমে এসেছে। কোনো মনীষীর জন্ম হল না, যিনি জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দেবেন, অন্ধকার দূর করবেন। ধর্ম ওঁত পেতে ছিল, লুকিয়ে ছিল অন্ধকারে, আড়াল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তার তীক্ষ্ণ নখরে ক্ষতবিক্ষত হতে হল অপাপবিদ্ধা নারী আর পুরুষকে। পথে ঘাটে গজিয়ে ওঠা ধর্মীয় পীঠস্থান অবাধে বেড়ে উঠেছে, রমরমিয়ে ব্যবসা চলছে, কলকাতা থাকতেই দেখে এলাম। মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়কে কাজে লাগিয়ে একশ্রেণীর লোক অবাধে মুনাফা লুঠছে। এই ধর্মের মধ্যে রয়েছে মোহ, রয়েছে পক্ষপাতিত্ব, রয়েছে বিরুদ্ধ চেতনা, এক ধর্মের লোক অন্য ধর্মকে ঘৃণার চোখে দ্যাখে। ধর্ম কৃত্রিমতার দ্বারা, বাহুল্যের দ্বারা নিজের গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করছে। স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় ধর্ম কোনো মেধা-প্রসূত নয়, ধর্ম কোনো হৃদয়বৃত্তি নয়, ধর্ম আচার-আচরণে আবদ্ধ এক সুবিধাবাদী নীতি।

বিপ্ সোনা আমার, একবার ভাবো তো জীবনের প্রাইম সময় কীভাবে আমাদের নষ্ট হয়ে গেছে? জীবিকার জন্য জীবনের আনন্দটাই যেতে বসেছিল। একটা সুস্থ সবল পুরুষ আর নারীর যৌবনের কী নিদারুণ অপচয় ধর্মর দোহাই দিয়ে! দুজনে এক ধর্মের নয় তাই এখনও আমাদের লড়ে যেতে হচ্ছে যৌবনকে রক্তাক্ত করে!

বিপ্, তুমি একদিন বলেছিলে বিয়ে একটা ভালাগার জিনিস। তোমার কণ্ঠে 'শেষের কবিতার' নায়ক অমিতের কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। আমি বলি বিয়েটা রেসপেক্টেবল যদি ভালেগারিটির মধ্যে থাকে ভালোবাসা, ভালবাসার অনুভূতি। বিপ, নির্দ্বিধায় সেই ভালগারিটির মধ্যেযে অমৃত রয়েছে তার স্বাদ আস্বাদন করবো তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো। যে বিয়েতে ভালোবাসা নেই, নেই ভালোবাসার অনুভূতি সেই বিয়েটা হচ্ছে জঘন্যতম ভালগার জিনিস। বিপ, সোনা আমার, আমরা ভালোবেসে বিয়ে করছি, যদি বিয়েতে কোনো ভালগারিটি থাকে তা আমি অমৃত ভেবেই গ্রহণ করবো। 'শেষের কবিতার' নায়ক অমিত রোমান্সের তরণীতে লাবণ্যকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছিল, পেয়েছিল তার সঙ্গ-সাহচর্য। লাবণ্য সম্পূর্ণ নিজেকে উৎসর্গ করলেও অমিত তাকে দিল মুক্তি, করলো না তার আসঙ্গ কামনা। শেষের কবিতা রোমান্স ভরপুর এক কালজয়ী লেখা রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু জীবন ভীষণ নির্মম, ভীষণ কঠিন, ভীষণ প্র্যাকটিক্যাল। একটা নারী তার সমস্ত সত্তা দিয়ে পুরুষের মধ্যেই সম্পূর্ণ হতে চায়। তুমি যতই ভালগার বলে বিবাহকে ক্রিটিসাইজ করো, পুরুষের সঙ্গ-অসঙ্গ ছাড়া নারীর অস্তিত্বই থাকে না।

আমার অস্ট্রেলিয়াবাসের পর্ব শেষ হলো। আর মাত্র সাতটা দিন বাকি কলকাতায় ফিরতে। কোম্পানি প্রমোশন দিয়ে কলকাতায় পাঠাচ্ছে। নতুন প্রোজেক্ট লঞ্চ করছে নিউটাউন-রাজার হাটে। ওখানকার সেশন ইনচার্য করেছে আমাকে। এতদিন শুধু ছিল অপেক্ষা আর অপেক্ষা। 'শবরীর প্রতিক্ষা'র সীমারেখাও পেরিয়ে গেছে। সাতদিন মনে হচ্ছে সাতশো বছর। কবে যে তোমার কাছে যাবো, তোমাকে ছোঁব, তোমাকে আদরে আর আদরে অস্থির করবো। ওয়েভক্যামে তোমাকে দেখে মন ভরে না, আমি তো একটা রক্তমাংসের মানুষ যার একটা গতি আছে, আছে সচলতা। স্থির ছবি যতই সুন্দর হোক, সেখানে আর যাই হোক জীবন থাকে না। জীবন সব সময় গতিশীল, চলমান। বিপ্ ভালো থেকো, আমার অনেক অনেক আদর নিও। তোমার কুহু'।

বিপ্রতীপের চিঠি পড়া শেষ হল। বেড়ে গেল তার অস্থিরতা। আর মাত্র সাতটা দিন। সাতটা দিন বাকি আছে কুহু আসতে। ম্যারেজ রেজিস্টারকে খবর দিতে হবে। হোটেল বুক করে রাখতে হবে একটা, ছোট-খাটো পার্টির জন্য। এদিকে অরিন্দমের প্রেম-তরণী তরতর করে ভেসে চলেছে। ও মোনালিসাকে নিয়ে চুটিয়ে ঘুরছে কলকাতার নতুন নতুন আকর্ষণীয় স্পটগুলিতে। কখনও নলবনে রোয়িং করছে, কখনো সিটি সেন্টারের শপিংমলে গিয়ে পারচেজ্ করছে নামি দামি বিদেশি পারফিউম, কিংবা কোনো আকর্ষণীয় উপহার। কফিসপে কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে তাদের মনের আদান-প্রদান করেছে। ছুটি পেলেই বেরিয়ে পড়ছে দুজনে সায়েন্সসিটিতে কিংবা মিলেনিয়াম পার্কে। প্রত্যেক দিনই যেন ভ্যালেন্টাইনস ডে. কখনও মুখ ফুটে, কখনও নীরবে। গঙ্গার বুকে লঞ্চে ভালোবাসার রোদ্দুর মেখে গায় হাতে হাত ধরে বসে থাকা। ফুটে ওঠে খুনসুটি, ভালবাসার আইন। দুজন দুজনকে ঘনিষ্টভাবে পাওয়ার বাতাবরণ তৈরি করে কোনো লেকের ধারে, রেস্তোরাঁয় কিংবা ক্রমশ জনহীন হয়ে যাওয়া রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে। অরিন্দম প্রায়ই ফোন করে তার বিপদাকে জানিয়ে দেয় রোমান্সের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা। কবে প্রথম চুমু খেয়েছিল মোনালিসাকে সেটাও জানাতে ভোলে না।

কুহুর আসার দিন সকালবেলায় অরিন্দম এসে হাজির হল তার মেঘরঙের স্কর্পিও গাড়িটা নিয়ে বিপ্রতীপের বাড়ি। সঙ্গে মোনালিসা। এর আগে বিপ্রতীপের সাথে ওর আলাপ করিয়ে দিল অরিন্দম। ওরা বেরিয়ে পড়লো সকালের ব্রেকফাস্ট খেয়ে দমদম এয়ারপোর্টের দিকে ঘণ্টাখানেক আগে থেকে। মাঝখানে সুকিয়া স্ট্রিট থেকে কুহুর বাবা সুকান্ত রোজারিওকে তুলে নিল। বিপ্রতীপ সবার লাঞ্চের জন্য মণিমাসিকে বলে দিয়েছে। সকালে মর্নিংওয়াক সেরে বাজার করে দিয়েছে। আমিষ-নিরামিষের তিন-চার পদের জব্বর মেনু তৈরি করতে বলেছে। এ ব্যাপারে

এই অনাত্মীয়া বিধবা ভদ্রমহিলার হাতযশ আছে। মণিমাসির জন্য খাওয়া-দাওয়ার কোনো অসুবিধা হবে না বিপ্রতীপ ভালো করেই জানে।

কুহুর বাবা—সুকান্ত রোজারিও একাই থাকেন। বিপ্রতীপের মায়ের মতোই কুহুর মাও ছোটবেলায় মারা গিয়েছিলেন। কুহুর বাবা দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহণ করেননি তার আদরের ছোট মেয়েটার কথা ভেবে। মেয়েকে বড় করেছেন—লেখাপড়া শিখিয়েছেন, তার মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন উচ্চাশা আর একটা সংস্কারহীনা বোধশক্তি। মাথা উঁচু করে সে যাতে জুঝতে পারে সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে, পার হতে পারে যাতে সমস্ত বাধাবিপত্তি। ওর কোনো ভাইবোন নেই। ওর বাবা এলআইসি-র ডেভেলপ্‌মেন্ট অফিসার। সদ্য রিটায়ার্ড। সার্ভিসে থাকা অবস্থায় মানিকতলার সুকিয়া স্ট্রিটে দোতলা বাড়িটা করেছেন।

কুহুর বাবা কুহুর মধ্যে জ্বালিয়ে দিয়েছেন একটা আগুন আর সেই আগুনের গনগনে তেজে বিপ্রতীপ সেঁকে নিল তার যৌবন। একটা ঠান্ডা হয়ে যাওয়া মিইয়ে যাওয়া তার শৈশব, কৈশোর আর যৌবনকে ছেঁকা দিয়ে গেল সেই আগুনের তেজ। বিপ্রতীপ বেরিয়ে এলো খোলস ছেড়ে, গুটি কেটে দাঁড়াল কঠিন জমিতে—লড়াই করার সাহস খুঁজে পেলো। একটা ভয়—না পারার ভয়—মাথা নীচু করে হেরে যাবার ভয়, যা মৃত্যুভয়ের চেয়েও ভয়ংকর, যেখান থেকে বেরিয়ে এল কুহুর বলিষ্ঠ হাত ধরে।

নির্দিষ্ট সময়েই দমদম এয়ারপোর্টে বিশাল ইন্টারন্যাশনাল বোয়িং প্লেনটা ল্যান্ড করলো। বিপ্রতীপ এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বসেছিল। বিকট আওয়াজ করে বিশাল প্লেনটা নামলো। সিঁড়ি লাগানো হল প্লেনে। প্যাসেনজাররা একে একে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল প্লেনের খোলা দরজা দিয়ে। কুহুকে তখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। অবশেষে ও দৃশ্যমান্যতার গন্ডির মধ্যে এলো। ওরা স্পষ্ট দেখতে পেলো অনেক দূর থেকে ওকে।

কুহু পাঁচফুট ছয়। বাঙালি মেয়েরা সচরাচর অত লম্বা হয় না। আজ আকাশি রঙের টপের সাথে পারফেক্ট কম্বিনেশন করে ফেডেড জিনস পরেছে ও। ওর কাঁধ অবধি লম্বা ঢেউ খেলানো চুল, ঈষৎ বাদামি চোখের মণি, স্বর্ণচাঁপা গায়ের রং আর গোলাপ-পাপড়ি পুরুষ্ট ঠোঁট। অশান্ত যৌবনের ঢেউ ফুটে বের হয়েছে শরীরের আবরণ ভেদ করে। কোথাও বাড়তি মেদের বাহুল্য নেই শরীরের কোথাও। পারফেক্ট গ্লামারাস্ স্মার্ট লেডি বলতে যা বোঝায় তার ষোলোআনাই ওর মধ্যে আছে। ওর মধ্যে আছে প্যাশন আর পারফেকশনের রেয়ার কম্বিনেশন। কুহু বিপ্রতীপের একশোভাগ পছন্দের নারী। সে তার রূপমুগ্ধ গুণমুগ্ধ। তার বাহিরের রূপলাবণ্য যদি তাকে আকর্ষণ করে তবে অন্তরের ঐশ্বর্যও তাকে বিস্মৃত করে। বিপ্রতীপ ভাবলো—জন্মতো আমার হাতে ছিল না, মৃত্যুও আমার হাতে

নেই, কখন আসবে কেউ জানে না। যেটা থাকবে সেটা একটা আনন্দ-ঘন জীবন, কুহুর সাথে যেটা আমি ভাগ করে নিতে পারবো। সে জীবনের অনেকখানি পার হয়ে এসেছে, বাকি যে জীবনটা পড়ে আছে, সেই জীবনের আনন্দটা তার সাথে ভাগাভাগি করে নিতে পারাটাই জীবনের পরম পাওয়া।

চেক আউট করে কুহু বেরিয়ে এলো, দ্যাখ্যা হল বিপ্রতীপের সাথে। বিপ্রতীপের সাথে ছিল তার বাবা, অরিন্দম ও মোনালিসা। ওরা অরিন্দমের স্কর্পিও গাড়িটা করে চলে এলো বিপ্রতীপের বাড়ি। স্নান-আহারাদি করলো। এলাহি মেনু আর খাবারের স্বাদে সবাই তৃপ্ত। অবশেষে বেলা তিনটে নাগাদ যে যার বাড়ি চলে গেল। রইল শুধু কুহু।

আজ বিপ্রতীপের মনে বেজে চলেছে একটানা জলতরঙ্গের সুর কুহুকে পাবার আনন্দে। সবাই চলে যেতে ও বারবার দৃষ্টির পালক বুলিয়ে দিচ্ছে কুহুর চোখ মুখ গলা গ্রীবা—তার বুক, সর্ব সৌন্দর্যের পশরায় সাজানো শরীরে।

কুহু প্যান্ট কুর্তা ছেড়ে পরে নিয়েছে শাড়ি। শাড়িতে মেয়েদের যতটা মানায় অন্য কিছুতে নয়। ওর অপরূপ রূপলাবণ্য ঝলসে উঠেছে। তার দ্যুতি পরেছে ঠিকরে ওর চোখে মুখে সারা শরীরে। কুহু আজ পরেছে একটা সুতির শাড়ি। ওর পরনে 'আঁচল' বুটিকের তুঁতে রঙা তাঁত প্রিন্ট। শাড়ির ফিরোজা জমিনে অলওভার কালো আর সাদা বুটি ডিজাইন। শাড়ির পাড় সোনালি জরি আর মুগা সুতো দিয়ে করা। পরেছে ঘটি-হাতা সোনালি টিস্যুর ব্লাউজ। গলায় তার মুক্তো আর নীল বিডসের চওড়া তিন থাকের নেকলেস। মুক্তোর সঙ্গে রয়েছে সোনার ছোঁয়াও। হাতে ব্লু বিডস মুক্তোর চুড়ি, গোল্ড প্লেটিং করা।

পারফিউম-এর একটা মৃদু চেনাগন্ধ, তার সাথে কুহুর শরীরের গন্ধ-শাড়ি-ব্লাউজ পোশাকের একটা আকর্ষণীয় সুবাসে বিপ্রতীপ তার একান্ত আপনজনকে পুরোপুরি পেল খুঁজে। কোনো জানান না দিয়ে কুহু ঝাঁপিয়ে পড়লো বিপ্রতীপের বুকে—তার গলার অস্ফুট স্বর—'আজ আমি আমার এই রক্তমাংসের শরীর—আমার লজ্জা-শরম, আমার নারীত্ব সব কিছু আমার রাজার পদপ্রান্তে উজাড় করে দিলাম। বিপ্, সব কিছু তুমি নাও—আমার কামনা-বাসনা, আমার চেতনা, আমার আনন্দ, আমার বোধবুদ্ধি—সব কিছুর একমাত্র দাবিদার শুধু তুমি। সব-সব কিছু তোমাকে দিলাম। আমার শরীর আমার মন আমার ভালোবাসা আমার যন্ত্রণা, আমার দুঃখ—সব কিছু আজ আমার রাজাকে বিকিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেলাম। আজ আমাকে যেমনভাবে ব্যবহার করবে, যেভাবে চালনা করবে, আমি আনন্দ সহকারে পালন করবো, আমার রাজাধিরাজের আদেশ। বিপ্ সোনা আমার রাজা আমার, এই মুহূর্তের জন্য এতদিন অপেক্ষা করেছিলাম আমরা। আজ তোমার পৌরুষ দিয়ে জাগিয়ে দাও আমার নারীসত্তা। আমাকে পূর্ণতা দাও,

আমাকে সম্পূর্ণ করো, তোমার অপার করুণা দিয়ে। তুমি অকিঞ্চন নও, তুমি তো করুণার সাগর।' লতানে গাছের মতো বিপ্রতীপকে জড়িয়ে ধরেছে কুহু। তীব্র ফিসফিসানির সুরে বলছে 'আমাকে জড়িয়ে ধরো বিপ্‌, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরো। আমাকে ছেড়ে যেও না'।

এই প্রথম বিপ্রতীপ তার পৌরুষ দিয়ে জাগিয়ে দিল কুহুর নারীসত্তা। তাকে বুকে নিল টেনে। শুইয়ে দিলো ডিভানে। নিরাভরণ করলো তাকে। একে একে খুলে নিল তার গলার তিন থাকের নেকলেস, হাতের গোল্ড প্লেটিং করা মুক্তোর চুড়ি। সরিয়ে দিল শাড়ি। খুলে দিল বক্ষ-বন্ধনীর বন্ধন। বক্ষ বন্ধনীর বন্ধন খুলতেই ঝাঁপির মধ্য থেকে যেন দুটো দুধ-গোখরা ফণা তুলে ছোবল মারার ভঙ্গিতে উদ্ধত হয়ে নড়েচড়ে স্থির হল। অবশেষে তারা স্বেচ্ছাবন্দি হল বিপ্রতীপের হাতে। তার হাতের ক্রমপর্যায়ে নির্মম অথচ সুখকর নিঃষ্পেশনে তারা আরো উচ্ছল, সুদৃঢ় আর সোহাগী হয়ে উঠলো। মিলনপিয়াসী দুই অধর কাছাকাছি আসে, পরস্পরকে স্পর্শ করে—সেই সঙ্গে ছুঁয়ে যায় জিহ্বা। শুষ্ক অধর আদ্র হয়ে ওঠে। দুই অধরের মধ্যবর্তী উষ্ণ বাতাস ছড়িয়ে দেয় উষ্ণায়ন শরীরের সর্বত্র। ক্রমশ তারা মিলেমিশে একীভূত হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় তাদের বাক্যস্ফুরণ! শুরু হয়ে গেল একটা ভয়ংকর সুন্দর কার্যক্রম। তাদের পরস্পরের সম্মতি, সহযোগিতা আর আগ্রহে।

প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সব কিছু। নদীর পার ভাঙছে—অনবরত ভাঙছে। আলগা হয়ে যাওয়া ঝুরো মাটি ঝরে ঝরে পড়ছে। পাহাড় থেকে ধসে ধসে পড়ছে পাথরের টুকরো। একটা ভূমিকম্প, স্তরচ্যুতি। অবশেষে ভলক্যানিক ইরাপসন! সুপ্ত ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি হঠাৎ জেগে উঠেছে। তার জ্বালামুখ থেকে গলন্ত, ফুটন্ত তপ্ত লাভা দুজনকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল এক অভূতপূর্ব আনন্দের স্রোতে।

এক সময় তাদের দীর্ঘ পরিশ্রমী কার্যক্রম শেষ হল। নিঃসরণ হল স্বেদগ্রন্থী থেকে বিন্দু বিন্দু স্বেদকণা, জুড়িয়ে গেল তাদের শরীর, ঠান্ডা হল দিঘির হিম-শীতল জলের মতো। শরীরের উষ্ণায়ন লীনতাপ ত্যাগ করে শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করলো। বিপ্রতীপ আলস্যভরে একটা হাত রাখলো কুহুর উদলা পিঠে। ও অনুভব করলো মুক্তোর কণার মতো বিন্দু বিন্দু স্বেদকণা ঝরে পড়েছে তার পিঠে। সেখানে শরীর জুড়ানো ঠান্ডা। বিপ্রতীপ তার হাতটাকে আরো বাড়িয়ে দিল—হাতের বেড়ে বাঁধা পড়ে কুহুর শরীর। কুহু হাতটা টেনে নিল তার বুকে। বিপ্রতীপ স্পষ্ট অনুভব করলো তার হৃদস্পন্দন, প্রাণশক্তি। প্রকটভাবে সংলগ্ন হয়ে থাকা দুটো শরীর একসময় সামান্য বিলগ্ন হল প্রবল তৃপ্তি আর আশ্লেষের পর। তারা দুজন সম্পূর্ণ হল। পূর্ণতা লাভ করলো এতদিনের মজে যাওয়া নদী, শুকিয়ে

যাওয়া নদী, মরুপথে হারিয়ে যাওয়া নদী। নদী ফিরে পেল তার হারিয়ে যাওয়া স্রোত।

দুজনে ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন ঘুম ভাঙলো তখন অন্ধকার নামছে ধীরে ধীরে। বিকালের মরা হলদেটে আলো খানিকটা জানলা গলে এসে পড়েছে পর্দার ফাঁক দিয়ে। কুহু তাড়াতাড়ি অবিন্যস্ত পোশাক ঠিক করে নিল। বিপ্রতীপকে ডেকে দিল। বিপ্রতীপ ঘুম জড়ানো চোখে একটু আদর করে উঠে পড়লো। পরে নিল তার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পরিচ্ছদ। কুহু টয়লেট থেকে ফিরে আসতে বললো—'কুহু আজ থেকে যাও'।

—'মাথা খারাপ! আবার তুমি দুষ্টুমি করবেই করবে। বিপ ইউ আর আ গ্রেট মিসচিফ-মেকার। বাবার কাছে যাচ্ছি, এগিয়ে দেবে চলো'।

বিপ্রতীপ হাসতে থাকে 'বাঃ আমার দোষ কোথায়? সব-সব দোষ তোমার কুহু' বলে টয়লেটে চলে গেল।

টয়লেট থেকে ফিরে আসতেই মণিমাসি চা আর কিছু খাবার দুজনের জন্য দিয়ে গেল। মণিমাসি চলে যেতেই কুহু বিপ্রতীপকে চেপে ধরে—'আমার দোষ না! একহাতে কি তালি বাজে? তুমি-তুমি ভীষণতম পাজি বিপ্। এখন আমাকে পৌঁছে দেবে চলো।' ওরা চা-টিফিন খেয়ে বেরিয়ে পড়লো।

কুহুর দিন পনেরো ছুটি। ও প্রমোশন নিয়ে এসেছে কলকাতায়। বিদেশ থেকে অস্ট্রেলিয়ার এক নামি ইউনিভারসিটি থেকে বাগিয়ে নিয়েছে ম্যানেজমেন্টের মূল্যবান ডিগ্রি। অবশ্য কোম্পানি ওর পারফরম্যান্স দেখে স্পনসর করেছিল। কলকাতায় এসে হেড অফিসে রিপোর্টিং করে দিয়েছে। কলকাতার হেড অফিস পার্কস্ট্রিটে। ছুটির পরে ও জয়েন করবে নিউটাউন-রাজারহাটের অফিসে প্রোজেক্ট ইনচার্য হিসাবে। এর মধ্যে ওকে কোম্পানি সমস্ত পেপার পাঠিয়ে দিচ্ছে অফিশিয়ালিভাবে। ইতিমধ্যে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্টে ওরা দুজন বিয়ে করলো। উইট্‌নেস দিল অরিন্দম আর মোনালিসা। বিপ্রতীপ পার্টি দিল পিয়ারলেস ইন-এ। হই হই করে সবাই এনজয় করলো। নানা উপহারে ভরিয়ে দিল ওদের। কুহু চলে এল মিসেস চ্যাটার্জি হয়ে বিপ্রতীপের বাড়ি।

বিয়ের পর কুহু একদিন ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় চুল বাঁধছিল, সাজগোজ করছিল। মুখ পরিষ্কার করছিল। কপালে একটা টিপ আর মাথায় সরু করে সিঁদুর পরে চোখে আই-লাইনার লাগাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, এমন সময় বিপ্রতীপ পেছন থেকে জড়িয়ে ধরলো তাকে।

—'আঃ ছাড়ো বিপ্, প্লিজ ছাড়ো'। হাসছে কুহু। 'সেই তো একটা বামুনের জাত গেল, নাকি একটা বামুন বাড়লো? হিন্দু হয়ে খৃস্টান বিয়ে করার ধকলটা

দেখলে বিপ্?’—ওর ঠোঁটের কোণে একখণ্ড ব্যঙ্গের সঙ্গে এক টুকরো মুচকি হাসি।

একদিন কুহুকে নিয়ে বিপ্রতীপ বেরিয়ে পড়লো লঞ্চে করে বেলুড় মঠ। মন্দিরে পুজো দিল। ভোগ খেল। দেখলো ঠাকুর রামকৃষ্ণ সারদা মা আর বিবেকানন্দের স্মৃতি বিজড়িত ঘর। বেলুড় মঠের একটা পবিত্রভাব ওদের মুগ্ধ করলো, মনটা শান্তিতে ভরে গেল।

সেখান থেকে ওরা গিয়ে বসলো গঙ্গার ধারে। কুহু একটা রবীন্দ্রনাথের ‘পূজা’র গান গাইল। অপূর্ব তার গলা। বিপ্রতীপের মরমে প্রবেশ করলো সেই সুরেলা গান। মনের মধ্যে অনুরণন হচ্ছে, এই জীবন, এই আনন্দ সবই ক্ষণিকের। একদিন মৃত্যু এসে সব ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, কেউ থাকবে না, কিছু থাকবে না। আমরা কত তুচ্ছ, কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য! তার একটা ভালোবাসার কবিতা কুহুকে শোনালো, যেখানে কবি আমাদের সীমাবদ্ধতার কথাই বলেছেন—

‘কতটা সুখ আর দুঃখ সমানুপাতিক থাকলে
  একটা জীবনে পরিপূর্ণতা আসে?
নাছোড় মন চোখের জল ফেলে   আপনজন ছেড়ে চলে গেলে
  কেউ কি কারোর জন্য আবার ফিরে আসে?
  কেউ কি হা-পিত্যেস করে বসে থাকে চিরকাল?
এই পৃথিবীতে বসবাসের জন্য
  আমাদের সময় নির্দিষ্ট করা থাকে
একটাও বাড়তি দিন যাবে না পাওয়া
  নতুন করে বেঁচে থাকবার জন্য
  নতুন করে ভালোবাসার জন্য।
সব প্রেমই শর্তহীন, শর্ত পূরণের অঙ্গীকার থাকে
জীবনের শর্ত কত সহজে মৃত্যুকে মেনে নেওয়া।
ভ্রম আর সংশয়—সংশোধনের দ্বিতীয় কোনো পন্থা নেই
ছেঁড়া তমসুক পড়ে থাকে অবহেলায় ধুলোমাখা রাস্তায়
এই জীবন কতটুকু-কতটুকু তার সীমারেখা
আহার আর মৈথুনে বেঁচে থাকা- দিব্যি ভালো থাকা।’

কখন সন্ধের আকাশ লাল হয়ে এসেছিল ওরা বুঝতেই পারেনি। বাতাস শুরু করে দিল দস্যিপানা। ঠান্ডা ঝোড়ো হাওয়ায় সাথে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। বৃষ্টি বেশ জোরেই পড়তে শুরু করলো। ওরা নিরাপদ আশ্রয় পাবার আগেই ভিজে গেল ভালোভাবে। কুহুর শালোয়ার কামিজ—বিপ্রতীপের প্যান্টসার্ট শরীরের সাথে সেঁটে বসে গেল। কুহু খুব অস্বস্তিতে পড়লো। বৃষ্টি একটু থামতেই বিপ্রতীপ

একটা ট্যাক্সি জোগাড় করে কুহুকে নিয়ে ওখান থেকে বাড়ি চলে এল।

অনেক রাতে একটা গোঁঙানির শব্দে বিপ্রতীপের ঘুম গেল ভেঙে। ওর শরীরে নিশ্চয়ই কোনো অস্বস্তি হচ্ছে। কুহুর গায়ে হাত দিয়ে ও দেখলো কুহুর শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। বেড সুইচ অন করলো বিপ্রতীপ। দেখলো কুহুর একশো চার জ্বর। অত রাত্রে ডাক্তার পাবে না ভেবে ও কুহুকে প্যারাসিটামেল ট্যাবলেট খাইয়ে দিয়ে অপেক্ষা করলো। আধঘন্টা অপেক্ষা করার পর দেখলো ঘাম হচ্ছে। কুলকুল করে ঘামে নাইটিটা ভিজে গেছে। বিপ্রতীপ তাড়াতাড়ি এ.সি.-টা বন্ধ করে দিল। সারা গায়ে টাওয়েল দিয়ে মুছিয়ে দিলো। কুহুকে ধরে একটু তুলে পাল্টে দিল নাইটিটা। অত রাত্রে মণিমাসিকে ডাকলো না। জ্বরটা আসছে যাচ্ছে। একঘন্টা অন্তর জ্বর নিতে শুরু করলো বিপ্রতীপ। একটা খাতায় চার্ট করে লিখে রাখলো। ভোর হতে মণিমাসিকে ডেকে কুহুর পাশে বসতে বলে। হাউস ফিজিশিয়ান ডা. বোসকে ফোন করলো। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে আসছেন। ইতিমধ্যে মাথাটা ধুয়ে দিতে বললেন, সারা শরীর ঠান্ডা জলে স্পঞ্জ করতে বললেন। বিপ্রতীপ আর মণিমাসি দুজনে ধরে কুহুর মাথা ধুইয়ে দিল, সারা শরীর স্পঞ্জও করে দিল। আস্তে আস্তে জ্বরটা কমতে শুরু করলো। ডা. বোস জ্বরের চার্ট দেখলেন। পরীক্ষা করলেন কুহুকে। বুকে কফ জমেছে, সঙ্গে কাসি। ওষুধ লিখে দিলেন, ব্লাডটা পরীক্ষা করতে বললেন। 'ভাইরাল ফিভার'—দু-চারদিন ভোগাবে। বৃষ্টিতে ভেজার ফলেই জ্বরটা এসেছে কুহুর।

ওষুধ তিনচার দিন খাবার পরেও জ্বরটা পুরোপুরি রেমিশন হল না। ব্লাড-রিপোর্টে কিছুই পাওয়া গেল না। কুহু কিন্তু খেতে চাইছিল না। সারা মুখে ওর অরুচি। চোখে মুখে ক্লান্তি, সারা শরীরে ব্যথা। বিছানায় শুয়ে আছে সারাদিন ও। বিপ্রতীপ কুহুর বিছানায় এসে বসলো, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো। ও চোখ তুলে তাকাল। বিপ্রতীপের হাত ধরলো। ক্ষীণ কণ্ঠে বললো—বিপ্, আমার যদি কিছু হয়ে যায়, তুমি ভেঙে পড়ো না, কিছুতেই হার স্বীকার করবে না। জানবে সব সময় তোমার কাছে আছি, তোমার পাশে আছি।

—'না না এ হতে পারে না। কিছুতেই না। ও কথা মুখে এনো না কুহু' বলে কুহুর মুখে হাত চাপা দিল বিপ্রতীপ। 'দ্যাখো তুমি সেরে উঠবে, তুমি সারাজীবন এত লড়াই করে সামান্য একটা রোগের কাছে হার মানবে? আমি কিছুতেই তোমাকে হেরে যেতে দেবো না। তুমি ছাড়া আমার কোনো অস্তিত্ব নেই। একবার ভাবোতো কত অসম লড়াই করে তুমি আমাকে জিতিয়ে আনলে। তুমি প্রতিষ্ঠা পেলে, আমিও প্রতিষ্ঠিত হলাম। জীবনে যেকটা দিন বাঁচবো তোমার সাথেই বাঁচবো। আমি তো জীবনে কিছু চাইনি, শুধু তোমাকে চেয়েছিলাম মনেপ্রাণে। তোমার ভালোবাসা আমাকে নতুন জীবন দিয়েছে। এই সুখ, এই

আনন্দ আমি কিছুতেই হারাতে চাই না'।

ডা. বোসের ওষুধ রেসপন্ড করছেন না। বিপ্রতীপ বুঝতে পারলো। ও সেই দিনই মেডিসিনের বড় ডাক্তার অচিন্ত্য বিশ্বাসের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে বাড়িতে নিয়ে এল। ডা. বিশ্বাস কুহুর সাথে কথা বলে জেনে নিলেন কফ আর কাসি ছাড়াও ওর ইউরিনের প্রবলেম রয়েছে, বেশিরভাগ মেয়েদের যে প্রবলেমটা হয়। ডা. বিশ্বাস ইউরিন কালচার আর ইউরিন সেনসেভিটির টেস্ট করতে বললেন। ডা. দত্তের নামকরা প্যাথোলজি ল্যাবরেটরি থেকে টেস্ট করে ধরা পড়লো 'ইউনারি ট্রাস্ট ইন্‌ফেকশন'। ডা. বিশ্বাসের মেডিসিন রেসপন্ড করলো। আস্তে আস্তে কুহু সেরে উঠতে লাগলো। জ্বর কমে গেল, খিদে হল, ঘুম হল।

বিপ্রতীপের একশো ভাগ পছন্দের নারী, যাকে সে ভালোবেসেছে, তাকে সে ফিরিয়ে আনলো শুধু ভালোবাসার জোরে। ওরা হারতে জানে না, ওরা হারবে না, ওরা লড়াই করে যাবে সারাজীবন।

সখি ভালবাসা কারে কয়

শিখা রায়

অনেকক্ষণ ধরেই বসে বসে ওদের কাণ্ডকারখানা দেখছিল সুজাতা। কখনও চটি, কখনও একটা বলকে ঢেউগুলোর সামনে রাখছে, আর চোখের পলক পড়তে না পড়তেই ঢেউগুলো এসে সেগুলো ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ওরা মানে একদল তরুণ-তরুণী, এদের মধ্যে দু-জোড়া দম্পতি বোধহয় সদ্য বিবাহিত। সুজাতা একা একাই ওদের মজায় অংশ নেয়। আজ সকালেই সুজাতা ওর দুই বান্ধবী এণাক্ষী আর কবিতার সঙ্গে পুরী এসে পৌঁছেছে। উদ্দেশ বর্ষায় পুরী দেখা। কিন্তু আকাশ কালো দেখে ওরা আর বিচে আসেনি। ওরা পুরী এসে পৌঁছবার পরও সূর্য আর মেঘের লুকোচুরি খেলা চলছিল। কিন্তু দুপুর থেকেই সূর্য অদৃশ্য, তাই বুঝি মেঘ ওরই মতো সঙ্গী বিহনে মুখ ভার করে আছে। হোটেলের বারান্দার দিকে তাকাল সুজাতা। ওরা হাত নাড়ছে, চলে যেতে বলছে। ইশারায় বলছে বৃষ্টি আসবে। আসুক বৃষ্টি। সুজাতা গ্যাঁট হয়ে বসে থাকে। বেশ ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। ভালো লাগছে। সমুদ্রের দিকে তাকাল সুজাতা। একটা বেশ বড় ঢেউ-এর ধাক্কায় অল্পবয়সি বউটি গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর ওর স্বামী ওকে হাত ধরে টেনে তোলার চেষ্টা করছে। সুজাতার একটা ঘটনা মনে পড়ল। বিয়ের পর প্রথম ও রজতের সঙ্গে পুরী এসেছিল, সঙ্গে শ্বশুর, শাশুড়িও ছিলেন। উদাস ভঙ্গিতে রজত বিচে বসেছিল। আর সুজাতা ওর শাশুড়িকে জলের কাছাকাছি বসিয়ে একটা ছবি তোলার জন্য খানিকটা জলে নেমেছিল, সুজাতার কাঁধে ছিল ব্যাগ, হাতে ক্যামেরা—সবে লেন্সটা চোখে লাগিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট ঢেউ-এর ধাক্কা। ঢেউ-এর মধ্যে লুটোপুটি খেতে খেতে সুজাতা দেখেছিল রজত দ্রুত সাঁতার কাটতে কাটতে এগিয়ে আসছে, তারপর কি তৎপরতার সঙ্গে রজত ওকে আর ওর ব্যাগ ক্যামেরা উদ্ধার করল সেটা ভাবলেই অবাক লাগে। ঢেউটা এতটাই বড় ছিল যে দূরে বসে থাকা শাশুড়ি মা-ও জলের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। তবে উনি সাঁতার জানতেন বলে সামলে নিয়েছিলেন, সুজাতা ভেবেছিল রজত একহাত নেবে, কারণ বিয়ের পর থেকে ও একই বাক্যবাণে জর্জরিত হত—কোনো কম্মের নয়, কিছুই পার না শুধু গানই গাইতে পার। কিন্তু না, আশ্চর্য শান্ত গলায় রজত বলে উঠল—তোমার লাগেনি তো? দেখো দেখো টাকাগুলো ভিজে গেল কিনা ... সুজাতার গলার কাছে একটা কান্না দলা পাকিয়ে এল। ঝাপসা চশমাটা কাপড়ের আঁচল দিয়ে মুছে উঠে দাঁড়াল। এবার বেশ বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে! আরথ্রাইটিসের রুগি সুজাতা, বালির ওপর দিয়ে যেতে বেশ সময় লাগে, তাই হোটেলে পৌঁছবার আগেই বেশ ভিজে গেল।

রাত্রে ডাইনিং হল থেকে খেয়ে এসে ওরা তিনজনে বেশ খানিকটা আড্ডা মেরে শুয়ে পড়ল। বাইরে তখন রিমঝিম বৃষ্টি হয়েই চলেছে। মাঝে মাঝে ঢেউ-এর গর্জন। তিনজনেই সুখনিদ্রায় তলিয়ে গেল। পরদিন খুব ভোরে সুজাতার ঘুম ভাঙল। বারান্দায় বেরিয়ে এল সুজাতা। কী অপূর্ব দৃশ্য। ঝমঝম বৃষ্টিতে কনসার্টের সুর। ঝোড়ো হাওয়ায় সমুদ্র আজ মাতাল। মেঘলা আকাশ আর সমুদ্রের জলের রঙে কোনো ফারাক নেই। সুজাতা আর থাকতে পারল না, একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়ে একটা ছাতা নিয়ে একা একাই বেরিয়ে এল। ওদের দিকে তাকাল, দুজনেই ঘুমে অচেতন। ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে ছাতা উল্টে ভেঙে একাকার। একটা বড় প্লাস্টিককে বাঁশ দিয়ে টাঙিয়ে তার তলায় কতকগুলো চেয়ার দিয়ে বসার ব্যবস্থা করে পয়সা উপার্জন করছে স্থানীয় কিছু লোক। একটা চেয়ার টেনে সুজাতাও বসে পড়ল। দশ টাকার বিনিময়ে যতক্ষণ ইচ্ছা বসা যায়। ও বসে বসে উত্তাল সমুদ্রের রূপ প্রত্যক্ষ করতে লাগল। দিগন্তরেখা দেখাই যাচ্ছে না। সুজাতা সমুদ্র বরাবরই ভালোবাসে, সমুদ্রের বিশালত্ব কেমন মনকে ছুঁয়ে যায়। জীবনের জটিলতাগুলো ক্ষুদ্র হতে হতে একসময় মিলিয়ে যায়, বৃষ্টিটা আরও বাড়ল। সুজাতা নিজের মনেই আবৃত্তি করে চলে—ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল/গরজি উঠিছে দারুণ রোষে ... না এবার উঠতেই হবে। ও সবে উঠতে যাবে ঠিক সেই সময় ছুটতে ছুটতে এক তরুণ ঝপ করে ওর পাশে বসে পড়ল। গা মাথা তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে সুজাতার দিকে তাকিয়ে হাসল।

বেশ জোরে এল না আন্টি?

হ্যাঁ, ছোট্ট করে উত্তর দিয়ে সুজাতা ভ্রূ কোঁচকালো। ভীষণ চেনা মুখ। ভীষণ চেনা। কার সঙ্গে যেন মুখের মিল, কোথাও যেন আগে ওকে দেখেছে। সুজাতার মস্তিষ্কের কোষগুলো ছেলেটাকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বেশিক্ষণ কৌতূহল চেপে রাখা সুজাতার স্বভাববিরুদ্ধ এই নিয়ে রজত খুব রাগ করত—এত যেচে যেচে কথা বলো কেন? কথা না বলে থাকতে পার না?

—না, পারি না, আমি তো নিজেকে তোমার মতো সেলিব্রিটি ভাবি না।

তুমি তো সেলিব্রিটিই নও, তো ভাববে কি?

না-কি? একটা গানের ক্যাসেট বার করে সেলিব্রিটি হয়ে গেছ?

আরও হবে, দেখে যাও ডারলিং—

নাঃ আর হল না, রজতের আর পুরোপুরি সেলিব্রিটি হওয়া হয়ে উঠল না। আবার মুখ ফেরাল ছেলেটির দিকে—একা এসেছ না বন্ধুদের সঙ্গে?

—না, বাবা মা'র সঙ্গে, বৃষ্টিতে ওরা দুজনেই হোটেল বন্দি। আপনি? আপনি একা আন্টি?

না, না আমার দুই সঙ্গী. তারাও হোটেল বন্দি। কোথায় থাক তুমি? কী

নাম তোমার? কী পড়? একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে ফেলে সুজাতা।

এক এক করে উত্তর দিই? মিষ্টি করে হাসে ছেলেটি। আমার নাম রূপক গাঙ্গুলি, থাকি বউবাজার, এম.এ পড়ছি, বাবার বিজনেস। মাঝে মাঝে দেখি।

কী নাম বললে? রূপক গাঙ্গুলি? তোমার বাবার নাম?

—দীপক গাঙ্গুলি। আপনি চেনেন আন্টি? ছেলেটি তাকিয়ে থাকে সুজাতার দিকে।

সুজাতা সংযত হয়। হৃদ্‌পিণ্ডের দাপাদাপিটা জোর করে থামাবার চেষ্টা করে।

না ; এমনিই জিজ্ঞেস করলাম। তোমার সাবজেক্ট কী?

পল সায়েন্স।

ভালো, তোমরা কি প্রায়ই আস এখানে? সুজাতা কথা ঘোরাবার চেষ্টা করে।

এটা আমার সেকেন্ড টাইম। বাবা প্রায়ই আসে। সমুদ্র নাকি বাবাকে ভীষণ টানে, আন্টি, আমার জুতোটা দেখবেন। বলেই ছেলেটি দৌড় লাগায় সমুদ্রের দিকে। আর স্থির হয়ে বসে থাকা সুজাতা স্মৃতির শিকড় ধরে এগোতে থাকে। প্রায় ধূসর হয়ে যাওয়া ছবিগুলো দাঁড়িয়ে পড়ে ওর সামনে।

তখন কত আর বয়স হবে সুজাতার, উনিশ কি কুড়ি, তখন প্রথম ওর পুরী আসা বাবা-মা'র সঙ্গে। প্রথম যৌবনের অনুভূতি প্রথম সমুদ্র দেখার অনুভূতির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এখানেই আলাপ হয়েছিল দীপকের সঙ্গে, দীপক গাঙ্গুলি, দীপকের চেহারা আর গায়ের রং দেখে প্রথমে ওকে বিদেশিই বলে মনে হয়েছিল। ধবধবে ফরসা, পাতলা লাল ঠোঁট, আর কটা চোখের দীপককে একদমই বাঙালি বলে মনে হয়নি। কিন্তু যেদিন পরিষ্কার বাংলায় ওর সঙ্গে আলাপ করল সেদিন একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল সুজাতা। সুজাতার শ্যামলা গায়ের রং ওকে সব সময় সংকুচিত করে রাখত। বন্ধুদের কাছে ওর মুখশ্রী গড়নের প্রশংসা শুনলেও ওর কালো রঙের কমপ্লেক্স সব সময় ওকে ঘিরে থাকত। ওর সঙ্গে ওদের পাশের ঘরের কঙ্কনার সঙ্গে ভীষণই বন্ধুত্ব হয়েছিল। সুজাতা ভাবত ফরসা চেহারার কঙ্কনাই বুঝি দীপকের মূল আকর্ষণ। কিন্তু দীপক যেদিন সোজাসুজি ওকে দেখে গানটা গেয়ে উঠল 'কালো, তা সে যতই কালো হোক ... সেদিন থেকেই সুজাতার বুকের মধ্যে বসন্তের বাতাস বইতে শুরু করল। ভয়, লজ্জা, অবিশ্বাসের দোলাচলে ও বিচে আসাই ছেড়ে দিল। ও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না দীপকের মতো সুন্দর চেহারার মানুষের ওর মতো কালো মেয়েকে ভালো লাগতে পারে। যদিও দীপকের একটা মাইনাস পয়েন্ট ছিল, ও লম্বা ছিল না, সুজাতার থেকে সামান্য লম্বা, ওকে দেখে শর্ট ফিগারই লাগত। একদিন দীপককে এড়ানোর জন্য সুজাতা খুব ভোরে

সি-বিচ ধরে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে গিয়েছিল। মনের আনন্দে ঝিনুক কুড়োচ্ছিল, মুখ তুলেই চমকে গিয়েছিল দীপককে দেখে। একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে। কখন সে ওর পিছু নিয়েছে ও টেরই পায়নি।

কী ব্যাপার? আমার সঙ্গে কথাও বলতে চান না? আমাকে দেখে কি খুব বখাটে ছেলে বলে মনে হয়?

ঠিক মনের কথাই ধরেছে দীপক, কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে সুজাতা ভদ্র হবার চেষ্টা করল—না তা নয়, আসলে আমার বাবা ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করেন না।

বাবাকে লুকিয়েই না হয় আমরা দেখা করব, জানেন আমি আপনাকেই রোজ স্বপ্নে দেখি, প্লিজ আমাকে ফেরাবেন না। সুজাতা দিশাহারা, কথাগুলোর মধ্যে কতটা সত্যতা আছে বুঝে উঠতে পারল না। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের দোলাচলে দুলতে দুলতে একরকম জোর করেই চলে এসেছিল ওদের সেই ভাড়া করা বাড়িতে। যেটা এখন বিরাট হোটেলে পরিণত হয়েছে—'হোটেল নীলাঞ্জন'। শরীরে তখনও এক হিমশীতল অনুভূতি, বুকের মধ্যে মৃদু কাঁপুনি। বাবা-মা'র সামনে ও আপ্রাণ চেষ্টা করছিল স্বাভাবিক হবার। এরপর দিন তিনেক ঘরে বসে থাকার পর কঙ্কনারা ওকে টেনে বার করেছিল। বাবা-মা'র চোখ এড়িয়ে, টুকরো টুকরো কথা দীপকের আবেশ করা দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বাকি দিনগুলো কেটে গিয়েছিল।

* * *

ওঃ আন্টি, থ্যাঙ্কস্, আপনি এখনও বসে আমার চটি পাহারা দিচ্ছেন? চমক ভাঙে সুজাতার, অপলক চেয়ে থাকে ও রূপকের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে হোটেলে ফিরে আসে।

—কিরে আমাদের না নিয়েই চলে গেছিলি? কবিতা চেঁচিয়ে ওঠে। নে মুড়ি খা, গরম গরম চপ আনিয়েছি, চা ও বলে দিয়েছি, এণাক্ষী এগিয়ে দেয় চপের ঠোঙা। কবিতা একটার পর একটা গান গেয়ে চলেছে। তার মধ্যেই নানারকম কথা। সুজাতা খানিকটা শুনছে, খানিকটা শুনছে না। আজ সুজাতার বার বার তাল কেটে যাচ্ছে, অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে, পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার বাসি স্মৃতিগুলো ওকে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। যদি দীপকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়? তাহলেও কি আগের মতো বুক কাঁপবে সুজাতার? ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নেই, ঘুম ভাঙল কবিতার চীৎকারে, এ্যাই চল বৃষ্টিটা ধরেছে, লাঞ্চটা সেরে নিয়ে বিচে যাব। ধড়ফড় করে উঠে বসল সুজাতা। তারপর দুপুরের লাঞ্চ সেরে ওরা তিনজনে বিচে গিয়ে বসল। তখনও ঝিরঝির করে বৃষ্টি হয়ে চলেছে।

অ্যাই সুজাতা, একটা গান ধরত—এনা বলে ওঠে, তারপর অপেক্ষা না করে নিজেই গান ধরে—মন মোর মেঘের সঙ্গী ... সুজাতাও গলা মেলায়, তারপরই ওর মনে হল কে যেন ওদের লক্ষ করছে, চকিতে দৃষ্টি ফেরাল সুজাতা, না চিনতে কোনো ভুল হল না। দীপকই, চুলটা বেশিরভাগই পাকা। একটু টাক পড়েছে। এছাড়া বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি তো! পাশে এক ভদ্রমহিলা একটু গোলগাল কিন্তু গায়ের রং? কালোই বলা চলে। সুজাতা ভ্রূ কোঁচকায় কালো? দীপক কালো মেয়েকে বিয়ে করেছে?

কি হল থামলেন কেন? ভালো লাগছে—দীপকই বলে উঠল। পাশের ভদ্রমহিলা মানে ওর স্ত্রী একটু হাসল।

সুজাতার খুব মজা লাগল—দীপক ওকে চিনতে পারছে না, কি করে চিনবে? পেকে যাওয়া চুল অনেক পাতলা চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, পৃথুলা সুজাতাকে কি করে চিনবে? ওর পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার চেহারাটা মনে পড়ল, সুশ্রী, সুগঠনা, কেশবতী। কই এতদিন পর দীপককে দেখে তো ওর বুকে কেউ হাতুড়ি পেটাচ্ছে না, মনে তো হচ্ছে না এই সেই দীপক যার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে একদিন জীবনটা অর্থহীন হয়ে গিয়েছি—ওরা এখন সবাই একসাথে গান ধরেছে। সমুদ্রের ঝোড়ো হাওয়ায় সুজাতার অ্যালবামটা আবার খুলে গেল।

পুরী থেকে কলকাতায় ফিরে এসে সুজাতা কোনো যোগাযোগ করেনি, দীপকই নিজের থেকে যোগাযোগ করেছিল। ঠিকানার আদানপ্রদান পুরীতেই হয়েছিল। দু-তিনটে চিঠির আদানপ্রদান, তারপর ধর্মতলায় মেট্রোর সামনে দেখা করার ডাক পেল সুজাতা। তখনকার দিনে প্রেম এতটা বেপরোয়া ছিল না। এখনকার মত ছেলে আর মেয়েদের মধ্যে অবাধ মেলামেশাও তখন ছিল না, দুরু দুরু বুকে সুজাতা যথারীতি মেট্রোর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সঙ্গে কঙ্কনাও ছিল। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে দীপককে ও দেখতে পেয়েছিল সঙ্গে আর একজন সুদর্শন, মাজা মাজা গায়ের রং, লম্বা, পুরুষালি চেহারা। দীপকই আলাপ করিয়ে দিল—আমার বন্ধু নিলয় মুখার্জি। হাতজোড় করে নিলয়—আপনার কথা অনেক শুনেছি দীপকের মুখে, ওর বর্ণনার থেকেও আপনি অনেক বেশি সুন্দর। চমকে উঠল সুজাতা, সারাজীবন ধরে ওর কালো রং ওকে শুধুই পীড়া দিয়ে গেছে, ও যে পুরুষের চোখে এত সুন্দর টের পায়নিতো, অথচ ও জানে ওর মুখশ্রীতে অনেক ত্রুটি, তবে কি ওর কলেজে বন্ধু নীতিশের কথায় ও গ্ল্যামার গার্ল? ওদের পাড়ার একটি ছেলে ওকে নাকি আড়ালে ডাকত ব্ল্যাক ডায়মন্ড বলে। সুজাতার হাসি পেল, পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে উঠল—ঠাট্টা নয়তো? কিন্তু দু-জোড়া চোখে শুধুই মুগ্ধতা। তবুও সুজাতার সংশয় যায় না। কালো রঙের হীনম্মন্যতাবোধের ঘেরাটোপে থাকতে থাকতে সংশয় যেন ওর নিত্যসঙ্গী হয়ে

দাঁড়িয়েছিল। এরপর থেকে যখনই ওদের দেখা হত, নিলয় সব সময়ই থাকত, কঙ্কনাও মাঝে মাঝে থাকত। গল্প আড্ডার মাঝে মাঝেই নিলয়ের গভীর দৃষ্টি সুজাতা অনুভব করত, কিন্তু সেটা ওকে কোনোভাবেই নাড়া দিত না, কোনো সন্দেহও মনের মধ্যে আসত না, কারণ ও তখন দীপকের প্রেম সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে। মাঝে মাঝে কঙ্কনা ও নিলয়কে আলাদা কথা বলার সুযোগ দিয়ে দীপক ওকে আলাদা ডেকে নিয়ে গল্প করত, সুজাতার গান শুনত। এর মধ্যে পরীক্ষার জন্য সুজাতা দীপকের সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করল। ফাইন্যাল বি.এস.সি মনোযোগ দরকার। পরীক্ষাও শেষ হল। একটা চিরকুটও এসে গেল, এটা পোস্টে নয়, সুজাতা বারান্দায় আর তারই মধ্যে হুশ করে সাইকেলে করে এসে চিরকুটটা ছুঁড়ে দিয়ে গেল একটি অচেনা ছেলে। হ্যাঁ। ভিক্টোরিয়ায় দেখা করতে বলেছে দীপক, তবে খুব তাড়াতাড়ি লিখেছে মনে হল, হাতের লেখাটা অন্যরকম। তখন অতশত ভাবার অবকাশ ছিল না সুজাতার, কী এক অমোঘ আকর্ষণে সুজাতা ছুটে গিয়েছিল ভিক্টোরিয়ার সামনে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখল শুধু দাঁড়িয়ে আছে নিলয়।

দীপক আসেনি? অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছিল সুজাতা। 'না, মানে এখনও আসেনি, আসবে হয়তো'—আমতা আমতা করেছিল নিলয়। চলুন না ভেতরে গিয়ে বসি—নিলয়ের গলায় সংকোচ। এরপর দুজনে দুটো বাদামের ঠোঙা নিয়ে বসেছিল।

'কি ব্যাপার? দীপক এখনও এল না?' ও বোধহয় আসবে না—নিলয়ের স্বর গম্ভীর কেন?

যদি রাগ না করেন তো বলি?

আপনি যা বলার বলুন—স্থির ঠান্ডা গলায় বলেছিল সুজাতা, মানে, ওর বাড়ির লোকেরা কালো মেয়ে পছন্দ করছে না, আর ভবিষ্যতের কথা ভেবে ও আর আপনার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না।

ধনুকের ছিলার মতো উঠে দাঁড়িয়েছিল সুজাতা। সারা শরীর কাঁপছিল, হাতের ঠোঙাটা দূরে ফেলে দিয়ে দ্রুত হাঁটা দিয়েছিল। পেছন থেকে নিলয়ের ডাক শোনা যাচ্ছিল,—ম্যাডাম শুনুন অত রেগে যাবেন না ... কিন্তু রাগে অপমানে সুজাতা তখন টালমাটাল, কীভাবে যে ও একা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল ও নিজেও জানে না। জীবনে ও প্রথম একলা ট্যাক্সি ধরল। অপমানিত ক্ষতবিক্ষত হৃদয় ওকে সেদিন সাহসী করে তুলেছিল। শুধু একটা শব্দই ওর মনের মধ্যে তোলপাড় হচ্ছিল 'কালো', 'কালো', 'কালো', ... ওতো দীপকের সঙ্গে মিশতে চায়নি, দীপকই তো জোর করেছিল—বাড়িতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছিল সুজাতা।

চমক ভাঙল কবিতার হাসিতে দীপকের সঙ্গে এর মধ্যেই ও আলাপ জমিয়ে ফেলেছে। সুজাতা আবার তাকাল দীপকের স্ত্রীর দিকে। ভদ্রমহিলা বেশ কালো তবে? দীপকের বাড়ির লোকও মেনে নিয়েছিল। তবে পর পর দুদিন ও দীপককে দেখেছিল সাইকেলে করে বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করতে। হয়তো কিছু বলত। রাগে অন্ধ সুজাতা ওর আসার কারণটা জানার চেষ্টাও করেনি।

আর আশ্চর্য, সুজাতার কিন্তু বিয়ে হল সেই ফরসা ছেলের সঙ্গেই, রজতের বাড়ির সকলেই বেশ ফরসা, কিন্তু ওর কালো রং নিয়ে ওরা কখনও কটাক্ষ করেনি।

কী ব্যাপার? আপনি এত চুপচাপ?

'চমকে ওঠে সুজাতা। দীপক ওর সঙ্গেই কথা বলতে চাইছে। দীপক ওকে চিনতে পারছে না, এটাতে ও মজাই পেল, একটা অনুভূতিশূন্য মন নিয়েই ও কথার জবাব দিল—এনজয় করছি গান, সমুদ্র, বর্ষা। কবিতা আর এণাক্ষী সমুদ্রে পা ভেজাতে গেল।

আপনি গেলেন না? দীপক প্রশ্ন করে।

না আমার হাঁটুর সমস্যা, বসে বসেই এনজয় করি।

দীপক উঠে এসে সুজাতার পাশের চেয়ারটায় বসে—আপনার বুঝি সমুদ্র খুব ভালো লাগে?

কেন, আপনার লাগে না?

লাগে না আবার? সেই কবে থেকে সমুদ্রের সঙ্গে আমার প্রেম।

তাই নাকি? তো শুধুই সমুদ্র না তার সঙ্গে কোনো সমুদ্রমানবী? চমকে তাকায় দীপক—ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়েই থাকে।

না মানে বলছিলাম, এখানে এসে তো মানুষ রোমান্টিক হয়ে যায়—কথা ঘোরায় সুজাতা। এর মধ্যে এনাক্ষী এসে পড়ে—জানেন উনি কিন্তু লেখেন, আপনার কাছ থেকে লেখার রসদ সংগ্রহ করছেন।

ও, তাই বলুন, আপনি লেখিকা। কী নাম আপনার?

ওরে বাবা, একেবারেই অনামি আমি, জাস্ট একটু-আধটু লেখার শখ।

হ্যাঁ, তা একটু তো যৌবনের স্মৃতি থাকবেই বলুন—দীপক বলে ওঠে।

হ্যাঁ। ছোটবেলাকার খেলাধুলোর স্মৃতির মতো তাই না? সুজাতার কথায় ব্যঙ্গ।

না, না খেলা নয়—দীপকের উদাস করা চোখ সমুদ্রের দিকে। তা আপনার সেই মানবী এখন নিশ্চয়ই আপনার পুত্রের জননী? একটু মজা করার চেষ্টা করে সুজাতা।

না, সেই মানবী আমার কোথায় মিলিয়ে গেছে। আধফোটা কুঁড়ি হয়ে যে

আমারে হৃদয়েই রয়ে গেল। ফুল হয়ে আর ফুটল না।

বলুন না, আপনার সেই প্রেমের কথা—উত্তেজনা চেপে সুজাতা জানার চেষ্টা করল।

কেন? লিখবেন? লিখুন যদি কখনও তার চোখে পড়ে। জানেন, এখানেই সে এসে দাঁড়াত, তন্বী, শ্যামাঙ্গী, শিখরদশনা আজানুলম্বিত বাহু বলেই দীপক হা হা করে হাসতে থাকে। একটু বঙ্কিমচন্দ্র বলতে ইচ্ছে করল—বলেই আবার হাসতে শুরু করল।

বলুন ভালো লাগছে, সুজাতা সহজ হবার চেষ্টা করল। জানেন, ওর চোখ দুটো এখনও দেখতে পাই, গভীর হ্রদের মতো, মাঝে মাঝেই ডুব দিতাম, ওর ছিপছিপে গড়ন, আর একরাশ কালো চুলের মধ্যে আমি যেন হারিয়ে যেতাম।

বাঃ আপনি তো বেশ সাহিত্যিক মশাই, আগে কখনও টের পাইনিতো, মানে প্রথমে দেখে মনে হয়নিতো—সুজাতা সামলে দেয়। কী করে বিচ্ছেদ হল আপনাদের? সরি, একটু পার্সোনাল কথা জিজ্ঞেস করে ফেললাম—সুজাতার সংকুচিত ভাবে নিখুঁত অভিনয়।

না, না ডাক্তার আর লেখকদের কিছু লুকোতে নেই। সুজাতা লক্ষ্য করল দীপক আড়চোখে ওর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে নিল। ওর স্ত্রী কবিতাদের সঙ্গে কথায় ব্যস্ত, তারপর বলতে আরম্ভ করল—আসলে ও ছিল অধরা মাধুরি, একদিন একটা চিঠি আমার বন্ধুর হাত দিয়ে লিখে পাঠাল।

চিঠি? কী লেখা ছিল তাতে? উত্তেজনা দমন করার চেষ্টা করল সুজাতা।

লেখা ছিল ওর বাড়িতে শর্ট ফিগারের ছেলে একদমই পছন্দ নয়, তাই ভবিষ্যতের কথা ভেবে ...

এক একই চিঠিও ও পেয়েছিল তবে কি নিলয়? শুধু চিঠি পেয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন? একবারও যাচাই করলেন না চিঠিটা সত্যি কি মিথ্যে? হাতের লেখা কি ওরই ছিল? সুজাতা একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন করে বসল।

দীপক তাকাল ওর দিকে—আপনি ঠিকই বলেছেন, যাচাই আমি করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও আমার সঙ্গে আর দেখাই করল না।

এত ট্র্যাজিক প্রেম। ওঃ ভেরি স্যাড, কখন যে এণাক্ষী এসে ওদের পেছনে বসে গল্প শুনছে টেরই পায়নি সুজাতা। আচ্ছা, তারপর কিছু জানতে পারেননি?

হ্যাঁ, জেনেছিলাম, জেনেছিলাম আমার সেই পত্রবাহক বন্ধুই ছিল পত্রলেখক, ও আসলে আমার সেই মানবীটিকে ভালোবেসে ফেলেছিল। ত্রিকোণ প্রেমের পরিণতি সব সময়ই বিয়োগান্তক, তাই না?

বুকের মধ্যে একটা ভারী পাথর অনুভব করছিল সুজাতা। এতটাই, এতটাই

বোকা ছিল সুজাতা? নাকি সেদিনের সেই ভুলটা ছিল ঈশ্বর নির্দিষ্ট। সেদিন যদি এরকম ভুল না করত তবে ও হয়তো রজতের মতো এত ভালো মানুষের সংশ্রবে আসতে পারত না। কই এই ভুলের কথা জেনে ও-তো অনুতপ্ত হতে পারছে না। সেটা কি এই যাদুকর সময়ের জন্য? যে খুব তাড়াতাড়ি চেনাকে অচেনা, প্রেমকে অপ্রেমে পরিণত করতে পারে? কিন্তু তাই বা কি করে হয়? দশ বছরের অনুপস্থিতিতে রজতকে ওর মন থেকে সরিয়ে দেয়নি, প্রতিটি সময় রজত ওর কাছে কাছে আছে, বরং রজতের উপস্থিতির থেকে রজতের অনুপস্থিতিটাই ওর কাছে বেশি আবেগময়, স্মৃতিগুলো এখনও অম্লান। হয়তো যন্ত্রণাটা কমেছে এই যা। একেই কি বলে সাতপাকের বন্ধন। কিন্তু দীপক? ওতো ওর স্ত্রীকে পাশে নিয়েও সুজাতাকে ভুলতে পারেনি। দীপকের কাছে ওর স্মৃতি আজও অম্লান, সেটা কি সুজাতার প্রতি ওর ভালোবাসা না কি বেতাস লতার মতো শরীর নিয়ে এক অধরা মাধুরীর স্মৃতিমাত্র। সুজাতা বুঝতে পারে রজত ছিল ওর অমল ভালোবাসা, যা সাতপাকে বেঁধে দিয়েছিল স্বয়ং ঈশ্বর। তাই রজত এখনও ওর পাশে, ওর চারধারে।

ম্যাডাম গল্পটা কীভাবে লিখবেন ভাবছেন? আরে এমনি মজা করলাম। তবে লিখলে আমার ঠিকানায় ম্যাগাজিনটা পাঠিয়ে দেবেন? ঠিকানা ...

জানি।

জানেন? কীভাবে?

আপনার ছেলের সঙ্গে আমার আগেই বন্ধুত্ব হয়ে গেছে।

ওঃ তাই বলুন—ও খুব মিশুকে।

ম্যাডাম, আপনার নামটা ... দীপক আবার জানার চেষ্টা করে।

না, ও নাম বলবে না, চেনাও দেবে না। ওর সেই বেতস লতার মতো গভীর চোখের কেশবতী কন্যার ছবিটা ও দীপকের মন থেকে মুছে দেবে না। ওটাই জীবন্ত হয়ে থাক। কাঁচা পাকা চুলের পৃথুলা আর্থারাইটিসের রুগি সুজাতাকে দেখে ওর সেই ছবি টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

আমার নাম সুমতি মিত্র, আস্তে করে বলে সুজাতা। দীপক হাতজোর করে উঠে দাঁড়ায়, আবার দেখা হবে মিসেস মিত্র। ওদের চলে যাওয়ার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে তাকে সুজাতা, দেখতে থাকে ওর প্রথম বসন্ত কেমন হলুদ রং থেকে ধীরে ধীরে ধূসর রঙে পাল্টে যাচ্ছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুজাতাও উঠে দাঁড়ায়। আর তারপর এলোমেলো পায়ে বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকে।

শেষ যাত্রা

(শিক্ষক নবপদ ভট্টাচার্যের স্মৃতির উদ্দেশ্যে)

রতন কুমার মৃধা

'মৃত্যু' আতঙ্ক সৃষ্টিকারী বিভীষিকাময়। কোনো বয়সের বিচার সে করে না। আগাম বার্তা না জানিয়ে নির্বিচারে নির্বিশেষে প্রাণ ছিনিয়ে নেয় কারণে-অকারণে। তাই মানুষ আমাদের ফাঁকি দিয়ে অকালে চলে যান কিন্তু বাস্তবটা তো রূঢ় এবং কঠিনও। পৃথিবী থেকে সকলকেই একদিন চলে যেতে হবে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে। সেই চলে যাওয়া মানুষটির জন্য পরিবারবর্গ শোক সাগরে স্নান করে অথচ তার স্মৃতি এখানে-সেখানে সাড়া দেয়। মনে হয় সবকিছু বড্ড অসহায় হারানো ব্যক্তিটির জন্য।

উনি আজ নেই, গতকাল ছিলেন। চারপাশে স্মৃতি উঁকিঝুঁকি মারছে। কোনো কিছু আর ভালো লাগছে না এই ভট্টাচার্য পরিবারের। সমবেদনায় নিরাশার মাঝে অসহায় হয়ে পড়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা। কেউ ভাবতে পারেনি উনি চলে যাবেন এই থমথমে আচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে।

যিনি চলে গেলেন তার নাম নবপদ ভট্টাচার্য। নববারাকপুর, দেশবন্ধু রোডে বাড়ি। এই এমন একটি মানুষ যার শিক্ষার সাথে জীবন ছিল খুব স্বাভাবিক। সহজভাবেই তার জীবনধারা, ন্যায় নিষ্ঠাবান এক অসম্ভব প্রাণবন্ত এবং উজ্জ্বলও। নির্জন স্বভাবের একজন মানুষ যেমন ছিলেন তেমনি স্বভাবগত আভিজাত্যের মধ্যে বিচরণ করতেন; ছিলেন সৎ ও অকপট।

বছর তিন পূর্বে আমার সাথে পরিচিত হয়। আমার মেয়ে ঋতুকে পড়াত। তখন বর্তমান সমাজ থেকে আলাদা মনে হতো। আশ্চর্য মনে হতো। আমি তখন সংস্পর্শে যাবার চেষ্টা করি। অনেক সমস্যার উত্তর না পেয়ে প্রশ্ন করি উত্তর পাবার জন্য। তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে না পারলে, নীরবে, সমাহিত ভঙ্গিতে উত্তর খুঁজে ছুটে এসে নিঃশব্দ হাসির তৃপ্তিতে বলে যেত অথবা কাগজে লিখে দিত। এমন মানুষ যার ভিতর কোনো অহংকার, ক্রোধ, অলস, লজ্জা, অনিহা কোনোটাই ছিল না। অস্বাভাবিক ভাবে চলে গেল। যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। গতকাল পড়ন্ত বিকেলে প্রাইভেট পড়িয়ে ঘরে ফিরলেন। সকালবেলা তার মুখে ফ্যাকাশে ছাপ পড়ল। শরীরখানা জীর্ণ-শীর্ণ বড় অসহায়ের মতন। লক্ষ করলেন স্ত্রী বন্দনা ভট্টাচার্য। স্বামীর কাছে গিয়ে জানতে চাইল, 'তোমার কি হয়েছে? তোমাকে এ রকম লাগছে কেন?

না-তো আমার কিছুই হয়নি। আমি তো ঠিক আছি।

স্ত্রী—তুমি ঠিক নেই। কী অসুবিধে আমাকে বলো। এখনি ডাক্তারের কাছে চলো।

—তুমি অযথা চিন্তা করছো। আমার কিছুই হয়নি। আমি ভালো আছি, আমি ঠিক আছি। তোমরা চিন্তা করো না।

স্ত্রী বন্দনা ভট্টাচার্য স্বামীর কোনো কথা কর্ণপাত না করে একমাত্র ছেলে সঞ্জীব ভট্টাচার্য এবং পুত্রবধূ নূপুর ভট্টাচার্যকে ডেকে আনে। রাজু বাবার আপাদমস্তক তাকিয়ে ডাক্তার-এর কাছে নিয়ে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। রাজু মানে সঞ্জীব ভট্টাচার্যের আদুরে বাবা-মায়ের দেয়া নাম। সরকারি চাকুরি করেন। অফিসে জানিয়ে বাবাকে তৈরি হতে বললেন। রাজুর বাবা ডাক্তার দেখানোয় রাজি ছিলেন না। অবশেষে না গিয়ে উপায় হল। জ্যেঠু অসুস্থ সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই ছাত্র-ছাত্রীরা চলে আসে। জ্যেঠু মানে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রিয় ডাক জ্যেঠু। যাবার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের বললো কয়েকদিন অপেক্ষা করো আমি চেক-আপ করে আসি। ডাক্তার দেখানোর জন্য জেনিক নার্সিংহোমে নিয়ে যায়।

নার্সিহোমের ডাঃ কে চ্যাটার্জি ভালো করে দেখে বললেন—একটু সমস্যা আছে। অ্যাডমিশন করতে হবে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে জানতে পারলো রাজুর বাবা জটিল রোগে আক্রান্ত।

ডাক্তারবাবু রাজুর বাবার কাছে জানতে চাইলো—কখনও কোনোদিন কোনো সমস্যা ছিল কিনা?

—ডাক্তারবাবু! আমার কোনো সমস্যা হয়নি, আজও নয়। আমি ভালোই আছি। আমাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিন। অনেক ছাত্র-ছাত্রী আছে তাদের সামনে পরীক্ষা, বাড়িতে গিয়ে পড়াতে হবে।

—ঠিক আছে। আপনার কিছুই হয়নি। আজকালের মধ্যে চলে যাবেন বাড়িতে। ডাক্তারবাবু তার চেম্বারে এসে বাড়ির লোকদের ডেকে বলল—ইমিডিয়েটলি অপারেশন করতে হবে। কারণ স্টুল প্যাসেজ ন্যারো হয়ে গেছে। স্টুল বন্ধ হয়ে গেলে বেঁচে থাকা কষ্ট হবে এবং তার সাথে ম্যালিগন্যান্টের প্রথম ধাপ। কিন্তু বায়োপসি রিপোর্ট না পেলে কিছুই বলা যাবে না কতদূর ছড়িয়েছে। কিন্তু এখনি অপারেশন করতেই হবে। অপারেশন হয়ে গেলে ভালো হয়ে যাবে।

—ডাক্তারবাবু রিপোর্ট আসতে কতদিন লাগবে?

—প্রায় পনেরো দিন অপেক্ষা করতে হবে। এখন আপনারা চিন্তা-ভাবনা করেন।

সবার মনে একটা আতঙ্কের ছাপ পড়ে গেল। বিষাদের ছায়া পড়ল মুখে এ যেন মৃত্যুর ভয়ংকর বিভীষিকা। স্ত্রী কেঁদে কেঁদে মরিয়া। কখনও বা চিৎকার করে বলে ওঠে, এ কি হল? আমার স্বামী এক কাপ লিকার চা ভিন্ন অন্য কিছু খেত না। কারো নিমন্ত্রণ বাড়িতেও যেতেন না। ভাবতে পারছো। রাজু বড়ো ক্লান্ত হয়ে গেল। বাবুয়া মামার পাশে থেকে বিশিষ্ট ডাক্তারদের সাথে

কন্‌সালটেশন করে অপারেশনের জন্য আইএলএস নার্সিংহোমে ভর্তি করে ডাঃ বি. আগরওয়ালের আন্ডারে।

অ্যাডমিশন্‌ হবার পূর্বে বড় আশা দিয়ে চলে গেল। আমি হাসপাতাল থেকে এসে তোমাদের পড়াব। একটু অপেক্ষা করো, চেক-আপ করে আসি। আমার কিছুই হয়নি। মনে মনে সকলে কামনা করছি তাই যেন হয়।

অ্যাডমিশন হবার তিনদিন পর অপারেশন। ডাক্তারবাবু রাজুর বাবাকে বলল—ছোট একটা অপারেশন করতে হবে। রাজুর বাবা দ্বিমত করেনি এবং কোনো প্রশ্নও করেনি। মনে মনে দুর্বল হয়ে পড়ল। ছেলে, স্ত্রী পরিবারবর্গ কষ্ট বা দুঃখ হবে জেনে, কখন কোনো বিষয় জিজ্ঞাসা করলে, আমি ভালোই আছি এর থেকে বেশি নয়। স্ত্রী তার পাশে বসে জানতে চেয়েছে—কী অসুবিধে।

উত্তরে না, আমার কোনো সমস্যা নেই। আমি ভালোই আছি। তোমাদের কোন অসুবিধে নেই তো। রাজুর কথা বললে দু-চোখ ভরে জল গড়িয়ে পড়ল। সত্যিকারের ভাবতে অবাক লাগে, এত কষ্ট অথচ একটিবার কারো কাছে শরীর নিয়ে অভিযোগ কখনও করেনি।

পরিবারে যেন একটা দুঃখের কালো মেঘের ছায়া বিরাজ করছে। স্ত্রী কেঁদে কেঁদে বলছে, আমার যাতে কোনো কষ্ট না হয় সবরকম ব্যবস্থা করে আমাদের ছেড়ে এমন করে চলে যাবে। ভালো হয়ে ফিরে আসার জন্য অসহায়ভাবে নূপুর, রাজু খুঁজে বেড়াচ্ছে পথের সীমানা। ছাত্র-ছাত্রীরা শুনে চাপা দীর্ঘশ্বাসে চোখ ভরা জল নিয়ে নীরবে চলে যায়, জ্যেঠুর কি হবে? আমাদের কি হবে? সবার মনে এক ভয়ংকর চিন্তা।

ভালোভাবে অপারেশন হয়ে যাবার সাতদিন পরে ডাক্তারবাবু বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য ডিস্‌চার্জ লিখে দিলেন। এখন কোনো অসুবিধে হবে না। বাড়িতে বসে ড্রেসিং করলে ঠিক হয়ে যাবে। মাস ছয়েক পরে সাধারণ জীবনে ফিরে আসবে। ত্রিশে আগস্ট বেলা দু'টার সময় ফিরে আসে বাড়ি। দলবেঁধে রাত পর্যন্ত সবাই দেখতে আসে। আমি কাছে গিয়ে জানতে চাই, কেমন আছেন আপনি? বললেন—আমি ভালো আছি। প্রতিবেশীরা রাত হতেই চলে গেল। সমস্ত রাত স্ত্রী পাশে ছিল। রাজু-নূপুর কখনো শরীরটা একটু নরম বিছানায় আড়মোড়া দিয়ে আবার চলে আসে বাবার কাছে। এমনি করে রাত শেষ পূর্ব আকাশে রবির আলো উঁকি দিয়েছে। একত্রিশে আগস্ট দুই হাজার দশ। সেদিন ভোরের আলো সূর্যকে নিয়ে খেলা করছে একরাশ কালো মেঘ। আবার কখনও থেমে থেমে বৃষ্টি পড়ছে। এমন এক মুহূর্তে মৃত্যুর দুর্জয় শক্তির আবির্ভাবের নির্মম আঘাত টেনে আনে নিষ্ঠুর মৃত্যু। ভেসে আসে কান্না, বেদনার আর্তনাদ। চিৎকার করে কেঁদে ওঠে অসহনীয় শূন্যতার জ্বালায়। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে মহাশক্তি মৃত্যুবানে নিথর দেহটির দিকে। মৃত্যুর অস্ত্র হল মৃত্যু। কেউ পারবে না তার

সাথে লড়াই। তাইতো মেনে নিতে হবে নিয়তি।

রাজু মাঝে মাঝে কেঁদে উঠে বলে, 'আমার সব শেষ হয়ে গেছে। স্ত্রী শোকে পাথর। পুত্রবধূ চোখের জলে নিথর হয়ে বসে আছে। দুঃখে গাছ-পালা, তরু-লতা শোকে শান্ত। নীরব পৃথিবীর কোথাও কোনো শব্দ নেই। চারদিকে মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল; সকলে ছুটে আসছে চারদিক থেকে। হারানোর ব্যথায় নির্বাক। থমথমে পরিবেশ। বিদীর্ণ বেদনায় চোখ ছল্‌ছল্‌। সকলেই দাঁড়িয়ে দেখছে মৃত্যু কত বেদনাদায়ক, ভয়ংকর এক আর্তনাদ। যে যাবার চলে গেছে—ডেথ সার্টিফিকেট-এর জন্য স্থানীয় ডাঃ পি. অধিকারীকে ডেকে আনা হল। ভালো করে দেখে সবার মুখের দিক তাকিয়ে ডাক্তারবাবু রাজুর মাকে বললো, 'সরি। কিছুই করার নেই। কষ্টের থেকে চলে গেছেন এই ভালো। এই কষ্ট আপনি সহ্য করতে পারতেন না। ঘণ্টাখানেক পরে কাউকে পাঠাবে আমি সার্টিফিকেট লিখে দিব। ডাক্তারবাবু চলে গেলেন।

সব থেকে আশ্চর্য যে মানুষটি কিছুক্ষণ পূর্বে সবকিছু দেখে কথা বলেছিল খানিকক্ষণ পরে সম্পূর্ণ দেহটি সাদা কাপড়ে ঢাকা পড়ল। এর থেকে পৃথিবীর কী আশ্চর্য ঘটনা হতে পারে। বিষণ্ন হৃদয়ে অশ্রুভরা নয়নে সকলে দেখছে। যে মানুষটি জীবনে সংগ্রাম করে সৃষ্টি করেছিল একটি প্রাচীর, গড়েছিল সাজানো ফুলের স্তর আজ সবই সেখানেই থেকে গেল, কিন্তু চলে গেলেন তিনিই। শবদেহের গাড়িটিতে শেষ যাত্রা করলেন নিমতলার শ্মশানে, সাদা ফুলে নিথর দেহটি পরিপূর্ণ। নিঃশ্চিহ্ন সব, শুধু স্মৃতিটুকু এই মায়ার বন্ধনে। এই তো ক্ষণিকের জীবন। তাই তো রবিঠাকুর বলেছেন—

মরণ রে

তুঁহু মম শ্যাম সমান।

শবদেহের গাড়িতে নিয়ে যাত্রা হল শুরু, ক্রন্দনে জীবনের নিঃশ্চিহ্ন পরিসমাপ্তি হবে চিতার ছাইয়ে মায়াজালের বন্ধনমুক্ত করে। তাই তো রবিঠাকুর ভাষায় বলতে পারি—

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি

বিচিত্র ছলনা জালে

হে ছলনাময়ী।

যিনি চলে গেছে ফিরে আসবে না মায়া সংসারে
শেষ যাত্রা হলো শুরু, কাঁদে নিঃশব্দে আছে যারা পাশে
দুঃখের স্মৃতি রইল পড়ে এমন মানুষ জন্মাবে না একালে
মানুষ মানুষের পরিচয় মেলে যখন জীবনের অবসান ঘটে।

লেখক

সুব্রত বসু

ঠিক সময় দমদম স্টেশনে অদিতি এসে পৌঁছেছিল বলেই সকালের মেল ট্রেন লালগোলায় উঠতে পেরেছিল। ফাঁকা কম্পার্টমেন্টটা দেখেই অদিতি মনে মনে ভাবল, 'দিদি ঠিকই বলেছে যে সকালের দিকে বেরোলে ট্রেনে যাত্রিদের ভিড় কম থাকে।' কম্পার্টমেন্টের জানালার ধারের খালি সিট্‌টাতে গিয়ে বসে অদিতি। যাত্রী বলতে জনা পঁচিশেক লোক, তার মধ্যে ছয়-সাতজন মহিলা বসে আছে। আর মাঝে মাঝে স্টেশন আসলেই হকাররা ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে উঠে ডাক ছেড়ে জিনিসপত্র ফেরি করে যায়। পর পর তিনদিন স্কুল ছুটি থাকায়, অদিতি দমদমে দিদির বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। থাকে বীরনগর, ওইখানে গার্লস স্কুলে শিক্ষকতা করে। নিজের ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে মনোযোগ সহকারে পড়তে থাকে। ট্রেনটা একটার পর একটা স্টেশন পিছনে ফেলে নিজের গন্তব্যস্থানে ছুটে চলে।

ব্যারাকপুর স্টেশনে ট্রেনটা থামতেই, একমাথা লম্বা ঝাঁকড়া চুল, ছিপছিপে চেহারার মাঝবয়সি যুবক, পরনে তার জিন্‌সের ফুলপ্যান্ট, গায়ে সাদা রঙের হাফহাতা জামা, কাঁধে একটা ঝোলানো ব্যাগ, মুখে জ্বলন্ত চুরুট টানতে টানতে অদিতিদের কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়লো। ট্রেনটা ছেড়ে দিতেই অদিতির সামনা-সামনি জানালার ধারের সিটে বসে আয়েশ করে চুরুট টানতে থাকল। চুরুটের গন্ধ সহ্য করতে না পেরে অদিতি একটু উত্তেজিত হয়ে বই থেকে মুখ তুলে বলে উঠলো 'দয়া করে ধূমপান করাটা বন্ধ করবেন!' 'সরি ভেরি সরি' বলেই সিট থেকে উঠে কাঁধের ঝোলানো ব্যাগটা নিজের সিটের উপর রেখে চলন্ত ট্রেনের দরজার কাছে গিয়ে চুরুট খেতে থাকে দিব্যেন্দু। খানিকবাদে চুরুটের শেষ টানটা দিয়ে, চুরুটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিজের জায়গায় এসে বসে দেখতে পেল অদিতি যে বইটা পড়ছে, সেই বইটার নাম 'যদি কোনোদিন', লেখকের নাম মুশাফির। কিছুক্ষণ বাদে অদিতি বইপড়া বন্ধ করে বইটা পাশে রেখে ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকে। দিব্যেন্দু এবার অদিতিকে বলে উঠল 'আমি এখানে বসেছি বলে আপনার বই পড়তে খুব অসুবিধা হচ্ছে।' দিব্যেন্দুর কথা শুনে অদিতি অমনি বলল—'না না তা কেন হবে, আপনি বসুন, আসলে আমি যাব অনেক দূর, সাথে চার-পাঁচটা বই নিয়ে এসেছি, সময় কাটাব বলে। সব বইগুলো একবার করে আমার পড়া আছে। তাই এখন আর পড়তে ভালো লাগছে না।' 'মনে যদি কিছু না করেন তাহলে এই বইটা আপনি পড়তে পারেন' বলে নিজের কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটা বই অদিতিকে বের

করে দিল।

বইটার নাম 'সূর্য ওঠার স্বপ্ন' লেখক মুশাফির। বইটা হাতে নিয়ে অদিতি দিব্যেন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল 'মনে করার কী আছে, আমি মুশাফিরের লেখা পড়তে খুব ভালোবাসি।' তারপর ভালো করে বইটা দেখে বলে উঠলো 'এই বইটা আপনি পেলেন কী করে, এটাতো বাজারে এখনও বের হয়নি।' হাসতে হাসতে দিব্যেন্দু বলল, বাজারে বইটা বের হয়েছে খুব অল্প সংখ্যায়। আমার এক বন্ধু প্রকাশক, সে আমাকে দিয়েছে।' দিব্যেন্দুর কথা শুনে অদিতি বলে উঠলো 'মুশাফির ছদ্মনামটা কোন সাহিত্যিকের বলতে পারেন?' 'না এ আমি ঠিক বলতে পারবো না।' বললেন দিব্যেন্দু। দেখ্‌তে দেখ্‌তে নৈহাটি স্টেশনে এসে দাঁড়ালো ট্রেনটা। ট্রেনের জানালা দিয়ে দিব্যেন্দু একজন চা-ওয়ালাকে ডাক দেয়, তারপর অদিতির দিকে চেয়ে বলল, 'আপনি চা খাবেন'। বই পড়তে পড়তে মাথা নেড়ে অদিতি বলল 'না'। অগত্যা পকেট থেকে পয়সা বের করে চায়ের দামটা চাওয়ালাকে দিয়ে এক ভাঁড় চা কিনে খেতে থাকে দিব্যেন্দু। ট্রেনটা নৈহাটি স্টেশন ছেড়ে আবার নিজের গতিতে চলতে থাকে। হঠাৎ বই পড়া বন্ধ করে অদিতি বলে ওঠে, 'আপনি কোন স্টেশনে নামবেন!' 'আমি কল্যাণী স্টেশনে নামবো' বললেন দিব্যেন্দু। 'ট্রেনের মধ্যে এত আওয়াজ, আর এতো অল্প সময়ের মধ্যে বইটা আমার পড়াই হল না। আপনি যদি অনুমতি দেন বইটা বাড়িতে পড়ে ডাকযোগে দু-একদিনের মধ্যে আপনাকে পাঠিয়ে দেব।' অদিতির কথা শুনে দিব্যেন্দু বলে 'অনুমতির কি আছে! যথাসময়ে পড়ে বইটা আমাকে দেবেন। আর এই নিন আমার ঠিকানা। বইটা ডাকযোগে পাঠাবার আগে আমাকে এই ফোন নম্বরে ফোন করে তবেই আমাকে বইটা পাঠাবেন। কেননা আমি বাসায় সব সময় থাকি না।' বলেই জামার পকেট থেকে একটা পেন আর সাদা কাগজ বের করে দিব্যেন্দু নিজের নাম ঠিকানা আর ফোন নম্বর লিখে দিলেন। দিব্যেন্দুর ঠিকানাটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে অদিতি বলে উঠলো 'আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব, তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।' ট্রেনটা এতক্ষণে কল্যাণীস্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। অদিতিকে নমস্কার জানিয়ে দিব্যেন্দু ট্রেন থেকে নেমে পড়ল।

মেসবাড়ির ঘরে বসে দিব্যেন্দু সকালবেলায় চা খেতে খেতে খবরের কাগজ পড়ছিল। এমন সময় টেলিফোনটা বেজে উঠলো। ফোনের রিসিভারটা কানে দিয়ে দিব্যেন্দু বলল, 'হ্যালো, আমি দিব্যেন্দু চৌধুরি বলছি।' অপরপ্রান্ত থেকে অদিতি বলে উঠল, 'নমস্কার আমি অদিতি সেন বলছি। আপনি ভালো আছেন?' অদিতির কণ্ঠস্বর শুনে দিব্যেন্দু বলল 'হ্যাঁ ভালো আছি।' 'আপনার দেওয়া 'সূর্য ওঠার স্বপ্ন' বইটা পড়া হয়ে গেছে। গতকালের খবরের কাগজে দেখলাম ওই

বইটা লেখার জন্য লেখক মুশাফির এ বছর সাহিত্য একাডেমি পুরস্কার পাচ্ছেন। খবরটা আপনি জেনেছেন?' অদিতির কথা শুনে দিব্যেন্দু বলে ওঠে 'আমিও খবরের কাগজে দেখলাম খবরটা।' অদিতি এবার বলল 'অত্যন্ত আনন্দের খবর আছে—সাহিত্যিক মুশাফির আমাদের এখানে বইমেলাতে প্রধান অতিথি হয়ে আগামী রবিবার আসছেন। আপনি চলে আসুন আমাদের বাড়িতে। আমি আর আপনি একসাথে গিয়ে ওনার সাথে দেখা করব। আর আপনার দেওয়া বইটা নিয়ে যাবেন।' দিব্যেন্দু এবার বলে উঠলো 'আমি আগামী রবিবার বিকালের দিকে আপনাদের বাড়ি যাবো। আপনার ঠিকানাটা বলুন আমি লিখে নিচ্ছি।' অদিতি এবার বলল 'লিখে নিন।

অদিতি সেন, রায়পাড়া, পোস্ট অফিস - বীরনগর, নদিয়া।

এবার শুনুন ট্রেনে বীরনগর স্টেশনে নেমে, একটা রিকশায় উঠে, রিকশাওয়ালাকে বলবেন রায়পাড়া যাবো। রায়পাড়া গার্লস স্কুলের কাছে গিয়ে রিকশা থেকে নামবেন। ওই গার্লস স্কুলের কাছেই আমাদের বাড়ি। আমার নাম অদিতি সেন, বললেই লোকে আমাদের বাড়ি দেখিয়ে দেবে। বুঝেছেন তো।' দিব্যেন্দু বলল, 'হ্যাঁ সব বুঝে নিয়েছি।' অপরপ্রান্ত থেকে অদিতি 'এবার ছাড়ছি' বলেই টেলিফোনটা রেখে দিলো।

আজ রবিবার ছুটির দিন, বাড়িতে নতুন লোক আসবে, তাই সকাল থেকেই বাড়ির কাজের মেয়ে গীতাকে দিয়ে ঘরদোর ভালো করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছিল অদিতি। কিন্তু বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়ে গেল, দিব্যেন্দু না আসায় বিষণ্ণ মনে নীল রঙের একাট শাড়ি পরে সামান্য সেজে-গুজে বাড়ি থেকে বইমেলার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। আলো ঝলমল বইমেলার সমস্ত বইয়ের স্টলগুলোতে মানুষের ভিড়। তার মধ্যে একটা স্টল থেকে মনের মতো পছন্দ করে দুই-তিনটে বই কিনল। তারপর একটু হেঁটে মূল মঞ্চের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই, একজন স্বেচ্ছাসেবক অদিতিকে সম্মানেব সাথে দর্শকদের মাঝে একটা চেয়ারে বসতে অনুরোধ করল। অনুষ্ঠান শুরু হয়ে গেছে, বেশ কিছুক্ষণ। একজন বক্তা মাইকে বইমেলা প্রসঙ্গে নানা কথা বলে যাচ্ছেন মঞ্চের একধারে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ অদিতির দৃষ্টি পড়ল মঞ্চের ওপরে চেয়ারে যে চারজন লোক আছেন তাদের দিকে। ধুতি পাঞ্জাবি পরা একজনকে চেনা চেনা লাগছে অদিতির। হ্যাঁ, এই তো সেই দিব্যেন্দু চৌধুরি। আজ বিকেলে আসার কথা ছিল আমাদের বাড়িতে। এমন সময়, যে বক্তা বইমেলা প্রসঙ্গে বলছিল, তার বলা শেষ হতেই ঘোষক এসে ঘোষণা করল, আজকের এই বইমেলার প্রধান অতিথি, এ বছরের সাহিত্য একাডেমির পুরস্কার প্রাপ্ত স্বনামধন্য সাহিত্যিক 'মুশাফির' ছদ্মনামের আড়ালে যিনি এতকাল সাহিত্য রচনা করে চলেছেন, সেই দিব্যেন্দু চৌধুরিকে কিছু বলতে

অনুরোধ করছি। দিব্যেন্দু চৌধুরি নাম শোনা মাত্রই দর্শকদের মধ্যে থেকে হাততালির আওয়াজ উঠল। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দিব্যেন্দু মাইকের সামনে গিয়ে বলতে লাগলেন, 'যে পুরস্কারের কথা বলা হল, সেই পুরস্কার নেয়ার যোগ্যতা আমার কতটুকু তা আমার জানা নেই, তবে পুরস্কার পেলে সকলের মতো আমারও আনন্দ হয়, ভালো লাগে। আর পুরস্কার, সম্মান আমাকে নাড়া দিয়ে জানিয়ে দেয় আরো অনেক দূর চলতে হবে। আর আমার প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা যারা আমার সৃষ্টিকে নিজের করে নিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তাঁদের ভালোবাসাই আমাকে উৎসাহ জোগায়, আমাকে উদ্বুদ্ধ করে। পরিশেষে বলি, এখানকার মানুষরা যে আন্তরিকতা, সহানুভূতি, ভালোবাসা দিয়েছেন তা চিরদিন পাথেয় হয়ে থাকবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, নমস্কার।' দিব্যেন্দুর বলা শেষ হতেই আবার দর্শকরা হাততালি দিয়ে উঠল। অদিতি বিষণ্ণ, ভারাক্রান্ত মন নিয়ে সেদিন বাড়ি চলে এসেছিল। পরের দিন সকালবেলা রান্নাঘরে রান্না করছিল অদিতি। এমন সময় বাড়ির কাজের মেয়ে গীতা এসে বলল 'দিদিমিণি সাদা রঙের গাড়ি করে একজন লোক এসেছে, তোমাকে ডাকছে। 'কেআবার সকালবেলায় এল' ভাবতে ভাবতে অদিতি বাড়ির দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই দেখতে পেল, দিব্যেন্দু চৌধুরি ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অদিতিকে দেখেই দিব্যেন্দু বলে উঠল, 'কাল বিকেলে না আসার জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আর এই ফুলগুলো আপনাকে দেবো বলে নিয়ে এসেছি।' 'ক্ষমা চাইবার কী আছে, আপনি ভেতরে আসুন' বলে অদিতি দিব্যেন্দুকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসতে বলল। চেয়ারে বসতে বসতে দিব্যেন্দু বলল 'আমি জানি কাল বিকালে না আসার জন্য আপনি রেগে আছেন, কিন্তু কাল কলকাতা থেকে আসতে আমার দেরী হওয়াতে আপনাদের বাড়িতে আসতে পারিনি।' 'ঠিক আছে, আপনি আসতে পারেননি দেরি হওয়ার জন্য, কিন্তু আজকে আপনাকে আমাদের বাড়িতে থেকে যেতে হবে।' ' না না আজকে সকালে আমাকে কলকাতা যেতেই হবে, অনেক কাজ আছে, অনেক জায়গায় যেতে হবে। এরপর অন্য একদিন এসে আমি থেকে যাবো আপনাদের বাড়িতে।' 'আপনাকে আটকে রাখার সাধ্যি কী আমার আছে' বলেই অদিতি বইয়ের তাক থেকে একটা বই বার করে দিব্যেন্দুর দিকে বইটা দিয়ে বলল, 'আপনার বইটা নিয়ে যান আমার পড়া হয়ে গেছে। আমি আপনার জন্য চা বানিয়ে আনছি,' বলে টেবিলের উপর বইটা রেখে পাশের ঘরে চলে গেল। বইটা হাতে নিয়ে কী সব লিখল দিব্যেন্দু, তারপর নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময় দেখতে থাকে। খানিকবাদে অদিতি চা আর জলখাবার এনে দিব্যেন্দুর সামনের টেবিলে রাখল। খাবারগুলো দেখে দিব্যেন্দু বলে উঠলো, 'এতো আমি খেতে পারবো

না, এর থেকে দুটো লুচি একটু হালুয়া আর চা খাচ্ছি' বলেই খেতে থাকে দিব্যেন্দু। অদিতি এবার বলে উঠলো 'মুশাফির ছদ্মনামটা আপনার, তা আমাকে না বলে এরকম হেঁয়ালী করলেন কেন বলুন তো।' খেতে খেতে অদিতির কথা শুনে দিব্যেন্দু বলে উঠল, 'ট্রেনের ভেতরে আপনি যেভাবে ধমক দিয়ে ধূমপান করতে মানা করলেন, তখন থেকে আমি ভাবছিলাম কী করে আপনাকে জব্দ করা যায়। তাই এই মতলবটা কাজে লাগালাম।' চা খেতে খেতে দিব্যেন্দু বলল 'আপনার কাছে একটা অনুরোধ করব' হাসতে হাসতে অদিতি বলল, 'বুঝেছি আপনি চা খেয়ে চুরুট ধরাতে চাইবেন।' দিব্যেন্দু বলল, 'ঠিক ধরেছেন আপনি।' অদিতি এবার দিব্যেন্দুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সব আবদার অনুরোধ আপনার মঞ্জুর কিন্তু আপনাকে আর একদিন আমাদের বাড়িতে আসতে হবে।' চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপ আর প্লেটটা টেবিলের উপর রেখে দিব্যেন্দু একটা চুরুট ধরালো, তারপর একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বলতে লাগল 'নিশ্চয়ই আসব, সারাদিন আপনাদের বাড়িতে থাকবো, আপনার সাথে এই জায়গায় বেড়াবো তারপর ফিরে যাবো। আজ চলি' বলেই দিব্যেন্দু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে অদিতি দেখল 'সূর্য ওঠার স্বপ্ন' বইটা দিব্যেন্দু নেয়নি, টেবিলের পড়ে রেখে গেছে। বইটা হাতে নিয়ে অদিতি বইয়ের মলাটটা ওলটাতেই দেখল একটা সাদা পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে —'প্রিয় বান্ধবী অদিতি সেনকে উপহারস্বরূপ দিলাম'—

দিব্যেন্দু চৌধুরি
(মুশাফির)

বইটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে অদিতি বাইরে এসে দেখল সাদা রঙের মারুতি গাড়িটা লেখক মুশাফিরকে নিয়ে অনেক, অনেক দূরে চলে গেছে।

ন্যাপলা

বন্দনা পাল

ন্যাপলা প্রথম শ্রেণিতে (ফাস্ট ডিভিশনে) উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়েছে। অথচ তেমন মাথা ছিল না বলেই তাকে বিজ্ঞান বাদ দিয়ে কলা বিভাগে যেতে হয়েছিল। সুতরাং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে কলাবিভাগে ভর্তি হতে যে কোনো বিষয়ে অনার্স পাওয়া বড় একটা কঠিন নয়।

ন্যাপলা ভর্তি হতে গিয়েও জানত না সে কী বিষয়ে অনার্স পড়বে। কারণ ইংরাজিতেও সে খুব একটা ভালো নয়, তার পক্ষে প্রাইভেট পড়া খরচা চালানোর একটা ব্যাপার আছে। সেই কারণে খুঁজে পেতে তাকে দেওয়া হল ভূগোল বিষয়ে অনার্স। এই বিষয়টা তখন বেশি ছেলে মেয়ে পড়ত না। সুতরাং অধ্যাপকদের সঙ্গে কাছাকাছি যেতে বা সুযোগ পেতে খুব একটা অসুবিধা হোত না।

ন্যাপলা কিছুদিন অগেও এতসব জানত না সে তখন হেদুয়ার স্যুইমিং পুলে বসে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছে। জীবনে প্রথম কলকাতা আসার দিনটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছে। কলকাতার দোতলা বাস-ট্রাম দেখছে। পাশেই সাহেব কলেজ স্কটিশচার্চ, লাল বিশাল বড় বাড়ি দেখছে আর ভাবছে নিজেকে এই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবো তো? ইত্যাদি-ইত্যাদি।

অবশেষে বাবু এলেন বল্লেন চল বাড়ি যাই। ন্যাপলা বলল কাজ হয়ে গেছে? বাবু বল্লেন হ্যাঁ কাজ হয়েছে। তবে ভেবে চিন্তে তোর জন্য ভূগোল পড়ার ব্যবস্থা করলাম। ন্যাপলা বলল আর কিছু না। বাবু বললেন, নারে বোকা শুধু পাশ নয়। ভূগোলে অনার্স তার সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর ইংরাজি বাংলা তো আছেই। ন্যাপলা ব্যাপারটা কিছুই বুঝল না, বাবু নিজেও অনার্স গ্র্যাজুয়েট নন, কিন্তু ন্যাপলাকে অনার্স পড়াতে ইচ্ছে হল কেন? সেদিন কিন্তু উনি জানতেন না ভাগ্যের দুনিয়ায় কোথায় কীভাবে চাকা ঘুরে যায়, ভর্তি করাতে গিয়ে ভাগ্যক্রমে ওনার এক অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা, উনি ওনাকে সব খুলে বলেন এবং কোন বিষয়ে অনার্স নেবে সে কথা জানতে চাইলে উনি ওনাকে পরামর্শ দেন ভূগোল বিষয়ে পড়তে। কারণ তখন থেকেই শিক্ষা ব্যবস্থায় একটা পরিবর্তন আসবে এইরকম কথা চলছিল, বাবুর সঙ্গে অধ্যাপকদের চিন্তার মিল খুঁজে পাওয়া গেল, সুতরাং তাই হল।

বাবু বললেন বিদ্যাসাগর কলেজে তোকে ভর্তি করলাম। এরপর নিয়ে গেলেন ওই মাস্টারমশাই-এর কাছে। ওনার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিয়ে ওকে নিয়ে গেলেন একটি রেস্তোরাঁয়। ওখানে ঘুগনি পাঁউরুটি খেয়ে ওকে ঘুরিয়ে দেখালেন কলেজ স্ট্রিট বই বাজার, মেডিকেল কলেজ, কলিকোতা বিশ্ববিদ্যালয়

ইত্যাদি। সব কিছু দেখে ন্যাপলা মোহিত হয়ে গেল। আরো খুশি হল বই বাজার দেখে। কারণ সে বই পড়তে খুব ভালোবাসে। কলেজ থেকে ইচ্ছে খুশি এসে বই দেখা তো যাবে।

পূজার ছুটির আগে থেকেই কলেজে ক্লাস শুরু হল। ন্যাপলা নিয়মিত ক্লাসে যায়, পড়াশোনা করে, কলেজ লাইব্রেরিতে যায়, বই নেয় নোট করে। বন্ধুদের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে সাহস হয় না। সবাইকে মনে হয় বেশ অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলে। তাই সে একটু দূরে দূরে থাকে। তার সঙ্গে তার স্কুলের একটি বন্ধু পড়ে, যে তার আদ্যপান্ত সব জানে। পড়াশোনায় তারা দুজনেই সমান ভালো, তার নাম সত্য। সেও বেশ অবস্থাবান বাড়ির ছেলে, সুতরাং ঠাটে বাঁটে কিছুটা মানলেও পুরোটা নিজেকে শহরের সব ছেলের সঙ্গে মেলাতে কষ্ট হত। সুতরাং ক্লাসে ন্যাপলার একমাত্র বন্ধু সত্য। সত্য পড়ার চেয়ে আরো বেশি ওস্তাদ বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মিশতে। সেই কারণে আস্তে আস্তে সত্যর মাধ্যমেই অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে ন্যাপলার ভালোই বন্ধুত্ব হয়ে ওঠে এবং সবার কাছে তার পরিচিতি বাড়লেও নিজেকে সে একটু আড়াল করেই রাখত। নিজের প্রয়োজনটা কিছু মিটিয়ে নিত ঠিকই, আস্তে আস্তে সবাইকে ছাপিয়ে সে তার নিজের জায়গা পাকা করে নিয়েছে। স্যারেদের খুব বাধ্য ছেলে হিসাবে খাড়া করতে পেরেছে।

সত্তর-একাত্তর সালে শহরে তখন নকশাল সন্ত্রাস চলছে। এই সময় স্কুলের কলেজের পড়াশোনার পরিবেশ নিতান্তই বলার মতো নয়। সমস্ত কিছুর মধ্যেই নৈরাজ্য চলছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সময় সীমার অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। সমস্তরকম বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়েও অবশেষে ন্যাপলা একদিন বি.এ পাশ করল, কোনোরকমে। তখন এম.এ-তে ভর্তি বিশেষ অসুবিধা হোত না, তাই ন্যাপলা এম.এ ভর্তি হল সঙ্গে চাকরির খোঁজ করতে লাগল বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা দিতে লাগল। পি.এস.সি, ইউ.পি. এসসি, ডব্লু.বি.এসসি ইত্যাদি। এম.এ পড়তে পড়তে বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষাও চলছে। তখন দুই বছরের শেষে একবারই এম.এ ফাইনাল পরীক্ষা দিতে হত। এম.এ ফার্স্ট ইয়ারের পরই হঠাৎ একটি চাকরি পেল। হাতে পয়সা এল। স্যারেদের কাছে পৌছন সহজ হল। ন্যাপলার মনে জোর একটু বাড়ল। বরাবরই ন্যাপলা খুবই ধান্দাবাজ। নিজের প্রয়োজনের বাইরে কারুর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে না বা কারুর কোনো উপকারেও আসে না। যে ঠাকুর যাতে সন্তুষ্ট ঠিক সেইভাবে নিজের আখের গোছাতে লাগল। ইতিমধ্যে এম.এ ফাইনাল পরীক্ষা খুব কাছে এসে গেল। চাকরি করতে গিয়ে সত্যর সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় নেই বল্লেই চলে, সত্য মন দিয়ে পড়াশোনা করছে। এইবার সম্ভবত সত্যই ফার্স্ট হবে, তাই ন্যাপলার খুব হিংসা হল, স্যারেদের সঙ্গে এত যোগাযোগ বা নানাভাবে মন জয় করেও প্রথম হওয়াটা তার হাতছাড়া হবে,

তাই পরীক্ষা ডুব দিল, কোন জায়গায় কতটা কিভাবে পূরণ করলে তার প্রথম হওয়াটা সহজ হবে তার চেষ্টা চালালো। পরের বছর অফিসের অনুমতি নিয়ে পরীক্ষায় বসল। যথাসময়ে পরীক্ষার রেজাল্ট বেরল। অফিস ছুটির পরেও তার রেজাল্ট জানতে যাওয়ার তাড়া নেই, কারণ সে তো আগে থেকেই জেনে গেছে সে ফার্স্ট হয়েছে। একেবারে মার্কসিট নিতে যাবে।

হঠাৎ একদিন বাবুর মেয়ের সঙ্গে ন্যাপলার বিয়েও হল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাবু ন্যাপলাকে জামাই মানতে বাধ্য হল। বাবু কিন্তু মনে মনে জানতেন মেয়ে কী ভুলটাই না করছে। কারণ ন্যাপলার ওই সামান্য চাকরি ছাড়া আর কিছুই নেই, না আছে সামাজিক প্রতিপত্তি, না আছে আর্থিক। সব মিলিয়ে একটি অশিক্ষিত অতি সাধারণ বাড়িতে মেয়ে বিয়ে করল। যাদের থাকার মতো একটা ঘর নেই। কোনোরকমে একটি মাত্র কুঁড়েঘরে জ্ঞাতিগুষ্টিদের সঙ্গে থাকে, যে ঘরে কোনো দরজা বা আগল বলতে কিছু নেই, মাটির ঘর, খড়ের ছাউনি বর্ষায় প্রায় রাত্রিজেগে কাটাতে হয়। যে ঘরে ন্যাপলা দিনের পর দিন অভুক্ত থেকেছে আর বাবার অশ্রাব্য ভাষা শ্রবণ করেছে। কখনও মার খেয়েছে। পেটের জ্বালায় ছটফট করেছে। তবুও খাবার জোটেনি। কিন্তু বাবার তাড়ির জোগাড় ঠিকই হয়েছে। অবশেষে একদিন নিজের অনিয়মেই অসুস্থ হয়ে মারা গেল।

সংসারের দায়িত্ব পড়ল ন্যাপলার ঘাড়ে। ভাইবোনদের বিয়ে দেওয়া পড়াশুনা সমস্ত কিছুই। ইতিমধ্যে ন্যাপলার দুই ছেলেমেয়ে হল। দুই দিদির বিয়ে দিল গ্রামের সাধারণ এক কৃষক পরিবারে। দুই ভাইকে কোনোভাবেই মানুষ করার পর্যায় পৌঁছতে পারেনি। কারণ ইতিমধ্যে নিজের ছেলেমেয়ের কথা ভাবতে হয়েছে। ভাইদের পড়াশুনায়ও মাথা নেই। তাই তাদের একজন মন দিয়ে চাষাবাদ করে, আর একজন কাঠের দোকানে মিস্ত্রির কাজ শেখে। এইভাবেই তাদের বেশ সময় কেটে যাচ্ছিল।

ইতিমধ্যে ন্যাপলা বাড়ি সিফট করল। কারণ ছেলে মেয়েকে মানুষ করতে হবে তো। কারণ তার পরিচিতি বাড়ছে। ছেলে মেয়ে বড় হচ্ছে। তারা তার কাকাদের সঙ্গে থেকে মানুষ হওয়ার অবস্থায় থাকবে না। কারণ পরিবেশ সে কথা বলে না। তাই নিজের পরিবেশ গোছাতেই বলুন বা নতুন খোলস চাপাতেই বলুন তাকে বাড়ি বদল করতেই হল। তাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করল আর এক শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি। যে তাকে ধ্যানে জ্ঞানে সব সময়ই আপন করে চায়। তার খুব সুবিধা হবে। তার কাছাকাছি থাকলে তার সমস্তরকম সুবিধাই হবে। উভয়েরই ইচ্ছা পূরণ হল।

ছেলে মেয়ে দুজনেই বাবার সুপারিশে দুই জায়গায় ভর্তি হল। একজন ICSE Board-এ পড়াশোনা করতে লাগল। উত্তরোত্তর ন্যাপলার ছাত্র পড়ানো

বাড়তে লাগল। লক্ষ্মী আস্তে আস্তে ভালোভাবেই বাসা বাঁধতে লাগল।

লক্ষ্মীর ভাণ্ড পূর্ণ হোক এটা যে তার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা, তাই বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু আজ তার হাতের মুঠোয়। সুতরাং আজ ন্যাপলা ধরা ছোঁয়ার বাইরে, বাবুরা আজ তার হাতের মুঠোয়। তাদের আজ আর সে সমীহ করে না। কারণ সে যে একটি সম্মানীয় পোস্টে চাকরি করে। তাই সে বাবুদের সম্মান দিয়ে সেই পুরোনো দিনকে আর বাঁচিয়ে রাখতে চায় না। আজ তাদের পদাঘাত করেই সে উপরে উঠতে চায়।

সত্যিই কি সে পেরেছে উপরে উঠতে। সময় বলে দেবে। আজো কিন্তু তার বাড়ির পরিবেশের কোনোরকম উন্নতি হয়নি। সেই গ্রাম্য ভাষা আচার ব্যবহারের মধ্যেই কুক্ষিত হয়ে আছে। টাকার বাইরে সমাজের আর একটি দিক আছে সেটা কিন্তু তার কাছে এখনও অজানা। আজও জীবনযাত্রায় কোনো উন্নতি ঘটেনি। মানসিক উত্থানও ঘটেনি। নিজের প্রয়োজনে মিথ্যেকে আশ্রয় করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে চুরি মিথ্যা এমনকি অশ্লীল কথা, সবই তার কাছে গ্রহণযোগ্য বা তার উপরে ওঠার মাপকাঠি।

স্বার্থপর মানুষটা উপরে উঠতে গিয়ে সংসারে কারুর কথা ভাবেনি। এমনকি স্ত্রী সন্তান তাদের কথাও না। সত্যিই সে উপরে উঠেছিল একদিন। উপরে উঠতে গিয়ে সিঁড়ির পাশে আরো যে কেউ দাঁড়িয়ে আছে সেদিকে নজর দিতেই সে ভুলে গেছে। এটা তার ভুল না ইচ্ছাকৃত সেটাও বোঝা মুশকিল। অবশেষে তার একটা বিশাল পাওনা হল। পাওনা যেমন তেমন নয় একজন কুলাঙ্গার ছেলের পিতা হিসাবে। যে মানুষকে প্রতিবেশীরাও চিনত না আজ তারাও চেনে কুলাঙ্গার ছেলের বাবা হিসাবে। কর্মক্ষেত্রেও তার পরিচিতি ছ্যাঁচড়া নামেই। অনেকেই তাকে নিয়ে রসিকতা করে ছ্যাঁচড়া বলে। সত্যিই সে কতটা মানুষ আর কতটা ছ্যাঁচড়া তার প্রমাণ দেবে সময়।

নতুন মা

সুব্রত দাস

বিকেলে কলেজ হোস্টেলের ছাদে দাঁড়িয়ে সতীনাথ সূর্য দেখছিল। রক্তাক্ত গোলার মতন। সমস্ত পশ্চিমাকাশে রক্ত রশ্মিমালার প্রলেপ। বাহাদুর সিঁড়ি ভেঙে এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল। সতীনাথ দেখল জেঠতুতো ভাই ভোম্বলের চিঠি।

মা মরে যাওয়ার পর এই ভোম্বলের মা তাকে মানুষ করেছে। এখনো বাড়ি গেলে জেঠাইমা তার মায়ের অভাব পূরণ করে। তবে বয়েস হয়েছে। বাতের ধাক্কায় বেসামাল, চিঠি খুলে দেখে সংক্ষিপ্ত আকারে মাত্র তিনটি লাইন।

'প্রিয় সতীদা,

তোমার বাবা কিছু লোকের কথায় বিশে ফাল্গুন বিয়ে করতে চলেছেন। মায়ের বাধায় কাজ হয়নি। তুমি যদি পারো তাড়াতাড়ি এসো'।

—ইতি ভোম্বল।

সতীনাথ হতবাক হল। আজই তো বিশে ফাল্গুন, সতীনাথ জৈষ্ঠের মতন বিবর্ণ হয়ে গেল। কি করবে ভেবে পেল না। ক্ষোভে দুঃখে পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা গরম স্রোত বয়ে গেল। কলেজ জীবনের মাঝপথে বাবার কাছ থেকে এ ধরণের আঘাত অপ্রত্যাশিত। বুড়ো বয়েসে ভীমরতি—আবার বিয়ে করা।

সতীনাথ ছুটে এল বাবাকে আটকাতে। বাড়িতে যখন এল তখন রাত অনেক গড়িয়ে গেছে।

নিষ্প্রদীপ চারপাশ। তারই মধ্যে বাড়িটা ভুতুড়ে বাড়ির মতন থমথম করছে, একঝাঁক ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। কিছুটা দূরে দু-একটা কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। তারা সতীনাথের আগমনে দু-একবার সন্দেহের দৃষ্টিহেনে চুপ করে যায়। বাবা এতক্ষণ হয়ত শুভদৃষ্টি বিনিময় করছে, মাকে মনে পড়ে না ঠিক মতো। কবে সেই মুখ হারিয়ে গেছে।

আজ সব বিস্মৃতির পাতায়, উনিশ বছরের সতীনাথ হাঁটু গেড়ে কাঁদল। বাড়ির সবচেয়ে পুরোনো চাকর শম্ভু এ ব্যথা বুঝল। তারই দেওয়া সংবাদে ভোম্বলকে সাথী করে জেঠাইমা ছুটে এল। কাঁদতে কাঁদতে সে বলল কেনে এত দেরি করে আইলি বাপ মোর।

গ্রাম্য সুরের কান্নায় ভেসে গেল সতীনাথ। জেঠাইমার বুকে মুখ গুঁজে কবেকার হারানো স্মৃতি সব কেঁপে কেঁপে ভেসে এল। জেঠাইমা তার শীর্ণ হাতের বন্ধনে টেনে নিয়ে গেল নিজের ঘরে। যেতে যেতে সে চিৎকার করে জানান দিল ওরে তনে কাই গেলুরে, মোর সতী বাপকে দেখে যারে।

সতীনাথ অসম্ভব কাঁদল। ভাবল কি আকাশ তার। চারপাশে একটা ধোঁয়াশা। অক্টোপাশের মতন জড়িয়ে ধরেছে, দমবন্ধ হয়ে প্রাণ আঁই টাঁই করছে। এই বুঝি প্রাণটা বেরিয়ে যায়। বুকের ভিতর কি অসম্ভব যন্ত্রণা তা সতীনাথ ছাড়া কেউ বুঝল না। তবু জেঠাইমার শীর্ণ বুকে মুখ গুঁজে একটা তৃপ্তি পেল। একটা অস্পষ্ট মা মা গন্ধ জেঠাইমার কাপড়ে। সতীনাথ কাঁদতে কাঁদতে প্রাণ ভরে তা নিল।

সতীর তখন ক্লাশ সেভেন। হঠাৎ একদিন বাড়ি ফিরে এসে দেখে মা নেই। সাপে কেটেছে, বাবা ব্রজেন্দ্রমোহন সতীকে মৃতদেহ স্পর্শ করতে দেয়নি। বলিষ্ঠ বাহুর স্নেহ বন্ধনে নিবিড় করে কথা দিয়েছিল সতী ছাড়া আর কিছু ভাববে না। সতীনাথ এতদিন তাই জেনেছিল। বাবা ছিল ভীষণ গর্বের। নিজেকে তিল তিল করে গড়েছিল সেইভাবে। কিন্তু ভোম্বলের চিঠির ছোট্ট একটা সংবাদে সব কিছু ধুলায় মলিন। শম্ভু, জেঠাইমার চোখের জলে কি হবে। সমাজের অধিকাংশই দু-পাত খাওয়ার আনন্দে মশগুল। দেখতে দেখতে সারাটা রাত কেটে গেল। অতন্দ্র প্রহরীর মতন শম্ভু সতীনাথের পাশে থাকল।

পরের দিন সতীনাথ দেখল বাবা তার একটা মাঝবয়েসী মেয়েকে বিয়ে করে এনেছে। কি ক্লান্তি চারপাশে। সবাইয়ের মুখে নতুন বৌয়ের গতরের কথা, রূপের প্রশংসা। দু-একজন সতীনাথকে কশাঘাত করে গেল। সতীনাথের কানে তারা বজ্রনির্ঘোষে বলে গেল সতী তোর লতুন মাকে দেখ্, কি সোনদর হয়েছে।

সতীনাথের চোখ ফেটে জল এল। এমন সময় বাবা এসে হাজির। বলল খুব রাগ করেছিস না।

সতীনাথ মুখ তোলে, কলকাতায় প্রায় বছর তিনেক থেকে একটু সাহসী হয়েছে। বাবার পাশে দণ্ডায়মান এক মধ্যবয়সীকে দেখল। চন্দন ফোঁটায় ছোট্ট কপাল, মাঝে কুমকুম আঁকা টিপ। কোমল চোখে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, সবুজ শ্যামলিমার মতন মনে হয়।

ব্রজেন্দ্রমোহন মেয়েটাকে বলল—আমার ছেলে সতী।

সতীনাথের ইচ্ছে হল চিৎকার করতে। কিন্তু পারল না বাবার গাম্ভীর্যের কাছে। এখনও গলায় কি গাম্ভীর্য, ব্যক্তিত্ব। সতীনাথ কি নিয়ে বড়াই করবে। সে তো আর সম্ভব নয়। বাবার যা কিছু সবই তার কাছে আজ মেকি। হঠাৎই দুটো নরম হাতের স্পর্শে তার চমক লাগে। চেয়ে দেখে সেই শ্যামলিমার মুখখানি। তথাকথিত তার নতুন মা, চেয়ে আছে হরিণীর চোখ নিয়ে। সতীনাথ তীব্রভাবে হাত ছাড়িয়ে নেয়। শ্যামলিমার মুখখানি নিমেষে শ্যামহীন হয়ে যায়। বিবর্ণ দুপুরের মতন নিস্তব্ধ হল। সতীনাথের কাছে সব মিথ্যা। বাবা তার নীরব। অর্থাৎ হেরে গেছেন। মনে মনে একটা জেতার আনন্দ পেয়ে বসল। সতীনাথ তার জেদকে দু-হাতে জড়াল, বিকেলে জেঠাইমার বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও কলকাতায় চলে এল।

দেখতে দেখতে কয়েকটা মাস অতিক্রান্ত। ও-প্রান্ত থেকে টাকা পয়সা ঠিকই আসে। শুধু বদলে গেছে সতীনাথ। বাবাকে আর চিঠি দেয় না। যা দেয় জেঠাইমা কিংবা ভোম্বলকে। কিন্তু কালক্রমে আশ্চর্য হল ভোম্বলের চিঠিতে। লিখেছে নতুন মার প্রশস্তি। বড় ভালো, এমন ভালো কদাচিৎ দেখা যায়। সতীনাথের জন্য চোখের জলও ফেলে।

সতীনাথ ভাবে এ সব তাকে ভোলানো ছাড়া কিছু নয়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, একদিন সব সুদে আসলে ফিরিয়ে দেবে, বাবাও একদম চিঠি দেয়নি তা নয়, মাঝে দু-দুটো চিঠি দিয়েছিলেন। কোনটার উত্তর সতীনাথ দেয়নি। বাবার অনুরোধ সতীনাথ যেন তার অভিমান ত্যাগ করে বাড়িতে আসে।

সতীনাথ বুঝবে না কেন এ বয়েসে বিয়ে করা। বড় একা। জীবন আকাশ বড় নিঃসীম হয়ে পড়ায় একাকিত্ব তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে। সতীনাথ দূরে থাকে। বুঝবে না নির্জনতা আর অতীত স্মৃতি তাকে অহরহ অসুস্থ করে তুলত। অনেক যুদ্ধ করেছে। অবশেষে মুক্তি পেতে গিয়ে এই সিদ্ধান্ত। আর বিয়ে যাকে করেছে সেতো সমাজের পড়ে থাকা একজন বিধবাকে। সতীনাথ কি এটাকে খুবই নিন্দনীয় ভাববে?

সতীনাথ বাবার এ ধরণের চিঠির জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। মনে মনে ধিক্কার দিয়েছিল স্বকীয়তা হারাবার জন্য। ঘৃণা করেছিল কামুক মনে করে।

একদিন সতীনাথ ভর দুপুরে কাউকে জানান না দিয়ে গ্রামের বাড়িতে এল। তখন ব্রজমোহন ছিল না, বাবার ঘরে কাউকে দেখতে না পেয়ে সন্তর্পণে খাটের উপরে উঠে তার মায়ের ফটোয় সতেজ ফুলের মালা ঝুলছে দেখে ব্যঙ্গের হাসি হাসল। এসব ভড়ং ছাড়া কিছু নয়। সতীনাথ এসেছে এই ফটো নিতে। সতীনাথ ফটো নামিয়ে বেরুতে যাবে দেখে দরজায় দু-বাহু বিস্তার করে নতুন মা দাঁড়িয়ে, মুখে মৃদু হাসি। সতীনাথ কাছে এগোতে বলে, 'এস্ এখুনো রাগ যায়নি দেখছি। দিদির ফটো লিয়ে যাচ্ছো কেনে?'

সতীনাথ ক্রোধান্বিত হয়। বলে সে কৈফিয়ত তোমাকে দেব নাকি? যেতে দাও।

নতুন মা ঠোঁট কামড়ে বলে—না। তোমার লেগেই তো বুসে আছি।

সতীনাথ বিস্মিত, বলে এসব আমার ভালো লাগে না। জোর ফলাচ্ছো সেতো আমার উপরে কেন? বাবার উপরে ফলাবে।

নতুন মা, এবারে হাসে। কাছে এগিয়ে এসে বলে সে তো ফুলাবই। তবে ছেলের উপরেও করব। সতী মোকে ভুল বুঝিস না। মুই কি তোর মা লয়?

সতীনাথ বিকট চিৎকার করে জবাব দেয়—নো। নেভার, কখনো নয়। একটা

বাজে মেয়েকে আমি মা বলতে পারি না।

নতুন মা ছুটে আসার আগে সতীনাথ তাকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। সতীনাথ শুনতে পায় একটা পেছনে ফেলে আসা কান্না, ছুটতে ছুটতে সে ষ্টেশনে আসে। ক্যানিং থেকে সোজা শিয়ালদায়। তারপর কলেজ স্কোয়ার। সতীনাথ মিশে যায় কলকাতার জন-অরণ্যে। হারানো মা বুকে তার। এ স্থান কারুর জন্য নয়। সতীনাথ নিজের মাকে ব্যাক্সবন্দী করে উপুড় হয়ে কাঁদল।

এরপর দিন গড়িয়েছে, সতীনাথ আর ক্যানিংমুখো হয়নি। কলকাতাই তার জীবন হয়ে দাঁড়াল। হোস্টেল ছেড়ে মেস ধরল, তিনটে ভালো টিউশনি করে। মাসান্তে প্রায় চারশ টাকা। চলে যায় নিজের খরচ। বুড়ো বাহাদুরকে দেয়নি নিজের ঠিকানা, পাছে কেউ বিরক্ত করে, ছিঃ বাবার কি রুচি। একটা দে-হাতি মেয়েকে বিয়ে করে আনল।

সতীনাথ ঠিক করল শিক্ষান্তে আর বাড়ি ফিরবে না। এইখানে থেকে টিউশানি করে চাকরি খুঁজে নেবে। একটা বিরাট জীবন তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। অজগাঁয়ে ফিরে গিয়ে কি হবে? অন্ধকার ছাড়া ওখানে কিছু নেই। না-হলে এই বুড়ো বয়েসে বাবা তার বিয়ে করে?

ফাইন্যাল পরীক্ষার শেষ দিনে ঢুকতে গিয়ে সতীনাথকে থমকাতে হয়। ভোম্বল দাঁড়িয়ে। বিষণ্ণ বদন। সতীনাথ আরক্তিম হয়, হিসেব মতো ভোম্বলের ফাস্ট ইয়ার হওয়া উচিত। প্রায় এক বছর পর দেখা। জেঠতুতো এই ছোটভাইটি তার বাল্যসখা ছিল। এর কাছে কোন অভিমান খাটে না। কাছে এসে বলে কখন এলি?

—অনেকক্ষণ।

সতীনাথ চুপ। কারণ তার মেসের ঠিকানা কেউ জানে না। ভোম্বলই নীরবতা ভাঙে। শীতের সকালের কবোষ্ণ রোদে সে অত্যন্ত ভগ্ন কণ্ঠে জানান দেয় নতুন মা তার সঙ্গে এসেছে। সতীনাথ ভোম্বলের অঙ্গুলি নির্দেশ অবলোকন করে একটা ল্যাম্পপোস্টের তলায় ঘোমটা ঢাকা মুখ তাকে নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করছে। আগের চেয়ে একটু রোগা হয়ে গেছে, নাকের নোলকে সূর্যের কিরণ পড়ায় অস্পষ্ট দ্যুতির ঘোমটা ঢাকা মুখটি কেমন যেন মোহময়ী হয়ে উঠেছে। হঠাৎই সে চমকিত হয়ে বলে বাবার শরীর কি খারাপ?

ভোম্বল মাথা নেড়ে সতীনাথের উদ্বিগ্নতার নিবারণ ঘটায়। সতীনাথ ভোম্বলের কাঁধ চাপড়ে বলে অপেক্ষা করিস এখানে। তবে একা আসলে ভালো করতিস।

সতীনাথ আর অপেক্ষা করে না। হন্‌হন্‌ করে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংয়ের দিকে এগিয়ে যায়।

ভোম্বল নতুন মায়ের কাছে আসে। শ্যামলিমা মুখখানি ততক্ষণে বেশ ঘেমে

উঠেছে। ভোম্বল হাসতে হাসতে বলল ঘাবড়াও মাৎ ছোট মা।

ছোটমা ডাকটি ভোম্বলকে তার মাই শিখিয়েছে। ভোম্বল তারপর ভালোবাসা পেল অফুরন্ত। রাজারহাট গ্রামের এই মেয়েটিকে তার সতীদা চিনবার চেষ্টা করল না। ছোটমার মধ্যে লেখাপড়া না থাকলেও অনেকের চেয়ে সে কত উঁচু দরের তা ভোম্বল জেনেছে, সতীদার কাছে এটুকু জানাতেই ছোটমার হাত ধরে কলকাতায় আগমন।

ছোটমা ততক্ষণে আঁচলে চোখ মুছতে শুরু করেছে, একসময় ভোম্বলের হাত ধরে কেঁদে বলে কেমনে ই পরাণে উকে বুঝাব রে।

ভোম্বল ছোটমার কানের কাছে মুখ এনে বলে এখানে এত জোরে এরকম কথা বলো না। লোকে হাসবে।

ছোটমা সতর্ক হয়। সত্যি তারা অজ গাঁয়ের মেয়ে। এইজন্য সতী তাকে পছন্দ করেনি। অনবরত ট্রাম বাসের শব্দে প্রাণ তার আঁই টাঁই। এর চেয়ে গ্রাম ভাল।

একসময় ভোম্বল ছোট মার হাত ধরে বলে 'কলকাতা দেখবে না'?

ছোট মা মাথা নাড়ে, বলে ইখানটায় বুস না। কেলকাতা দিখে কাজ নেই।

ভোম্বল হাসে। বলে এখানে বসলে লোকে তোমাকে গালি দিবে। চল একটু খেয়ে আসি। ছোট মা চিত্রাপিতের ন্যায় স্থির। বলে মোর খিদে নেই রে। তুই যা বাপ্। মুই ইখানে একটু বুসিরে।

ভোম্বল হো হো করে হেসে ওঠে। ছোটমা সেদিক পানে চেয়ে নিশ্চল হয়ে যায়। ভোম্বল দেখল অজ গাঁয়ের এই কাকিমা কি সরল আর বোকা। কোন্ সকাল থেকে খিদে চেপে দুঃখ সামলাচ্ছে। সতীদার জন্য তার ভাবনার অন্ত নেই। মাথার ঘোমটাটা এখন খসে গেছে। সূর্যের আলোয় কলকাতায় কতশত রঙ করা মুখের পাশে ও মুখ কত নির্মল, স্নেহময়ী তা যদি তার পরমপ্রিয় দাদা-বন্ধুটি জানত তবে কখনোই সেদিন অমন করে ছুটে চলে যেত না।

এই এক বছরে কত যে পিঠে পায়েস করে খাইয়েছে তার বর্ণনা তো সতীদা তার চিঠিতে জেনেছে, তবু সতীদা নির্বিকার থেকেছে স্রেফ কলকাতা মোহে। ভোম্বল এই সত্যিটুকু জানাল শ্যামলিমার দীঘল চোখের কোলে। সত্যি ব্রজকাকুর একটা আলাদা চোখ আছে। তার মায়ের ভাষায় চিরকাল ব্রজটা এমুনিযে। ওরে চেনা মনিষ্যির কম্ম লয় রে।

এই মধ্যবয়সী বাল্য বিধবাকে বিয়ে করে ব্রজকাকু এতটুকু ভুল করেনি। কোনো পণ নেই—একেবারে নিঃশর্ত জীবন বন্ধনে আহ্বান।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বেঁচে থাকলে ছুটে আসতেন এই লাট গ্রামে। অজ গেঁয়ো কাকিমাটির শুধু একটি কথা, ই পেরাণে কেমনে ব্যথা দিই।

ভোম্বলের হাসিতে ছোটমা একটা আলতো চাপড় দিয়ে বলে এই অমন

করে হাসিস না। শরম লাগে না বুঝি।

ভোম্বল থমকে যায়। বলে কলকাতা, তুমি আমার ছোট মার ভাষা শোনো, ই কেমনে দেশ গো,-শুধু ঘটর ঘটর আওয়াজ হয়েঠে। মোর পরাণ যে শুধু আঁই টাঁই করেঠে।

ভোম্বল আবার হাসতে থাকে। ছোটমা চিমটি দিয়ে বলে সড় আর দেখতি লারে।

ভোম্বল ছোটমার কোমল হাতে হাত রেখে বলে একটু আগে তোমাকে নিয়ে একটা কথা মনে পড়ে গেল। তাই হেসে ফেললাম। তুমি আবার রাগ করোনিতো।

—কেনে রাগ করবো, পড়েক (ছেলে) মনে তো ইমনি হয়।

—শোনো ছোটমা সতীদার পরীক্ষা শেষ হতে এখনো তিন ঘণ্টা দেরি। চল তোমাকে একটু হাওড়ার ব্রীজ ঘুরিয়ে আনি। একটু গঙ্গার জলও নিয়ে নেবে।

ছোটমা উৎসাহিত হয়। বলে সিই ভালোরে। একসময় বলল ই বড় সোন্‌দর দেশরে।

ভোম্বল বলল এটা আমাদেরই দেশ। এর নাম হাওড়া ব্রীজ, ওর তলা দিয়ে গঙ্গা বয়ে গেছে।

ছোটমা রাস্তা পার হতে গিয়ে ভোম্বলের হাত জড়িয়ে সিঁটিয়ে যায়। ফিসফিস করে বলে বাপ্‌রে ই জায়গা কেমনে গো। পেরাণ যে যায় যায়। সতী বাপ্ ইখানে কেমনে থাকে।

ভোম্বল ছোটমাকে হেঁচড়ে রাস্তা পার করে। ভয়ে গায়ের কাপড় খুলে গেছে। ভোম্বল কোনক্রমে তা জড়িয়ে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বলে ভালো করে পরে নাও।

ছোটমা লজ্জায় মরে যায়। বলে গেঙ্গা দিখে কাজ লেই গো। মোনে সতীরে লিয়ে ফিইর‍্যা যাই।

ভোম্বল হেসে বলে তোমার সামনেই গঙ্গা ভালো করে চেয়ে দেখো।

ছোটমা বুকের কাছে হাত জড়ো করে। কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করে। ভোম্বলের হাত ধরে নীচে নামে। গঙ্গার জলে হাত দিয়ে মাথায় ঠেকায়, ভোম্বলকেও দেয়, পরক্ষণে আঁচল ভরা জল মাথায় চাপড়ায়। তারপর ভিজে জল পেছনে টেনে দু-হাত দিয়ে সমান করে। এমন কমনীয় সৌন্দর্য গ্রাম বাংলার ঘাটে দেখা যায়।

আজ কলকাতা দেখল ও কেমন ভালোবাসা। গঙ্গার জল ছোটমার হাতের মধ্যে বারে বারে উঠছে নামছে। নাকি দ্বিতীয়বার বিয়ে করে পাপখণ্ডন করছে। উ জলতো পূজায় লাগবে রে, একটুখানি লিয়েও যেতে হবে।

ভোম্বল ছোটমার হাত ধরে হাঁটতে থাকে। ছোটমা বিব্রত, কত আর গা

বাঁচিয়ে চলবে। ধাক্কা লাগে। পরপুরুষের ধাক্কায় ছোটমা ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠে। যত গা বাঁচাবার চেষ্টা করে ততই লেগে যায়। এক সময় একহাত ঘোমটার আড়াল থেকে ফিসফিস স্বরে বলে অ ভোম্বল ই কেমন দেশরে। শুধু ধাক্কা মারে, সোয়ামী জানলে সে মোকে খেদি দেবে।

ভোম্বল আকাশ কাঁপিয়ে হেসে বলে না-না, ব্রজকাকু অমন নয়, সেও জানে কলকাতা কেমন জায়গা, আর তুমি তো আমার সঙ্গে আছো, কেউ কিচ্ছু বলবে না।

ছোটমা আর কথা বাড়ায় না। ভোম্বলের পিঠের সঙ্গে লেপটে পথ চলে।

কিছুক্ষণ চলার পর সামনে হাওড়ার ব্রীজ দেখে অবাক হয়ে যায়। হা করে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে। ভোম্বল দেখল ছোটমা আর এ জগতে নেই। কত যে লোক ধাক্কা মেরে গেল—কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে ভ্রুকুটি করল, আবার কেউ কেউ দু-একটা খারাপ কথাও বলে গেল, তবু ছোটমা নিশ্চল। মাথার ঘোমটা ঘাড়ের কাছে নেমে গেছে। খালি পায়ে কমদামী সবুজ পেড়ে কাপড় গায়ে হলদে রঙের ব্লাউজ। রাস্তায় লাট গ্রামের অজ গেঁয়ো এই বধূ এত বিস্মিত এর আগে হয়নি। রোদের আবছা আলোয় শ্যামলিমা মুখখানি নাকের নোলক উঁচিয়ে করুণাময়ী হল।

জানে এই অজ গেঁয়ো মেয়েটির মন। ভোম্বল এতক্ষণ এই সব দেখে সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে পকেট থেকে শিশি বের করে ছোটমার হাতে দেয়। ছোটমা ভক্তি ভরে শিশিতে জল ভরে। এক সময় কেঁদে ফেলে বলে, অ ভোম্বল এ পোড়ার মুখীরে কেনে গঙ্গা নিলুনিরে।

ভোম্বল চঞ্চল হয়ে ছোটমার হাত ধরে। যেমন এসেছিল তেমন করেই ফিরে গেল। শুধু ব্যতিক্রম হল ফেরার পথে। ছোটমা কেঁদেই ভাসাল। ভোম্বল জানে ছোটমা কোথায় দুঃখিত, পেরাণ তার ব্যথা দিতে চায় না। সতীদাই ছোটমার দুঃখের কারণ। তার ভাষায় ছোটমা, একটা বাজে মেয়ে ছাড়া কিছু নয়। সেদিন ছোটমা পেছন পেছন কত কেঁদে বলেছিল সতী বাপ্ মুই লস্ট মেয়ে লইরে।

কিন্তু সতীদা সেদিন পাগল হয়ে গিয়েছিল। আর ঘরমুখো হয়নি। সেই দুঃখে ছোটমা একটা বছর শুধু কেঁদেই ভাসাল; ভোম্বল অনেক সহ্য করেছে। আর পারল না। অবশেষে ব্রজকাকুর সম্মতি নিয়ে কলকাতার সাথি হল ছোটমা।

সতীনাথ যখন বেরিয়ে এল বেলা তখন দ্বি-প্রহর। মাঝ আকাশে সূর্য গন্ গন্ করে জ্বলছে গা-হাতে কেমন যেন ব্যথা ব্যথা ভাব। ক্লান্ত সতীনাথ কপালে হাত দিয়ে দেখল কেমন যেন গরম। এই একটা বছর মানসিক, শারীরিক সমস্ত রকম চাপ সতীনাথকে কম ব্যতিব্যস্ত করেনি। তবু সতীনাথের পরীক্ষা ভাল হয়েছে—এটাই সান্ত্বনা।

সতীনাথ বাইরে বেরিয়ে এসে ভোম্বলের পাশে যাকে দণ্ডায়মান দেখল তাতে

ভীষণ বিস্মিত হল। ভোম্বল ছুটে এসে সতীনাথকে টেনে নিয়ে যায়। সতীনাথ কাছে এসে কি করবে ভেবে পেল না। ভোম্বল বলল, সতীদা ছোটমাকে আর দুঃখ দিও না, তোমার জন্য ভীষণ ভাবে।

সতীনাথ দেখল কলকাতায় ব্যস্ত ফুটপাতে এক মধ্য বয়সী গ্রাম্য বধূ তার দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চেয়ে আছে, চোখের কোন দুটোয় জল টিক্ চিক্ করছে। সতীনাথ অস্বস্তি বোধ করে। বলে এখানে নয়। অন্য কোন ফাঁকা জায়গায় চল্। শরীরটা একটু খারাপ করছে।

ছোটমা এবার কেঁদে ফেলল, বলল, মোকে মা না বলিস জেন ক্ষেতি নেই। তবু একবার বাপকে চোখ মেইলা দেখে আয়। না হলে নোকে মোকে লস্ট মেয়ে বলবে।

সতীনাথ ছোটমার ভাষায় আর বিব্রত হয় না। তবে মাথার মধ্যে একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে। চোখ তার অন্ধকার হয়ে আসে। ধুলি ধূসরময় এই কলকাতার বাতাস তার নিঃশ্বাসকে যেন বন্ধ করে দিতে চায়। কি ক্লান্তি। জীবন যে এত কষ্টের তা সে এই একটি বছরে অনুভব করেছে। তবু এই অজ গেঁয়ো দে-হাতি ঢঙে কথা বলা মেয়েটিকে সে সহ্য করতে পারে না। হঠাৎই মাথা চেপে রাস্তার উপর লুটিয়ে পড়ার উপক্রম হয়। ভোম্বল ছুটে এসে না ধরলে হয়ত কোন অঘটন ঘটত। ছোটমা এ দৃশ্যে শুধু কেঁদে ভাসাল আর নিজের কপালকে গালমন্দ করে গেল। ভোম্বল একটা ট্যাক্সি ডেকে সোজা শিয়ালদা। প্রাচী সিনেমার বিপরীত দিকে তারা উঠেছে। সতীদার গায়ে হাত দিয়ে বোঝে জ্বরে বেঁহুশ হয়ে গিয়েছে। ভালো ডাক্তার এনে দেখায়। ছোটমাকে বোঝায় ভয়ের তেমন কিছু নেই।

সতীনাথ এখন জ্বরের অতল গহ্বরে। ছোটমা এখন যেন সাক্ষাৎ জননী। ভোম্বলকে হোটেল মালিক গরম জল থেকে সব রকম সাহায্য করল। কোলকাতার লোকের প্রাণ আছে। বিপদে পড়লে সাহায্য করে। চোর-ছ্যাঁচড় যেমন আছে ভালো লোকও তেমন আছে। শুধু চিনে নিতে হয়।

সতীনাথের মনে নেই কি হয়েছিল। সারা রাত অতিক্রান্ত। উষার আলোয় প্রথম ট্রাম ঠং ঠং শব্দে চলে গেল। ক্লান্ত সতীনাথ অনুভব করতে পারল না কোথায় সে নিদ্রায়মান। দুর্বল শরীরে একটা পরিচিত গন্ধ পেল। ঘরের স্বল্প আলোয় সেটা কি প্রথমে তা বুঝতে পারল না। চোখ বুজেই পড়ে ছিল। কিন্তু সময় এগোতেই অনুভব করে পরিচিত গন্ধটা বড় গভীর। ভোরের শিউলির মতো সুন্দর। মায়ের বুকের শাড়ির গন্ধ। এতদিন পর তা কি করে এল সেটাই বোঝবার তাগিদে চোখ দুটো খুলে যা দেখল তা সতীনাথ বিশ্বাস করতে পারল না। ভোম্বলের ছোট মায়ের কাছে সে অসহায়ের মতন পড়ে আছে, মাথায় কাছে ট্যাবলেট ক্যাপ্সুল, কাঁচের গ্লাসে চামচ দেখে বুঝল কাল বিকেল থেকে সারারাত

একটা যুদ্ধ গেছে। সামনের টেবিলে এক বছরের বাক্সবন্দী মৃতা গর্ভধারিণীর মুক্তি দেখল। রজনীগন্ধার মালা আর পোড়া ধূপ দেখে অনুভব করে এ কার প্রেরণায় ঘটেছে।

সতীনাথের নড়াচড়ায় ছোটমার চোখ খুলে যায়। সতীনাথ দেখল ভোম্বল এতটুকু মিথ্যে লিখেনি। চোখ দুটোয় কি মমতা। সীমাহীন দিগন্তের মতন। সতীনাথের পুরোনো ব্যথা নতুন করে জেগে উঠল। পেট থেকে বুক পর্যন্ত একটা কাঁপন কেঁপে কেঁপে যায়। চোখ দুটো জলে ভরে আসে। ছোটো মায়ের চোখে তা আড়াল করা যায় না। আঁচলের প্রান্তে সে জল মুছে যায়। সতীনাথ অসুস্থ শরীরে কিছু বলতে চায়, ঠিক তখনি তার মুখ একজোড়া স্নেহময়ী বাহুর আকর্ষণে বুকের প্রত্যন্ত প্রদেশে নেমে আসে। সতীনাথ মা পেল, এক অপূর্ব অনাস্বাদিতা বিভায় তার মনে নতুন কল্লোলধ্বনি অনুরণিত হল।

বুকের কাছে শাড়ির গন্ধটা মা মা গন্ধে ভেসে এল। বড় গভীর হয়ে সতীনাথ অনুভব করল এ পৃথিবীর সবাই খারাপ নয়। কিছু ব্যতিক্রম মাঝে মধ্যে রয়ে যায়।

এক সময় সতীনাথ পাশ ফিরে দেখে পাশের খাটে ভোম্বল নিদ্রায়মান। কি ভেবে হঠাৎ সে তাকে ডাকে।

ছোটমা ব্যতিব্যস্ত হয়ে সতীনাথের উপর ঝোঁকে। সতীনাথ তবুও ভোম্বলকে ডেকে যায়। ছোটমা আতঙ্কিত হয়ে ভাবে তার পূর্বের আচরণে সতী কি তাকে খারাপ ভাবল। ছোটমার চোখ দুটো জলে ভরে আসে। ভোম্বল সতীনাথের ডাকে উঠে পড়ে। কাছে এসে বলে আমাকে ডাকছ সতীদা।

—একটা কাজ করতে পারবি।

—কি কাজ?

—একটু বেলা হলে কলেজস্ট্রিটে চলে যা । ওখান থেকে বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগটা কিনে নিয়ে আয়।

—কেন?

সতীনাথ ম্লান হাসে। বলে আমাদের মামনি কি চিরকাল মূর্খ হয়ে থাকবে? লেখাপড়া শিখাতে হবে না?

ভোম্বল হতবাক। তারপর হঠাৎই খাটের উপর একটা ডিগবাজি খেয়ে ঘর কাঁপিয়ে হো হো করে হাসতে থাকে। সতীনাথ সে হাসিতে সাধ্যমতো যোগ দেয়। আর ছোটমা বিস্ফারিত চোখে ওদের দিকে চেয়ে থাকে। আগের জমা জল টপ্‌টপ্‌ করে তার শ্যামলিমা গন্ডের উপরে গড়িয়ে আসে।

ভূতের চালাকি

মনোজিৎ কুইতি

দীপেন বেশ মজাদার ছেলে, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানের ছাত্র, কলেজে পড়ে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের বেশ প্রিয়। যদিও কখনো কখনো সে, কথা না শুনলে গাঁট্টা মারে। কাপ ফেলে দেয়, তবুও ছেলে-মেয়েরা তার সঙ্গ ছাড়া থাকতে পারে না। মজার কথা হল, দীপেন আসলে সকল ছেলে-মেয়েদের খুব ভালবাসে। নিজের পয়সা খরচ করে তাদের খাওয়ায়। মজার মজার গল্প বলে, ম্যাজিক দেখায় ইত্যাদি। দীপেন বেশ কিছু ম্যাজিক জানে। কোন ছেলেকে কোন উপায়ে বশ করতে হবে এ কৌশল তার জানা আছে। শুধু বাড়িঘরে নয়, পাড়া-প্রতিবেশী, এমনকি কলেজের ছেলে-মেয়েদের কাছেও বেশ জনপ্রিয়। দীপেন-এর মনে কোন ধান্দা ছিল না। স্রেফ মজা করাই তার লক্ষ্য। আর সেই সঙ্গে ছোটদের দিয়ে সারা শরীর দাবাই করে নিত।

সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে ঘেটু, পুটি ও টুলু মায়ের সাথে মামাবাড়িতে এসেছে। দীপেন ওদের ছোটমামা। মামাদের মধ্যে ছোটমামাকে টুলুর খুব পছন্দ। মামাবাড়িতে এলেই ছোটমামার সঙ্গে বনে-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে পেয়ারা পাড়া, আমের সময় আম পাড়া, পাখি দেখে বেড়ানো প্রভৃতি। তিন ভাই-বোন ম্যাজিক খুব পছন্দ করে। মামার কাছে শিখবার লোভে পিছু পিছু ঘুরত। দীপেনও বিভিন্ন লোভ দেখিয়ে সারা শরীর মালিশ করে নেয়।

আজ তিনদিন হল ওরা মামাবাড়ি এসেছে। ছোট মামার সাথে মজা করে সময় কেটে যায়। সকালে ঘেটু জানতে পারল মামাদের এক প্রতিবেশী বৃদ্ধ মারা গেছে। তাকে গাঁয়ের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর তীরের শ্মশানে পোড়াতে নিয়ে গেছে। ঘেটু, পুটি ও টুলু শ্মশানে মড়া পোড়ানো দেখতে গেল। বহু মানুষ হরিধ্বনি দিচ্ছে। আর কেউ কেউ চিতা সাজিয়ে মড়া পোড়াচ্ছে। শ্মশান-যাত্রীদের মড়া পোড়িয়ে বাড়ি ফিরতে প্রায় বিকেল হয়ে যায়। ঘেটু, পুটি ও টুলু শ্মশান থেকে ফিরে পথের ধারে বটগাছের নীচে বসে খেলা করার সময় ঠিক করে আজ রাত্রে ভূত দেখতে আসবে। ওরা শুনেছে, মানুষ মরার পর ভূত হয়ে শ্মশানের কাছে ঘুরে বেড়ায়। আজ খুব ভাল সুযোগ। ঘেটু ভূতকে ভয় করে ঠিকই, তবে তার বড় ইচ্ছে একবার নিজের চোখে ভূত দেখে জীবনটা সার্থক করতে চায়। তারা অনেকের কাছে ভূতের ভালমন্দ অনেক গল্প শুনেছে। ওরাও অনেকবার অনেকভাবে ভূত দেখার চেষ্টা করেছে, তবু ভূত দেখতে পায়নি। আজ হল সব থেকে ভাল সময়।

বিকেলে ঘুরতে ঘুরতে তিনজনে আবার সেই জ্বলন্ত চিতার কাছ হতে

ঘুরে গেছে। রাস্তাঘাট ভাল করে দেখে নিয়েছে। রাত্রে ভূত দেখতে আসার নিখুঁত ছক মনে মনে এঁকে নিয়েছে। তার কাউকেও ওদের পরিকল্পনার কথা বলল না। এমনকি ছোটমামাকেও না। জানাজানি হয়ে গেলে, মা, দিদিমা, বড়মামা সবাই বকাবকি করবে।

যথারীতি রাত্রের খাওয়া সেরে সকলে শুয়ে পড়েছে, ওরাও তিনজন একসঙ্গে শুয়ে পড়েছে। কত রাত হল ঠিক বোঝা গেল না। এতক্ষণ ওরা ঘুমোনোর ভান করে শুয়েছিল। বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে চুপিচুপি উঠে লাইট নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। ঘরের বাইরের ঘরটি ছোটমামার থাকার ঘর। দরজা খোলার শব্দ শুনে দীপেন অন্ধকারে মশারির মধ্যে দিয়ে দেখল, ঘেটু, পুটি ও টুলু চুপিচুপি বেরিয়ে কোথায় যাচ্ছে। দীপেনের কৌতূহল হল। সে কোন সাড়া করল না। ওদের গতিবিধি লক্ষ করতে থাকে। তার বুঝতে কোন অসুবিধা হল না। সে বুঝতে পারল তার ভাগ্না-ভাগ্নিরা ভূত দেখার জন্য শ্মশানে যাচ্ছে। মনে মনে ভাবল, ঠিক আছে, ওদের সাহস হয়েছে। একবার ওদের মজা দেখাতে হবে। ঘেটু, পুটি ও টুলু প্রত্যেকে একটি করে লাঠি ও টর্চ নিয়ে। আগে ঘেটু, মাঝে টুলু পিছনে পুটি শ্মশানের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। রাস্তার ধারে পুরোনো বটগাছের কাছে আসতে ওদের বেশ ভয় ধরে যায়। কেমন যেন গা-ঝমঝম পরিবেশ, গভীর অন্ধকার, নিস্তব্ধ মানুষজন সব ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত্রে ঝিঁঝিঁপোকার ডাক আরো ভয়ার্ত পরিবেশ তৈরি করেছে, জোনাকিরা গাছে গাছে আলো জ্বেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। টুলু জিজ্ঞাসা করল, ওই বটগাছের ছোট ছোট আলোগুলো কি ভূতের আলো? ঘেটু ধমক দিয়ে বলল, চুপ কর, কোন সাড়া করিস না, বটগাছের কাছে আসতে কয়েকটি পাখি গাছের ডালপালা নাড়িয়ে ঝটাপট শব্দ করে উড়ে গেল। হঠাৎ শব্দ শুনে ওরা ভয়ে আঁতকে ওঠে। কিছু সময় দাঁড়িয়ে যায়। পরিস্থিতি লক্ষ করতে থাকে। এইসময় দুটি কি তিনটি শিয়াল ওদের দেখে দৌড়ে রাস্তা পার হয়ে গেল। পুটি বলল, দাদা পালিয়ে চল, আমার খুব ভয় করছে। টুলু কোন সাড়াশব্দ করল না। তারও খুব ভয় লেগেছে, তবে ভূত দেখার কৌতূহল, তাকে অনেক বেশি টেনে নিয়ে চলেছে। কারণ ভূত দেখতে গিয়ে তার যে কোন ক্ষতি হতে পারতো তার ধারণাই ছিল না। ঘেটু বলল, এরূপ সুন্দর সুযোগ আর হয়ত কখনো হবে না। সাহস নিয়ে চল, দেখা যাক না কি হয়। ওরা পুনরায় যাওয়া শুরু করল, বটগাছ পেরিয়ে প্রায় চিতার কাছে এসেছে এমন সময় টুলু হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠল, ওইটা কি? হঠাৎ টুলুর চিৎকার শুনে ঘেটু ও পুটির বুকের মধ্যে কেমন যেন ধকাস করে ওঠে। ভয়ে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেকে টর্চের আলো জ্বেলে রাখে। ঘেটু সাহস নিয়ে টুলুকে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় কি? টুলু দেখিয়ে বলল, ওই তো

গাছের মধ্য দিয়ে ভূতের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। লাইটগুলো জ্বেলে সেইদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অল্প সময় পরে মনে হল যেন চোখদুটো নড়ে উঠল, সেই সঙ্গে গাছের ফাঁক দিয়ে দুটো শিংও নড়তে দেখা গেল। টুলু বলল, ভূতের কি শিং হয় নাকি? ঘেটু বলল, না না, এ ভূত নয়। এ মনে হচ্ছে ষাঁড়। সকালে বটগাছের নিচে শুয়ে থাকতে দেখেছি। এতক্ষণে ভয় অনেক কমে গেছে। আলো জ্বেলে এগিয়ে গিয়ে দেখল সত্যিই সেই ষাঁড়টি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একমনে জাবর কেটে চলেছে। নিশ্চিত হওয়ায় ওদের সাহস অনেক বেড়ে যায়। পুটি বলল, আর আমাদের ভয় নেই। কাছে আপাতত আরো একজন রয়েছে। টুলু জিজ্ঞাসা করল, কে? কেন, এই ষাঁড়টি খুব ভদ্র, শান্ত। কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেও কিছু বলবে না। ষাঁড়টির কাছে গিয়ে গায় হাত বোলাতে লাগল। ষাঁড়টি স্থির হয়ে আদর পেতে লাগল, সত্যিই ওরা এখন যেন চারজন হয়ে গেছে। আরো কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখল চিতার আগুন বাতাসে মাঝেমধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। চিতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল এবং চারপাশ লক্ষ করতে লাগল। চিতার আলোতে বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চারিদিক আলোকিত হয়ে আছে। ষাঁড়টিও মাঝেমধ্যে ঘেটুদের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে। অনেক সময় দাঁড়ানোর পর ঘেটু বলল, কোথায় ভূত দেখা গেল না। বাড়ি ফিরে যাই চল। যাওয়ার আগে ঘেটু বড় একটি মাটির চাপ নিয়ে জ্বলন্ত চিতার উপর ফেলল। বড় ঢিলার আঘাতে চিতার জ্বলন্ত কয়লাগুলো চারিদিকে ছিটকে পড়ল। ভূত যখন দেখা গেল না, নির্ভয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে ভূত সম্বন্ধে নানা ঠাট্টা ফচকেমি করতে করতে বাড়ি ফিরছিল। ঠিক বটগাছের কাছে এসেছে, হঠাৎ ওদের লক্ষ পড়ল বটগাছের ডাল থেকে একটি নরকঙ্কাল ঝুলে দোল খাচ্ছে। টর্চের আলোতে বেশ স্পষ্ট। ওরা ভয়ে আ-আ করে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে এবং কিছুটা পিছিয়ে আসে। তবে লাইট সেই ঝুলন্ত কঙ্কালের উপর ফেলে রাখে। ভয়ে সারা শরীর ঘামে ভিজে যায়। টুলু দাদাকে ধরে ভয়ে চুপসে গেছে। ঘেটুরা ভাবতে পারেনি যে ভূত এইভাবে ওদের সামনে গাছ হতে ঝুলে দোল খেতে পারে। ভূতটি বুঝি ওদের অবস্থার কথা বুঝতে পেরেছিল। তাদের ভয় দূর করার জন্য নাকিসুরে বলল, পুচকে তিনটার সাহস তো কম নয়, এতরাত্রে আমাদের রাজত্বে এসেছিস ভূত দেখতে। আমরা আছি কি নেই বিশ্বাস হয়নি বুঝি? জানিস কি করতে পারি এখন। তোদের ঘাড় মটকে খাবো। তোরা যখন এই গাছের নিচ দিয়ে গিয়েছিলি, খুব ছোট বলে তখন কিছু বলিনি। তোদের স্পর্ধা তো কম নয়। আমার চিতায় অতবড় ঢিল মেরে এলি। এতে কি আমার কম লেগেছে ভাবিস। বুকে আমার প্রচণ্ড ব্যথা করছে। ঘেটু একটু সাহস করে বলল, আমার ভুল হয়েছে, আমায় ক্ষমা করো। আমাদের কোন ক্ষতি কোরনা। ভূত বলল, তোরা আলো বন্ধ কর।

আমি এখন গাছ থেকে নাবব। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে। আলো জ্বালাবি না। ধমক দিয়ে বলল, কোথায় আলো বন্ধ করলি? পুটি বলল, এই বন্ধ করছি বলে, আলো নিভিয়ে দেয়। ভূতটি মাটিতে পড়ার ধুপ করে শব্দ হল। শোন তোদের দেখে আমার দয়া হচ্ছে। তোদের কোন ক্ষতি করব না। সমস্ত দোষ ক্ষমা করে দিলাম। তবে একটা কথা, ওই পুচকে ছোড়াটিকে আমি ছাড়ব না, ওটা ভারী বদমাস, মিটমিটে চোর। ঘেটু বলল, ও আমার ভাই, ওর কিছু কোরো না, ওকে ছেড়ে দাও। বলছিস? ভাইকে খুব ভালবাসিস বুঝি? ঠিক আছে ছেড়ে দিতে পারি, আমি যা যা বলব, সেগুলো যদি মেনে চলিস তাহলে ছেড়ে দেব। নচেৎ নয়। পুটি বলল, সমস্ত কথা আমরা মেনে চলব। শোন তবে, আগে প্রত্যেকে পাঁচবার করে কান ধরে উঠবোস কর। ওরা প্রত্যেকে কান ধরে উঠবোস করল। আর কখনো এভাবে আমাদের রাজত্বে আসবি না। ভূতকে গালি দিবি না। তোর ছোটমামা আমার বন্ধু। তার সকল কথা শুনে চলবি। ঘেটু বলল, কেন আমরা তো মামার কথা শুনে চলি। ভূত একটু রেগে বলল, না না আজ বিকেলে তোর মামার শরীর মালিশ করে দিতে বলেছিল, করেছিলি? ঘেটু চুপ করে যায়। আজই ভোর হলে মামার বিছানায় গিয়ে মামার গা বেশ ভাল করে দাবাই করে দিবি। ঘেটু বলল, ঠিক আছে। আর শোন, আমার সাথে যে দেখা হয়েছে, কাউকেও বলবি না। আমি যে এই গাছে আছি বলবি না। এমনকি মাকেও না। মামাকেউ না। ঘেটু জিজ্ঞাসা করল, মামাকে তুমি খুব ভালবাস বুঝি? হ্যাঁ, তোর ছোটমামার কষ্ট আমি সহ্য করতে পারি না।

পুটি বলল, আমরা আপনার সব কথা মেনে চলব, আমাদের যেতে দাও। হাঁ তোরা যাবি, তবে এই পথ দিয়ে নয়। ওই যে পথ দেখছিস, ওই পথ দিয়ে আলো জ্বেলে চলে যা। পুটিরা কিছুটা স্বস্তি পেল। যা, আলো জ্বেলে চলে যা, গিয়ে শুয়ে পড়িস। আস্তে আস্তে যাবি ছোটমামা যেন জানতে না পারে। আর শোন ওই পুচকেকে লক্ষ রাখবি। ওর যেন কোন ক্ষতি না হয়। আর শোন যদি কখনো বিপদে পড়িস আমায় ডাকবি। টুলুর এখন একটু সাহস হয়েছে। সে জিজ্ঞাসা করল, কি বলে ডাকব। আমায় কেটিবাবু বলে ডাকবি। ভূতের রাজ্যে আমি কেটিবাবু হিসাবে পরিচিত।

তিনজনে চুপি চুপি বিছানায় শুয়ে পড়েছে। ঘুমিয়েও গেছে। ভোরে টুলুর ঘুম ভেঙে যায়। সে দাদা ও দিদিকে ডেকে বলে, মামার শরীর দাবাই করতে হবে, নচেৎ ভূত রেগে যাবে। তিন ভাইবোন মামার বিছানায় গিয়ে মামার শরীর দাবাই করতে লাগল। মামা ঘুমিয়ে ছিল, ওদের দাবাই-এর ফলে ঘুম ভেঙে যায়। প্রথমে ঠিক বুঝতে পারেনি। জিজ্ঞাসা করল, তোরা কি করছিস? কেন, গা দাবাই করছি। দীপেনের সমস্ত কথা মনে পড়ে। চুপটি করে মনে মনে হাসে

আর টেরিয়ে টেরিয়ে ওদের দিকে দেখে। কতক্ষণ যে দাবাই হচ্ছিল বলা কঠিন। সকালে মা অরুণা উঠে দেখে ছেলে-মেয়েরা মামার বিছানায় মামাকে দাবাই করছে। প্রথমটা ঠিক গুরুত্ব দিল না। তারপর কি যে মনে হল। বিছানার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, সকাল-সকাল গা দাবাই করছিস, ব্যাপার কি? টুলু বলল, মা গত রাত্রে না ভূত বলেছে ভোরে ছোটমামার গা দাবাই করে দেওয়ার কথা। আর ভূত না, আমাদের পাঁচবার করে কান ধরে ওঠবোস করিয়েছে। অরুণা ঠিক বুঝতে পারল না। ঘেটু গতরাত্রের ঘটনাটি বলল। অরুণা শুনে মা অবাক। একটু সময় ভাবল। তারপর মনে মনে বলল, হু বোঝা গেছে। বলে ভাইয়ের কানটি ধরে, ওঠ গাধা।

প্রদীপ জেগে চুপটি মেরে শুয়েছিল। যখন দেখল দিদি ব্যাপারটি বুঝতে পেরে কানটি ধরেছে, সে তখন উ, উ করে উঠে বসে, বলে ছাড় ছাড় দিদি, লাগে লাগে, বলছি বলছি, সব বলছি।

পুটিরা দেখে অবাক, তারা ঠিক বুঝতে পারল না। মামা উঠে পড়তে টুলু দেখল কালো রঙের একটি কাপড়। সে তুলে দেখে, সেই কালো কাপড়ে সাদা রঙ দিয়ে মানুষের কঙ্কাল আঁকা। ঠিক গতরাত্রে যা দেখেছিল, ঠিক সেইরূপ। টুলু বলল, দেখ দাদা গত রাত্রের ভূতটা ঠিক এরকম ছিল না, ঘেটু ও পুটি দেখে বলল, হ্যাঁ, ঠিক এরকম ছিল। ঘেটু অবাক হয়ে বলল, তাহলে মামার কাজ।

যদি ক্যাকলাস...

গৌতম দাস

যখন সন বাইশশ উনপঞ্চাশ। স্থান কলকাতা। চওড়া ঝাঁ-চকচকে রাস্তার দু-ধারে বড়ো বড়ো বহুতল বাড়ি। বস্তি নেই, হকার নেই, রাস্তার পাশে আবর্জনার স্তূপ নেই, নর্দমার পচা-গলা দুর্গন্ধ নেই, ট্রেনে-বাসে জনতার হুল্লোড় নেই, নেই দূষণের ঝিঁ-ঝি পোকারাও। পরিকল্পিত নিকাশি আর উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থায় কলকাতা এখন যেন ফ্যাশন দুরন্ত স্মার্ট ঝকঝকে তিলোত্তমা সুন্দরী। চোখধাঁধানো বাড়িঘর। নয়, দশ, পনেরো, কুড়ি পর্যন্ত উজ্জ্বল বর্ণের নানাবিধ ফ্ল্যাট। তথাকথিত গরিবদের জন্যেও রয়েছে এক কামরার হাউজিং প্ল্যান। তবে কলকাতা এখন মূলত উচ্চবিত্ত আর মধ্যবিত্তের নিবাসস্থল। মাল্টিমিডিয়া কোম্পানি আর বহুজাতিক সংস্থা ছেয়ে গেছে কলকাতার আনাচে-কানাচে। ব্যাঙ্ক, রেল, অফিস-কাছারি সবই চলছে বেসরকারি উদ্যোগে। অফিসে বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই, নেই জোরাজুরি। শুধু কাজ চাই, কাজ। কাজ করতে পারো বাড়িতে বসেই ল্যাপটপে। যাতায়াতে সময় নষ্টর দরকার নেই, বাড়তি সময়টুকু দাও কোম্পানির জন্য, ইন্টারনেটে কিংবা মোবাইলে। সারা মাসের কাজের খতিয়ান অবশ্য পাঠিয়ে দিতে হবে হেডঅফিসে। কাজের হিসেব-নিকেশেই নির্ধারিত হয় কর্মচারীর প্রমোশন কিংবা বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টের স্কেল।

অফিসযাত্রীর সংখ্যা কম, তাই বাস-ট্রেনেও নেই হুড়োহুড়ি। একালের হকার নামক জীবেরাও আজ উধাও। বাজার বদলে এখন মল কিংবা মাল্টিপ্লেক্স। একই ছাদের তলায় সবরকম দ্রব্যসামগ্রী আর বিচিত্র উপভোগের সামগ্রী। জিনিসপত্র তোল ইচ্ছামতো, মাপ-জোপ করো নিজে নিজেই। তারপর ক্রেডিট কিংবা ডেবিট কার্ড ঢুকিয়ে দাও নির্দিষ্ট খাপে, তোমার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা যথারীতি চলে যাবে কোম্পানির ঘরে। সব বাড়িতেই এখন নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি। ছেলে-মেয়ে একটি কিংবা দুটো। আজকের নেলসন, ক্লিন্টন, জ্যাকশন কিংবা জ্যোতিরা স্কুল-কলেজে অ্যাটেন্ড করে নিয়মিত। টিচারের লেকচার শোনে মন দিয়ে, সেমিনারে যায়, ই-মেলে প্রাইভেট টিউশানিও চায় প্রত্যেকে। বাড়িতে ঝি-চাকর বলতে এখন যন্ত্রমানব। রোবট এখন ঘরে ঘরে। দরজা খোলা, বন্ধ করা, রান্না কিংবা বাসন পরিষ্কার, ঘর ঝাড়া, পোকামাকড় মারা, বিছানা পাতা কিংবা তোলা, গাড়ি চালানো, মাথা টেপা আর পিঠ মালিশ, এমনকি বডি স্পা-তেও আছে যন্ত্রমানব। নির্দিষ্ট সময়ে শুধু ঠিকঠাক বোতাম টিপে দিলেই হল। ছোট্ট শিশুর খেলার সাথী নব আবিষ্কৃত শিশুবোধসম্পন্ন পিংপং নামের রোবটগুলো। পোস্ট মডার্ন জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত আজকের কলকাতা তাই লন্ডন, প্যারিস কিংবা নিউজার্সিরই সহোদরা। সরকারি ব্যবস্থাপনায় জীবনযাত্রা যখন সুচারু ও ছন্দায়িত, ঠিক তখন দেশে এলো

নতুন উপসর্গ, ক্যাকলাস। কলকাতার মতো ভারতের বড়ো বড়ো শহর-নগর, গ্রাম-গঞ্জ এমনকী প্রত্যন্ত এলাকাগুলিও আক্রান্ত এই নতুন ভাইরাসে।

ক্যাকলাস নামক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবাণু, জল-স্থল-বায়ু সর্বত্রই দলবদ্ধ বিচরণে সক্ষম। তবে এদের বিচরণক্ষেত্র মূলত ভূমি। এদের খাদ্য রক্ত। যেনতেন রক্ত নয়, মানুষের গন্ধ জড়ানো রক্ত। সেই রক্তের টানেই এদের গতি বিদ্যুতের মতো তাৎক্ষণিক। মুহূর্তের মধ্যে এরা উঠে আসে ভূমি থেকে মেঝে, মেঝে থেকে দেওয়ালে। সেকেন্ডের ভগ্নাংশে ক্যাকলাস ছড়িয়ে পড়ে এধার থেকে ওধার। বিধ্বংসী সাইক্লোনের মতো এদের প্রজনন ক্ষমতা। ঘণ্টাখানেকের ব্যবধানে এরা পৌঁছে যায় হাজার থেকে লক্ষ, লক্ষ থেকে কোটি, শেষে সংখ্যাতত্ত্বের হিসেবেও আর ধরা যায় না ওদের।

ঘর ছেড়ে মাটিতে পা রাখা মাত্র ক্যাকলাস ঢুকে পড়ে শরীরে। চামড়া ভেদ করে শিরা-উপশিরায় ফাটল ধরিয়ে চুষে খায় রক্ত। ধমনীর প্রাচীর ভেদ করে রক্তস্রোতে মিশে গিয়ে ওরা। ঢুকে পড়ে হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। তারপর কখন যেন লিক হওয়া বেলুনের মতো চুপসে যায় হৃৎপিণ্ড। অঙ্গ থেকে অঙ্গ, এব দেহ থেকে আর এক দেহ। পিন পিন করে ওরা চুষে নেয় রক্ত। মাত্র তিন থেকে পাঁচদিনের মধ্যে সুস্থ সবল দেহটাকে উইপোকার ঢিবির মতো ঝাঁঝরা করে দিয়ে ক্যাকলাস মানুষকে পৌঁছে দেয় মৃত্যুর দুয়ারে।

ক্যারেন্টের শকের মতো হঠাৎ দেহের আনাচে-কানাচে রি-রি করে ওঠা, মানব শরীরে এভাবেই তাদের উপস্থিতি জানান দেয় ক্যাকলাস। চামড়া দিয়ে কোনোমতে গলতে পারলেই হল। তারপর হাজারো চিৎকার-চেঁচামেচি কিংবা কানফাটা আর্তনাদ, কোনো কিছুতেই রক্ষে নেই। গরম ছ্যাঁক কিংবা অনবরত কারেন্টের শক কোনো কিছুতেই যন্ত্রণার প্রশমন হয় না। আর ফল মেলে না কোনো চিকিৎসা বিদ্যাতেও। আয়ুর্বেদ, এ্যালোপ্যাথি কিংবা হোমিও, কোনো ফার্মেসিতেই কোনো কাজ হয় না। ক্যাকলাসের ওপর প্রভাব খাটাতে পারছে না বায়োটেকনোলজি, জেনেটিক বিজ্ঞান কিংবা রসায়ন শাস্ত্র।

ক্যাকলাস আক্রান্ত বডি নিয়ে বিজ্ঞানের নানা শাখায় চলছে নিরন্তর গবেষণা। চলছে নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাটা-ছেঁড়াও। গবেষণাগারে দিন-রাত্রি সর্বক্ষণ একনিষ্ঠ পরীক্ষায় নিমগ্ন বিজ্ঞানীগণ। স্নান-খাওয়ার ঠিক নেই, রাতের পর রাত ঘুম নেই। সবকিছু ভুলে এখন সবাই ব্যস্ত বিশেষ একপ্রকার অ্যান্টিজেনের গতি-প্রকৃতি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহে। মার্কিন জীববিজ্ঞানী অ্যালফ্রেড ব্রাউন এবং জন ক্লার্ক দু-মাস ধরে নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যে জার্নাল বের করলেন 'জার্নাল অব বায়োকেমিস্ট্রিতে' তা থেকে শুধু এটুকুই জানা গেল, মাটিতে মিশে থাকা বিশেষ একপ্রকার গার্বেজ ক্যকলাসের জন্মদাতা। গত কয়েক প্রজন্মের সিভিলাইজড্ মানব প্রজাতির যথেচ্ছ জীবনাচরণ, তারই ফলশ্রুতিতে বিশেষ প্রকার গার্বেজের ভূমিতে

সঞ্চায়ন, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিভিন্ন খনিজের সঙ্গে তার রাসায়নিকরণ, পরিবর্ণতিতে ক্যাকলাসের জন্ম। তারপর নিউক্লিওফিসানের মতো দ্রুত বংশবৃদ্ধি ও বিস্তার। পূর্ব পূর্ব প্রজন্মের অপরিণামদর্শিতা কিংবা অজ্ঞানতার ফল ভোগ করতে হচ্ছে আজকের প্রজন্মকে।

ক্যাকলাস আক্রমণের ভয়ে কলকাতার মানুষজন আর পথে বেরচ্ছে না। বেরচ্ছে না ঘর ছেড়ে। দিনের বেলাতেও বাড়ির দরজা-জানলা বন্ধ করে অন্তরীন হয়ে থাকেন অধিকাংশ মানুষ। কোনোরকম ফাঁকফোকর রাখা যাবে না, কেননা একটু-আধটু ফাঁক পেলেই যদি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে ক্যাকলাস। ক্যাকলাসের ভয়ে স্কুল-কলেজও বন্ধ এখন। বন্ধ মল, মাল্টিপ্লেক্স, ডিস্কোথেক, বার কিংবা নাইটক্লাব। এমনকি গত মাস থেকে অফিস-কাছারিগুলোও বন্ধ হয়ে গেছে অনির্দিষ্টকালের জন্য। ব্যাঙ্ক, কোর্ট কিংবা পুলিশ থানাগুলিতেও তালা ঝুলছে বেশ কিছুকাল। পার্টি নেই, মিছিল নেই, নেই কোনো স্লোগান। মানুষ নেই, জন নেই, তাই পথ-ঘাটও সুনসান। মৃত্যু আতঙ্কে জবুথবু আজকের শহর কলকাতা। শুধু কলকাতা নয়, ক্যাকলাস আতঙ্কে ভুগছে গোটা পৃথিবীর পাঁচশো কোটি মানুষ।

ক্যাকলাসের ভয়ে মানুষ ক্রমেই উঠছে ওপরে। একতলা থেকে দোতলা, দোতলা ছেড়ে তিন, চার, পাঁচ কিংবা আরও ওপরে। কখনো বা আলোর সন্ধানে ছাদে পায়চারি। কিন্তু তবুও নিস্তার মিলছে না মানুষের। চারতলা, পাঁচতলাতেও উঠে আসছে ওরা। এই তো সেদিন, নিউটাউনে মিসেস মুনিয়ার রক্তশূন্য ডেডবডি মিলল পাঁচতলার বেডরুম থেকে। মুনিয়ার প্রতিবেশী গোমস বডি নিয়ে আসা সরকারি প্রতিনিধিদের তো জানিয়েই দিলেন যে, গত একমাস যাবৎ মুনিয়া ঘর ছেড়ে বেরোননি ক্যাকলাসের ভয়ে, তবুও কোন্ উপায়ে যে ক্যাকলাস ঢুকতে পারল ওর ঘরে, আজও তা কেউ বুঝে উঠতে পারছেন না। ক্যাকলাস আতঙ্কে আজ কদিন গোমসদেরও খাওয়া-নাওয়া বন্ধ হতে বসেছে।

সল্টলেকের করুণাময়ীর ঘটনা। মিসেস পালানি মাঝরাতে স্বামীর কালচে হয়ে ওঠা মুখটা দেখে হঠাৎ আঁতকে উঠলেন। সেক্টর ফাইভের কোনো এক বহুজাতিক কোম্পানির এগ্‌জিকিউটিভ অফিসার মি. ধ্রুব বসু। স্কুলশিক্ষিকা স্ত্রী পালানি আর দেড় বছরের কন্যা রিমাকে নিয়ে ওর সুখের সংসার। কিন্তু হঠাৎ যে কী হলো! ক্যাকলাসের ধাক্কায় সবকিছুই উল্টে-পাল্টে গেল ওদের। পরের দিন আয়নায় নিজের মুখ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তন্নতন্ন করে যাচাই করে ধ্রুব। ক্ষোভে-দুঃখে-যন্ত্রণায় মুষড়ে পড়েন প্রচণ্ডভাবে। একসময় আলোর খোঁজে ব্যালকনিতে ছুটে যান। কখনো ঘরের দেওয়ালে মাথা ঠোকেন। কখনো বা হাঁটুতে মাথা গুঁজে নিজের মাথার চুল ছেঁড়েন। দুদিন বাদে পালানিকে ব্যাগে জামা-কাপড় গোছাতে দেখে ক্যাকলাস আক্রান্ত ধ্রুব কাঁপা-কাঁপা গলায় তাকে বলে—আজই চলে যাবে?

পালানির চোখে উদাস দৃষ্টি—হুঁ!

—কিন্তু আমি একা-একা কী করে থাকব এখানে? উগরানো কষ্টটা যেন চেপে ধরতে চায় কণ্ঠটাকে।

—স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ই-মেল করেছি। রেসপন্সও পেয়েছি। আজ-কালের মধ্যেই মেডিক্যাল টিম পাঠাবে ওরা। পালানির কণ্ঠে স্নেহ ঝরে পড়ে—

ওরা না আসা পর্যন্ত...

চোখ দুটো ছল ছল করে ধ্রুবর।

কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চল হয়ে পড়েন পালানি, কোনো কথাই বলতে পারেন না আর। একটু পরে পাশের ঘর থেকে দেড় বছরের মেয়ে রিমাকে নিয়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। স্নিগ্ধ স্বর শোনা যায়—আমরা বড়ো অসহায় ধ্রুব, নিজেকে নিয়ে ভাবছি না। কিন্তু আমাদের একমাত্র বংশধর রিমা, ওর যদি কিছু হয়! শুধু ওর কথাটা ভেবে আমাকে যেতে দাও ধ্রুব। প্লিজ!

ধ্রুব আর একটা কথাও বলে না। করে না কোনো অনুময়-বিনয়ও। কয়েক পা হেঁটে এসে দরজার পর্দাটা শুধু টেনে দেয়। পালানি আর দাঁড়াতে পারে না সেখানে। গুমরানো কান্নাটা বুকে চেপে রিমাকে পিঠে ঝুলিয়ে দু-হাতে দুটো বোঝা তুলে তাড়া-খাওয়া রিফিউজির মতো মি. বার্কের দরজায় এসে দাঁড়ায়।

ক্যাকলাস উঠছে দেওয়াল বেয়ে। মেঝে থেকে দেওয়াল, দেওয়াল থেকে আবার মেঝে। খুঁজছে রক্ত, মানুষের গন্ধমাখা রক্ত। ছয়-সাত কিংবা আট তলার মানুষেরাও আজ আর নিশ্চিন্তে থাকতে পারছে না। তারা খুঁজছে দশ-এগারো কিংবা আরও ওপর বাঁচার জন্য আকাশ ছুঁতেও রাজি সবাই।

ক্যাকলাস নিয়ন্ত্রণে সরকারি উদ্যোগও দেখার মতো। শহর জুড়ে বর্মপরিহিত মিলিটারি, জল-কামান, গ্যাস স্প্রে। হেলিকপ্টার থেকে ছাদে ছাদে খাবার আর জলের প্যাকেট বিতরণ। সবই চলছে ঠিকঠাক। ব্যয় হচ্ছে কোটি কোটি ডলার। গবেষণায় নিমগ্ন বিজ্ঞানীগণ। জানতে চাইছে যেন-তেন-প্রকারেণ ক্যাকলাস মারার রণ-কৌশল।

ঠাসাঠাসি মানুষের ভিড় উঁচুতলার ফ্ল্যাটগুলিও এখন আর নিরাপদ নয়। তাই ক্যাকলাসহীন ভূমির খোঁজে ছেলে-মেয়ে, বাচ্চা-বুড়ো সবাই এখন দিশেহারা। গামবুট পরে, রবারের চাদরে চোখ-মুখ ঢেকে সবাই পালাচ্ছে। পালাচ্ছে এক শহর থেকে আর এক শহর কিংবা শহর ছাড়িয়ে গ্রামে। কখনো বা ছুটছে বনে-জঙ্গলে, কখনো পাহাড়-পর্বত কিংবা সমুদ্র উপকূলে। কিন্তু ক্যাকলাসহীন ভূমির হদিশ নেই কোথাও। তবুও মানুষ খুঁজছে, খুঁজেই চলেছে এক টুকরো উর্বরা ভূমি।

উপন্যাস

ওরা আছে ওইখানে

ছান্দিক

কাল থেকে বৃষ্টি নেমেছে, থামার কোনও লক্ষণ নেই। কালীদাসীরও কাজে যাওয়া হয় না। কাল থেকে পেটেও কিছু পড়েনি। বুকেই বা দুধ আসবে কোথা থেকে? এমন সময় নিকুঞ্জ আসে ভিজতে ভিজতে। কাল সে গিয়েছিল কাজের খোঁজে, রাতে ফেরেনি। তার কথা ভাবার সময় নেই কালীদাসীর। ভাবেওনি। কিন্তু, এই ভরা বর্ষা মাথায় তাকে ফিরতে দেখে, আনন্দই হয় কালীদাসীর। অন্তত কথা বলে তো সময়টা কাটানো যাবে।

নিকুঞ্জ বলল—কাল থেকে খাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই।

এত কষ্টেও ম্লান হাসে কালীদাসী। আর খাওয়া? তোমার কাজ কাম কিছু হল?

নিকুঞ্জ তার গামছার গিঁটটা খুলল, ভিতরে কেজিখানেক চাল, কয়েকটা আলু, আর গোটা কয়েক কাঁচালংকা। কালীদাসীর চোখ দুটো চিক চিক করতে থাকে। জানতে চাইল কোথায় পেলে? ভিক্ষে করেছো?

না।

তাহলে?

নিকুঞ্জ বলল, এক বেলার কাজ পেয়েছিলাম বুঝলি? হঠাৎ বৃষ্টি নামায় তাও হল না। মালিক লোক মন্দ নয়। বললেন যা বৃষ্টি নেমেছে, যাবে কি করে নিকুঞ্জ? এক কাজ করো, চিড়ে গুড় দিচ্ছি, খেয়ে ঐ মাদুরটা পেতে শুয়ে পড়ো। রাতটা এখানে থেকে সকালে না হয় বাড়ি যেও। অন্ধকার রাত, আসতে সাহস হল না। সকালে বৃষ্টি সামান্য কমতে মালিককে বললাম, তাহলে আসি বাবু? মালিক জানতে চাইলেন বাড়িতে কে আছে? বললাম বৌ আর চার মাসের বাচ্চা। বললেন, আজও তো কাজ করা যাবে বলে মনে হয় না। গোটা তিরিশেক টাকা দিয়ে বললেন, বর্ষা থামলে বাকি কাজটা একসময় করে দিয়ে যেও। ওই টাকা দিয়েই কিনে এনেছি এসব। আরো গোটা পাঁচেক আছে এখনো!

কালীদাসী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, একটু গুঁড়ো দুধ যদি নিয়ে আসতে, জল দিয়ে গুলে বাচ্চাটাকে খাওয়ানো যেত। বুকে তো কিছু নেই যে তাই খাবে?

নিকুঞ্জ বলল, একবার মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু কোন দোকান দেখতে পেলাম না। তারপর বলল—তুই এগুলো দিয়ে একটু ভাতে ভাত ফোটা তো। আমি আসছি।

তাকে বাধা দিয়ে কালীদাসী বলল—তুমি আবার কোথায় যাবে?

দেখি ঐ মোড়ের দোকানটা খোলা আছে কি না? দেখছিস না মেয়েটা কেমন নেতিয়ে পড়েছে? তারপর কালীদাসীর কোন বাধা না শুনে বেরিয়ে যায় নিকুঞ্জ।

আবার জোরে বর্ষা নামে তার সঙ্গে জোরে হাওয়া। রাস্তার পাশের কৃষ্ণচূড়া গাছের ডালগুলো মড়মড় করে ভেঙে পড়ে। নিকুঞ্জ নিজেকে কোন রকমভাবে বাঁচিয়ে হাঁফাতে তাকে। তবু সে প্রায় দৌড়াতে দৌড়াতে মোড়ের দোকানটায় এসে দেখে দোকানদার ঝাঁপবন্ধ করছে। নিকুঞ্জ বলল, দাদা, ঝাঁপ বন্ধ করার আগে আমাকে দু'টাকার গুঁড়ো দুধ দিন না। দোকানদার বলল, তোর ঐ দুটাকার জন্য আমি ঝাঁপ বন্ধ করব, না? আজ আর হবে না। কাল আসিস। নিকুঞ্জ আবারও অনুরোধ করে, দাদা আমার চার মাসের মেয়েটা সেই কাল থেকে না খেয়ে আছে, দাও না দু টাকার দুধ। বললাম তো হবে না, বলে ঝাঁপ বন্ধ করে ছাতা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে যায় দোকানদার। নিকুঞ্জ বুঝতে পারে না সে এখন কি করবে?

একটা রিকশা এসে দাঁড়ায় সামনে। নিকুঞ্জ দেখে তাদের পাড়ার প্রভাত। প্রভাতই কথা বলে, চিনতে পারছ নিকুঞ্জদা? সে কি কথা? তারপর বলল, কি যে বলিস প্রভাত? তোকে চিনব না? থাক, তবু ভাল যে, চিনতে পেরেছো। তারপর বলল, কদিন আগে বৌদিকে দেখলাম একটা বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে। তারপর তারপর গলি পথে যে কোথায় চলে গেল বুঝতে পারলাম না। মনে হল ভুল দেখলাম কি? এখন মনে হচ্ছে, না ঠিকই দেখেছি। তা আছ কোথায়? নিকুঞ্জ বলল, কোথায় আর থাকবো? দেশে তো আর থাকা হল না। কাজ কাম কিছু নেই। তাই মাসদুয়েক হল এখানে এসেছি। থাকি ঐ খাল পাড়ে। প্রভাত বলল, ওঠ রিকশায়। আমি ওদিকেই যাব। কিন্তু। কিন্তু আবার কি? তুমি কি দেশ গাঁয়ের সেই সব কথা এখনো মনে করে বসে আছো নাকি? তারপর বলল, একটা কথা তোমায় বলতে পারি দাদা, এই শহরটা যেমন বড়, এখানকার মানুষের মনটাও তেমনি বড়। গ্রাম গাঁয়ের মতো ঐসব ছোট ছোট কথা নিয়ে এরা পড়ে থাকে না। অন্যমনস্ক ভাবে নিকুঞ্জ বলল, কি জানি ভাই। আমি তো বেশিদিন আসিনি। প্রভাত বলল, আমার কিন্তু দেখতে দেখতে অনেকদিন হয়ে গেল। তারপর চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে তোমাকেও বলেছিলাম, কিন্তু তুমি তো পুরোনো রাগটাকে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারলে না। নিকুঞ্জ বলল, ওসব কথা থাক না প্রভাত। উত্তরে প্রভাত বলল, আমি কি আর ইচ্ছে করে এসব কথা বলছি? তুমি শীতে কাঁপছ তবু আমার সঙ্গে যেতে চাইছো না বলে বলছি।

নিকুঞ্জ বলল, আসলে মেয়েটার জন্য দুই টাকার দুধ কিনতে এসেছিলাম। দোকানদার মুখের 'পর ঝাঁপ বন্ধ করে বলল, যে কাল আসিস!

কি? এই কথা বলেছে? ঠিক আছে তুমি আমার সঙ্গে চল, আমি দেখছি কোথায় দুধ পাওয়া যায়।

এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরে অবশেষে একটা দোকান থেকে এক প্যাকেট দুধ কেনে প্রভাত। দশ টাকা দাম। নিকুঞ্জ বলল, অত টাকা তো আমার কাছে নেই। তাতে কি? পরে এক সময় দিয়ে দিও। রিকশায় বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করতে করতে বৃষ্টিটা ধরে আসে। আকাশও পরিষ্কার এখন। প্রভাত বলে, বৃষ্টি মনে হয় আর হবে না। চল তোমাকে তোমার বাসায় নামিয়ে দিয়ে যাই। আর বাসা? প্রভাত বলল, এই খাল পাড়ে যারা থাকে তাদের অনেককেই আমি চিনি। বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে ওরা এখানে ঠাঁই নিয়েছে। বর্ষায় যে এদের কি অবস্থা হতে পারে অনুমান করতে পারি।

প্রভাতের রিকশা এসে থামে নিকুঞ্জের অস্থায়ী আস্তানায়। নিকুঞ্জ নামতে নামতে হাঁক ছাড়ে, কৈরে কোথায় গেলি কালী? কালীদাসী এগিয়ে এসে প্রভাতকে দেখে, দ্রুত অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়। এখানে তো আর আলাদা ঘর নেই যে নিজেকে সেখানে লুকোবে? প্রভাত বলল, আমায় চিনতে পারছ না বৌদি? আমি প্রভাত।

জানি কিন্তু এখানে কেন এসেছো? এখানে তোমার কি চাই? তুমি চলে যাও এখান থেকে।

প্রভাত হেসে বলল—তার মানে সেই পুরনো রাগটা এখনো মনে করে রেখেছো? কিন্তু বৌদি. দেশ গাঁয়ের রাগটা দেশ গাঁয়েই থাক না। এখানে তো আমাদের ভিটে মাটি কিছু নেই। বলতে পার ভেসেই চলেছি। ভাসা মানুষেরা খড়কুটো যা পায় তাইই আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায়। মনে করো না আমরা একে অপরকে সেই খড়কুটো ভেবে আঁকড়ে ধরতে চাইছি।

কথাটা মনে ধরে নিকুঞ্জের। বলল—যা বলেছিস প্রভাত। একেবারে খাঁটি কথা বলেছিস। তারপর কালীদাসীকে বলল, কালী গ্রাম গাঁয়ে যা হয়েছে হয়েছে ও সব এখন ভুলে যা। দেখছিস না প্রভাত কিছুই মনে রাখেনি। তাই তো নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে মেয়েটার জন্য এক প্যাকেট গুঁড়ো দুধ এনেছে। ওর পরে আর রাগ রাখিসনি কালী। আমরা সবাই তো ভাসছি। ভাসা মানুষের কি রাগ পুষে রাখতে আছে?

কালীদাসী একথার কোন প্রতিবাদ না করে একপাশে সরে দাঁড়ায়। নিকুঞ্জ বলে আয় প্রভাত। বড্ড খিদে পেয়েছে। প্রভাত বলল, খিদে আমারও পেয়েছে নিকুঞ্জদা, তাই চলি আজ। মা নিশ্চয়ই চিন্তা করছে।

খুড়িমা এসেছে নাকি?

এই তো মাসখানেক হল এসেছে। প্রথমে যখন বললাম চল মা আমার সাথে, কিন্তু নাতি-নাতনী রেখে আসতে কি আর চায়? এখন সেই নাতি- নাতনীরা, দাদা-বৌদির সঙ্গে জোট পাকিয়ে ঘর থেকে বের করে দিলে। মা অনেক অনুনয়

করলে তোরা তোদের ঘরের এক কোণে আমায় একটু থাকতে দে। কিন্তু শুনলে কি কথা? মা তখন কাঁদতে কাঁদতে হরিকাকার বাড়ি গিয়ে উঠলো। হরিকাকা সব শুনে বললে, মায়ের গায়ে হাত? তোমার এ ছেলে নির্বংশ হল বলে? মা তাকে বাধা দিয়ে বললে, অমন কথা বলো না ঠাকুরপো। ওরা বেঁচেবর্তে থাক। আমাকে বরং ছোট খোকার কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার একটু ব্যবস্থা করো। মা তো বলে খালাস! হরিকাকা জানবে কি করে যে মায়ের ছোট খোকা কোথায় আছে? তবু তার দয়ার শরীর বলতে হবে। ট্রেনের টিকিট কেটে মাকে তো ট্রেনে তুলে দিল। কিন্তু শিয়ালদহে নেমে মা আমাকে কোথায় খুঁজে পাবে? নিকুঞ্জ বলল, তারপর? তারপর আর কি। আমি তো রিকশা চালাই। একদিন দেখি মা দোরে দোরে ভিক্ষে করছে। আমার বুকের মধ্যে যে কি হচ্ছিল তা তোমাকে বুঝাতে পারব না নিকুঞ্জদা। আমি কাছে গিয়ে বললাম, মা তুমি ভিক্ষে করছ? আমাকে দেখে তো হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। আমি আর কোন কথা না বলে মাকে রিকশায় তুলে নিয়ে এলাম আমার কাছে। এখনও মাঝে মাঝে চিৎকার করে ওঠে, আমাকে আর মারিস নারে বড় খোকা? বড্ড খিদে পেয়েছিল বলে লুকিয়ে একমুঠো ভাত খেয়েছি। আর খাবো না। বলতে বলতে প্রভাতের দুচোখ জলে ভেসে যেতে থাকে। গামছায় চোখ মুছে বলে, কি বলবো আর মায়ের দুঃখের কথা। শুধু বললাম, তোমার আর কি দোষ মা! এমন কুলাঙ্গার সন্তানের জন্ম দেবে তা কি আর জানতে? তাই তো নিকুঞ্জদা, দেশ গাঁয়ের পরে ঘেন্না ধরে গেছে। ঠিক করেছি মরে যাবো তবু ঐ দেশ গাঁয়ের মায়া আর করব না।

আস্তানা থেকে বেরিয়ে রিকশার কাছে আসে প্রভাত। কালীদাসী ডাকে ঠাকুরপো। আঃ কি আরাম! ভিতরের সমস্ত অভিমান যেন জল হয়ে যায় প্রভাতের। সাড়া না দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কালীদাসী বলে, ঠাকুরপো একবার ভিতরে এস। প্রভাত বলে, না বৌদি, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। তা হোক, আর একটু দেরি হলে কি আর এমন ক্ষেতি হবে? কিন্তু তুমি এভাবে চলে গেলে আমার যে অনেক ক্ষেতি হয়ে যাবে ঠাকুরপো। অগত্যা প্রভাতকে ভিতরে যেতে হয়। প্লাস্টিক ছাউনির ঘরে একপাশে একটু শুকনো জায়গা তখনো টিকে আছে। সেখানে তাকে বসতে বলে বলল—খুড়িমা এখন ভাল আছে তো? তা আছে। তবে লোকজন খুব একটা চিনতে পারে না। এই তো দাশুদা এসেছিল সপ্তাহখানেক আগে। মা তাকে চিনতেই পারেনি।

খুব দুঃখের কথা ঠাকুরপো। দাশু এখন কেমন আছে? ভালই আছে। কলকাতার মহাজনের দোকানে হিসাব লেখার কাজকর্ম করে। প্রথম যেদিন দেখা করতে যাই, আমাকে বলেছিল,—'তোমাকে যে আমার কাছে নিয়ে রাখবো সে সামর্থ্য তো আমার নেই। তবে একটা জিনিস এখানে এসে বুঝেছি, অলস না হলে

কলকাতা শহরে ভাতের অভাব হয় না।' ওকে বললাম, তোমার কথা আমি ১০০ ভাগ মানি। কিন্তু কি কাজ করবো বল তো? আমি শুধু পরিশ্রম করতে পারি। কিন্তু কাজ দেওয়ার তো লোক চাই।

কালীদাসী মাটির হাঁড়ি থেকে গরম গরম ভাত আলু সিদ্ধ কাঁচালংকা আর নুন, দুটো কাঁধা ভাঙা থালায় সাজিয়ে দিয়ে বলে, খেতে খেতে তোমার গল্প বলো ঠাকুরপো। প্রভাত বলল, না বৌদি তোমাদের ভাতে ভাগ বসালে শেষ পর্যন্ত তোমাকে না খেয়ে থাকতে হবে। সেটি কিছুতেই হবে না। অতি দুঃখেও হেসে ফেলল কালীদাসী। তারপর বলল, না খাওয়ার অভ্যেস আমার আছে। তুমি খাও তো! প্রভাত প্রতিবাদ করে বলে তা হয় না বৌদি। কালীদাসী বলল, তার মানে পুরনো রাগটা শুধু আমি পুষে রাখিনি, তুমিও রেখেছো? নিকুঞ্জ বলল, খেয়ে নে ভাই। তারপর বলল—মা বলতেন মেয়েরা হচ্ছে অন্নপূর্ণার জাতি, ওদের অবজ্ঞা করতে নেই। তাহলে সারা জীবনেও তার দুঃখের দিন শেষ হবে না। প্রভাত বলল, বেশ তোমরা যখন এত করে বলছো তাহলে আর একটা কিছু আনো, তারপরে সমান তিন ভাগে ভাগ করো। একসঙ্গে খেয়ে নেওয়া যাবে। অন্নপূর্ণার জাতি তোমরা তোমাদের তো আর অবজ্ঞা করা যায় না। জিভে কামড় দিয়ে কালীদাসী বলল—ছিঃ ঠাকুরপো ছিঃ, দিনে দিনে এসব কি শিখছো বল তো? কেন অন্যায়টা কি বললাম? কালীদাসী বলল, ঘরের বৌ হয়ে বেটা মানুষের সাথে একসঙ্গে খাবো? না না তা আমি পারব না ঠাকুরপো। নিকুঞ্জ বলল, ঘরই নেই তার ঘরের বৌ? প্রভাত তো অন্যায় কিছু বলেনি। কালীদাসী বলল, ন্যায়-অন্যায় থাক। তোমরা খেয়ে নাও। ঘরে তো এখনো কিছুটা চাল আছে, কম যদি পড়ে আমি না হয় পরে ফুটিয়ে খাব। প্রভাত বলল, তাহলে আগে ফোটাও তারপর না হয় খাওয়া যাবে। উত্তরে কালীদাসী বলল— আমার মাথা খাও ঠাকুরপো, সামনে ভাত রেখে উঠ না। অগত্যা আবারও বসতে হয় তাকে।

আলুসিদ্ধ ভাত। খেতে আর কতক্ষণ। তবু অনেকক্ষণ ধরে তারিয়ে তারিয়ে খায় প্রভাত। কালীদাসী বলল—তারপর কি হল ঠাকুরপো? প্রভাত বলল—আমার কথা শুনে দাশুদা বলল, কথাটা তো ঠিক। সবাই যদি কাজ করতে চায় তাহলে কাজ দেওয়ার লোকও তো চাই। তারপর বলল, ধর যদি স্বাধীনভাবে কিছু করা যায়? যেমন? দাশুদাই বলল; ধর তোমায় যদি একটা রিকশার ব্যবস্থা করে দিই। আমি তো শুনে অবাক। শেষ পর্যন্ত দাশুদাই আমাকে রিকশাটা কিনে দেয়। এজন্য সে মহাজনের কাছ থেকে সুদে কর্জ নেয়। সুদটা একটু চড়া। কিন্তু বাজারে আমাকে কে কর্জ দেবে? দাশুদা বলল, দেখ, তুমি যদি খাটতে পার এই চড়া সুদটাকে তখন আর অতটা চড়া মনে হবে না। রোজ তোমাকে কিছু মূলধন আর সুদ শোধ করতে হবে মনে রেখ।

প্রথম মাসখানেক রাজমিস্ত্রির জোগাড় দিয়েছি। কিন্তু কঠোর পরিশ্রমে যে কয়টাকা পেতাম তাতে আর চলে না। একজনের বারান্দার একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি। ২০০ টাকা ভাড়া। সে টাকা জমাতে হবে। দুবেলা খাওয়া, টিফিন, কিছুতেই চলে না। এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন গিয়েছিলাম দাশুদার কাছে। দাশুদা সব শুনে বলে রিকশা চালাতে পার? বললাম—না, তবে শিখে নিতে পারবো। কিন্তু রিকশা কেনার টাকা কোথায়? দাশুদা বলল, আমি জোগাড় করে দেব, কিন্তু তোমাকে কথা দিতে হবে যে তুমি কথার খেলাপ করবে না।

তারপর সত্যি সত্যি সে রিকশাটা কিনে দিয়ে বলে, একটা কথা প্রভাত, ন্যায্য ভাড়া থেকে কখনো বেশি ভাড়া নেবে না। কোন সওয়ারের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না। অসুস্থ, বৃদ্ধ এবং বয়স্ক মহিলাদের কখনো না করবে না। আর সব সময় হাসিখুশি থাকবে, দেখবে তোমার সওয়ারের অভাব হবে না। একটু থেমে তারপরে বলে, দাশুদার কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবার চেষ্টা করেছি। আর সত্যি কথা বলতে কি আমার সওয়ারের কোন অভাব যেমন হয়নি, তেমনি গতকাল আমি, রিকশার জন্য যে টাকা কর্জ করতে হয়েছিল সুদে আসলে তা শোধ করতে পেরেছি। রিকশাটা এখন আমার। এ যে কি আনন্দ বৌদি তা তোমাকে বুঝাতে পারব না।

প্রভাতের এই আনন্দে অজান্তে শরিক হয়ে যায় কালীদাসীও। চোখ দুটি তার আনন্দে চিক চিক করতে থাকে। মনে মনে ভাবে প্রভাত যদি পারে তবে নিকুঞ্জই বা পারবে না কেন? একটু একলা হতে সে কথা বলতে, নিকুঞ্জ বলল—তুই ক্ষেপেছিস কালী? তারপর বলল, দেখ দাশু ওর মাসতুতো ভাই। দেশের বাড়িতে সম্পর্ক না থাকলেও এখানে কিন্তু ওদের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব নেই। এই শহরের অভিজ্ঞতায় দাশু যেমন বুঝেছে প্রভাতের পায়ের নীচে মাটি ফিরিয়ে দিতে পারলে আখেরে তারই লাভ। তার একটা যাওয়ার জায়গা হল, হাত শক্ত হল। এখন প্রভাতও কি পারবে তাকে অস্বীকার করতে? কিন্তু আমাকে কে টাকা দেবে? কালীদাসী দৃঢ় কণ্ঠে বলল—আমিই দেব। তুই দিবি মানে? তুই কোথায় পাবি এত টাকা? সে আমি যেভাবে পারি জোগাড় করবো, এবার তুমিই বল, তুমি পারবে কিনা। নিকুঞ্জ বলল, বেঁচে থাকার জন্য আরো কঠিন কাজ আমি করতে পারি কালী। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা। কি কথা? এত টাকা তুই কি ভাবে জোগাড় করবি?

কালীদাসী বলল, বিয়ের সময়ের দুলজোড়া আজও আমার কাছে আছে। খাঁটি সোনার আর বেশ ভারী। অনেক দুঃখেও হাতছাড়া করিনি। হাজার হোক বাবা তার শেষ সম্বল জমিটুকু বিক্রি করে এই দুলজোড়া দিয়েছিলেন। বিয়ে বলে কথা। মেয়েকে একটাও সোনার জিনিস দেবে না? তার কথা কেড়ে নিয়ে নিকুঞ্জ

বলল—এর আগে তুই কিন্তু বলেছিলি ওটা বিয়ের সময়ে তোর এক বৌদি নতুন বিয়ের কনেকে পরতে দিয়েছিলেন, অষ্টমঙ্গলায় তোর সেই বৌদিকে কথা দিয়েছিলি আজ ফেরত দিলে অনেক কথা উঠবে। তোমাকে আমি লুকিয়ে এর পরের বার যখন আসবো ফেরত দিয়ে যাবো এবং তা তুই ফেরতও দিয়েছিস। কিন্তু একথা তো আগে বলিসনি! না বলিনি। কারণ বাবার শেষ সম্বল ছিল যেমন একটুকরো জমি, আমারও শেষ সম্বল ঐ এক জোড়া খাঁটি সোনার দুল। আর এর জন্য তোমার মায়ের কাছে আমায় কম গঞ্জনা সহ্য করতে হয়নি। উনি আমার গায়ে হাত তুলতেও বাকি রাখেনি।

নিকুঞ্জ তার মায়ের কথা উঠতে বলল, থাক না ওসব পুরনো কথা কালী! সেদিন তো কেবল মায়ের দোষ ছিল না, আমিও তো তোকে কম গঞ্জনা দিইনি। তাকে বাধা দিয়ে কালীদাসী বলল—তুমি সোয়ামী, তুমি আমায় মারধর সব মেনে নেবো। কিন্তু মায়ের মতো শাশুড়ি গায়ে হাত তুলবে? চ্যালা কাঠ দিয়ে মারবে, গরম খুন্তির ছ্যাঁকা দেবে? বলতে বলতে কেঁদে ফেলে কালীদাসী। নিকুঞ্জ যে কি সান্ত্বনা দেবে বুঝতে পারে না। মায়ের এই অত্যাচারে সেদিন যে তারও সমর্থন ছিল। সে শুধু বলল, সব দোষ আমার কালী, সব দোষ আমার। এখন বুঝতে পারছি সেদিন তোর উপর ঘোর অবিচার করা হয়েছিল। তুই আমায় শাস্তি দে কালী. এই কথা বলে তার পা ধরতে গেলে চার পা পিছিয়ে গিয়ে বলল, এ তুমি কি করছো? আমার পাপের বোঝা বাড়াচ্ছ কেন? তারপর বলল, তোমার কোন দোষ নেই। আমি তো বৌ হয়েও সোয়ামীর কাছে মিথ্যে বলেছিলাম। জানি এর জন্যে আমার নরকেও ঠাঁই হবে না। আমি ঐ মিথ্যে পাপের বোঝা আর বইতে পারছি না। তাই তো বলছি ওই দুলজোড়া বিক্রি করে তুমি একটা রিকশা কেন। হবে না? কিন্তু কালী, ওটা যে তোর শেষ সম্বল, যক্ষের মতো আগলে রেখেছিস? আজ কি ওটা বিক্রি না করলে নয়?

কালীদাসী বলল, মানুষ সোনাদানা করে কেন? বিপদে কাজে লাগবে বলে তো? এবার বল তো আজকের মতো এতবড় বিপদেও তা কাজে না লাগালে আমার মরা বাপ কি আমায় ক্ষমা করবে? ওকথা বলিসনে কালী, তোর বাপ মানে আমার শ্বশুরমশায় বড় ভাল লোক ছিলেন রে? তাই তো তোকে এক জোড়া ভারী দুল বিয়েতে দিয়েছিলেন। তিনি স্বগগে গেছেন। তার কথা থাক কালী, কিন্তু দুলজোড়া যে বিক্রি করবি, কিভাবে? কেন তুমি স্যাকরার কাছে নিয়ে যাবে। দুই চারজন স্যাকরার সঙ্গে দরদাম করবে। তারপরে বিক্রি করে দেবে যেখানে বেশি দাম পাবে। নিকুঞ্জ বলল—নারে কালী আমার দ্বারা তা হবে না। কেন? ওরা ভাববে এত খাঁটি আর ভারী সোনার দুল আমি কোথায় পেলাম? আমার বৌয়ের বললেও বিশ্বাস করতে চাইবে না। হয়তো পুলিশে দেবে! কালিদাসী প্রতিবাদ করে

বলল, কেন পুলিশে দেবে কেন? আমার নিজের জিনিস বললেও বিশ্বাস করবে না? না করবে না। ওরা যে সব ভদ্রলোক। ওদের মতে আমাদের মতো গোমুখ্যু ছোটলোকদের ঘরে ওসব দামী জিনিস থাকতে পারে না। শুধু কি তাই? এই কয় মাসে শহর সম্পর্কে আমার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি জানি ওরা আমাদের চোর-ছ্যাঁচ্চড়া ছাড়া অন্য কিছুভাবে না। উত্তরে কালীদাসী বলল—কিন্তু ঠাকুরপো তো বলল, এই শহরটা যেমন বড়, এখানকার মানুষের মনটাও বড়। সে তো ওই দাশুকে দেখে। দাশু তো আর আমাদের মতো নয়। অনেক দিন শহরে আছে। লেখাপড়াও জানে। ভদ্রলোকদের সঙ্গে ওঠাবসা করে। ওকে চোর-ছ্যাঁচড় ভাবা যে অসম্ভব। কালীদাসী বলল, তাহলে তুমি একবার দাশুর সঙ্গেই দেখা কর। ওকে সব কথা খুলে বল। ও নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করে দেবে। কথাটা মন্দ বলিসনি বলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে নিকুঞ্জ।

২

প্রভাত ভাবেনি অন্য রিকশাওয়ালাদের কাছে তাকে মার খেতে হবে। সবাই এককাট্টা হলে ও আর কি করবে? তার অপরাধ এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ডেকে তার রিকশায় তোলা। খালঘাট রিকশাস্ট্যান্ডের ও-ও একজন সদস্য। শুধু সদস্যই নয়, সে এই স্ট্যান্ডের রিকশাওয়ালা ইউনিয়নের সেক্রেটারিও। ইউনিয়ন থেকে এখানে একটা ভাড়ার চার্ট টাঙানো আছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক ভাড়া জানতে চাইলে প্রথমে যে লাইনে আছে সে বলল, কুড়ি টাকা। ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, চার্টে তো আছে দশ টাকা। তাহলে তুমি কুড়ি টাকা চাইছো কেন? রিকশাওয়ালা বলল, দেখছেন না বৃষ্টি হচ্ছে। তা তো দেখতেই পাচ্ছি। তুমি বলতে পারতে যাবো না। কিন্তু তুমি বেশি চাইলে কেন? বেশি চেয়েছি বেশ করেছি। যদি বেশি টাকা দিতে রাজি থাকেন রিকশায় উঠুন। না হলে হেঁটে যান। ভদ্রলোক বললেন হেঁটে যাবো, না আদৌ যাব না, সেটা আমি ভাবব। হ্যাঁ তাই ভাবুন। ভদ্রলোকের স্ত্রী সঙ্গে ছিলেন, তিনি বললেন, ঝগড়া করছো কেন? ওর রিকশা ছাড়া তো আরো রিকশা আছে। হ্যাঁ তা আছে, দেখি ওরা কি বলে? তারপর একে একে প্রায় সব রিকশাওয়ালাকে ভাড়া জিজ্ঞেস করলে তারা এক একজন এক এক রকম বলল। ২০/২৫/৩০ এর নীচে কেউ যেতে রাজি নয়। ভদ্রলোক মনে মনে গজরাতে থাকেন। এদের একটা নির্দিষ্ট ভাড়ার চার্ট আছে, তবু এরা সুযোগ বুঝে ঘাড় ভাঙার জন্য ঘসে আছে। শাসন করার কেউ নেই। সব মাথায় চড়ে বসেছে। দিনে দিনে দেশটা যে রসাতলে যেতে বসেছে সেদিকে কারো খেয়াল নেই। ভদ্রমহিলা বললেন, কি আর করবে? চল বরং হেঁটেই যাই। ভিজে তো এমনিতেই গেছি।

আর একটু নয় বেশি ভিজবো। প্রভাত ছিল লাইনের একেবারে শেষে। সে এগিয়ে এসে বলল—আপনারা কোথায় যাবেন মাসিমা? ভদ্রলোক নির্দিষ্ট জায়গার কথা বললে, প্রভাত বলল, আসুন। আসবো তো বাবা, কিন্তু তুমি আবার কত ভাড়া নেবে? প্রভাত হেসে বলল, কত আর নেবো? যা ভাড়া আছে তাই দেবেন। আহা একেবারে যে ভিজে গেছেন। উঠুন উঠুন মাসিমা। তাঁরা উঠলে প্রভাত রিকশায় গোটানো প্লাস্টিকটা ভাল করে নামিয়ে দেয়, যাতে বর্ষায় না ভেজেন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা। যখন অন্য রিকশাওয়ালাদের পাশ কাটিয়ে চলে যায় প্রভাতের রিকশা, শরৎ বলে কাজটি কিন্তু তুই ভাল করলি না প্রভাত? ফিরে আয় দেখাচ্ছি মজা। প্রভাত বলল, আগে তো ফিরে আসি। কি করবি ফিরে এসে? বোঝাপড়া করবি? যদি করতে হয় তাই করবো। বেশ ফিরে আয়। আমাদেরও তোর সঙ্গে বোঝাপড়া হবে। আচ্ছা সে দেখা যাবে বলে প্রভাত দ্রুত রিকশা চালিয়ে বেরিয়ে যায়।

বেশি পথ নয়। কিন্তু রাস্তায় মাঝে মাঝে এমন জল জমে আছে যে খুব সাবধানে রিকশা চালাতে হচ্ছে তাকে। ভদ্রলোক জানতে চান তুমি কোথায় থাকো বাবা? এই কাছেই। কথায় কথায় আলাপ জমে ওঠে। প্রভাত বলে ওদের হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি মেসোমশাই। ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, সে কি? তুমি কেন ক্ষমা চাইবে? তুমি তো কোন অন্যায় করনি। তা অবশ্য একদিক দিয়ে ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আমি এই স্ট্যান্ডের সেক্রেটারি। ইউনিয়নকে ওরা সবাই কথা দিয়েছে নির্ধারিত ভাড়ার বেশি কেউ ভাড়া নেবে না। আজ না হয় বৃষ্টির দিন, কিন্তু অন্য দিনেও প্যাসেঞ্জারদের ওরা হয়রানি করে। বেশি ভাড়া নেয়, আমি সেক্রেটারি হিসাবে তাদের কোনভাবে বাগে আনতে পারিনি। তাই এই অন্যায়ের ভাগ তো আমাকেও নিতে হবে, তাই না? ছেলেটিকে ভীষণ ভাল লেগে যায় ভদ্রলোকের। নামার সময় পাঁচ টাকা বেশি দিতে গেলে প্রভাত বলে, তা হয় না মেসোমশাই। আপনারা গুরুজন ব্যক্তি। আশীর্বাদ করুন যেন জীবনে কোন অন্যায় না করি। ভদ্রলোক মুগ্ধ হয়ে যান তার অমায়িক ব্যবহারে। একটা ভিজিটিং কার্ড তাকে ধরিয়ে দিয়ে বলেন, কোন প্রয়োজন হলে আমার সঙ্গে কার্ডে দেওয়া ঠিকানায় গিয়ে দেখা করো, অথবা ফোন করো। কোন রকম লজ্জা করো না কিন্তু।

শরৎ এদিকে ঘোঁট পাকায়। না এর একটা বিহিত করতে হবে। পল্টু বলে, কি বিহিত করবি? ও তো কোন অন্যায় করেনি। বরং আমরা কথার খেলাপ করেছি, ভদ্রলোকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি, বেশি ভাড়া চেয়েছি। তাছাড়া ও এই স্ট্যান্ডের সেক্রেটারি। ইউনিয়নের নেতারা তো ওর কথারই গুরুত্ব দেবে। উপর মহলের অনেকের সঙ্গে ওর পরিচয়ও আছে। বিহিত করবো বললে তো আর করা যায় না। উত্তরে শরৎ বলল, তাহলে কি ওইই বরাবর জিতে যাবে? আমরা এ লাইনে কত বছর হয়ে গেল বল তো রিকশা চালাই? ও তো সেখানে একেবারে

শিশু। পল্টু বলল, তা অবশ্য ঠিক কথা। আবার এটাও তো মানবি ওর জন্যেই এ রিকশাস্ট্যান্ড করা সম্ভব হয়েছে। রাজনীতির দাদা দিদিদের সঙ্গে ওর যোগাযোগটা একবার বোঝার চেষ্টা কর। সব মানছি, তাই বলে আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে একা খাবে সেটা তো হতে পারে না? সন্তু বলল—তোর প্ল্যান কি বল তো শরৎ? শরৎ বলল—আক্রমণ। আক্রমণ? সেটা আবার কি?

শরৎ বলল, এই সোজা ব্যাপারটা বুঝলি না? ও সেক্রেটারি থাকলে আমাদের কোন মত চলবে না। তাই ওর প্রতি অনাস্থা আনতে হবে। রমেন বলল, সে তো সময়সাপেক্ষ। তাহলে তুই কি করতে চাস? ওকে কোন সুযোগ না দিয়ে আঘাত হানা। যাকে বলে অরক্ষিত অবস্থায় আক্রমণ। মেরে ওর হাত- পা ভেঙে দেওয়া দরকার। তারপর নিজেদের কারো সেক্রেটারি হওয়া। শরৎ প্রস্তাবটা লুফে নিয়ে বলল, কথাটা মন্দ বলিসনি। তাহলে তো সে কাজটা আজই করা যায়। তোরা রাজি তো? সবাই একবাক্যে বলল, রাজী। শুধু পল্টু বলল, কাজটা কি ভাল হবে? শরৎ বলল, তোর যদি এত ভয়, তাহলে এখান থেকে পালা! আমি চাই আজই এর একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক।

প্রভাতের মনে তখন অন্য চিন্তা। সাধারণ মানুষের অভিযোগ এত বেড়ে চলেছে যে ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে কথা বলা দরকার। ইউনিয়নকে সে স্পষ্ট বলবে, আমি এদের ভাড়ার ব্যাপারে বাগে আনতে পারিনি তাই আমাকে দায়িত্ব থেকে রেহাই দেওয়া হোক। তার তো জানার কথা নয় যে রঙ্গমঞ্চে তখন অন্য অঙ্ক অভিনীত হচ্ছে। সবে মাত্র রিকশাটা স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়িয়েছে, সবাই তাকে ঘিরে ধরে। প্রভাত বলে, কি ব্যাপার তোরা এভাবে ঘিরে দাঁড়িয়েছিস কেন? কিন্তু কে উত্তর দেবে। প্রথমেই মুষ্ঠিবদ্ধ হাত এগিয়ে নিয়ে এসে শরৎ তার চোয়ালে এক প্রচণ্ড ঘুষি মেরে বলে, শালা সেক্রেটারি হয়েছিস শুধু নিজের স্বার্থ বোঝার জন্য? মার শালাকে। ওর ভাল মানুষী মুখটায় রক্তের বাণ ছুটিয়ে দে তো। শালা বলে কিনা ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে। এইবার দেখ কে কার সঙ্গে বোঝাপড়া করে। শরৎ আবারও একটা আঘাত করে। অন্যেরাই বা বসে থাকে কেন? তারাও এই বৃষ্টিভেজা দিনে হাতের সুখ মেটায়। সন্তু বলল, আর নারে, একেবারে মরে গেলে কিন্তু আমরা সকলে বিপদে পড়বো। কথাটায় টনক নড়ে শরতের। মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে প্রভাত। এমন অতর্কিত আক্রমণে প্রতিরোধ করারও অবকাশ পায়নি সে। শরৎ তার নাকে হাত দিয়ে দেখে, না নিঃশ্বাস পড়ছে। সে তখন সকলকে উদ্দেশ করে বলে, থাক শালা এখানে। তোরা সবাই চল এখান থেকে। বিপদের গন্ধ পেয়ে যে যার রিকশা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

আবারও জোরে বৃষ্টি নামে। বৃষ্টিতে ধুয়ে যায় তার নাক মুখের রক্ত। সামান্য জ্ঞান ফিরে আসে তার। উঠবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। চোখে কেমন ঝাপসা

দেখতে থাকে। দুটি অল্পবয়েসি ছেলেমেয়ে একই ছাতার নিচে আধভেজা হয়ে আসে স্ট্যান্ডে। কিন্তু কোন রিকশা নেই। একটা রিকশা আছে বটে, কিন্তু রিকশাওয়ালাকে তো দেখা যাচ্ছে না। কাছে এগিয়ে এসে দেখে একটা মানুষ শুয়ে শুয়ে বর্ষায় ভিজছে। শখ মন্দ নয় বলে মেয়েটি হাসে। ছেলেটি বলে আমরাও তো ভিজতে পারি। উত্তরে মেয়েটি বলে, এতই যখন শখ তখন ভেজ না! তুইও চল। কি আব্দার? ছেলেটি বলল, সত্যি কথাটা বল না। মনে মনে তোরও ভিজতে ইচ্ছে হচ্ছে। অপাঙ্গে তাকায় মেয়েটি ছেলেটির দিকে। ছেলেটি হঠাৎ বলে, আচ্ছা লোকটা কি সত্যি ভিজছে? না কেউ মেরে ফেলে রেখে গেছে? কথাটা বুকে বাজে মেয়েটির। বলে—রিণ্টু, মনে হচ্ছে তোর কথাই ঠিক হবে। চল এগিয়ে দেখা যাক না। না থাক পিয়াশা, পুলিশের ঝামেলা হতে পারে। রিণ্টুর কথা শুনে পিয়াশা ক্ষোভে ফেটে প'ড়ে, বলে পুলিশের ঝামেলা হবে বলে আমরা এড়িয়ে যাবো? এখনো তো প্রাণে বেঁচে থাকতে পারে? থাকলে থাকবে। আমরা কি করবো? তুই এত স্বার্থপর রিণ্টু? দেখ জ্ঞান দিস না পিয়াশা, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে পিয়াশা। বলে, তাহলে তুই সেই বাপের নাম জপ করতে করতে বাড়ি চলে যা। আমি দেখি লোকটি বেঁচে আছে কি না? বেঁচে থাকলে কি করবি? কি আর করবো কাছাকাছি কোন নার্সিংহোমে বা হাসপাতালে নিয়ে যাবো। আগে তো তাকে বাঁচাতে হবে। বিরক্তির সঙ্গে রিণ্টু বলল, তোর যা ইচ্ছে তাই কর। আমি চললাম।

সত্যি সত্যি চলে যায় রিণ্টু তাকে একা ফেলে। রাস্তায় জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। এই ঝড়-বাদলের দিনে কেইবা আর বেরুবে। হাতঘড়িটা ভিজে টইটম্বুর। তবু অতি কষ্টে সময়টা দেখার চেষ্টা করে পিয়াশা। না এখনো সন্ধ্যা হতে দেরি আছে। সবেমাত্র ৪—১৫মিনিট। এমন জোরে জল ঝরছে যে কাছের মানুষকেও দেখা যাচ্ছে না। রিণ্টুটা সঙ্গে থাকলে ভাল হ'ত। কিন্তু কি আর করা যাবে? এতটা স্বার্থপর যে ও হতে পারে ভাবতে পারেনি সে। কাছে গিয়ে বলে, ও দাদা কি হয়েছে আপনার? শরীর খারাপ? চোখ মেলে তাকায় প্রভাত। সামনে এক বর্ষা-ভেজা সুন্দরী মেয়েকে দেখে লজ্জায় আবারও চোখ বন্ধ করে সে। পিয়াশা বলে, কি হল দাদা? শরীর খুব খারাপ? থাকেন কোথায়? প্রভাত চোখ বন্ধ করে বলে কাছেই। আমি পৌঁছিয়ে দেব? না না দরকার নেই। আমি চলে যেতে পারব। এমনভাবে কথাগুলো বলে যেন মৃত্যুযাত্রীর কণ্ঠস্বর। পিয়াশা বলে, বলছেন তো চলে যেতে পারবেন, কিন্তু দেখে তো মনে হচ্ছে না। তারপর বলল, আমায় ধরে উঠতে পারবেন?

এত কষ্টের মধ্যেও মনে মনে আশ্চর্য হয়ে ভাবে প্রভাত, এ তো সাংঘাতিক মেয়ে। ভয়ডর বলে কিছু নেই? উত্তরে প্রভাত বলে, আপনি চলে যান দিদি।

দেখছেন না বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ নেই। যাবো তো বটেই। কিন্তু আপনাকে এ অবস্থায় রেখে যাই কি করে বলুন তো? তারপর ফাঁকা রিকশাটাকে লক্ষ্য করে বলে, রিকশাওয়ালাই বা কোথায় গেল কে জানে? রিকশাটা তো ওখানে পড়ে আছে অনেকক্ষণ। প্রভাত কোনভাবে বলে, ওটা আমার রিকশা। পিয়াশা বলে, তাহলে আর চিন্তা কি? আমাকে ধরে উঠুন তো; আমিই আপনাকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেব। প্রভাত অবাক হয়ে বলে আপনি?

কেন নয়? আমি মেয়ে মানুষ বলে? না ঠিক তা নয়। ওঃ আপনি ভয় পাচ্ছেন আমি চালাতে পারব কি না? তারপরে বলল, চিন্তা করবেন না, আমি তো সাইকেল চালাই, রিকশা চালাতে পারব না? তারপর ধমক দিয়ে বলল, নিন উঠুন তো, বলে নীচু হয়ে বসে পিয়াশা। প্রভাত কিন্তু ওঠার কোন চেষ্টাই করে না। পিয়াশা তখন তাকে ধরে তুলতে যায়। প্রভাত বাধা দিয়ে বলে, আমি নিজেই উঠছি। চেষ্টাও করে। কিন্তু সারা গায়ে এত ব্যথা যে, কিছুতেই সে উঠতে পারে না। পিয়াশা তখন তার কোন বাধাকে গ্রাহ্য না করে দু'হাত দিয়ে তাকে তুলে বসায়। কিন্তু একি! শরীরের বিভিন্ন অংশে যে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ? বলল, কেউ মেরেছে আপনাকে? প্রভাত চুপ করে থাকে। পিয়াশা বলে, চুপ করে থাকলে কি মারের ব্যথা কমবে? তার জন্য শুশ্রূষা দরকার। লজ্জা করবেন না দাদা। আমাকে ধরে ঐ রিকশায় গিয়ে বসতে হবে।

প্রভাতের মনে হয় স্বর্গের কোন দেবী যেন নেমে এসেছে তাকে আশ্বস্ত করতে। পিয়াশাকে ধরে কোনভাবে রিকশায় গিয়ে বসে। আর এই আশ্চর্য মেয়েটি সত্যি সত্যি রিকশার পাদানিতে পা রাখে। রিকশা এগিয়ে চলে। বড় রাস্তায় পড়তে পিয়াশা জানতে চায় কোনদিকে যাব দাদা? বৃষ্টির ঝাপসায় কিছুই দেখতে পায় না প্রভাত। বলে ঠিক চিনতে পারছি না দিদি। চারদিকে এত অন্ধকার যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পিয়াশা রিকশাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলে। নিজেদের বাড়িতে এসে রিকশাটা থামায় সে। বলে, এবার যে নামতে হবে দাদা? প্রভাত বলে, এটা তো আমার বাড়ি নয়। কোন ভয় নেই আপনার। একটু সুস্থ হলেই আপনাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেব। কিন্তু আপনার পরিচয়? আমি পিয়াশা খাতুন। বাবার নাম শেখ আখতার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় বাবা মুক্তি যুদ্ধবাহিনীতে নাম লেখান। আমি তখন কোথায়? বাবা বিয়েই করেননি। তারপর তো একসময় মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়। বাবা কিন্তু আর বাংলাদেশে ফেরেননি। এদেশেই রয়ে যান।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এক মধ্যবয়সী মহিলা। পিয়াশা বলেন, আমার মা। মহিলা জানতে চান ছেলেটি কে? আর রিকশাটাই বা কার? রিকশাওয়ালা কোথায়? উত্তরে পিয়াশা বলে, বলছি মা। আগে তো ওনাকে ধরাধরি করে নিয়ে চল। তারপর বলছি। মহিলা খানিকটা উষ্মার সঙ্গে বলে, কি যে করে বেড়াচ্ছিস?

কারো কথা শুনিস না। বলি এখনো কি সেই ছোট্টটি আছিস? পিয়াশা তার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলে আমি তো ছোট্টই আছি। তুমি শুধু দেখ আমি বড় হয়ে গেছি। তারপর মায়ের গলা ছেড়ে বলল, আঃ মা একটু ধরো না? মহিলা বললেন, তুই ওকে কোথায় পেলি আগে বল, তারপর ধরবো। আঃ মা, শুধু শুধু ঝামেলা কর। আব্বু কোথায়? আব্বু? রীনা বললেন, তোর বাবা এখনো ফেরেনি? কেন তাকে কি দরকার? দরকার তো ছিল না, কিন্তু তোমার অসহযোগিতা দেখে মনে হচ্ছে আব্বুকেই দরকার। রীনা হেসে বললেন, আচ্ছা হয়েছে হয়েছে, আর অসহযোগিতা করব না। এখন বলত কিসের সহযোগিতা চাস? পিয়াশা বলল, ও একজন রিকশাওয়ালা। কারা যেন ওকে বেদম মেরে রিকশাস্ট্যান্ডে ফেলে রেখে গেছে। আমি রিকশার খোঁজেই ওখানে গিয়েছিলাম। একটা রিকশা আছে কিন্তু রিকশাওয়ালা নেই। পরে জানলাম এ রিকশাটা ওরই। তাই সোজা বাড়ি নিয়ে এলাম। এখন আমার ছুটি। মা হাসিমুখে বললেন, ছুটি মানে? এখন তোর রুগীকে কে সামলাবে? তুমি। আমি? তারপর বললেন, আমার তো কাজ নেই? কাজ থাকবে না কেন? তারপর বলল, আব্বু যদি সব কাজ করেও মুক্তিযুদ্ধ সামলাতে পারেন, তুমি এই সামান্য কাজটা সামলাতে পারবে না? আচ্ছা হয়েছে হয়েছে আর বাপের সুখ্যাতি গাইতে হবে না। এবার ধরে ওকে ঘরে নিয়ে চল।

সুন্দর খাট, সুন্দর বিছানা। ভেজা জামাপ্যান্ট ছেড়ে নতুন পাজামা-পাঞ্জাবি গায়ে। প্রভাতের চোখ ফেটে জল আসে। এসব এরা কেন করছেন? সে কি এসবের যোগ্য? রীনা তার আঘাতের চিহ্নে ওষুধ লাগাতে লাগাতে বলেন, যারা এভাবে মেরেছে তারা কি মানুষ না পশু? পিয়াশা বলল, একটু ভুল হল আম্মিজান, তোমার বলা উচিত ছিল ওরা কি পশু না মানুষ? আব্বু বোধহয় তোমাকে বলেননি যে মানুষের চেয়ে হিংস্র আর কোন জন্তু নেই। প্রভাত অবাক হয়ে দেখে তাদের মা-মেয়ের সম্পর্ক। এরা সব লেখাপড়া জানা মানুষ। আহা তার মা যদি একটু লেখাপড়া জানতেন, আর সেও লেখাপড়া শিখতো তাহলে তাদের মা-ছেলের সম্পর্কও এমন সুন্দর হতে পারতো।

রীনা বললেন, তোমার নাম কি বাবা? প্রভাত, প্রভাত বিশ্বাস। তোমার বাড়ি কোথায়? বর্ধমান জেলার পটেশ্বরী গাঁ। কিন্তু এখন আর ওখানে থাকি না। খালঘাটে একজনের বাড়িতে ভাড়া থাকি। বাড়িতে আর কে কে আছেন? আমি আর মা।

সন্ধ্যার পর ফেরেন শেখ আখতার। তাকে দেখে প্রভাতের মনে হয় আরে একে তো আমি চিনি। আমার রিকশায় প্রায়ই সওয়ার হন। খুশি হয়ে মাঝে মাঝে বকশিসও দেন। আমার নামধাম সবই জানেন। একদিন বলেওছিলেন, তোমার বাড়িতে একদিন যাব প্রভাত। অবশ্যি যাননি কখনো। বড়লোকের খেয়াল। বলতে

হয় তাই বলা। মনে মনে উচ্চারণ করে প্রভাত। শেখ আখতার ঘরের ভিতর আসেন। মেয়ের মুখে সব শুনে দেখতে আসেন প্রভাতকে। দেখেই চমকে ওঠেন শেখ আখতার। বলেন কারা এভাবে মারল তোমাকে প্রভাত? উত্তরে বলল, ঠিক বুঝতে পারিনি বাবু? কেন মারল সেটা কি বুঝতে পেরেছো? না বাবু, বর্ষায় কিছু মালুম হয়নি। পিয়াশাকে বললেন, একে এখানে এনেছিস কেন? তাহলে কোথায় নিয়ে যেতাম? বলল পিয়াশা। কেন হাসপাতাল নার্সিংহোমে কোথাও তো নিয়ে যেতে পারতিস? একে তো আগে ডাক্তার দেখানো দরকার।

প্রভাত বলল, না বাবু তার কোন প্রয়োজন নেই। আর একটু বর্ষা কমলেই আমি চলে যেতে পারব। পিয়াশা তার আব্বুর কথার উত্তরে বলল, ডাক্তার তো তুমি বাড়িতেও ডাকতে পার। হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে নিয়ে গেলে পুলিশি ঝামেলায় পড়তে হত।

শেখ আখতার বললেন, তা অবশ্য ঠিক বলেছিস। তাছাড়া পুলিশ তো টাকা ছাড়া এক পাও নড়বে না উল্টে সহজ ব্যাপারটাকে জটিল করে তুলবে। কথা বলতে বলতে তিনি ফোনে ডাক্তারকে ধরেন। ডাঃ রঞ্জন সেন ফোন পেয়েই ছুটে আসেন বৃষ্টি মাথায় নিয়ে। পরীক্ষা করেন। তারপর প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে উঠে দাঁড়ান। আখতার সাহেব বললেন, কেমন বুঝছেন? ঠিক আছে। কয়েকদিন ব্যথাটা থাকবে। তবে ভয়ের কিছু নেই। শেখ আখতার ডাক্তারের আশ্বাসে নিশ্চিত হয়ে বেরিয়ে যান ওষুধ কিনতে।

৩

কয়েকদিন একনাগাড়ে বৃষ্টি এবং মেয়েটার শরীর খারাপের জন্যে কালীদাসী কাজে যেতে না পারায় তার কাজটা চলে যায়। ঘরে খাবার নেই, নিজের সামান্য অন্যের বাড়ি ঠিকে ঝি-এর কাজটাও নেই। নিকুঞ্জেরও সবদিন কাজ হয় না। সংসার চলতে চায় না। সেই সময় প্রভাতের চেষ্টায় কালীদাসী আবারও কয়েকটা কাজ জোগাড় করে নেয়। ঠিকে ঝি-এর কাজ। তিন বাড়িতে সকাল-বিকাল বাসনমাজা ঘরমোছার কাজ। মাস মাহিনা ৮০০/৭০০ এবং ৬০০ টাকায়। দু বেলায় তিন বাড়িতে যা টিফিন হিসাবে পায়, তার কিছুটা অংশ ব্যাগে করে নিয়ে আসে বাড়িতে। বিকেলের খাওয়াটা হয়ে যায়। কিন্তু টাকা পাবে তো সেই মাসের প্রথমে। এই একটা মাস কিভাবে চলবে বুঝতে পারে না নিকুঞ্জ। তার মুনীশের কাজ রোজ হয় না। মেয়েটার দুধের দরকার। সোনার দুলজোড়া নিয়ে নিকুঞ্জ গিয়েছিল দাশুর কাছে। দাশু বলেছে, বৌদির বিয়ের একমাত্র স্মৃতি। বিক্রি করে দেবে নিকুঞ্জদা? কষ্ট হবে না? তাহলে তুমি কি করতে বল? জানতে চায় নিকুঞ্জ।

দাশু বলল, দেখি প্রভাতের মতো কিছু একটা করে দিতে পারি কিনা? কিন্তু এখনি তো আর পারব না। তুমি বরং আগামী মাসের প্রথম দিনে এসো।

কালীদাসী আর কোন কথা বলেনি নিকুঞ্জকে। ঝোঁকের মাথায় দুলজোড়া বিক্রি করার কথা বলেছিল বটে, কিন্তু পরে বুকের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল। মেয়েটাতো একদিন বড় হবে। সোনার দাম দিনে দিনে যেভাবে বাড়ছে, তাতে মেয়ের বিয়েতে সোনার জিনিস দিতে পারবে বলে মনে হয় না। তখন এই দুলজোড়াই কাজে লাগবে। তাই নিকুঞ্জ যখন দুলজোড়া ফেরত দিয়ে দাশুর কথা বলল, মনে খুব আনন্দ হলেও কালীদাসী তা প্রকাশ না করে বলল, তার মানে ভগবান চান না আমাদের দুঃখের দিন তাড়াতাড়ি শেষ হয়। খেয়ে না খেয়ে দিনগুলো কেটে যায় কালীদাসীর। প্রভাত অবশ্য মেয়েটার দুধটা কিনে দিয়ে যায়। এখন আর কালীদাসী না করতে পারে না। আর মাত্র ক'দিন পরেই সে মাইনে পাবে। হাতে আসবে কড়কড়ে ২১০০ টাকা। এতটাকা একসঙ্গে সে জীবনে দেখেনি। মনে মনে ঠিক করে আরো ৩/৪টে মাস সে কষ্টেসৃষ্টে চালিয়ে দেবে। তারপর নিজেদের টাকায় সে একটা রিকশা কিনবে। রিকশা চালিয়ে নিকুঞ্জ যা পাবে তাই দিয়ে সে সংসার চালাবে। নিজের টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখবে। একটা বছর এভাবে চালাতে পারলে এই খালপাড়ের যেখানে তারা আছে সেখানেই একটা টালির ঘর বানাবে। নিজের ঘর। মনের মতো করে সাজাবে তাকে। মেয়েকে স্কুলে পাঠাবে। ব্যাগ কাঁধে নিয়ে মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে, আঃ কি আনন্দ। কিন্তু তার এই মগ্ন স্বপ্নটা ভেঙে যায় নিকুঞ্জ এসে যখন বলে, একটা দুঃসংবাদ আছে কালী। দুঃসংবাদ? কিসের দুঃসংবাদ। খুবই খারাপ সংবাদ। তারপরে বলে, প্রভাতকে কারা যেন বেদম মেরেছে। আজ প্রায় দিন সাতেক হয়ে গেল বাড়িতে শুয়ে আছে। খালঘাটের স্ট্যান্ডে অন্য রিকশাওয়ালাদের কাছে শুনে আজ তাকে দেখতে গিয়েছিলাম। বুকটা ছাঁৎ করে ওঠে কালীদাসীর। প্রভাতকে কারা যেন বেদম মেরেছে। কিন্তু কেন? ও তো খুব ভাল ছেলে। কারো সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার ছেলে তো ও নয়! গ্রামগঞ্জে গোঁয়ার-গোবিন্দ বলে যত দুর্নামই থাকুক এখানে সে অন্য মানুষ। তাহলে ওকে মারবে কেন? নিকুঞ্জ বলল, গরিবের আবার ভাল আর খারাপ? বুঝলি কালী গরিব ভাল ব্যবহার করুক এটা ওদের পছন্দ নয়। গরিব গরিবের মতো ব্যবহার করবে তাতেই ওদের আনন্দ। তারপর বলল—জানিস তো ও বার বার তোর কথা জানতে চাইছিল। বলছিল, এ সপ্তাহে মেয়েটার দুধটাও কিনে দিতে পারল না। কি যে অসহায় লাগছিল তাকে। তারপর বলল, একবার যাবি নাকি দেখতে?

কালীদাসী একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে তুমি হয়তো ঠিকই বলেছো গরিব ভাল

মানুষেরা ভদ্রলোকের মতো ব্যবহার করুক তা ওরা চায় না। ওরা চায় গরিব গরিবই থাক। একটু ভাল থাকার স্বপ্নকে ওরা স্পর্ধা বলে মনে করে। তারপর বলল, একবার তো অবশ্যই যাওয়া দরকার। কিন্তু কখন যাই বলত? সন্ধ্যার পরে কাজ থেকে ফিরে আজই চল না! উত্তরে কালীদাসী বলল, আজ আর হবে না। কাল বরং চল। আজ সব বাড়িতে বলে রাখবো একটুখানি তাড়াতাড়ি যাবো কিন্তু কাল।

একটু তাড়াতাড়ি ফিরে নিকুঞ্জ ও কালীদাসী সন্ধ্যার একটু আগে পৌঁছিয়ে যায় খালঘাট পাড়ায়। এখানে কোন প্লাস্টিক ছাউনির ঘরবাড়ি নেই। সবই টালির ঘর আর মুলিবাঁশের বেড়া। বিভিন্ন জায়গার লোক এখানে পাশাপাশি বাস করে। বেশির ভাগ লোকেরই পূর্বনিবাস অধুনা বাংলাদেশ। পাশাপাশি আছে বর্ধমান/নদিয়া ও বনগাঁর লোক। বেশ কিছু মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকও আছে। পূর্বনিবাস জানতে চাইলে মুখে যদিও তারা এই বাংলার কোন জেলার নাম করে, আসলে তারা বাংলাদেশেরই লোক। খাদ্যের সন্ধ্যান একদিন তারা বেরিয়ে পড়েছিল। ঘরে ফেরা আর হয়নি। প্রভাত তাদেরই একজনের বাড়ি ভাড়া করে থাকে। আগের মতো আর কোন বারান্দায় থাকে না।

এখানকার হিন্দুরা জানে এইসব মুসলমানদের আদি নিবাস অধুনা বাংলাদেশ। জেনেও কিছু বলে না। বরং একে অপরের বিপদকে নিজের বিপদ ভেবে পাশে এসে দাঁড়ায়। তাদের গাঁ-গঞ্জের মানুষের থেকে এরা অনেক আলাদা। তাদের পটেশ্বরী গ্রামে দেখেছে এই সেদিনও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সামান্য একটা খেলার মাঠ নিয়ে দাঙ্গা বাধবার উপক্রম। পঞ্চায়েতের সালিশীতে দাঙ্গা প্রশমিত হলেও হিন্দুদের টাকা দিয়ে মাঠটাকে বাজারদরে কিনে নিতে হয়েছে। এই মাঠ নিয়ে উত্তেজনা জিইয়ে ছিল অনেকদিন। হিন্দুদের দাবী যেহেতু টাকা দিয়ে তারা মাঠটাকে কিনে নিয়েছে তাই সেখানে খেলার অধিকার কেবলমাত্র হিন্দু ছেলেদের। উভয়পক্ষের কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের প্রচেষ্টায় সে সমস্যার একটা মীমাংসা হলেও মীমাংসা সূত্রের সঙ্গে একমত নয় কালীদাসী। একসঙ্গে যারা বড় হয়েছে এবং হচ্ছে, তারা কেন আলাদা আলাদা খেলবে? গোপনে চোখের জল ফেলে কালিদাসী। এই যেখানে গ্রামের অবস্থা সেখানে এখানকার চিত্রটি সম্পূর্ণ আলাদা। মনে তার এক ফুরফুরে আনন্দ। শুধু পাশাপাশি থাকা কেন, প্রয়োজনে উভয় সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েরা বিয়ে করুক এটাই সে মনে মনে চায়। আঃ এসব সে কি ভাবছে? তাড়াতাড়ি সে প্রভাতের বিছানায় গিয়ে বসে।

কেমন আছো বৌদি? কালীদাসী কোন উত্তর না দিয়ে শুধু মৃদু হাসে। প্রভাত বলে, জান বৌদি, শুয়ে শুয়ে শুধু তোমার কথা মনে হচ্ছিল। কেন? জানি না!

থাক আর বানিয়ে বানিয়ে আমার মন ভুলাতে হবে না। তারপর বলল, কত যে আমার কথা ভেবেছ সে আমি জানি। না বৌদি বিশ্বাস কর, আমি যা বলেছি তা সব সত্যি। উত্তরে কালীদাসী বলল, এত যখন আমার কথা ভেবেছো তখন একটা সংবাদ দাওনি কেন? কাকে দিয়ে দেব? কালীদাসী বুঝতে পারে সব। আসলে এই বয়সের ছেলেরা সমবয়সী নারীর সাহচর্য চায়। আহা ঠাকুরপোর যদি একটা বৌ ঘরে থাকতো? ভাবতেই বুকের মধ্যে একটা যন্ত্রণা হয়। কিন্তু কেন?

প্রভাতের মা এসে বললেন, কেমন আছো বৌমা? ভাল। তারপর উঠে গিয়ে তাকে প্রণাম করে কালীদাসী বলল, কতদিন পরে তোমায় দেখলাম বলত খুড়িমা? হ্যাঁ সে তো অনেকদিন হয়ে গেল। তারপর প্রভাত যেদিন তোমার কথা বলল, মনে মনে ভাবলাম, কাছেই যখন থাক একটা কথা বলার লোক তো হল। কথা না বলতে পেয়ে আমি একেবারে হাঁফিয়ে উঠেছি।

কালীদাসী বলল, আমি তো কতবার আসতে চেয়েছি, কিন্তু তোমার ছেলের যে সময়ই হয় না। বোঝই তো গরিবের সংসার, একদিন কাজ না হলে, না খেয়ে থাকতে হয়। সেকি আর বুঝি না? এই তো প্রভাত আমার ছেলে গত এক সপ্তাহ কাজে যেতে পারেনি। আমাদের যে কিভাবে চলছে তা শুধু ঠাকুরই জানে।

কালীদাসীর ভিতরটা ডুকরে কেঁদে ওঠে। মাথা নীচু করে থাকে সে। তার যে কিছু করার উপায় নেই। এক কাজের টাকাটাও যদি সে পেতো। কিন্তু তা পেতেও তো আরো কয়েকটা দিন সময় লাগবে। আশ্বাসবাণী শোনাবার যে তার কোন উপায় নেই। নিকুঞ্জ তবু বলে, এত চিন্তা করছ কেন খুড়িমা, আমরা তো আছি!

তা আছো বটে, কিন্তু তোমাদেরও তো অবস্থা আমি জানি! প্রভাত আমায় সব বলেছে। প্রভাত বলল, আঃ মা, থাম না! এখনো তো জমানো টাকার সব শেষ হয়ে যায়নি। তা যায়নি। তবে তাতে আর কদিন চলবে আমি জানি না। এতদিনে তো শেষ হয়ে যেতো। শুধু...।

কথা আর শেষ হয় না। ব্যাগের মধ্যে ওষুধ আর কিছু ফল নিয়ে সোজা প্রভাতের বিছানায় গিয়ে বসে ১৯/২০ বছরের এক সুন্দরী মেয়ে। বলে, আজ কেমন আছো প্রভাতদা? তারপর বলল, আজ ডাক্তারকাকুকে আচ্ছা একচোট নিয়েছি। পেয়েছেন কি উনি? বললেন ২/৩ দিনে ঠিক হয়ে যাবে, আর আজ সাতদিন হয়ে গেল! তারপর ব্যাগ থেকে ওষুধগুলো বের করে বলল, নাও এবার ওষুধগুলো খেয়ে নাও তো। আব্বুর কড়া হুকুম ওষুধগুলো যেন আমি নিজের হাতে খাইয়ে যাই। ডাক্তারকাকু নাকি বলেছেন পেশেন্ট ঠিকমতো ওষুধ খাচ্ছে না। বোঝ কথা। পেশেন্ট আবার ওষুধ খাবে না কেন? তার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি যে ওষুধ না খেয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে যন্ত্রণাটা বাড়াবে। হঠাৎ তার খেয়াল

হয় প্রভাতের বিছানায় এক ভদ্রমহিলা বসে আছেন। লজ্জিত হয়ে বলল, কিছু মনে করবেন না ভাই। প্রভাতদার সুস্থ হওয়ার ব্যাপারে আব্বুর গরজটা বেশি। ব্যাখ্যা করে বলে আব্বুকে রিকশা করে রোজ প্রভাতদাই পৌঁছিয়ে দেয় বাসস্টপেজে। আব্বুর গাড়ি আছে আবার নিজে ড্রাইভও করতে পারেন, তবু তিনি গাড়িতে যাবেন না। না, তেলের নাকি খুব দাম। তাই তিনি রিকশায় যাবেন। আর এখন যে রিকশায় চেপে যাচ্ছেন সে নাকি ভাল চালায় না। তাই আমার উপর কড়া হুকুম হয়েছে সকাল বিকাল দু'বেলা যেন আমি নিজের হাতে রুগীকে ওষুধ খাইয়ে যাই। ২/৩ দিনের মধ্যে প্রভাতদাকে সুস্থ হতেই হবে। কেন বাবা? ও বেচারা একটু শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে তাতে তোমার এত গাএদাহ কেন? প্রভাতদা নেই তো অন্য কেউ আছে। আর তাদের যদি তোমার পছন্দ না হয়, গাড়িতে না যাও হেঁটে যাও। তা না। প্রভাতদাকেই সুস্থ হয়ে তাকে নিয়ে যেতে হবে। যত সব অন্যায় আব্দার। মুক্তি যুদ্ধের সৈনিক তো, তাই আব্দারও কেমন হুকুমের মতো মনে হয়।

কালীদাসী অবাক হয়ে তাকায় মেয়েটির দিকে। মেয়েটি হেসে বলে, লক্ষ বার তাকিয়েও আমাকে আপনি চিনতে পারবেন না। আমি পিয়াশা, পিয়াশা খাতুন। থাকি ঐ বড় রাস্তার মোড়ে। হাঁটা পথে ১০/১৫ মিনিট লাগা উচিত। আমার লাগে আট মিনিট। তা আপনাকে কি বলে ডাকবো? প্রভাতের মা'ই উত্তর দিলেন, ও আমার এক বৌমা।

খানিক চিন্তা করে পিয়াশা বলল, তাই হবে হয়তো। তা না হলে আর রুগীর এত কাছাকাছি আসবেন কি করে? তাই বলে আমার 'পরে কিন্তু রাগ করবেন না। আমি আবার চুপ করে থাকতে পারি না।

কালীদাসী বলল, চুপ করে থাকবে কেন ভাই? চুপ করে থাকা তো একটা রোগ, আর কথা বলা হচ্ছে ওষুধ। একেবারে ঠিক কথা বলেছেন ভাবী, থুড়ি বৌদি। আর এই কথাটা একটু বোঝান তো প্রভাতদাকে। ঐযে ডাক্তারকাকু বলেছেন, বেশি কথা বলবে না। ব্যস মুখে কুলুপ। তা ডাক্তার কি সবজান্তা নাকি? কথা বলা যে একটা বিশ্রাম, মনের বিশ্রাম ডাক্তারবাবুরা তা বুঝতেই চান না। শুধুমাত্র এই অপরাধে ডাক্তারবাবুদের রেজিস্ট্রেশান কেড়ে নেওয়া উচিত, কি বলেন বৌদি?

কালীদাসী এসব কথা বোঝে না। মেয়েটি শিক্ষিত, জ্ঞানগম্যিও অনেক। তার সঙ্গে সমান পা রেখে সে চলতে পারবে কেন? শুধু বলল, ওসব বড় বড় কথা কিছু বুঝি না ভাই, শুধু দেখেছি, কথা না বলার চেয়ে বরং বেশি মাত্রায় বললে বা বলতে পারলে রুগী বেশি মাত্রায় ভাল থাকে। কিন্তু ভাই আমায় যে উঠতে হবে। জানতাম বৌদি, আপনি আর থাকবেন না, থাকতে পারেন না, আমাকে বেশিক্ষণ

কেউ সহ্য করতে পারেন না, তার চেয়ে দরকার কি বৌদি, আমিই চলে যাচ্ছি।

প্রভাত তার কথা শুনে শুধু হাসছে। ক'দিনই বা পরিচয়, তবু যখন দেখা হয় তীব্র দহনে দখিনা হাওয়া বয়ে নিয়ে আসে যেন। বলল, তুমি তো থাকতে আসনি ভাই, তার চেয়ে দাও কি ওষুধ এনেছো? আর বাবুকে বলো, আমি কাল ঠিক রিকশা নিয়ে পৌঁছিয়ে যাবো।

পৌঁছিয়ে যাবে? অবাক হয়ে জানতে চায় পিয়াশা।

হ্যাঁ যাবো। সে তুমি ওষুধ নিয়ে আসলেও যেতাম, না নিয়ে আসলেও যেতাম।

ব্যস। তাহলে তো হয়ে গেল। কি হয়ে গেল? এই যখন-তখন বাড়ি থেকে বেরোনো। কেন বাড়ি থেকে বেরোতে চাও কেন? বাড়িতে আমার সব সময় ভাল লাগে না, ভাবলাম তুমি আর কটাদিন শুয়ে থাকবে, তা নয়, কালই তুমি বেরোবে? কি দরকার বাপু এত তাড়াতাড়ি বেরোনোর। আর কটাদিন শুয়ে থাকলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

না ভাই কিছুই অশুদ্ধ হবে না। আমার শুধু শুয়ে থাকতে আর ভাল লাগছে না। বেশ তাহলে নিয়ে যাই ওষুধগুলো। আব্বুকে বলবো, গেল তো তোমার টাকা কিছু গচ্ছা? তোমার রিকশা কাল তোমায় ঠিক নিয়ে যাবে। উত্তরে প্রভাত বলল, ওষুধগুলো থাক ভাই, খেয়ে যদি আরেকটু শক্তপোক্ত হতে পারি। তবে থাক। আমি চললুম।

প্রভাতের মা বললেন, চললুম মানে কি? আমার বৌমা এসেছে, আমার আরেক ছেলে এসেছে ওদের সঙ্গে একটু গল্প করবি না।

আজ না খালা, তার চেয়ে ঠিকানাটা দিয়ে দাও, আমি গিয়ে এমন জ্বালানো জ্বালিয়ে আসবো যে আর কোনদিন যেতেই বলবে না। আজ যাই, অনেক দেরি হয়ে গেছে। ঝড়ের মত বেরিয়ে যায় পিয়াশা।

কালীদাসী বলল, কি ভাল মেয়েটা তাই না খুড়িমা। ভাল তো অবশ্যই কিন্তু আমার যে বড্ড ভয় করে বৌমা? কেন? জানি না। কত বড় বড়লোকের মেয়ে ও। ওর কি আমাদের মতো মানুষের সঙ্গে এমনভাবে মেশা উচিত?

কি আর করা যাবে খুড়িমা? ভগবান তো আর সবাইকে বড়লোক গরিবলোকের মন দিয়ে গড়েন-না। ঈশ্বর ওকে এমন একটা মন দিয়েছে যে মন গরিব ধনী বোঝে না। প্রভাতের মা বললেন, সেটাই তো ভয় বৌমা! কবে না ওর আব্বু ওকে এ বাড়িতে আসা বন্ধ করে দেন। কি বলতে চান বুঝতে পেরেও কোন প্রতিবাদ না করে চুপ করে থাকে কালীদাসী।

৪

কয়দিন ধরে উত্তেজনা ছিল। কিছু লোক এসে বলেও গিয়েছিল তোমাদের এ জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে। নিকুঞ্জের সঙ্গে আরো অনেকে প্রতিবাদ করে বলল, কোথায় যাবো আমরা? তাছাড়া আমরা তো আর কারো জায়গায় বাস করছি না। আমরা কেন উঠে যাবো? যারা বলতে এসেছিল তাদের মধ্যে নেতাগোছের লোকটির নাম রাণা। এ অঞ্চলের মস্তান হিসাবে তার যথেষ্ট নাম ডাক আছে। সে বলল, আমরা বলছি উঠে যেতে হবে, তাই উঠে যেতে হবে। তোদের কে বলেছে যে এ জমি কারো নয়? এ জমির মালিক এই আমি এবং আমরা। তোদের আবারও বলছি এখান থেকে চলে যা, প্রাণে বাঁচবি, না হলে সকলে একসঙ্গে মরবি।

কালীদাসী এগিয়ে এসে বলল, মরতে হয় মরবো, তবু তোমাদের কথায় আমরা কোথাও যাবো না। খালপাড়ের এ জায়গা খাস জায়গা, সরকারের জায়গা, একমাত্র সরকার বললে তবেই ভাববো আমরা যাবো কি না? কালীদাসীর বয়স বেশি নয়। বড়জোর ২৩/২৪ হতে পারে। নাম কালীদাসী হলেও, কালীদাসী কিন্তু কালো নয়। বাংলাদেশে একে উজ্জ্বল শ্যাম বলা হয়। লেখাপড়া সামান্য জানলেও পূর্ণ যৌবনের ছড়াছড়ি তার সারা শরীরে।

রাণা একবার দেখে বলল, তুই আবার কে? এখানেই বা কেন? তোর তো এখানে থাকার কথা নয়। তারপর একজনকে উদ্দেশ করে বললে, চ্যাং ওকে একটু দেখে রাখ। বড্ড বাড় বেড়েছে। মুগুরের ঘা খেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। শালী আবার সরকার দেখাচ্ছে। তারপর বলল, চলে যাচ্ছি, তবে আবার আসবো। যাওয়ার আগে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায় কালীদাসীর দিকে।

ওরা চলে গেলে নিকুঞ্জ বলল, কি দরকার ছিল তোর বাইরে আসার? এখন কি হবে? কি আবার হবে? ওরা ধরে নিয়ে যাবে। দুদিন ভোগ করবে, তারপর ছেড়ে দেবে। এর চেয়ে আর বেশি কী হবে? নিকুঞ্জ ক্ষোভের সঙ্গে বলে, তোর মুখে কি কিছু বাধে না? না বাধে না। তারপর বলল, ঐ গুণ্ডাগুলো তোমাদের এতগুলো বেটাছেলের সামনে অপমান করে গেল, অশ্লীল ইঙ্গিত করে গেল, আর তোমরা সব চুপ করে শুনলে, একটা প্রতিবাদও করলে না? তাহলে আর আমার কি হবে না হবে তা নিয়ে এত মাথাব্যথা কেন? মাথাব্যথা হবে না? ওরা সব মস্তান, ওদের সঙ্গে কি আমরা পারবো? না পারলে মরবে, আমি একাই লড়বো ওদের সঙ্গে, দেখি কে জেতে? আমি না ওরা?

এ যেন এক নতুন কালীদাসী। শৌর্যবীর্যে যেন দশভূজা দুর্গা। এ কালীদাসীকে চেনে না নিকুঞ্জ। নিকুঞ্জ চিরকালই একটু দুর্বল প্রকৃতির লোক। যে কোন রকম

ঝামেলাকে সে এড়িয়ে থাকতে পছন্দ করে। মার খেলেও প্রত্যাঘাত করতে জানে না। কালীদাসী ঠিক তা নয়, কোন কিছুকে হজম করার মানসিকতা তার নেই। কিন্তু আজকের মতো ভয়ংকরী রূপ তার কোনদিন দেখেনি নিকুঞ্জ। বলল, এমন অসম্ভব দুঃসাহস দেখাস না কালী। সবাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোকেই দুষবে? কালীদাসী নিকুঞ্জের কথার কোন প্রতিবাদ না করে ঘরের ভিতর চলে যায়।

সকাল হতেই মেয়েটাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এত ছোট্ট মেয়েকে সে কার কাছেই বা রেখে যাবে? মনে মনে ঠিক করে কাজ থেকে ফেরার পথে সে একবার প্রভাতের ওখানে যাবে এবং যায়ও। প্রভাত কাজে বেরিয়েছে। ওর মা বললেন, এখনই এসে পড়বে। ওর কাছে কি কোন দরকার আছে? দরকার আর কি খুড়িমা। তারপর বলল, দাশু তাড়াতাড়ি আসবে কি না সেটাই জানতে এসেছি। ওর কাছে আমার একটু প্রয়োজন আছে।

কথা বলতে বলতে প্রভাত ফেরে। ও সকালে কিছুক্ষণ এবং বিকেলে কিছুক্ষণ কাজ করে। দুপুরটা বিশ্রাম নেয়। শরীরটা এখনো পুরোপুরি সুস্থ হয়নি। কালীদাসীকে দেখে বলে, আরে বৌদি যে? এলুম ঠাকুরপো। ভেবেছিলাম তুমি বোধহয় একবার যাবে, তা তো গেলে না তাই ভাবলুম কেমন আছো দেখে যাই। প্রভাত তার মাকে বলল, বৌদিকে দুপুরে খেয়ে যেতে বল মা! তার মা উত্তরে বললেন—সে আবার কি কথা? এই দুপুরবেলায় বৌমা আবার না খেয়ে কোথায় যাবে? তারপর কোলের মেয়েকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে বললেন, চল দিদি আমরা ভিতরে যাই।

উনি চলে গেলে কালীদাসী বলল, কাল খালপাড়ে খুব ঝামেলা হয়েছে জান? প্রভাত অবশ্য সকালেই শুনেছে রাণারা নাকি গিয়ে খুব ঝামেলা করেছে। যারা ওখানে অস্থায়ী ভাবে বাস করছে তাদের উঠে যেতে বলেছে। খালপাড়ের লোকেরা বলেছে জায়গাটা সরকারের, সরকার বললেই তারা ভাববে, তাদের কথা শুনতে যাবে কেন? রাণারা তবু শাসিয়ে এসেছে, তারা দেখে নেবে! ওখানকার কোন একটা বৌ বেরিয়ে এসে প্রতিবাদ করাতে তাকে অশ্লীল গালিগালাজ করেছে। এটুকুই সে শুনেছে এবং ঠিক করেছে যে বিকেলে সে একবার খালপাড়ে যাবে।

খালপাড় আর খালঘাট একই খালের একটা দিকের দুটি অংশ। খালঘাটে অনেকদিন ধরে এইসব নিরাশ্রয় মানুষেরা স্থায়ী ভাবে মাথা গুঁজবার ঠাঁই করে নিয়েছে। এখানেও ঝামেলা কম হয়নি। রক্তও ঝরেছে এক সময়। কিন্তু এখানকার কেউই এ জায়গা ছেড়ে কোথাও যায়নি। সরকারি চেষ্টাও যখন ব্যর্থ হয়ে গেছে, তখন সব পক্ষই মেনে নিয়েছে এদের এখানে থাকার অধিকার। তবু ফিস ফিস কিছু কথা উঠেছিল। বাংলাদেশ থেকে যারা এখানে এসে আস্তানা গেড়েছে তাদের

কেন এ অধিকার দেওয়া হবে? ওরা তো সব বেআইনি পথে এদেশে এসে জনসংখ্যার চাপ বাড়িয়ে চলেছে। বিশেষভাবে বাংলাদেশী মুসলিম সম্প্রদায়, তারা এখানে কেন?

সত্যেন দাস এখানকার সবচেয়ে ক্ষমতাবান এবং জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা। প্রধানত তারই একক প্রচেষ্টায় খালঘাটের এই নিরাশ্রয় জনগণ আশ্রয় পেয়েছে। বলতে গেলে তারই জঙ্গী আন্দোলনের কাছে মাথা নত করেছে সব পক্ষই। প্রত্যেকের রেশনকার্ডের ব্যবস্থাও তিনিই করেছেন কখনো আইনি পথে, কখনো বা ভয় দেখিয়ে। অবশ্য সত্যেনবাবু যে একদিনেই এই স্থানে পৌঁছেছেন তা কিন্তু নয়। দীর্ঘদিন ধরে তিনি এখানকার মানুষের সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছেন। প্রায় সকলেই তাঁর নেতৃত্ব মেনেও নিয়েছে। সুখে দুঃখে তিনি সবসময় এদের সঙ্গে ছিলেন এবং এখনো আছেন। সেই সত্যেনবাবু বললেন, কে বাংলাদেশী আর কে বাংলাদেশী নয় তার বিচার কে করবে? তাছাড়া ওরা তো কেউ পূর্বনিবাস হিসাবে বাংলাদেশের নাম বলেনি। তাহলে তাদের বাংলাদেশী বলা হবে কেন? আর একটা কথা ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, এখানে হিন্দু, মুসলমানের অধিকার সমান, তাহলে ধর্মে কেউ মুসলমান হলে তাকে বাংলাদেশী তকমা পরিয়ে ফেরত দেওয়ার আয়োজন কেন? না ওসব হবে না। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এখানে যারাই আছে তাদের সবাইকে থাকার অধিকার দিতে হবে, না হলে আবারও অনেক রক্ত ঝরবে। কিছু লোক প্রশ্ন তুলেছিলেন কিন্তু সত্যেনবাবু আপনি তো জানেন ওরা বাংলাদেশী। হ্যাঁ জানি, আর আমি নিজেও তো তাই। আইনি নাগরিক কার্ড আমারও আছে, তাই আজ আর কেউ বলতে পারবে না আমি বাংলাদেশী। তারপর বললেন, আইনি নাগরিক কার্ড এরাও পাবে। আপাতত তা পেতে গেলে যে রেশন কার্ড, ভোটার কার্ড লাগে তা সবই তাদের আছে। নির্মলেন্দু বলে একজন বললেন, কিন্তু সত্যেনবাবু, জনসংখ্যার চাপ বলে তো একটা কথা আছে। ওরা যে বিশ্রী ভাবে পরিবেশকে দূষিত করছে তা তো আপনি অস্বীকার করতে পারেন না? না, পারি না। কিন্তু নির্মলবাবু পরিবেশ কি শুধু ওরাই দূষিত করছে? আপনারা মানে আপনাদের মতো তথাকথিত ভদ্রলোকেরা করছেন না? বলুন তো কজন নাগরিক পরিবেশ সম্পর্কে সজাগ? রাস্তায় ময়লা ফেলছেন তো আপনারা। তালার পর তালা বাড়িয়ে এবং ভাড়াটিয়া বসিয়ে আপনারা জনসংখ্যার চাপ বাড়াচ্ছেন না? বলুনতো কজন বাড়ির মালিক প্ল্যান অনুসারে বাড়ি করছেন? গাছ কেটে পুকুর বুজিয়ে প্রোমোটররাজকে তো আপনারাই ডেকে এনেছেন? এখন এই গরিব লোকদের দোষারোপ করলে হবে কেন? নির্মলেন্দুবাবু নিজেও প্রোমোটারি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং তিনি আর প্রতিবাদ না করে বরং বললেন, কথাটা আপনি মিথ্যে বলেননি। নাগরিক সভ্যতায় এইসব গরিব মানুষের

প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। এরাই তো ভদ্রলোকদের বাড়িতে কাজ করে তাদের জীবনকে সহজ করে তুলেছে। তাছাড়া এরাই পরিবেশকে দূষিত করছে কথাটা বোধহয় সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ এরা তো জনপদের একপ্রান্তে বাস করছে।

সত্যেনবাবু খুশি হন যে কোন প্রতিবাদকে তিনি দানা বাঁধতে দেননি। এতগুলো লোকের হয়ে কথা বলার জন্য নির্বাচনে ভোটটা যে তিনি পাবেন এ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বলেন, না ধর্ম নিয়ে জাত নিয়ে কোন ভেদাভেদ করা যাবে না। সবাই এখানে সমান অধিকার ভোগ করবেন।

রাণারা এই সত্যেনবাবুরই লোক। প্রভাত দেখেছে এইসব নেতারা তাদের জনপ্রিয়তাকে ধরে রাখার জন্য একদল মস্তান পোষেন। তারাই তার হয়ে ভালমন্দ সব কাজ করেন। অনেকবার প্রভাত সত্যেনবাবুকে দেখলেও এমনকি তার দলের ইউনিয়নের একজন সদস্য হলেও তার সঙ্গে কোনদিন কথা বলার সুযোগ হয়নি। একদল লোকের দ্বারা সব সময় তিনি পরিবৃত থাকেন।

খালপাড়ের ঘটনাটা তাই প্রভাতের কানে আসতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিকুঞ্জদা এবং বৌদির নিরাশ্রয় অসহায় মুখ দুটি। সামান্য রিকশাওয়ালা সে। কি করতে পারবে জানেও না। তবু এই সময়ে তাদের পাশে দাঁড়ানোটা উচিত বলেই তার মনে হয়। এর ফলে রাণাদের বিষ নজরে পড়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়। কিন্তু সে নিরুপায়। তাকে যেতেই হবে খালপাড়ে এবং জানতে হবে আসল ঘটনা।

কালীদাসীর প্রশ্নের উত্তরে তাই বলল, সকালে শুনেছি তোমাদের ওখানে রাণারা ঝামেলা করেছে। কাকে নাকি অশ্লীল ইঙ্গিতও করেছে, তাই তুমি না এলেও আমি কাল বিকেলে যেতাম বৌদি। কালীদাসী বলল, তুমি যখন জেনে গেছো, তখন আর আমার বলার কিছু নেই। দেখ কি করতে পার? আর হ্যাঁ, দাশু কি এর মাঝে আসবে? রবিবারে আসতে পারে। আসলে আমায় একটু সংবাদ দেবে? সংবাদ দেওয়ার দরকার নেই। আসলে আমি নিয়েই যাবো।

সন্ধ্যায় শেখ আখতার আবার তার রিকশায়। আখতার সাহেবের একটা বিশেষ গুণ, কে কি কাজ করে তা দিয়ে তিনি কারো বিচার করেন না। সবার সঙ্গে তিনি একইরকম ব্যবহার করেন। আখতার সাহেব কি কাজ করেন, জানে না প্রভাত। তবে বড় কোন কাজ করে বলেই মনে হয়। প্রভাতকে অন্যমনস্কের মতো রিকশা চালাতে দেখে তিনি বলেন, কারো সঙ্গে ঝগড়া করেছো বুঝি?

কার সঙ্গে ঝগড়া করবো বাবু? ঘরে তো এক মা ছাড়া কেউ নেই।

কাউকে নিয়ে এস।

কি যে বলেন বাবু! দুজনের সংসার চালাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি আবার আর একজন?

সত্যি! ভাবতেও অবাক লাগে। চায়ের পিছনে তার যে টাকা খরচ হয় তার থেকেও কম টাকায় এদের সংসার চালাতে হয়।

আখতার সাহেব এবার প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে জানতে চান, প্রভাত কিছু জানতে পারলে? কি ব্যাপারে বাবু? ওই সেদিন কারা তোমাকে ঐভাবে মেরেছিল? না বাবু! তাছাড়া ওসব জেনে কীইবা হবে? কিইবা হবে মানে? কেন তারা মারল জানতে হবে না? তারপর বললেন, তুমি জানার চেষ্টা করো। জানতে পারলে আমায় ব'লো। তারপর আমার যা করার আমি করবো।

সন্ত্রস্ত হয়ে প্রভাত বলল, না বাবু তার কোন দরকার নেই।

রিকশা যখন আখতার সাহেবের বাড়ির দিকে বাঁক নেবে, সত্যেনবাবু এবং তাকে ঘিরে থাকা আরো তিন-চারজন রিকশাটাকে থামাতে বলে আখতার সাহেবকে বললেন আখতারদা, আমি আপনার বাড়ি গিয়েছিলাম।

কেন?

আপনার কি একটু সময় হবে?

বল না কি বলবে?

সত্যেনবাবু বললেন, কাল একটা বাজে ঘটনা ঘটে গেছে।

কি ঘটে গেছে সেটা বলবে তো!

কাল খালপাড়ের ঘটনা আপনার কানে গেছে তো?

হ্যাঁ গেছে, আর ভেবেছি তোমার কাছে জানতে চাইবো তোমার লোকেরা আজকাল এইসব করে বেড়াচ্ছে নাকি?

সত্যি আখতারদা আমার এত খারাপ লাগছে যে!

খারাপ লাগলে তো হবে না সত্যেন। তোমাকে তো এইসব কাজের বিরুদ্ধে অ্যাকশান নিতে হবে।

নিয়েছি আখতারদা। আমি নিজেই থানায় গিয়ে রাণা আর চ্যাংকে ধরিয়ে দিয়েছি। পুলিশকে বলেছি কোনরকম করুণা নয়, জবরদস্ত কেস সাজিয়ে কোর্টে পেশ করতে হবে। দেখতে হবে কোনভাবে যেন বাইরে আসতে না পারে। এখন বাকিটা আপনাকে দেখতে হবে।

আখতার সাহেব বললেন, আমাকে খালপাড়ের মানুষের কেসটা হাতে নিতে হবে, তাই তো?

একদম ঠিক কথা আখতারদা।

তুমি নিশ্চিত থাক সত্যেন, তুমি যখন চাও না, অন্তত কয়েক বছরের সাজা যাতে হয় আমি দেখবো। আর হ্যাঁ, প্রভাতকে দেখিয়ে বললেন, একে চেন? চিনি মানে মুখ চিনি। আখতার সাহেব অবাক হয়ে বললেন, সেকি সত্যেন? শুধু রাণাদের চিনলে হবে? এদের চিনতে হবে না? সারা দিন রিকশা চালিয়ে এরা কয়

পয়সা পায়। কিভাবে এদের সংসার চলে খোঁজ নিতে হবে না? দল তো এবার তোমায় ক্যান্ডিডেট করবে শুনেছি। তা এদের ভোট চাও না? এ তো তোমার দলের ইউনিয়নের একজন সদস্য। আবার খালঘাট রিকশা স্ট্যান্ডে যে পঁচিশখানা রিকশা আছে তাদের সেক্রেটারি। অথচ একেই তুমি চেন না?

সত্যেন লজ্জিত হয়ে বললেন, খুব দুঃখিত আখতারদা। আমার অবশ্যই চেনা উচিত ছিল। তারপর প্রভাতকে বলল, কিছু মনে করো না ভাই, কিন্তু তুমিও তো আমার সঙ্গে একটু যোগাযোগ রাখতে পারতে? এতবড় জনপ্রিয় নেতা তার সঙ্গে যেচে কথা বলছেন এতেই সে কৃতজ্ঞতায় গলে যায়, কোন কথা না বলে সে চুপ করে থাকে।

সত্যেন বলে, কাল একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে প্রভাত? প্রভাত জানতে চায় কোথায়? সত্যেনবাবু বললেন, ১নং ইউনিট অফিসে। ৪টে থেকে ৫টা আমি থাকবো। প্রভাত শুধু বলল, আচ্ছা।

আখতার সাহেব বললেন, সে না হয় করবে? কিন্তু ওর দুটো দুঃসংবাদ আছে। একটা কয়েকদিন আগে, তার ঘা এখনো শুকায়নি, আর দ্বিতীয়টা কাল। ঐ যে খালপাড়ে যা ঘটেছে, ওখানে তো ওর দাদা-বৌদিও থাকে। তাই? হ্যাঁ তাই। তারপর বললেন, আমার তো মনে হয় তোমার একবার সশরীরে সেখানে যাওয়া উচিত। তোমার দল অথবা প্রশাসন যদি মনে করে ওদের ওখানে থাকা চলবে না, তাহলে ওরা কোথায় যাবে সেটা তো তোমাদের দেখা উচিত?

সত্যেন বললেন, থাকবে না বললে তো হবে না আখতারদা। এরা সব গরিব মানুষ, যাবে কোথায়? আর যেখানে, সেখানে গেলে তো হবে না, সেখানে ওরা কি ভাবে বাঁচবে সেটাও তো দেখা দরকার। তারপর বললেন, আমার খুব অবাক লাগে এইসব তথাকথিত ভদ্রলোকদের দেখে। নামমাত্র মূল্যে এদের কাছ থেকে পরিষেবা নেবে, এদের না হলে ওদের চলবে না অথচ এদের বিরুদ্ধেই বিষোদ্গার করবে। আখতার সাহেব হেসে বললেন, তুমি কি আমাকেও তাদের একজন ভাবা নাকি? ছিঃ আখতারদা, এসব কথা আপনি ভাবলেন কেমন করে? ঠিক আছে ভাববো না, বরং পারলে এখনি একবার খালপাড়ে চলে যাও। পুলিশ তো আসবেই। তার আগে নিজে একবার ভাল করে খোঁজ নাও। সত্যেন বললেন, তাই হবে আখতার দা। আমি এখনি একবার যাচ্ছি। আখতার সাহেব হেসে বললেন, তোমার এই গাড়ি নিয়ে? কেন অসুবিধা আছে? অসুবিধা তো আছে। একটা নয় হাজারটা। তারপর বললেন, তুমি গরিবদের বন্ধু। যাবে গাড়ি চড়ে? ওরা তোমাকে বন্ধু হিসাবে নেবে কেন? সবচেয়ে ভাল হয় হেঁটে গেলে। তা অবশ্য তুমি পারবে না। তার চেয়ে প্রভাতের রিকশায় উঠে চলে যাও। সবার সামনে ওকে কিন্তু ঠিক ঠিক ভাড়াটা দিয়ে দিও। আপনি? আমি এটুকু পথ হেঁটেই চলে যেতে পারবো।

আখতার সাহেবের কথাগুলো ভীষণ ভাল লাগে প্রভাতের। কি যেন যাদু আছে ওনার কথায়। হিন্দুদের কেউ কেউ অবশ্য আখতার সাহেবকে পছন্দ করে না। এক মুক্তিযুদ্ধের একজন সৈনিক হয়েও উনি স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে যাননি। দ্বিতীয়ত, তিনি এখানকার এক হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করে হিন্দুদের মধ্যেই মাথা উঁচু করে বাস করছেন। ব্যাপারটা অবশ্য প্রভাত আগে জানতো না। পিয়াশাই তাকে গল্পচ্ছলে বলেছে। আখতার সাহেবকে এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার কম চেষ্টা হয়নি। কিন্তু এই সত্যেনবাবু এবং তার দল রুখে দাঁড়াতে অবশ্য তাড়ানো সম্ভব হয়নি। আর এখন সেই সত্যেনবাবু তার রিকশায় উঠে চলেছেন খালপাড়ে?

পৌঁছিয়েই দেখে নিকুঞ্জদার আস্তানার সামনে একটা জটলা। সত্যেনবাবু রিকশা থেকে নেমে জানতে চান কি হয়েছে এখানে? আপনারা এত জটলা করছেন কেন? সত্যেনবাবুকে সবাই না চিনলেও অনেকেই চেনে। তাদের মধ্যে থেকে একজন বললেন, সত্যেনদা, আপনি কি দেখতে এসেছেন? জানতে চাইছেন জটলা কেন? তারপর বলল, জটলা তো এখন রোজ দেখতে পাবেন। আরে ব্যাপারটি আসলে কি হয়েছে সেটাই তো জানতে এসেছি। একজন বলল, আর জেনে কি হবে সত্যেনদা? ওরা তো সব আপনার লোক। আপনার সম্মতি ছাড়া কি ওরা এত দুঃসাহস দেখাতে পারে? জঙ্গী চরিত্রের অধিকারী হলেও সত্যেনবাবু মস্তান নন। তিনি জানেন কখন চুপ করে থাকতে হয়। এখন রাগারাগির সময় নয়। সময়টাও ভাল যাচ্ছে না। তবু এমন সরাসরি যে কেউ তাকে আঙুল দেখাতে পারে তিনি ভাবেননি। ভিতরটা তাঁর এদের ঔদ্ধত্যে জ্বলেপুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু রাগ দেখালে তো চলবে না। এদের ভোটগুলোও যে তাঁর চাই। গম্ভীর ভাবে বললেন, হ্যাঁ আমারই লোক। কিন্তু আপনাদের জেনে রাখা দরকার কোন রকম অন্যায়কে আমি বরদাস্ত করি না। সে নিজের লোক হলেও নয়। ওদের কথা জানতে পেরেই আগেই তাদের পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি যাতে তারা গা ঢাকা দিতে না পারে, তারপরে নিজেই এসেছি ব্যাপারটা জানতে।

যারা ক্ষোভ প্রকাশ করছিলেন সত্যেনবাবুর একথায় তারা থেমে যান। প্রভাত জানতে চায় নিকুঞ্জদা, বৌদি এখনো ফেরেনি? ফেরার সময় তো হয়ে গেছে। কেন যে এখনো ফিরছে না কে জানে? প্রভাত বলল, অত চিন্তা করছ কেন নিকুঞ্জদা? হয়তো এখনি ফিরে আসবে। সত্যেন জানতে চায়, প্রভাত ইনিই তোমার দাদা? হ্যাঁ, প্রভাত বলল। ঘরে কিছু আছে বসতে দেওয়ার মতো? নিকুঞ্জ অন্যের ফেলে দেওয়া একটা ভাঙা চেয়ার ভাগাড় থেকে কুড়িয়ে এনেছিল কয়েকদিন আগে। সেটাকেই এনে দিল বসতে। সত্যেনবাবু বললেন, থাক না, আমি একটু ঘুরে ঘুরে দেখি।

দেখতে দেখতে অবাক হয়ে যান সত্যেনবাবু। কিছু না হলেও প্রায় ১০০ থেকে

১৫০ পরিবার কুকুর-বিড়ালের মতো বাস করছে এখানে। কারো মাথার উপর পাকা ছাদ তো দূরের কথা টালির বা টিনের ছাদ পর্যন্ত নেই। পুরনো কাপড় বা ফেলে দেওয়া প্লাস্টিকে তৈরি করা হয়েছে এক একটা খুপরি। এমনি খুপরির মধ্যে তাদের রান্না খাওয়া শোয়া সব। ছেলে-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী, শ্বশুর- শাশুড়ি সব একই জায়গায় শুয়ে আছে। জৈবক্রিয়া যা কিছু তাও ওরই মধ্যে। এক ভয়ংকর দুর্বিষহ জীবন। এভাবে যে কোন মানুষ বাস করতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করাই কষ্টকর। অথচ খাল বরাবর আরো বিস্তীর্ণ জায়গা পড়ে আছে। এরা যে কেন সেদিকে যায়নি বুঝতে পারেন না। সত্যেনবাবুর মাথার মধ্যে চট করে আর একটা বুদ্ধি খেলে যায়। আচ্ছা এই গাদাগাদি করে থাকা মানুষগুলোকে যদি খালপাড় বরাবর হাফ কাঠা করে জমি দেওয়া যায়, এবং টালির ছাদ এবং বাঁশের বেড়া দিয়ে একটা রান্নাঘর এবং একটা শোয়ার ঘর করে দেওয়া যায় তাহলে ১৫০ পরিবারের জন্য কতটাকা লাগতে পারে, মনে মনে হিসাব করে প্রভাতকে বলে প্রভাত, তুমিও কি এখানে থাক? না। কোথায় থাক? আমি খালঘাটে একজনের বাড়িতে ভাড়া থাকি। আচ্ছা তোমাকে যদি হাফ কাঠা জায়গা আর মাথা গুঁজবার জন্য একটা টালির ঘর বানিয়ে দেওয়া হয় তুমি চলে আসতে পার না? না দাদা পারি না। কেন? উত্তরে প্রভাত বলে, এরা আমাকে সন্দেহ করবে, শত্রু ভাববে।

সত্যেনবাবু বললেন, খালপাড় বরাবর তো অনেক জায়গা আর এখানে ১৫০-এর মতো পরিবার আছে, সবাইকে যদি হাফ কাঠা জমি আর একটা করে ঘর বানিয়ে দেওয়া হয়? আশ্চর্য হয়ে প্রভাত বলে, সে তো অনেক টাকার দরকার! কে দেবে এত টাকা?

সত্যেনবাবু বললেন, ধর যদি আমিই দিই। আপনি? আপনি দেবেন কেন? প্রভাতের মনের অবস্থা বুঝতে পেরে সত্যেনবাবু বললেন, আরে না না। তুমি যা ভাবছো তা নয়, আর আমি অত টাকা পাবই বা কোথায়? কিন্তু ধর যদি জোগাড় করে দিই। উত্তরে প্রভাত বলল, কিন্তু সেটা তো এদের শোধ করতে হবে? হ্যাঁ তাতো হবেই। প্রভাত হেসে বলল, কিন্তু দাদা এদের অনেকের ঘরে দু'বেলা উনুন জ্বলে না, রোজ এদের কাজ হয় না। এরা কিভাবে শোধ করবে? তারপর সুদও তো দিতে হবে। হ্যাঁ তা তো হবেই। তবে কাজ করতে চাইলে এদের কাজ আমিই দেব। মুনীশের কাজ, ঝি-এর কাজ, বা কেউ যদি অন্য কোন কাজ করতে চায় যেমন রাজমিস্ত্রী, কলের মিস্ত্রী, ইলেকট্রিকের কাজ, ধোবার কাজ, অথবা কেউ যদি দোকান করতে চায় এই যেমন মুদিখানা, বা তোমার মতো রিকশা যদি কেউ চালাতে চায় তাকে রিকশা কিনে দেবো, ভেড়ির কাজ দেব, মোদ্দা কথা যারা কাজ করতে চায় তাদের সবাইকে আমি কাজ দেব। কিন্তু শর্ত থাকবে মজুরির অর্ধেক টাকা ধারের জন্য জমা দিতে হবে, সেই টাকার আবার অর্ধেক টাকা সুদের জন্য

কেটে নেওয়া হবে। বাকি অর্ধেক মূলধন শোধ হবে বলে জমা পড়বে। দেখ রাজি কিনা? আর এদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটা প্রাথমিক স্কুল যাতে হয় তার ব্যবস্থা করে দেব। এবার দেখ ওদের জিজ্ঞেস করে দেখ কজন রাজি।

প্রভাত বলল, তার জন্য তো একটু সময় লাগবে সত্যেনদা। সময় তো লাগবে। আর তার জন্য তোমায় সাতদিন সময় দিলাম। ওরা রাজি থাকলে ওদের যাবতীয় নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার। আচ্ছা আমি কথা বলে দেখি, বলল, প্রভাত। হ্যাঁ তাই বলো বেং সাতদিন পরে আমায় জানাও। মনে রেখ সময় কিন্তু মাত্র সাতদিন।

৫

পিয়াশাকে ইদানীং মাঝে মাঝে প্রভাতের রিকশায় দেখা যায়। কোন কোনদিন বলে, আমাকে অনেক দূরে কোথাও নিয়ে চল না প্রভাত দা। মেয়েটিকে প্রায়ই প্রভাতের রিকশায় চড়তে দেখে অন্যান্য রিকশাওয়ালারা ঠারেঠোরে অনেক মন্তব্য করে প্রভাত গায়ে মাখে না। ইদানীং তাদের ঠাট্টার মাত্রাটা এত বেড়ে গেছে যে প্রভাত প্রতিবাদ না করে পারে না। কথায় কথা বাড়ে। অন্যান্য রিকশাওয়ালাদের সঙ্গে তিক্ততা সৃষ্টি হোক তা সে চায় না। তাই ওদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। বিশ্বনাথ তো একদিন বলেই বসে, প্রভাত তুই রিকশাওয়ালা, রিকশাওয়ালাই থাকবি। ওইসব বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করিস না। আর মেয়েটাও হয়েছে, ঠায় তোর জন্যে অপেক্ষা করবে। এটা কিন্তু ভাল নয়। বিশ্বনাথ হয়তো তার ভালর জন্যেই এসব কথা বলে। কিন্তু প্রভাত রেগে যায়। বলে, তোদের রাগটা কেন বলতো? ও যদি তোদের রিকশায় না উঠতে চায় তার কৈফিয়ত কি আমাকে দিতে হবে নাকি?

বিশ্বনাথ বলে, তোকে দিতে হবে আমার কথার কি তাই মানে হয়? তারপর বলে, ওইসব বড়লোকদের তুই কতটা চিনিস আমি জানি না। কিন্তু এ লাইনে আমি তো অনেকদিন আছি। ওরা কাজ হাসিলের জন্য কত ভাল ভাল কথা বলবে, কিন্তু মনে রাখিস ওরা কিন্তু মনে মনে আমাদের মানুষ বলে মনে করে না। তারপর বলল, সেদিন তোর পরে যা করা হয়েছে সেটা অন্যায়। আমি কোনভাবে সমর্থন করি না। তুই এ অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোন প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করিসনি এটা ঠিক কথা। কিন্তু যেভাবে তুই এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছিস তাতে কিন্তু তোর উপর ওদের সন্দেহটা যায়নি। তার উপর ইদানীং আবার সত্যেনবাবুর সঙ্গে তোর দহরম মহরম। ওদের মনে ভয় হওয়া তো স্বাভাবিক। আরো বলল, এইসব রাজনীতির লোককে বিশ্বাস করতে নেই। দেখলি না রাণা ও চ্যাং-এর অবস্থা। ওরা খুবই অন্যায় করেছে এটা ঠিক, কিন্তু এই রাণা ও চ্যাং-রা কি সত্যেনবাবুর জন্য কম

করেছে? আজ তাদেরই উনি পুলিশের হাতে তুলে দিলেন? তারপর আবার এটাও জানাজানি হয়ে গেছে যে খালপাড়ের ওই মহিলা তোর বৌদি হয়। ওরা কিন্তু একদিন বেরিয়ে আসবে, সেদিন যদি সব কিছুর জন্যে তোকে দায়ী করে?

এত গভীর ভাবে কোন কিছু ভাবেনি প্রভাত। বলল, কিন্তু আমি তো কোন ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত নই। বিশ্বনাথ বলল, ওরা তা বিশ্বাস করবে না, তাই বলছিলাম, এড়িয়ে না চলে সবার সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহার কর। দেখ নিজেদের মধ্যে আমাদের যে তর্কাতর্কি হাতাহাতি হয় না, তা তো নয়। কিন্তু ভুলেও যাই। তারপর বলল, একটা কথা ভাব তো—কোন ভদ্রলোক কি দয়াপরবশ হয়ে আমাদের একটা টাকা বেশি দেয়? স্বাভাবিক অবস্থায় তো আর কেউ বেশি পয়সা দাবি করে না। কিন্তু সেদিন ঐ ঘোর দুর্যোগে আমরা যদি কিছু টাকা বেশিই চেয়ে থাকি সেটা কি খুব অন্যায়? ধর বর্ষায় ভিজে আমাদের যদি কারো অসুখ-বিসুখ হয় কে দেখবে? সেদিন তুইও সবার বিরুদ্ধে যা করলি তা কিন্তু ঠিক করিসনি।

প্রভাত বলল, আমি তো কারো বিরুদ্ধে কোন কথা বলিনি। না বলিসনি। আর বলিসনি বলেই ওরা কিন্তু তোকে আর আপন বলে ভাবতে পারছে না। তাই কথাটা মনে রাখিস।

এইসব কথাই ভাবছিল প্রভাত। তাই পিয়াশার কথাটা ভাল করে বুঝতে না পেরে বলল, কি বললে? খিল খিল করে হেসে উঠে পিয়াশা। বলল, এতক্ষণ কোথায় ছিলে প্রভাতদা? প্রভাত তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে আখতার সাহেবের বাড়ির রাস্তা ধরলে পিয়াশা বলল, ভয় পেয়ে গেলে? কিসের ভয়? বাঃরে কিসের ভয় তা আমি কি করে বলবো? প্রভাত জোরের সঙ্গে বলে আমি কোন কিছুকে ভয় করি না। কর না বুঝি?

না করি না। তাহলে তোমায় যে বললাম আমাকে দূরে কোথাও নিয়ে যেতে। কোথায় যাবে বল? তা আমি কি করে বলব? তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই যাব। প্রভাত বলল, একটা কথা বলব বুলি? হেসে উঠে পিয়াশা, বলে তুমি আমার এ নামটা জানলে কি করে?

প্রভাত বলল, তুমিই বলেছো, এখন আর মনে নেই। বেশ আমি বলেছি, আর এখন থেকে তুমি আমায় বুলি বলে ডাকবে। একসময় আমার আম্মি এই নামে ডাকতেন, কিন্তু এখন আর ডাকেন না, কিন্তু নামটা আমার খুব প্রিয়। তাই বুঝি!

পিয়াশা বলল, কই কি বলবে বললে না? বলছি বলে রিকশাটা ঘুরিয়ে ফাঁকা রাস্তায় নিয়ে এল। এই রাস্তা গ্রামের দিকে চলে গেছে। আগে রাস্তাটা কাঁচা ছিল, এই অল্প দিন হল রাস্তাটা পাকা হয়েছে। এই রাস্তা দিয়ে অটো চলে, তাই রিকশা খুব একটা চলে না। দু'পাশে সবুজ ধানক্ষেত তার মাঝ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে দূর

গ্রামে। চলতে চলতে পিয়াশা জানতে চায়, এই রাস্তায় তুমি প্রায়ই রিকশা চালাও বুঝি? প্রভাত বলে একদম না। এ রাস্তায় রিকশা খুব একটা চলে না। অটো আছে না? আচ্ছা তুমি অটো চালাতে পার? হেসে ওঠে প্রভাত। হাসলে যে!

প্রভাত বলল, আচ্ছা তুমি আমাকে কি মনে কর? কি আবার মনে করবো? একটা অটো কিনতে কত টাকা লাগে জান? জানি না আবার? তারপর বলল, এখন মনে হয় দেড়লাখে পাওয়া যায়। উত্তরে প্রভাত বলল, আমি ঠিক জানি না। আর ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা আমি পছন্দও করি না। বাব্বারে! এত রাগ? প্রভাত বলল, আর কতদূর যাবে? বললাম তো তোমার যেখানে ইচ্ছে। তারপর বলল, কই কি যেন বলবে?

প্রভাত বলল, দেখ বুলি আমি এক গরিব রিকশাওয়ালা। হঠাৎ রেগে গিয়ে পিয়াশা বলল, থাম? তারপর বলল, তুমি যে একজন রিকশাওয়ালা সে কথা আমি জানি। বার বার ঐ এক কথা রেকর্ডে বাজিও না তো? কি করবো? আমি যে ভুলতে পারি না আমি একজন রিকশাওয়ালা। পিয়াশা বলল, কিন্তু তোমাকে ভুলে যেতে হবে প্রভাতদা যে তুমি একজন রিকশাওয়ালা।

তাহলে কি ভাববো? ভাববে তুমি একজন মানুষ। তোমার বুকের মধ্যে অনেক স্বপ্ন লুকিয়ে আছে। সে স্বপ্নগুলোকে বাস্তবে রূপ দিতে ইচ্ছে করে না?

প্রভাত হেসে বলল, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বুলি! আর নিয়মিত ভাবে তুমি আমার রিকশায় চড়লে আমারও মাথা খারাপ হয়ে যাবে। তারপর বলল, এবার বরং ফেরা যাক।

পিয়াশা বলল, আরেকটু চল না। ঐ গ্রামের পাশ দিয়ে গেলে নিশ্চয় কোন চায়ের স্টল পাওয়া যাবে। প্রভাত বলল, তা যাবে, কিন্তু আমাকে খাওয়ার জন্য জোরাজুরি করবে না কিন্তু! নিরাশ হয়ে পিয়াশা বলল, তাহলে আর দরকার নেই। বরং ফেরা যাক।

ফেরার পথে একটাও কথা বলে না পিয়াশা। প্রভাত বলল, রাগ করলে? চমকে উঠে পিয়াশা বলল, কি বললে? ও কিছু না। বাড়ির গেটে পিয়াশাকে নামিয়ে দিতেই, পিয়াশা বলল, কাল ন'টায় আসবে কিন্তু! অত সকালে? তুমি তো বেরোও ১১টার পরে। তোমার কোন অসুবিধা আছে? অসুবিধা আর কি? তাহলে ঐ ন'টায় আসবে কিন্তু!

ন'টায় কেন আসতে বলল, বুঝতে পারে না প্রভাত। মনটা তার বিভিন্ন চিন্তায় বিষণ্ণ। আজ তো সুযোগ পেয়েও কোন কথাই বলতে পারল না। প্রভাত নিজেও বুঝতে পারছে ঝড় আসছে। কিভাবে যে সে ঝড় সামলাবে বুঝতে পারে না। অথচ বিশ্বনাথের কথাগুলো তার মনকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়ে যায়। না তাকে

শক্ত হতে হবে। পিয়াশাকে বুঝিয়ে বলতে হবে, তারই মঙ্গলের জন্য তার আর আমার রিকশায় না চড়াই ভাল।

ন'টার একটু পর পর আসে প্রভাত। দেরি হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলে, আসলে একটা বাচ্চা মেয়েকে স্কুলে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতে হল তো! পিয়াশা তার কোন উত্তর না দিয়ে নিজের হাতঘড়িতে সময়টা দেখে নিয়ে বলল, এতক্ষণে নিশ্চয়ই খুলে গেছে। তারপর বলল, চল। রিকশায় উঠলে প্রভাত জানতে চাইল কোথায় যাবো? রিমঝিম অটো সেন্টার। চেন তো? চিনি। কিন্তু সেখানে কেন? কাজ আছে, চল না? মিনিট ২০/২৫-এর পথ। নেমে পিয়াশা বলল, চল! আমি কোথায় যাবো, তুমি যাও না?

আরো কয়েকটি রিকশা দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। সবাই প্রভাতের পরিচিত নয়, কিন্তু কেউ কেউ পরিচিত। তাদের কেউ একজন বলল, যা না প্রভাত, উনি যখন এত করে বলছেন, আমরা তোর রিকশা পাহারা দেব। অগত্যা ভিতরে যেতে হয় প্রভাতকে। এত বড় শোরুম। এয়ার কন্ডিশান করা সারা হলটা। একটু পরে শীতশীত লাগে তার। পিয়াশাকে আর দেখতে না পেয়ে সে বাইরে এসে দাঁড়ায়। একটু পরে সিকিউরিটি গার্ড তাকে ভিতরে ডেকে বসতে বলে। কে একজন এসে ওকে একটা ঠাণ্ডা পানীয় দিয়ে যায়। প্রভাতের বড্ড অস্বস্তি হতে থাকে। এরকম জায়গায় সে জীবনে কখনো ঢোকেনি। একটু পরে আসে পিয়াশা। এসেই বলে, না বলে কোথায় গিয়েছিলে? তার লজ্জা করল বলতে যে ওখানে শীত লাগার জন্যে সে বাইরে গিয়েছিল। বলল, রিকশাটা ঠিক আছে কিনা দেখতে গিয়েছিলাম। পিয়াশা শুধু হাসল, তারপর বলল, চল। হয়ে গেছে? হ্যাঁ হয়ে গেছে।

বেরিয়ে এসে বলল, ভীষণ খিদে পেয়েছে প্রভাতদা। চল 'দত্ত সুইট হোম' থেকে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক। প্রভাত বলল, কেন তুমি খেয়ে বেরোয়নি? তাতে কি? তারপর বলল, খেলে কি আর খিদে লাগতে পারে না? সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলল, আর কোথাও যাবে? কেন তোমার কি খুব তাড়া আছে? তাড়া আর কি? তবে চল। দত্ত সুইট হোম থেকে সিঙ্গাড়া আর মিষ্টি খেয়ে পিয়াশা বলল, এখানে একটা পার্ক আছে যাবে? এই দুপুর রোদে পার্কে? তোমাকে পাগল ছাড়া কিছু বলবে না। তাছাড়া এখন সব পার্ক বন্ধ হয়ে গেছে। না আমি যাবো না। যাবে না? না যাবো না। তাহলে তুমি চলে যাও। আমি পরে যাবো। সেই ভাল বলে প্রভাত রিকশা ফিরিয়ে নিয়ে চলে যায়। একবারও পিছন ফিরে তাকায় না। তাকালে দেখতে পেতো ছল ছল চোখে পিয়াশা তাকিয়ে আছে তার দিকে।

রাতে কারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে খালপাড়ের এই অসহায় মানুষগুলোর আস্তানায়। প্রত্যেকেই ব্যস্ত আপন আপন সামান্য যা কিছু আছে তা বাঁচাতে। কালীদাসী তার মেয়েকে নিয়ে বাইরে আসতে গেলে তার শাড়ির আঁচলে আগুন লেগে যায়। নিকুঞ্জ কোন কিছু না ভেবে শাড়িটাকেই খুলে নেয় তার গা থেকে। তাতে কালীদাসী রক্ষা পেলেও নিকুঞ্জ পায় না। আগুনে তার সর্বাঙ্গ পুড়ে যায়। সে চিৎকার করে বলে কালী রে! কালীদাসী ফিরে দেখে আগুন লেগেছে নিকুঞ্জের জামা ও লুঙিতে। মেয়েটাকে রাস্তায় শুইয়ে রেখে নিকুঞ্জকে বাঁচাতে গেলে নিকুঞ্জ তাকে ঠেলা মেরে বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে বলে মেয়েটাকে দেখ কালী! ততক্ষণে আগুনে সে ঝলসে গেছে।

পুলিশ যখন আসে তখন সব শেষ। মাথা গুঁজবার একটা ছাউনিও টিকে নেই। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় কালীদাসী কাঁদতে পর্যন্ত ভুলে যায়। লজ্জা নিবারণেরও কোন উপায় নেই। পরনে শুধু সায়া আর গায়ের ব্লাউজ ছাড়া কিছুই নেই। সংবাদ পৌঁছে যায় সত্যেনবাবুর কাছে এবং খালঘাটের মানুষের কাছে। প্রভাত ঐ অত রাতেও রিকশা নিয়ে চলে আসে। কালীদাসীকে এক পাশে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, জানতে চায় নিকুঞ্জদা কোথায় বৌদি? কালীদাসী শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

সত্যেনবাবুর ছেলেরা যুদ্ধগতিতে উদ্ধারের কাজে লেগে যায়। আগুনে নিকুঞ্জের মতো আরো দুই-তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ফোন করে একটা অ্যাম্বুলেন্স এনে তাদের সবাইকে তিনি হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। প্রভাত ঝুঁকে নিকুঞ্জকে বলে, চিন্তা করো না নিকুঞ্জদা। ভাল হয়ে যাবে। নিকুঞ্জ কোন কথা বলতে পারে না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। এই প্রথম কালীদাসীর চোখে জল। হাউ হাউ করে কেঁদে বলে, কেন তুমি আমায় বাঁচাতে গেলে গো? আমার এখন কি হবে? প্রভাত তাকে টেনে নিয়ে নিজের রিকশায় তুলে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেয়। মাকে বলে, মা বৌদিকে আর খুকুকে দেখ। আমি হাসপাতালে যাচ্ছি। কালীদাসী বলে, আমিও যাবো ঠাকুরপো। ওর মা বললেন—তুমি গিয়ে কি করবে বৌমা? রাতটুকু শেষ হোক সকালে যেও বলে, তার নিজের একটা থান কাপড় এগিয়ে দিলে কালীদাসী অসহায়ের মতো বলল, পরবো খুড়িমা? দাঁড়াও বলে প্রভাতের একটা লুঙ্গি আর জামা এনে দিয়ে বলেন, না ওটা পরো না মা, আপাতত এটা পরো। সকালে দেখছি কি করা যায়?

সেই রাতেই প্রভাত তার রিকশা নিয়ে চলে যায় হাসপাতালে। সারারাত অপেক্ষা করে সেখানে। ভোরবেলায় মারা যায় নিকুঞ্জ। সেইই সবথেকে বেশি

পুড়েছিল। ডাক্তাররা চেষ্টার ক্রটি করেননি। কিন্তু তাকে বাঁচানো যায়নি। অন্যদের ব্যাপারে ডাক্তার বলেছেন—এখনি কিছু বলা যাচ্ছে না।

গোটা খালপাড় অঞ্চলটা শ্মশানের মতো পড়ে আছে। সরকার থেকে শুকনো খাবার নিয়ে আসা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবীর দল এসেছেন সাহায্যের জন্য। সত্যেনবাবু নিজের উদ্যোগে ব্যবস্থা করছেন দুপুরে ডাল ভাত খাওয়াবার। তার ছেলেরাও প্রত্যেককে যথাসম্ভব সান্ত্বনা দিচ্ছে, ভেঙে পড়বেন না। সত্যেনদা যখন আছেন, তখন ব্যবস্থা একটা হবেই। আর সত্যেনবাবু সারাক্ষণ সামনে থেকে উদ্ধারকাজে যেমন নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তেমনি মাঝে মাঝে খোঁজ নিচ্ছেন হাসপাতালে যাদের পাঠান হয়েছে তাদের কি হল? যখন শুনলেন নিকুঞ্জ নামের একজন মারা গেছে তিনি বললেন, কোনভাবে বাঁচানো গেল না? না গেল না। চেষ্টার কোন ক্রটি হয়নি, কিন্তু এতবেশি পুড়ে গেছে যে এ কেসে বেঁচে থাকার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। সত্যেনবাবু জানতে চাইলেন, বাড়ির লোক কেউ আছে ওখানে? একটু ধরুন দেখছি।

বাড়ির লোকের খোঁজ পড়াতে প্রভাত সামনে এসে দাঁড়ায়। আপনার ফোন। প্রভাত কাঁপা কাঁপা হাতে ফোনটা নেয়। বলে— হ্যালো! আমি সত্যেন দাস বলছি। বলুন সত্যেনদা, আমি প্রভাত। তোমার বৌদি কোথায়? ওনাকে তো বাড়িতে রেখে আমি হাসপাতালে এসেছিলাম। সত্যেনবাবু বললেন, তুমি বাড়ি চলে যাও, আমি ওদিকটা দেখবো। দেহ পেতে দেরি হবে। বৌদিকে বলো যেন কোন চিন্তা না করেন। ওনার সৎকারের কাজের দিকটা আমি দেখবো। আর বাড়ি যাওয়ার সময় তুমি আমার এখানে হয়ে যেও। আচ্ছা।

কালীদাসী বলল, ও কেমন আছে ঠাকুরপো? বাঁচবে তো? প্রভাতের গলা শুকিয়ে কাঠ। সত্যেনবাবু যে শাড়িটা দিয়েছেন তা হাতেই ধরা আছে। কোন কথাই তার মুখ দিয়ে সরছে না। কালীদাসী আবার বলল, কি হ'ল ঠাকুরপো। কথা বলছ না কেন? ও কেমন আছে? বলছি বলে হাতের শাড়িটা তাকে দিয়ে বলল, এটা পরে নাও বৌদি, বলছি। উত্তরে কালীদাসী বলল—আর তোমাকে বলতে হবে না। আমি জানতাম ও আর ফিরে আসবে না। তাই তো তোমার সাথে যেতে চেয়েছিলাম, মেয়েটাও শেষবারের মতো দেখে নিতো একবার তার বাবাকে। এখন ও কাকে বাবা বলে ডাকবে? তার পরে সে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, ওগো কেন তুমি আমাকে বাঁচাতে গেলে? আমি আর বাঁচতে চাই না ঠাকুরপো। বলতে থাকে আর বুকে করাঘাত করে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। তার চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ভীড় করতে থাকে। প্রভাতের মা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, ভেঙে পড়লে তো হবে না বৌমা। ভগবান যতদিন না ডাকবেন ততদিন তো বেঁচে থাকতে হবে। একবার তোমার মেয়ের কথা ভাব।

ওর জন্যও তো তোমাকে বাঁচতে হবে। কালীদাসী বিলাপ করতে করতে বলে ওকে তোমরাই দেখো খুড়িমা। লোকটাকে তো আমিই মেরে ফেললাম। একথা আমি কি করে ভুলবো?

একটু বেলা হলে এল পিয়াশা। পিয়াশাকে কেউ সংবাদ দেয়নি। কাগজ পড়ে সে জানতে পারে যে খালপাড়ে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সব বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়, আরে খালপাড়ে তো প্রভাতের দাদা বৌদি থাকেন। তাই খোঁজ নিতে এসেছে সে, তারা কেমন আছেন? কিন্তু বাইরে থেকে কান্নার শব্দ শুনে তার বুকটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে। কে তাহলে মারা গেল? প্রভাত নয়তো?

বাড়িতে ঢুকেই সামনে প্রভাতকে দেখতে পেয়ে তার বুকটা আনন্দে ভরে ওঠে। তবে কে? জানতে চায়। কি হয়েছে প্রভাতদা? কে কাঁদছেন? প্রভাত সংক্ষেপে বলে কাল রাতে খালপাড়ে যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে তাতে নিকুঞ্জদা পুড়ে মারা গেছে। বৌদি কাঁদছে। হাঃ আল্লাহ্ তোমার এ কি বিচার!

পিয়াশা ধীরে ধীরে ভিতরে ঢুকে কালীদাসীর পাশে বসে তার কাঁধে হাত রাখে। কালীদাসী পাশ ফিরে দেখে সেদিনের সেই মেয়েটি। কালীদাসী আবারও জোরে কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমি সর্বনাশী গো ভাই, আমার জন্যই লোকটাকে চলে যেতে হল।

পিয়াশা তার নিজের পরিবারে কোন মৃত্যু দেখেনি। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে তো কোন যোগাযোগই নেই। তাই শোকে কিভাবে সান্ত্বনা দিতে হয় তা সে জানেও না। কালীদাসীর এই বিলাপে তাই সে চুপ করেই থাকে। যারা কান্না শুনে ভিড় জমিয়েছিল, তারাও একে একে ফিরে যায়। সত্যেনবাবু বলেছিলেন, এখন আর তোমার বৌদিকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার দরকার নেই। আমি সংবাদ দিলে তবেই তোমার বৌদিকে নিয়ে যেও।

সকাল থেকে দুপুর, তারপর বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়, কোন সংবাদ আসে না। কালিদাসী অধৈর্য হয়ে ওঠে। সারাদিন তাকে কেউ খাওয়াতে পারেনি। পিয়াশাও তাকে অনেক অনুরোধ করেছিল, কিছু খেয়ে নাও ভাবী। কালীদাসী শুধু বলেছে, আমার গলা দিয়ে কিছু নামবে না ভাই। আমাকে তোমরা খেতে বল না। বরং মেয়েটাকে একটু দেখ। যদি দুধটুধ কিছু খাওয়াতে পার।

সন্ধ্যাতেও যখন খবর এলো না, তখন কালীদাসী বলল, আমি আর তোমাদের কোন কথা শুনবো না। আমি হাসপাতালে যাবোই। প্রভাত বলল, পাগলামী করো না বৌদি। তারপর বলল, এইসব অপঘাতে মৃত্যু নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়। সব ঝামেলা মিটে গেলে সত্যেনদা ঠিক সংবাদ পাঠাবেন। কালীদাসী ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, তাই নিয়ে তুমি বসে থাক ঠাকুরপো? তোমার আর কি? গ্রাম সম্পর্কে ভাই ছাড়া

তো কিছু নয়। দেশের বাড়িতে তো ছায়াও মাড়াতে না, তুমি কি বুঝবে? কথাটা খট করে কানে বাজে পিয়াশার। কালীদাসী ভাবী তার মানে প্রভাতের নিজের বৌদি নয়, গ্রাম সম্পর্কিত বৌদি! সংবাদটায় তার ভিতরটা তোলপাড় হতে থাকে। এর মধ্যে সে দু'বার বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছে। এতক্ষণ তার মনে হয়েছিল, প্রভাতের পাশে দাঁড়ানো তার কর্তব্য, এখন মনে হচ্ছে গ্রাম সম্পর্কিত দাদা যখন আর নেই, সব কিছু মিটে গেলে এই গ্রাম সম্পর্কিত বৌদিই প্রভাতের সব দায়িত্ব নিতে পারবে। আর এই কথা যতোবার ভাবছে ততই সে ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ যে কালীদাসীর জন্য তার এক গভীর মমতা বোধ ছিল এখন মনে হচ্ছে, কিসের মমতা? কোন মমতাই নেই তার কালীদাসীর জন্য। কেনই বা থাকবে? তার তো আঁকড়ে থাকার লোক রয়েছে হাতের কাছে।

কালীদাসীর বয়স আর কতই বা হবে? প্রভাতের থেকে মনে হয় ছোটই হবে। এক সন্তানের মা হলেও দেহে কোন ভাটার টান নেই। এই বৌদির প্রতি প্রভাতের যে টান সে কি এমনি এমনি? শুধুই কর্তব্যবোধ? আর কোন ব্যাপার নেই? সে প্রভাতের মাকে গিয়ে বলে, খালা আমি আসছি। সে কি মেয়ে, তুমি তো বললে বৌমার সঙ্গে তুমিও হাসপাতালে যাবে। হ্যাঁ বলেছিলাম খালা, কিন্তু আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে? প্রভাতের মা বললেন, তা অবশ্য ঠিক। তারপর বললেন, কিন্তু মেয়ে তুমি আমায় খালা না বলে মাসীমা, কাকীমা এসব কিছু বলতে পার না? পারব না কেন? তারপর বলল, মাসীমা, কাকীমা কেন, মাও বলতে পারতাম। কিন্তু এখন আর কিছুই পারব না। কেন? জানি না বলে যখন দ্রুত বেরিয়ে যেতে চায়, প্রভাত বলে, আর একটু অপেক্ষা কর না বুলি? হয়তো এখনি সত্যেনদা খবর পাঠাবেন। হয়তো পাঠাবেন, কিন্তু আমি আর থাকতে পারব না। আর একটা কথা, আমাকে আর কোনদিন বুলি বলে ডাকবে না প্রভাতদা। আমার আম্মিই ডাকে না, তাহলে তুমি কেন ডাকবে?

চলে যায় পিয়াশা। প্রভাত আপন মনে বলে, কি যে খেয়ালী মেয়ে? আখতার সাহেব যে কেন ওকে কিছু বলে না কে জানে? প্রভাত ওকে হাল্কা ভাবে উড়িয়ে দিলেও কালীদাসী তা পারে না। স্বামীর মৃত্যুশোকের থেকেও বড় হয়ে ওঠে তার প্রতি পিয়াশার এই ঈর্ষা। যে ঈর্ষা তার আচরণে ফুটে উঠলো সে ব্যাপারটা কালীদাসীর মাথায় কখনো আসেনি। ভবিষ্যতে কি হবে তা ভবিষ্যৎই বলতে পারে, কিন্তু এখন পর্যন্ত তার মনে এ প্রশ্ন একবারও উকি মারেনি। অথচ পিয়াশা সেই অনাগত ভবিষ্যৎকে তার সামনে এনে দ্রুত পালিয়ে গেল। হায়রে বোকা মেয়ে! ভালবাসাকে কি এমনি করে ছুঁড়ে ফেলা যায়?

কালীদাসী গ্রামের পাঠশালায় পড়েছিল কিছুদিন। একটু আধটু লিখতে পড়তেও পারে। সেই কালীদাসী যখন গ্রামের পাঠশালার পড়া শেষ করে আর

একটু বড় হয়েছে, ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে, তার বাবা-মা তার বিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্র খুঁজতে আরম্ভ করে। এই সময়ে গ্রামের ছেলে সিরাজকে তার ভাল লেগে যায়। আঁকাবাঁকা অক্ষরে তার সেই ভালবাসার কথা সে জানিয়েওছিল সিরাজকে। আর সিরাজও সে আহ্বানকে উপেক্ষা করতে পারেনি। তাদের আশনাই বেড়ে চলতে থাকে। গ্রাম বলে তা আর চাপা থাকে না। দুই সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমে পাশাপাশি বাস করলেও সামাজিক সম্পর্ক কখনো গড়ে ওঠেনি। সুতরাং সিরাজ ও কালীদাসীর ব্যাপার নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মুরুব্বীদের নিয়ে সালিশী বসে। স্থির হয় এই অবৈধ সম্পর্কের জন্য উভয় পক্ষ ৫০০ টাকা করে জরিমানা দেবে। আর কালীদাসীর বিয়ে দিতে হবে একমাসের মধ্যে। আর এই এক মাস সিরাজ গ্রামে থাকতে পারবে না।

রায় শুনে কালীদাসীর খুব কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু সালিশী বোর্ডের এই রায় না মেনেও যে কোন উপায় নেই তা সে ভালভাবে বুঝতে পেরেছিল। একবার মনে হয়েছিল সে পালিয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় যাবে? সিরাজ তো গ্রামছাড়া।

কালীদাসীর কথা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় কেউ আর তাকে বিয়ে করতে রাজি হয় না। সালিশী বোর্ডের আর একটি রায় ছিল, একমাসের মধ্যে যদি তার বিয়ে না হয় তবে তাদের পরিবারকে একঘরে হয়ে থাকতে হবে। গ্রাম্যজীবনে এ বড় কঠিন শাস্তি। কালীদাসী মনে মনে ঠিক করে যে তাকে বিয়ে করবে তাকে সে ভীষণ ভালবাসবে। তার মনে কোন প্রশ্ন উঠতে সে দেবে না।

অবশেষে নিকুঞ্জের মা ১০০০ টাকা পণ নিয়ে কালীদাসীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে রাজি হয়। প্রভাতের একটা বোন ছিল, তার সঙ্গে নিকুঞ্জের বিয়ের পাকা কথা হয়েও নিকুঞ্জের মা সে বিয়ে ভেঙে দেন ১০০০ টাকা পণের লোভে। আর তাই নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে চরম মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। কালীদাসীর চরিত্র নিয়ে যা খুশি অপপ্রচার ছড়াতে থাকে প্রভাতের পরিবার। প্রভাত তো একদিন কালীদাসীকে বেশ্যা বলেও গালি দেয়। কিন্তু প্রভাতের মা অদ্ভুত সংযমের পরিচয় দিয়ে নিজেকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে রাখার চেষ্টা করেন। সেই থেকে কালীদাসী প্রভাতদের পরিবারের সবাইকে ক্ষমা করতে পারলেও প্রভাতকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারে না।

অথচ আজ সেই কালীদাসী প্রভাতের আশ্রয়ে। এতবড় শহরে তার একমাত্র আপনজন। একথা ঠিক যে, প্রভাত যেদিন এই খালপাড়ের বাড়িতে প্রথম আসে কালীদাসী সেই আগের কথা কিছুতেই ভুলতে চায়নি কিন্তু প্রভাতের নরম ব্যবহার কালীদাসীর মনকেও নরম করে দেয়। সেও ভুলে যায় গ্রামের সেই কুৎসিত ঝগড়াকে।

দুয়েকবার যে সিরাজের কথা তার মনে আসেনি এমন নয়? কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টায় তা সে ভুলে যেতে চেয়েছে। নিকুঞ্জকে সে সবটুকু মন দিয়ে ভালবাসতে চেয়েছে, চেষ্টাও করেছে। এর মধ্যে প্রভাত যে তার মনের উপর একদম কোন ছায়া ফেলেনি এমনটা নয়। কিন্তু সে নিজেকে বুঝিয়েছে প্রভাতকে সে ভালবাসবে আপন দেওরের মতো। কোন পাপ যাতে তার মনকে স্পর্শ না করে তার জন্য সে সচেষ্টও থেকেছে। একটা দিন একটা বারের জন্যও সে প্রভাতকে নিয়ে অন্যরকম কিছু ভাবেনি।

কিন্তু তার মনের এই দৃঢ় অবস্থানকে তালগোল পাকিয়ে দিয়ে গেল পিয়াশা নামের এই বড়লোকের মেয়েটি। এতদিনে লোক পরম্পরায় সে জেনে গেছে পিয়াশা আখতার সাহেবের মেয়ে। যে আখতার সাহেব একটা হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করে বহাল তবিয়তে এখানে বাস করছে। আখতার সাহেব যে একজন নামকরা উকিল তা জানতে পেরেছে এই কিছুদিন আগে রাণা ও চ্যাং-এর সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড হলে। এমন যার প্রতাপ তার মেয়ে যে প্রভাতের মতো এক সামান্য রিকশাওয়ালাকে ভালবাসতে পারে এটা তার কল্পনায়ও আসেনি। তবে সবসময় মনে হয়েছে এক চঞ্চল মেয়ের এ শুধু খেয়াল। আর মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছে প্রভাত যেন খাদে না পড়ে যায়।

কালীদাসীর ভাবনা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। সত্যেনবাবুর মতো নামকরা লোকের সঙ্গে তার সম্পর্ক, তার প্রতি আখতার সাহেবের স্নেহ সামান্য রিকশাওয়ালা প্রভাতকে যে অনেক উঁচুতে তুলে দিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রভাত যে এদের সংস্পর্শে এসেও নিজের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন এটা ভাবতে কালীদাসীর খুব গর্ব হয়। আর আনন্দ হয় তার প্রতি প্রভাতের সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে। ভাবনাগুলো তাকে এমন মগ্ন করে রাখে যে সে ভুলে যায়, তার স্বামী, তার একমাত্র মেয়ের বাবা আর ইহজগতে নেই। বৌদি! প্রভাতের ডাকে চমকে ওঠে কালীদাসী। আর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসে বাস্তবে। বলে, বল ঠাকুরপো। প্রভাত বলে, সত্যেনদা খবর পাঠিয়েছেন আমাদের যেতে। কালীদাসীর যে ভয়টা আস্তে আস্তে চলে গিয়েছিল, তাই ফিরে আসে ধীরে ধীরে। ঐ ভয়ঙ্কর ছবিটাকে তাকে দেখতে হবে? বলল, আমাকেও কি যেতে হবে ঠাকুরপো? উত্তরে প্রভাত বলল, তোমাকে তো যেতে হবে বৌদি! কয়েক জায়গায় তোমার সই না হলে যে ডেডবডি পাওয়া যাবে না। কালীদাসী জানতে চায় ওকে কি আবার পোড়ানো হবে? হিন্দুদের সংকার তো এইভাবেই হয় বৌদি! তারপর বলল, চল আর দেরি করো না।

৭

কারা এ কাজ করেছে সত্যেনবাবুর মতো ঝানু লোকও এখনো তার কূলকিনারা করে উঠতে পারেনি। রাণারা তো জেলে। তাহলে? অন্য কোন শক্তি নিশ্চয়ই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তাদের কাজে লেগে পড়ার আগে সত্যেনকে কাজে লেগে পড়তে হবে। রাজ্য নেতৃত্বও সত্যেনের 'পরে পূর্ণ আস্থা রেখে কাজে নেমে পড়তে বলেছে। সত্যেন তাই ভীষণ ব্যস্ত। এই ঘটনার আগে প্রভাতকে দিয়ে একটা সমীক্ষা করেছিলেন, তাতে প্রায় চল্লিশ শতাংশ মানুষ সত্যেনবাবুর দেওয়া প্রস্তাবে রাজি হয়নি। তাদের বক্তব্য ছিল, উনি যখন সবাইকে কাজ দেবেন বলেছেন, তখন সেটাই দিন না। আমরা সেই পয়সায় নিজেদের ঘর নিজেরা গড়ে তুলবো। শুনে অবাক হয়েছিলেন সত্যেনবাবু। এ তো ওদের কথা নয়। ওরা যে উচ্ছেদ হতে পারে জেনেও এই জোরটা তারা পাচ্ছে কোথায়? রাণার দলে আর কারা আছে বুঝতে পারেন না তিনি। কিন্তু এখন যা অবস্থা তাতে সত্যেনবাবুর খুশি হওয়ার কথা। কারণ এখন আর ওদের সত্যেনবাবুর প্রস্তাবে রাজি না হয়ে উপায় নেই। মাত্র পাঁচজন লোক তার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে বলেছে আমরা অন্য কোথাও চলে যাব তবু এই শর্তে কিছুতেই রাজি হতে পারব না। প্রভাত তাদের বোঝাবার চেষ্টা করে, কোথায় যাবে ভাই? তাছাড়া একবার ভেবে দেখ রোজ যেখানে তোমাদের কাজ পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই, সেখানে উনি তোমাদের কাজের নিশ্চয়তা দিচ্ছেন, মাথার উপর ছাউনির ব্যবস্থা করবেন বলে কথা দিয়েছেন, হাফ কাঠা করে জমি দেবেন, এটা কি আমাদের মতো মানুষের পক্ষে কম পাওনা? ওদের মধ্যে একজনের নাম খোকন, খোকন মল্লিক। সে বলল, আমি এখানে তোমাদের থেকে অনেক আগে এসেছি। তোমাদের ঐ সত্যেনবাবুকেও আমি তোমাদের থেকে বেশি চিনি। তোমাদের কাছে উনি দাতা কর্ণ হতে পারেন, কিন্তু আমি ওঁকে ঘৃণা করি। কত মেয়ের যে সর্বনাশ উনি করেছেন? প্রভাত চিৎকার করে বলে. খোকনদা? অনেক হয়েছে। এবার চুপ কর। খোকনও ছাড়বার পাত্র নয়। বলল, থামব কেন? যা সত্যি তা বলতে আমি ভয় পাই না। উত্তরে প্রভাত বলল, ভয় পাওয়ার দরকার নেই, কিন্তু দুঃসাহসও ভাল না। সত্যেনদা সম্পর্কে যে ইঙ্গিত তুমি করলে তা আর কেউ করেনি। আর তোমার কাছেই বা কি প্রমাণ আছে জানি না। কিন্তু যা বলেছো, আর কখনো তা বলো না খোকনদা। এখানকার এতগুলো মানুষ কিন্তু ওনার দিকেই তাকিয়ে আছে। তা থাক না তোমরা তাকিয়ে, কে তোমাদের না করছে? আমি ওনার কোনো সাহায্য নেব না। প্রয়োজনে এখান থেকে চলে যাব।

কথাটা শোনা ইস্তক প্রভাত অনেকবার ভেবেছে সত্যেনদা সম্পর্কে খোকনদা

যা বলেছে তা কি সত্যি না ব্যক্তিগত কোন রাগ আছে এর পিছনে? একসময় খোকানদা তো ঐ খালঘাটেই বাস করত। তারপর কি কারণে ওখান থেকে উঠে এসে এই খালপাড়ে বাস করছে জানে না প্রভাত। মনটা তার বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু সত্যেনবাবুর উপকারকেই বা সে ভুলবে কি করে? বিশেষভাবে নিকুঞ্জদার সৎকার থেকে আরম্ভ করে কালীদাসী বৌদির যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার যাবতীয় ব্যবস্থা তিনি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করেছেন। এমনকি প্রভাতকে একদিন বলেছেন, তোমার বৌদি তো সামান্য লেখাপড়াও জানে তাই না? প্রভাত হ্যাঁ করাতে বললেন, লোকের বাড়ি বাড়ি কাজ না করে উনি কি কোন বেসরকারী অফিসে মাস মাহিনার কাজ করবে? যদি রাজি থাকে তাহলে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে বলত? সে কথা কালীদাসীকে বলতে কালীদাসী বলল, আমাকে একটু ভাবতে দাও ঠাকুরপো? সবে তো তোমার দাদার কাজটা মিটেছে, আর তার জন্য উনি যা করেছেন, তাতে ওনার অবাধ্য হওয়া আমার সাজে না। তবুও কয়েকটা দিন সময় চাইছি।

নিকুঞ্জের যাবতীয় কাজকর্ম প্রভাতের ওখানে বসেই হয়। অতবড় মানী লোক শেখ আখতারও একবার এসেছিলেন প্রভাতের এই ভাড়া বাড়িতে। কিন্তু আসেনি পিয়াশা। কালীদাসী একবার জানতে চেয়েছিল, তোমার বুলি তো একবারও এলো না ঠাকুরপো? না এলে কি আর করা যাবে বৌদি? বড়লোকের খেয়াল, এই রোদ তো এই বৃষ্টি। ও কি জানে না তোমার দাদার কাজ আজ? নিশ্চয়ই জানে। আখতার সাহেব জানেন আর ও জানে না? কালীদাসী বলল, ওর সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া করনি তো? উত্তরে প্রভাত বলে, কি যে বল বৌদি? ওর সঙ্গে আমি কেন ঝগড়া করতে যাব? তোমার সঙ্গে দেখা হয় না? হয়। তবে ও এখন আর আমার রিকশায় ওঠে না। কেন? জানি না বৌদি। তারপর বলল, আজকের দিনে ওর কথা থাক না বৌদি। সে না হয় থাক। কিন্তু ও কেন তোমাকে এড়িয়ে চলে জানতে চাইবে না? না। কালীদাসী আর কথা বাড়ায় না।

কাজকর্ম মিটে গেলে কালীদাসী একদিন বলল, ঠাকুরপো, তুমি এবং খুড়িমা আমার জন্য যা করলে সে ঋণ আমি জীবনেও শোধ করতে পারব না। প্রভাত হেসে বলল, কে তোমাকে শোধ করতে বলেছে? থাক না ওটুকু ঋণ। অন্তত ঋণের কথা ভেবে আমায় যে ঘেন্না করতে পারবে না এটুকু সান্ত্বনা থাক আমার জন্য।

এমন সুন্দর কথা সে যেন জীবনে কখনো শোনেনি। বলল, তুমি তো ভারি সুন্দর কথা বলতে পার! উত্তরে প্রভাত বলল, আর লজ্জা দিও না বৌদি। দেশের বাড়িতে গোঁয়ারগোবিন্দ বলে আমার বেশ একটা নামডাক ছিল, নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে? সে আর নেই? তোমার এই স্বভাবের জন্য কত জায়গায় যে ঝামেলা

প্যাকিয়েছো? হ্যাঁ, আর শেষ ঝামেলা মনে হয় তোমার সঙ্গে, তোমাদের সঙ্গে। কিন্তু বিশ্বাস কর বৌদি আমি কিন্তু ওকথা বলতে চাইনি। আমি জানি। তুমি জান? বাঃ রে জানব না? তুমি তারপর কতবার ক্ষমা চাইবার জন্য আমায় একা পেতে চেয়েছো। কিন্তু আমি তোমায় পাত্তা দিইনি, ঠিক কিনা বল? একদম ঠিক কথা বৌদি। কিন্ত তুমি আমার মনের কথা জানলে কি করে? আহারে, আমি জানব না তো কে জানবে তোমার মনের কথা? আমি যে তোমার মনের মধ্যে বসে আছি গো ঠাকুরপো, তুমি বুঝি তা জান না? হাসে কালীদাসী। হাসলে তার দুই গালে টোল খায়। ভারি সুন্দর লাগে তাকে। প্রভাত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কালীদাসীর দিকে। কালীদাসী জিজ্ঞাসা করে অমন করে কি দেখছো ঠাকুরপো?

তোমাকে, বলে প্রভাতও হাসে। কালীদাসী কপট রাগ দেখিয়ে বলে, অমন করে দেখলে হবে? কাজে যেতে হবে না? লজ্জা পেয়ে বলে এই যাই বৌদি!

বেরিয়ে যায় প্রভাত। প্রভাত বেরিয়ে গেলে একা একা হাসতে থাকে কালীদাসী আর মনে মনে বলে, পাগল! কাকে পাগল বলছো গো বৌমা। মাথার কাপড়টা টেনে নিয়ে কালীদাসী বলে, কাকে আর বলবো খুড়িমা? বলছি আমার ভাগ্যকে। তারপর বলল, নাতনী খুব জ্বালাচ্ছে তো! আরে না না। ও তো এখন ঘুমুচ্ছে। ওঃ বলে বলল, ঠাকুরপো বলছিল সত্যেনবাবু যে ঘরগুলো করে দেবেন বলেছিলেন তা প্রায় করা হয়ে গেছে। ভাবছি অনেক দিন তো হল, এবার আমি যাবো। যাবো মানে? কোথায় যাবে? কোথায় আর যাবো? আমার ভাগ্যটাই তো এই রকম। কাউকে সুখ দেওয়া আমার কপালে নেই, আমার সংস্পর্শে ঠাকুরপোর কপাল পুড়ুক তা তো আমি চাইতে পারি না, তাই ভাবছি তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যাবো। প্রভাতের মা বললেন, চলে যাবে প্রভাত জানে? এখনো বলা হয়নি খুড়িমা। কিন্তু আর কতদিন ঘাড়ে বসে খাব? তাছাড়া আমার কাজগুলো টিকে আছে কিনা তাও তো জানি না। প্রভাতের মা বললেন, না থাকে আবার জোগাড় করে নেবে। তুমি আছ বলে প্রভাত আমার সঙ্গে বসে খানিকক্ষণ গল্প করে। কোন মা না চায়, তার সন্তান তার মাকে কিছুটা সময় দিক। তুমি চলে গেলে আবারও আমি একা হয়ে যাব। কালীদাসী বলল, একা হয়ে যাবে কেন? ঘরে একটা সুন্দর টুকটুকে বৌ নিয়ে এসো না? হায়রে পোড়া কপাল। তা হলেই হয়েছে। কম বলেছি ওকে? বলে কি জান? কি? বলে যে তোমাকেই ভালভাবে রাখতে পারছি না আবার একটা বৌ? কেমন হবে কে জানে? তার চেয়ে এই ভালই আছি, তাছাড়া ঘরে তো বৌদি আছে। কালীদাসী বলে, বৌদি আর বৌ তো এক নয় খুড়িমা? বুঝি সব মা। কিন্তু ওকে বুঝাবে কে? আচ্ছা আমি বোঝাবো। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্রভাতের মা বলে, দেখ বুঝিয়ে। কিন্তু তুমি চলে গেলে মেয়েকেও তো নিয়ে যাবে তাই না? তা ছাড়া আর কি করবো? যেমন হতভাগীর গর্ভে

জন্মেছে ওকেও তো তার বোঝা বইতে হবে। প্রভাতের মা বললেন, একান্তই যদি চলেই যাও ওকে আমার কাছে রেখে যাবে তো? খুড়িমা!

জানেন এ অসম্ভব। কোন মাই তা পারে না। তবু মেয়েটা যে কি মায়ায় তাকে জড়িয়েছে, ও চলে যাবে এ যেন ভাবতেই পারেন না। কি অদ্ভুত এই মানুষের মন। কোথায় যে কার স্নেহের বাঁধন কিভাবে কাকে জড়িয়ে বাড়তে থাকে আগে থাকতে কেউ তা বলতে পারে না।

খুড়িমা চলে গেলে কালীদাসীর ভাবনাগুলো ডানা মেলে। সে ভালভাবেই বুঝতে পারে পিয়াশা নামের মেয়েটি প্রভাতকে ভালবেসে ফেলেছে। যদিও এ ভালবাসার পরিণতি পাওয়া সম্ভব নয়, তবু ভালবাসতে তার কোন অসুবিধে হয়নি। ভালবাসা মনের মধ্যে জন্ম দেয় ঈর্ষা। পিয়াশার মনের মধ্যে সেই ঈর্ষা, আর ঈর্ষা কাকে? সদ্য বিধবা এক গ্রাম্য অশিক্ষিত মেয়েকে। ধারে ও ভারে কোনদিক দিয়ে যে তার যোগ্য নয়। পিয়াশা অবুঝ হলেও প্রভাত অবুঝ নয়। প্রভাত জানে যা সম্ভব নয়, কোনদিনও সম্ভব হওয়ার নয়, সেখানে পা না দেওয়াই ভাল, দেয়ওনি। কিন্তু তার চোখে এক তীব্র লালসা দেখেছে কালীদাসী, মুখে যতই সে বৌদি বৌদি বলে কথা বলুক না কেন, ভিতরটা যে তার ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারে সে। কিন্তু যে উপকার প্রভাত করেছে, সেখানে তাকে সে কোনভাবেই সকলের সামনে হাস্যাস্পদ করতে পারবে না। তার মনটাও যে ধীরে ধীরে ঐ একই দিকে এগিয়ে চলেছে এ সত্য তার চেয়ে তো কেউ বেশি জানে না।

কিন্তু কালীদাসীই বা কি করবে? কতই বা বয়স তার, ২৩/২৪ হবে। প্রভাত আর ও তো একই বয়সী। বরং প্রভাত সামান্য বড়ও হতে পারে। গ্রামের পাঠশালায় প্রভাত তার থেকে এক ক্লাশ উপরে পড়তো। কালীদাসী আজীবন যে সত্য গোপন করে এসেছে এখানে থাকলে তা আর গোপন থাকবে না। সিরাজকে ভালবাসার আগে এই প্রভাতই তাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু ও ছিল খানিকটা ডাকাবুকো স্বভাবের। কালীদাসীর এই দুর্বল মনের খোঁজ রাখার কোন প্রয়োজনই সে বোধ করেনি।

কিন্তু নারীর মনে যখন ভালবাসার জন্ম হয় সে কারো কাছে তা ঢেলে দিতে চায়। তার দুর্বল মন এই ভালবাসার বোঝা আর বইতে পারে না। কিন্তু কে সেই পুরুষ যে তার ভালবাসাকে উপহাস না করে প্রশ্রয় দেবে, তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলবে যৌবন জোয়ারে। মন তখন উথাল পাথাল। ভালবাসার মানুষ খুঁজে ফিরেছে সে।

খালি গলায় গান গেয়ে ফেরে সিরাজ। রাত নেই, দিন নেই আপন মনে গান গেয়ে সে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। তার এই আপনভোলা স্বভাব কালীদাসীকে

তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। কালীদাসী পাগল হয়ে ওঠে তার কাছে নিজেকে সঁপে দিতে। সেইসময় একদিন আধোচাঁদ অন্ধকারে একাকী সিরাজের খালি গলার গান শুনে তালগাছটার আড়ালে কালীদাসী তাকে ডাকে সিরাজ ভাই। চমকে ওঠে সিরাজ। কিন্তু আশেপাশে কাউকে না দেখতে পেয়ে আবারো সে খালি গলায় গান ধরে

কোন আকাশে আছো তুমি আমার হৃদয়তারা
এত ডাকি তবু কেন দাও না ওগো সাড়া,
আমি, খুঁজি তোমায় পথে পথে
সুর তুলি যে এক তারাতে
গহন রাতের অন্ধকারে
তোমায় দেখতে যে চাই পাশে
হয় না দেখা
নয়ন পারে শুধু তোমার আঁচলখানি ভাসে
ওগো, পলক তরে এসো তুমি,
ধরার বুকে আকাশ চুমি
মন যে আমার তোমার লাগি পাগলপারা।

এ তো কালীদাসীরই মনের কথা। তার মনও যেন এমনি কাউকে খুঁজে ফেরে। এবার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুত সিরাজের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বুকে অসীম সাহস সঞ্চয় করে বলে, এই দেখ সিরাজ ভাই আমি এসেছি। তারপরে বলে, তুমি তো আমায় খুঁজছো, তাই না?

চমকে উঠে সিরাজ, বলে, কে তুমি? খিল খিল করে হেসে উঠে কালীদাসী, বলে, যাকে তুমি খুঁজছো পথে পথে তাকেই তুমি চেনো না সিরাজ ভাই? আমি যে তোমার মনের মানুষ। তোমার ঐ মিষ্টি গান আমায় শিখিয়ে দেবে?

সিরাজ বুঝতে পারে না কে এই দুঃসাহসী মেয়েটি। সে নিজেই তো জানে না সে কাকে খুঁজে ফিরেছে। নবমী আঁধার যেন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। গানপাগল সিরাজ নামেই তাকে সবাই ডাকে। গানের মধ্য দিয়েই সে পৌঁছিয়ে যেতে চায় সেই অশরীরী নারীর কাছে, রক্তমাংসের কোন নারী তার কল্পনায়ও নেই। অথচ যে নারী তার সাথে কথা বলছে সে তো বাস্তব। বলল, কে তুমি? তোমাকে তো আমি খুঁজিনি। তুমি চলে যাও আমার সামনে থেকে। কিন্তু আমি যে তোমায় খুঁজেছি, আমি কালীদাসী।

চমকে ওঠে সিরাজ। কালীদাসী? হিরুকাকার মেয়ে? কি চাও তুমি আমার কাছে? আমি তোমাকে চাই সিরাজ ভাই? ভুল করছো কালীদাসী। আমি কোন রক্তমাংসের নারী চাই না। করুণাময় আল্লাহ আমার প্রেমিকা।

মিথ্যে কথা। ও শুধু নিজেকে ভুলানো। একবার আমায় স্পর্শ করে দেখ, তখনি বুঝতে পারবে তুমি আমাকে না আল্লাহকে চাও? বলেই সিরাজের একটা হাত জোর করে ধরতেই সিরাজ থর থর করে কেঁপে ওঠে। কালীদাসী হেসে উঠে বলে, কি হল সিরাজ ভাই? কাকে চাও তুমি? আমাকে না তোমার করুণাময় আল্লাহকে?

সিরাজ ধীরে ধীরে বলে, জানি না কালী আমি কিছু জানি না। কালীদাসী বলল, তুমি না জানলেও আমি জানি, তুমি আমাকে চাও। হয়তো হবে, এই বলে আরো জোরে কালীদাসীর হাতটা চেপে ধরে।

সেই শুরু। পরের ইতিহাস তো অন্য। কালীদাসী আজো ভেবে পায় না সেদিন এমন বাচালতা সে কিভাবে করল? সিরাজ মোটেই তার সমবয়সী নয়।, তবু তার হাতে নিজেকে সঁপে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয়নি কালীদাসীর। ভাবারও চেষ্টা করেনি, গ্রামীণ সমাজে এমনটা যে একেবারেই অসম্ভব।

মাঝের বছরগুলিতে কালীদাসী সিরাজকে ভুলে যেতে চেয়েছে। আজ জীবন যখন নতুন মোহনায় এসে দাঁড়িয়েছে, নতুন করে চোখের সামনে ভেসে উঠছে সেই পুরনো ছবিগুলো। তীব্র এক অভিমান আবারো তাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে সিরাজের দিকে। যখন সালিশী সভা বসেছিল কালীদাসী অপেক্ষা করেছিল সিরাজ কিছু একটা করবে। অন্তত সিরাজ তাকে বলবে, চল কালী আমরা পালিয়ে যাই। পথে পথে গান গেয়ে যা পাবো তাতেই আমাদের চলে যাবে। কিন্তু সিরাজ তো সে সব কিছু করল না, বরং গ্রাম থেকে সে পালিয়ে গেল। যতদিন কালীদাসী গ্রামে ছিল একদিনের জন্যও সে গ্রামে ফেরেনি। ঐ যে কথায় আছে না জীবনের প্রথম ভালবাসা মরেও মরে না। সেদিন তার বিরুদ্ধে যত অভিমানই থাক, আজ কিন্তু ভীষণ ভাবে মনে পড়ছে তাকে। কেমন আছে সিরাজ? কোথায় আছে সে? সে কি নতুন করে তার মনের মানুষ খুঁজে পেয়েছে?

আচ্ছা সিরাজ যদি তার সামনে এসে দাঁড়ায়, কি করবে সে? তাকে কি সে ভীরু, কাপুরুষ বলে তাড়িয়ে দেবে? না তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলবে, আমার সব বাঁধন ছিঁড়ে গেছে সিরাজ ভাই। এবার তুমি আমায় নিয়ে চল তোমার যেখানে ইচ্ছে। আজ আমি স্বাধীন। বাধা দেওয়ার কেউ নেই। কি হল সিরাজ ভাই? চুপ করে আছ কেন? তুমি কি আর আমায় ভালবাস না? কি? মেয়েটির কথা ভাবছো? না না ওকে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। খুড়িমা ওর দায়িত্ব নিয়েছে। শুধু তুমি আর আমি। আচ্ছা সিরাজ ভাই তুমি পালিয়ে গেলে কেন? তোমার মনে কি একবিন্দু দয়ামায়া ছিল না? একবারও কেন ভাবলে না আমার কি হবে? তবু তোমাকে আমি আজো ভালবাসি সিরাজ ভাই ঠিক আগের মতো। এমনি এক আলো আঁধারি ভাবনা তাকে আচ্ছন্ন করে থাকে।

কখন যে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়েছে টের পায়নি কালীদাসী। প্রভাতের ডাকে

যেন সম্বিৎ ফিরে পায়। এতক্ষণ কি তাহলে সে স্বপ্ন দেখছিল? প্রভাত বলে, তোমার কী শরীর খারাপ বৌদি? তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসে বলে, না তো! তুমি কখন এলে? এই তো কিছুক্ষণ আগে। মা বলল, যে, তোমার নাকি শরীর খারাপ? কে খুড়িমা? উনি কি আমায় ডেকেছিলেন? হ্যাঁ সন্ধ্যা হতে অনেকবার ডেকেছেন। তারপর ভাবলেন, কদিন তো অনেক ধকল গেল, হয়তো শরীরটা ঠিক নেই। কালীদাসী বলল, না না ঠাকুরপো আমি ঠিক আছি। তারপর বলল, আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে? প্রভাত তার কোন উত্তর না দিয়ে মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে বাইরে চলে গেল।

কালীদাসী রান্নাঘরে এসে দেখে একটা ইলিশ মাছ কুটছেন খুড়িমা। কালীদাসী বলল, এতবড় একটা ইলিশ মাছ, এর তো অনেক দাম খুড়িমা? তা তো জানি না বাপু। প্রভাত তো বলল, আজ নাকি ইলিশ মাছ খুব সস্তা, তাই একটা কিনে আনল। কতদিন এ বাড়িতে মাছ আসে না বলত বৌমা। ওর ইচ্ছে হয়েছে তাই নিয়ে এসেছে। তুমি আবার এ নিয়ে কিছু বল না।

উত্তরে কালীদাসী বলল, আমি আর কি বলবো খুড়িমা? আমার নিজেরই তো খারাপ লাগে, এক পয়সা দেওয়ার ক্ষমতা নেই। অথচ বসে বসে ওর অন্ন ধ্বংস করছি।

উত্তরে তিনি বললেন, ঐ তোমার এক কথা বউমা! আচ্ছা নিকুঞ্জ যদি আমার পেটের ছেলে হ'ত প্রভাত কি তোমায় ফেলে দিত? তারপর বললেন, কতদিন আঁশ রাধি না বৌমা, তাই রান্নাটা কিন্তু তুমি করবে, ও যা যা খেতে চায় তাই করে দেবে। আহা কতদিন যে ছেলেটা একটু ভালমন্দ খেতে পায় না।

কালীদাসী বলল, আমি আঁশ রাধবো? তুমি বলছ খুড়িমা? কেন তোমার আঁশ রাঁধতে অসুবিধা কোথায়?

উত্তরে বলল, সদ্য বিধবা আঁশ ছোব? ওমা তাই তো! তারপরে বললেন, তুমি কি মাছ মাংস খাবে না ঠিক করেছো নাকি? তাই তো নিয়ম খুড়িমা।

প্রভাতের মা বললেন, নিয়ম আমিও জানি। আমি নিজেও তো সেই নিয়ম অনেকদিন পালন করেছি। বড় খোকার কাছে যখন ছিলাম তখন এর অন্যথা করিনি। কিন্তু এখানে আসার পরে প্রভাতের জবরদস্তিতে আবার আঁশ ধরেছি। এখন কিন্তু আমার মনে হয় কেন আঁশ খাব না? মন তো খেতে চায়। জোর করে কি তা বন্ধ করা যায়? তাই তুমিও খাবে। কিন্তু সমাজ? কিসের সমাজ বৌমা? বৌ মরলে কি কোন বেটাছেলে আঁশ খাওয়া বন্ধ করে?

কথা বলার মাঝে ফিরে আসে প্রভাত। শেষ কথাটা তার কানে যায়, বলে তুমি একদম ঠিক বলেছো মা! কারা যে এ নিয়ম করেছিল কে জানে? এ শুধু মেয়েদের শাস্তি দেওয়ার ফন্দি। তারপর বলল, জান বৌদি, তুমি ইলিশ মাছ খুব পছন্দ কর,

তাই তোমার কথা ভেবে মাছটা কিনেছি। এখন তুমি যদি না খাও, তাহলে তো আমাদেরও খাওয়া হবে না।

ওর মা বললেন, কেন খাওয়া হবে না? বৌমার আর কতটুকুই বা বয়স, সারাটা জীবন তার আঁশহীন চলবে নাকি? কালীদাসীর দু'চোখে জল টলটল করতে থাকে। এত ভালবাসা সে রাখবে কোথায়? সে ভালবাসে বলে প্রভাত এককাড়ি টাকা ব্যয় করে মাছটা কিনেছে, আর সে ছোঁবে না তা কিছুতেই হবে না। শাড়িটা কোমরে ভালভাবে গুঁজে কালীদাসী কড়াই উনুনে বসায়।

অনেক কিছু রেঁধেছে সে। ইলিশ মাছ ভাজা, ইলিশ মাছ ভাপানো, ইলিশ মাছের টক। রান্নার সময় সমস্ত মন ঢেলে দেয় তাতে। তাই শহরে আসার পরে একবার মাত্র দুইপিস ইলিশ মাছ এনেছিল নিকুঞ্জ। তাও অনেক দিন বলাতে। প্রায়ই বলতো কি করে আনি বলতো কালী, যা দাম? তার উপর আবার অর্ধেকটা নিতে হবে। কালীদাসী কিছু বলত না। মানুষটা যে কত দুর্বল তা সে জানে। তাই সেদিন যখন মাত্র ছোট ছোট দুপিস ইলিশ মাছ এনেছিল নিকুঞ্জ, কালীদাসী বলেছিল, কি দরকার ছিল মাত্র দুপিস মাছ আনার? এতে তো শুধু লালসাই বাড়বে মন তো ভরবে না। উত্তরে নিকুঞ্জ বলেছিল, তুই তো জানিস ইলিশ মাছের গন্ধ আমি সহ্য করতে পারি না। এক পিস ভাজা খাবি আর এক পিস ঝোল। নিকুঞ্জ যাইই বলুক তাকে বাদ দিয়ে সেই মাছ সে একা একা খেতে পারেনি। আর আজ কত মাছ? তবু এই সময় একবার অসহায় নিকুঞ্জের কথা মনে পড়ে তার। একটা অসহায় শিশুর মতো ভালবেসেছিল নিকুঞ্জকে। কিন্তু নিকুঞ্জের ভালবাসায় সেই আবেগ কোনদিন ছিল না। কালীদাসীকে নিজের ইচ্ছায় একটাও কটুকথা সে কোনদিন বলেনি, কিন্তু স্বামীর ভালবাসার আবেগে যে ভেসে যাবে এমন উষ্ণতার সন্ধান কোন দিনও সে পায়নি নিকুঞ্জের মধ্যে। সিরাজের প্রতি এক তীব্র অভিমানে সে শুধু নিকুঞ্জকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছে।

খেতে বসে প্রভাত বলল, কি ভাবছ বৌদি? কালীদাসী মৃদু হেসে বলল, আচ্ছা ঠাকুরপো আমি যে ইলিশ মাছ খুব ভালবাসি তুমি জানলে কেমন করে? প্রভাত একবার কালীদাসীর চোখের দিকে তাকিয়ে আবারও খাওয়ায় মন দিল। মেয়েটা কেঁদে উঠতে প্রভাতের মা সেই ঘরে চলে গেলে কালীদাসী বলল, ঠাকুরপো, আমাকে তুমি খুব ভালবাস তাই না? এবারও প্রভাত কোন উত্তর দিল না।

কালীদাসী বলল, আমার একটা কথা তুমি বিশ্বাস করবে ঠাকুরপো? কি? কালীদাসী বলে, সিরাজ ভাই তখনো আমার জীবনে আসেনি, সেদিন কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসতে চেয়েছিলাম। প্রভাত খাওয়া থামিয়ে বলে, জানি।

আশ্চর্য হয়ে কালীদাসী বলল, তুমি জান? হ্যাঁ জানি। আর এটাও জানি আজও তুমি আমায় ভালবাস। কিন্তু বৌদি, এটা যে অসম্ভব।

কালীদাসী বলল—কোনটা? লজ্জা পেয়ে যায় প্রভাত। বলে থাক না বৌদি। তুমি যে আমার সামনে আছো এতেই আমার সব পাওয়া হয়ে গেছে।

কালীদাসী বলল, কথাটা যখন উঠল তখন তো এর একটা সমাধান হওয়া দরকার। কিসের সমাধান?

কালীদাসী হেসে বলল, সামনে লোভনীয় খাবার অথচ তা ছোঁয়ার উপায় নেই, আমি তা পারব না ঠাকুরপো। তাই খুড়িমাকে বলেছি সত্যেনবাবু তো অনেকগুলো ঘর ইতিমধ্যে বানিয়ে ফেলেছেন। ভাবছি তার কোন একটাতে চলে যাব। চলে যাবে? যেন আর্তনাদ করে ওঠে প্রভাত। কালীদাসী বলল, দুঃখ করো না ঠাকুরপো, চলে তো আমাকে যেতেই হবে একদিন, দুদিন না হয় আগে গেলাম।

প্রভাত শুধু ফিসফিস করে বলল, তুমি এত নিষ্ঠুর বৌদি?

কালীদাসী হেসে ফেলল, তারপর বলল, নিষ্ঠুরতা কাকে বলে আমি জানি না, কিন্তু সমাজের দেওয়া শাস্তি আমি মাথা পেতে নিয়েছি। কোন প্রতিবাদ করিনি। তারপর বলল, এইমাত্র বললে না আমি খুব নিষ্ঠুর, কিন্তু ঠাকুরপো নিষ্ঠুরতার কি দেখলে তুমি আমার মধ্যে? অথচ আমি যে যন্ত্রণা সহ্য করে আজো টিকে আছি তা শুধু একজনের কাছে ভালবাসার পাঠ পেয়েছিলাম বলে। তা না হলে ভালবাসার আমি বুঝিই বা কি? ঐ মানুষটার কাছে কতটা কাকুতিমিনতি করেছি একবার তার বুকে তুলে নিতে, নেয়নি। বলেছিল কি জান? প্রভাত কিছু না বলে তাকিয়ে থাকে।

কালীদাসী বলে চলে, ঐ মানুষটি বলেছিল তোমার মধ্যে এই যে তৃষ্ণা এটা যেদিন মরে যাবে, সেদিন ভালবাসার সৌন্দর্যও মরে যাবে। এই যে তোমাকে আমি ভালবাসি, তুমিও আমায় ভালবাস, আমরা একে অপরকে চাই নিবীড়ভাবে, অথচ আমাদের মধ্যে বয়ে চলেছে একটা নদী। কিছুতেই তাকে পাড়ি দিতে পারছি না। না তুমি, না আমি। এর থেকে সুন্দর কিছু কি আর আছে পৃথিবীতে?

বিশ্বাস কর ঠাকুরপো ওর এসব কথা আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। কোন দিনও ঐ মানুষটি আমায় ছুঁয়েও দেখেনি। আমি নিজেকে সম্পূর্ণ সঁপে দিয়েও তার মন গলাতে পারিনি। এমনও দিন গেছে যেদিন তাকে নপুংসক বলতেও আমার বাধেনি। তার উত্তরে সে শুধু বলেছে, এসব তুমি রাগের মাথায় বলছ কালী। না হলে তুমি নিজেও ভাল করে জান আমি মোটেও নপুংসক নই, তারপর বলেছিল, আমার প্রেম আল্লাহ্ তালার সাথে। তোমাকে ভালবেসে আমি যে তার স্পর্শ পাই। সেই তোমাকে আমি কিভাবে অপমান করব? তারপর কতবার যে পাগলের মতো তার বুকে মাথা ঠুকেছি সে আর তোমাকে আমি কি বলব? তবু তাকে টলাতে পারিনি। অথচ সেই মানুষটাকে জড়িয়ে গ্রামের মানুষের মনে কত না প্রশ্ন।

চারিদিকে মুখ দেখাতেও লজ্জা। সালিশী বোর্ডের সভা, শাস্তি ঘোষণা। কিন্তু সেই যে মানুষটা চুপচাপ গ্রাম থেকে পালিয়ে গেল একটাও প্রতিবাদ না করে, তারপর আর একদিনের জন্যও ফিরল না। সে অভিমান তার কার প্রতি আমি জানি না ঠাকুরপো।

তারপরের ইতিহাস তো তোমার জানা। এই চরিত্রহীন অসতী মেয়েটাকে কেউ বিয়ে করতে রাজি নয়। আঠারো বছরের যৌবন আমার দেহে। সেই সময় একদিন ভেবেছিলাম তোমার কাছে একবার যাবো, পারিনি। যদি ফিরিয়ে দাও। সিরাজ ভাইয়ের কাছে ভালবাসা বলতে আমি যা বুঝি তা পাইনি। তোমার কাছ থেকেও পাব না, না সে কষ্ট অসহ্য। তাই তোমার নিকুঞ্জদার মা যখন ১০০০ টাকার পণ পেলে তার ছেলের সাথে আমার বিয়ে দিতে রাজি হলেন, আমি অমত করতে পারিনি। অবশ্য সে শক্তিও আমার ছিল না। মনে মনে ভাবলাম, আমি তো হিন্দু মেয়ে, স্বামীকে যারা দেবতা হিসাবে মান্য করে। তবে আমিই বা পারব না কেন? মুহূর্তে মুছে দিলাম আমার অতীতকে, আমি ভীষণভাবে ভালবাসতে চাইলাম তোমার নিকুঞ্জদাকে। তার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। এতদিন বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন বেশ বুঝতে পারি, কালীদাসীকে তার পক্ষে ভালবাসা সম্ভব ছিল না। কিন্তু সে কথা সে মুখ ফুটে কোনদিন বলেনি, আর আজ তো সে সবকিছুর বাইরে।

নতুন করে সিরাজ ভাই এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। জানি না সে কোথায়? কিন্তু আমার মন বলছে সে আছে এই পৃথিবীর কোথাও না কোথাও। আর যেখানেই সে থাকুক তাকে আমার খুঁজে বের করতে হবেই। কিন্তু ঠাকুরপো তোমার এখানে বসে তো তা সম্ভব নয়। একনাগাড়ে এতগুলো কথা বলে থামে কালীদাসী। আর প্রভাত সেই যে মাথা নীচু করেছে, একবারের জন্যও সে মাথা উঁচু করে তাকায়নি কালীদাসীর দিকে।

প্রভাতের মা ঘর থেকে চিৎকার করে বললেন, বৌমা রাত তো কম হয়নি, প্রভাতের খাওয়া হয়নি? প্রভাত থালায় গ্লাস থেকে জল ঢালতে গেলে তাকে বাধা দিয়ে কালীদাসী বলল, আমার মাথা খাও ঠাকুরপো। উঠো না। কথা বলতে বলতে ভুলেই গেছি তোমার থালার ভাত ফুরিয়েছে।

প্রভাত বলল, আমার পেট ভরে গেছে বৌদি। তোমরা খেয়ে নাও।

কালীদাসী বলল, এইভাবে যদি উঠে যাও ঠাকুরপো, তুমি নিশ্চয় জানবে আমি ভালবাসি বলে যে মাছ তুমি এত পয়সা ব্যয় করে কিনে এনেছো তা আমি চেখেও দেখব না। খুড়িমা হাজার জোর করেও আমাকে খাওয়াতে পারবে না।

৮

সত্যেনবাবু তার দলবল নিয়ে বিলি ব্যবস্থার তদারকি করছিলেন। এখানে তিনি প্রভাতের জন্যও ব্যবস্থা করেছেন। প্রভাত অবশ্য প্রতিবাদ করে বলেছিল, আমি তো খালপাড়ের কেউ নই, তাহলে আমার জন্য এ ব্যবস্থা কেন? সত্যেনবাবু হেসে বললেন, দেখতে দেখতে তোর সঙ্গে তো আমার পরিচয় কম দিনের হল না। কিন্তু তোর মতো বোকা আমি আর একটিও দেখিনি। তুই কি নিজের স্বার্থটুকুও বুঝিস না? প্রভাত বলে, কি যে বলেন সত্যেনদা? নিজের স্বার্থ দেখি না? নিজের স্বার্থ না দেখলে চলে? যাকগে সে কথা, আপনি যখন ঠিকই করেছেন আমাকে ঘর দেবেন মাটি দেবেন, কিন্তু একটা সর্তে। বল তোর শর্ত? হাসেন সত্যেনবাবু। প্রভাত বলল, খালঘাটের রিকশাস্ট্যান্ডে আমরা ২৫ জন আছি, তার মধ্যে পাঁচজনের কোন থাকার জায়গা নেই, সারাদিন খেটে যা পায় তার বেশিটাই চলে যায় ভাড়া দিতে। তাদের যদি একটু ব্যবস্থা করে দেন! সত্যেনবাবু অবাক হয়ে তাকান প্রভাতের দিকে। কিছু বলেন না। সত্যেনবাবুর যে বাহিনী তখন এখানে আছে তার নেতা মণ্টু। মণ্টু বলে, প্রভাত, বড্ড সাধুগিরি হয়ে যাচ্ছে? শর্ত দিচ্ছিস সত্যেনদাকে? তোর ভাগ্য ভাল যে এত কিছুর মধ্যেও তোর কথা উনি মনে রেখেছেন। সংসার চালাবি তো সেই রিকশা চালিয়ে। অত দাতা কর্ণগিরি করার দরকার কি?

প্রভাত চট করে রেগে গিয়ে বলে, তুমি থাম মণ্টুদা। নিজেকে তুমি কি মনে কর জানি না। আমার তো তবু রিকশা চালিয়ে চলে যাবে। কিন্তু তুমি কি করবে? আজ যদি সত্যেনদা তোমায় ছেঁটে দেন, দুবেলা দুমুঠো ভাতও তো জুটবে না। তারপর রিকশায় উঠে পড়ে বলে, সত্যেনদা, ওটাই আমার শর্ত, রাজি থাকলে আমিও রাজি, বলে চলে যেতে উদ্যত হতেই সত্যেনবাবু বললেন, আবে শোন শোন, যাচ্ছিস কোথায়? মণ্টু বলল, ছাড়ুন তো সত্যেনদা, এই সব গোঁয়ার গোবিন্দকে আপনি যে কেন এত গুরুত্ব দেন বুঝি না? সত্যেন ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, থাম তুই। খুব বড় নেতা হয়ে গেছিস, না? ও তো ঠিক কথা বলেছে, আমি যদি তোকে আশ্রয় না দিই তোর চলবে কি করে? তারপরে বললেন, ভবিষ্যতে আমার সামনে কাউকে কোন কথা বলেছিস তো সেদিনই তোকে জবাব দিয়ে দেব। কথাটা যেন মনে থাকে।

এতটা ভাবেনি মণ্টু। সে এতদিন নিজেকে সত্যেনবাবুর ডানহাত বলে মনে করে এসেছে। লোকেও জানে তার কথা মানে সত্যেনবাবুর কথা। কোন দিন তার কথার কোন প্রতিবাদও করে নি। কিন্তু আজ কি হল? ছোটলোক এক রিকশাওয়ালার সম্মানই তার কাছে বড় হল? সে প্রতিবাদ না করে চুপ করে

থাকে। সত্যেনবাবু প্রভাতের কাছে এসে বলে, অত মাথা গরম করছিস কেন? আর মণ্টুর কথাকে এতটা গুরুত্বই বা দিচ্ছিস কেন? এবার বলতো তোর পাঁচজন রিকশাওয়ালা কে কে? প্রভাত রিকশা থেকে নেমে বলল, শরৎ, পল্টু, রমেন, বীজন ও বিকাশ। সত্যেনবাবু হা করে শুনলেন নামগুলো। তারপর বললেন, তুই নামগুলো ঠিক বলছিস তো? কেন সত্যেনদা? ওদের কি কারো ঘরবাড়ি আছে নাকি? সত্যেনবাবু বললেন, যতোদূর জানি নেই। এবং ওরা পাঁচজন একই বাড়িতে দুটো ঘর ভাড়া করে থাকে। তাহলে? সেটাই তো হাজার টাকার প্রশ্ন, তাহলে? তারপর বললেন, আচ্ছা তোকে যারা মেরেছিল তাদের কি তুই সত্যিই চিনিস না? বললেন সত্যেনবাবু। উত্তরে প্রভাত বলল, চিনলে তো বলতাম সত্যেনদা। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে, সেই সময় কেউ আচমকা মারলে তাকে কি চেনা যায়? না যায় না, বললেন সত্যেনবাবু। তারপর বললেন, তুই না বললেও আখতারদার অনুরোধে আমি খোঁজ নিয়েছিলাম। এবং আমি ভালভাবেই জানি ওদের প্রত্যেককে তুই ভালভাবেই চিনিস, তবু তাদের তুই বাঁচাতে চেয়েছিস। কিন্তু কেন বল তো?

প্রভাত ভাবেনি সত্যেনদা ব্যাপারটাকে এমন সিরিয়াসলি নেবেন? বলল, কি করব বলুন? ওদের অবস্থা তো আমার থেকেও খারাপ। ওদের কিছু একটা হয়ে গেলে বাড়ির লোকেরা খাবে কি? তাছাড়া ওরা যাইই করুক না কেন, ওরাই কিন্তু আমার আপনজন। যতদিন আপনাদের বিরুদ্ধাচরণ করব না আপনারা আমার কথা ভাববেন, কিন্তু ওরা ভাববে সব সময়। একজন রিকশাওয়ালার কিভাবে চলে তা ওদের থেকে কেউ ভাল জানে না। ওরা আমাকে মেরেছে একথা যেমন সত্যি তেমনি পথের মন্দিরে রোজ আমার জন্য মঙ্গল কামনা করেছে। নিজেরা চাঁদা দিয়ে সাত-সাতটা দিন আমার সংসারকে সাহায্য করেছে। এর পরেও কি আপনি বলবেন কেন আমি ওদের নাম বলিনি?

সত্যেনবাবু বললেন, না প্রভাত আমি কিছু বলবো না। তারপর বললেন, আমরা তো স্বপ্ন দেখি এমন এক পৃথিবীর, যেখানে তোমার মতো মানুষেরা তাকে দরদ দিয়ে মায়া-মমতা দিয়ে সাজিয়ে তুলবে। তোমার জন্য গর্বে আমার বুকটা ফুলে উঠছে। ঠিক আছে আমি আর কোন প্রশ্ন করব না। ওদের পাঁচজনের ঘরের ব্যবস্থা আমি করে দেব। তুমি কালই ওদের নিয়ে এস আমার কাছে।

প্রভাত সে কথা বললে, শরৎ বলল, সত্যেনদা ডেকেছেন? আমার যে ভয় করছে প্রভাত? কিসের ভয়? আমি তো থাকব। তাহলেও আমি যে কিছুতেই সেদিনের কথা ভুলতে পারছি না। মাথায় যে কেন এমন রোখ চেপে গেল? জানিস তো পরের একমাস আমি তোকে মুখও দেখাতে পারিনি।

প্রভাত বলল, সেই সব কথা মনে রেখেছো নাকি শরৎদা? কি করবো? মন

থেকে যে মুছতে পারি না। তোর বৌদি জানতে চেয়েছিল কি হয়েছে তোমার? এমন গোমড়া মুখ করে সব সময় থাক কেন? সত্যি কথাটা তাকে কিছুতেই বলতে পারি না। কিন্তু পরদিন যখন চেপে ধরল, সব কথা বললাম তাকে। আর সঙ্গে সঙ্গে সে এমন রেগে গেল যে, বলল, তোমরা ওকে মেরেছো? এই সামান্য কারণে? তোমরা কি মানুষ? যাও যতোদিন ও সুস্থ না হয়ে ওঠে ওর সংসার চালাও তোমরা। সুস্থ হলে ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে। তার কথা রাখার চেষ্টা করেছি কিন্তু ক্ষমা চাইতে আজো পারলাম না। বলতো কি করে তোর কাছে ক্ষমা চাইবো? প্রভাত তার হাতটা ধরে বলল, শরৎদা, তুমি তো আমার দাদার মতো। দাদা হয়ে ভাইয়ের কাছে কিভাবে ক্ষমা চাইবে? কিন্তু মনে মনে যে চেয়েছ তা তো আমি জানি।

শরৎ বলল, যাবো, কিন্তু কেন ডেকেছেন সে কথা জানতে পারলে ভাল হত। বুঝিস তো মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, কি বলতে কি বলে ফেলব। প্রভাত বলল, ঠিক আছে, সবাই আসুক, আমি সকলের সামনেই বলব। কেন তিনি ডেকেছেন?

পরে একে একে দাঁড়িয়ে যায় পঁচিশটি রিকশা। এ সময় তারা খানিকটা জিরিয়ে নেয়। প্যাসেঞ্জারও থাকে না। নিজেরা গ্রুপ করে গল্প গুজব করে। আজ আর গ্রুপ নয়। প্রভাত বলল, তোমরা নিশ্চয় এতক্ষণে জেনে গেছ সত্যেনদা আমাদের কয়েকজনকে ডেকেছেন? বীজন বলল, শুনেই তো ভয়েতে আছি, রমেনও সেই একই কথা বলল। দু'য়েকজন যারা তখনো শোনেনি তারা বলল, কেন ডেকেছেন জানি না। আমাদের যদি কোন অন্যায় হয়ে থাকে তবে তার জন্য সবাই আমরা দায়ী। আমরা সবাই যাবো। প্রভাত বলল, তুমি অযথা চিন্তা করছ দীনেশদা। আসলে খালপাড়ে তিনি অনেকগুলো ঘর বানিয়েছো যাদের থাকার জায়গা নেই তাদের মধ্যে ঘরগুলো বিলি করবেন বলে। উনি খোঁজ নিয়ে জেনেছেন, যাদের উনি ডেকেছেন তাদের কারো থাকার জায়গা নেই। অন্যের বাড়িতে ছোট খুপরি ভাড়া নিয়ে থাকে। তাই তাদের ডাকা, যদি তারা ঐ সব ঘরে যেতে চায়। দীনেশ বলল, বিনা পয়সায়? না না বিনা পয়সায় নয়। তার জন্য কিছু শর্ত আছে। তার আগে বলতো আমরা পাঁচজন ছাড়া আর কেউ আছে কিনা যাদের নিজেদের ঘর মাটি নেই। সবাই চুপ করে থাকে। শরৎ বলে, আমি যতদূর জানি আমরা পাঁচজন ছাড়া আর কেউ নেই। দীনেশ বলল, হ্যাঁ তোমরা বল আর কেউ আছে কিনা? তারপর বলল, শর্ত না হয় বুঝলাম ওনাকে বা ওনার দলকে ভোট দিতে হবে। কিন্তু টাকাটা তো শোধ করতে হবে? তা তো হবেই দীনেশদা। উনি তো আর দানসত্র খুলে বসেননি। তাহলে সেই টাকাটা শোধ হবে কি করে? প্রভাত সব কথা খুলে বললে, পল্টু বলে, অর্ধেক টাকা দিয়ে দিতে হবে? তাহলে খাবো কি? যা পাই তাতেই তো চালাতে পারি না। শরৎ বলল, আমাকেও তো একটু ভাবতে হবে

প্রভাত? অর্ধেক টাকা রোজ দিয়ে দিতে হলে আমার অতবড় সংসার চালাবো কি করে?

প্রভাত বলল, আমি জোর করব না শরৎদা। কিন্তু একবার ভেবে দেখ নিজের ঘর নিজের মাটি। বাড়িওয়ালার মুখঝামটা নেই, বকাবকি নেই। একটু তো কষ্ট হবে। সে আর ক'দিন? আমি শুনেছি এর জন্য তিন হাজার করে দর সাব্যস্ত হয়েছে। যদি প্রতিদিন ১০০ টাকা করে আমরা দিতে পারি তাহলে ৫০ টাকা করে মূলধন শোধ হবে। এইভাবে শোধ করতে পারলে ৬০ দিনে টাকাটা শোধ হয়ে যাবে। মাত্র দু মাস! শরৎ বলল, ১০০ টাকা করে প্রতিদিন দেওয়া তো কম কথা নয় প্রভাত? উত্তরে প্রভাত বলে, অসুবিধা হলে ৫০ টাকা করে দেবে। তাতে দু'মাসের জায়গায় চারমাস লাগবে। পারবে না শরৎদা?

শরৎ বলল, পারতে তো হবেই। নিজের মাটি নিজের ঘর কে না চায়?

সত্যেনবাবু কথা রাখেন। ঘরের বিলি ব্যবস্থা হয়ে যায়। কালীদাসী আগে আসতে চাইলেও আসা হয় না। প্রভাত তাকে আসতে দেয় না। এখন যখন সমস্ত বিলি ব্যবস্থা হয়ে গেছে কালীদাসীর পাশের ঘরটি পায় প্রভাত। শরৎদের ভাগে পড়ে একেবারে শেষদিকের প্লটগুলো। খোকন মল্লিক রাজি হয় না সত্যেনবাবুর প্রস্তাবে। তার সঙ্গে রাজি হয় না আরো চার-পাঁচ জন। তারা খানিকটা দূরে নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরাই করে নেয়।

হাফকাঠা করে জমি মানে কালীদাসী ও প্রভাতের ভাগে মোট এক কাঠা জমি। কালীদাসী স্বপ্ন দেখে এই ফাঁকা জায়গায় সে চাষ করবে। লাউ, কুমড়ো, লংকা ও বেগুন গাছ লাগাবে। বেশ খানিকটা জায়গা আলাদা করে মুরগি পুষবে। সে আর বাড়ি বাড়ি কাজ করবে না। প্রভাত তার প্রস্তাবে রাজি হয়ে বলে, সে তো খুব ভাল কথা। পরে একটা ছোট মুদিখানা দোকান করলে হবে। কালীদাসী হেসে বলে, কিন্তু সবার আগে তো সত্যেনবাবুর টাকাটা শোধ করতে হবে? সে একভাবে হয়ে যাবে। তুমি কিছু ভেবো না। কালীদাসী বলে, না ঠাকুরপো, একভাবে হয়ে যাবে বললে তো হবে না। তাই ভাবছি আরো কয়েকটা মাস কাজ করবো। খুড়িমার কাছে ঝিমলি থাকবে। আমার তো আর কোন ঝামেলাই রইল না। তারপর টাকাটা শোধ হয়ে গেলে তখন না হয় ভাবা যাবে কাজটা আর করব কি না।

সত্যেনবাবুর প্রস্তাবটা বলি বলি করেও বলা হয়নি। এই সুযোগে বলে ফেলে প্রভাত। সত্যেনদা বলেছিলেন, তুমি যদি চাও তাহলে তোমাকে একটা ১০—৫টার ডিউটিতে লাগিয়ে দিতে পারেন। মাইনেও পাবে, তিন বাড়িতে কাজ করে তুমি যা পাও তার থেকে বেশি।

কালীদাসী হেসে বলল, আমার প্রতি তার যে এত দয়া? প্রভাত উত্তরে বলে, দয়া তো তিনি অনেককেই করেন, তোমার প্রতি দয়াকে তাই আলাদা করে ভাবছ

কেন? না ভাবছি না। তবে তোমার সত্যেনদাকে বলে দিও আমি তার প্রস্তাবে রাজি নই। কিন্তু কেন? আমার ভাল লাগে না ঐ ১০—৫টার ডিউটি করতে। তারপরে বলে, আচ্ছা ঠাকুরপো আমি যদি কোন কাজই না করি তুমি আমায় খাওয়াতে পারবে না? আমি তোমার সমস্ত কাজ করে দেব। রান্না করব, ঘর মুছব, বাসন ধোব, বিছানা করে দেব, এমন কি চাইলে—চোখে কটাক্ষ হেনে মুচকি হাসে কালীদাসী। প্রভাত বলে, আমি চাইলে কি? কালীদাসী অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, আগে তোমার বৌ আসুক তারপরে বলব। প্রভাত বলে, যাঃ বৌদি। তোমার খালি ইয়ারকি। ইয়ারকি কোথায় করলাম ঠাকুরপো? খুড়িমার কষ্ট হয় না? না হয় না। তাছাড়া আমিও চাই না সংসারে আরো সদস্য বাড়ুক। কালীদাসী বলল, সদস্য বাড়বে বলে বৌ আনবে না? তাহলে আমাকে তো তাড়িয়ে দিতে পার? আশ্চর্য হয়ে প্রভাত বলে, তোমাকে তাড়িয়ে দেব? কি যে বল বৌদি? কেন খারাপ কথাটা কি বললাম? পুরুষ মানুষ এই বয়সে বৌ না হলে চলে?

তোমার খালি বাজে বাজে কথা! হ্যাঁ বাজে কথা ঠিকই কিন্তু শুনতে খুব মিষ্টি তাই না? তারপর বলল, আচ্ছা ঠাকুরপো তোমার বুলির সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ নেই? উত্তরে প্রভাত বলে, যোগাযোগ তো ওর সঙ্গে আমার কোনদিন ছিল না। এমনকি আমি জানতামও না যে ও আখতার সাহেবের মেয়ে। কালীদাসী বলল, ও কিন্তু খুব ভাল মেয়ে।

ভাল না ছাই। ভীষণ হিংসুটে। কি করে বুঝলে? ওর আচরণে। কালীদাসী বলল, ও তোমার সঙ্গে কি এমন আচরণ করেছে যে তুমি ওকে হিংসুটে বললে? প্রভাত খানিকটা বিরক্তির সঙ্গে বলল, আমি জানি না। কালীদাসী হেসে ওঠে খিল খিল করে। প্রভাত বলল, হাসছো যে? বাঃ রে হাসবো না, তুমি যে ধরা পড়ে গেছ? কিসে ধরা পড়ে গেছি? কালীদাসী বলল, ভালবাসায়। তারপর জানতে চাইল, আচ্ছা ঠাকুরপো ও তোমায় বেশি ভালবাসে না তুমি ওকে বেশি ভালবাস? প্রভাত কপট রাগ দেখিয়ে বলে, তোমার আর কোন কথা নেই? শুধু আজেবাজে প্রশ্ন? কি করবো ঠাকুরপো ভিতরে ভিতরে আমিও যে কত হিংসুটে সে তুমি বুঝতেও পারছ না। যেন এক আশ্চর্য কথা শুনছে প্রভাত, বলল, তুমি হিংসুটে? আমি হিংসুটে নই? না একদম নও। তারপর বলল, বেলা হল বৌদি, এবার আর না বেরোলে নয়! বাঃ রে আমি কি তোমায় ধরে রেখেছি নাকি?

প্রভাত বলল, সাদাচোখে অবশ্য ধরে রাখনি, কিন্তু সত্যি কথাটা কি জান? কি? তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার একদম ইচ্ছে করে না। কালীদাসী এবার হেসে ওঠে খিল খিল করে। তারপরে বলে, সত্যি ঠাকুরপো বানিয়ে বানিয়ে এত মিথ্যেও তুমি বলতে পার? একদম মিথ্যে নয় বৌদি। এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি। আমি যা বলেছি তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অর সত্যি সত্যি কালীদাসীর কাঁধে হাত রাখতে

এমনভাবে তার সারা শরীরটা কাঁপতে থাকে যে প্রভাত ভয় পেয়ে বলে, কি হল বৌদি? এমন কাঁপছো কেন? শরীর খারাপ?

কাঁধ থেকে প্রভাতের হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলে, হ্যাঁ শরীর খারাপ। কবে থেকে? জানতে চায় প্রভাত। ঐ যেদিন তোমার বুলি তোমাদের ওবাড়ি থেকে বলতে গেলে রাগ করে চলে গেল সেদিন থেকে। প্রভাত সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, আগে বলনি কেন? বললে কি করতে? ডাক্তার ডাকতুম। তাহলে ডাকলে না কেন? বাঃ রে তুমি তো বলনি? তাহলে আর ডাক্তার ডেকে দরকার কি? এতদিন যখন অসুখটাকে পুষতে পেরেছি ভবিষ্যতেও পারব। আমার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। এবার কাজে যাও। এই যাই বলে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে, সাবধানে থেকো বৌদি। আমি আসার সময় ডাক্তার নিয়ে আসব। বাধা দিয়ে কালীদাসী বলে একদম না। উত্তরে প্রভাত বলে, না বললে আমি শুনছি না। তারপর বলল, এ আমারই ভুল। তুমি এতদিন রোগটাকে পুষে নিয়ে বেড়াচ্ছ অথচ আমার চোখে পড়ল না? ছিঃ ছিঃ আমি কি? কালীদাসী বলল, এত ছিঃ ছিঃ করছ কেন ঠাকুরপো? তোমার কি দোষ? আমি যদি তোমায় না বলি তুমি জানবে কি করে? তাহলে এতদিন বলনি কেন? ভয়ে? ভয়ে? কিসের ভয় বৌদি। জানি না ঠাকুরপো। তবে একথা ঠিক যে ভয় আর সঙ্কোচে তোমাকে বলতে পারিনি।

রোদ উঠেছে অনেকটা। আর দেরি করা ঠিক নয়। আবারও বলল, সাবধানে থেকো বৌদি। আজ আর দুপুরে আসবো না। তোমরা খেয়ে নিও। তারপর সোজা রিকশা চালিয়ে স্ট্যান্ডে। এসে দেখে দাশু দাঁড়িয়ে আছে! অবাক হয়ে প্রভাত বলে, তুমি এখানে দাশুদা? কি করবো বল। তোর আগের বাড়িতে গিয়েছিলাম, শুনলাম ওবাড়ি ছেড়ে দিয়েছিস। অথচ সে কথা আমাকে জানাসনি। তাই এখানে অপেক্ষা করছিলাম। বল কেমন আছিস? ভাল। তুমি? আমিও ভাল আছি। তারপর বলল, কিছুদিন আমি এখানে ছিলাম না, মহাজনের নির্দেশে রাজস্থান ও দিল্লি গিয়েছিলাম। তা ধর প্রায় ৪/৫ মাস তো হবে। এখানে এসে সংবাদটা শুনলাম। কি হয়েছে নতুন করে জানাবার দরকার নেই। এখন বৌদি কেমন আছে? কোথায় আছে? প্রভাত বলল, আছে আমার কাছে, এবং ভাল আছে। চল তোমাকে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি।

আধঘণ্টা বা তার থেকে কিছুটা বেশি হবে, বাইরে থেকে ডাক দেয় প্রভাত, বৌদি দেখ কে এসেছে? কালীদাসী ঘর থেকে বেরিয়ে জামাপ্যান্ট পরা দাশুকে দেখে মাথার ঘোমটাটা আরেকটু টেনে দিয়ে বলে, ওনাকে ঘরে নিয়ে এসে বসাও ঠাকুরপো। দাশু হেসে বলে, আমায় চিনতে পারছ না বৌদি? আমি দাশু! দাশু? কিন্তু এত অচেনা লাগছে যে ভাবলাম কে না কে? তারপর বলল, সবই তো শুনেছ ঠাকুরপো। মনে মনে আশাও করেছিলাম অন্তত একবার না এসে পারবে না। কিন্তু

এলে না যখন, তখন ভাবলাম, এ আমারই ভুল। কে আমি? কেন আসবে তুমি? গ্রামের এক অসতী কুলটা মেয়ের এ পরিণাম হবে না তো কার হবে?

কালীদাসীর ক্ষোভকে অস্বীকার করতে পারে না দাশু। বলল, তোমার এ অভিযোগকে আমি অস্বীকার করবো না। কিন্তু বৌদি, গত চার-পাঁচ মাস আমি এখানে ছিলাম না। তাই তোমাদের কোন কথা আমি জানিও না। তোমাদের কথা জেনেও এখানে থাকলে আমি আসব না এতটা নীচ আমাকে ভেবো না বৌদি!

প্রভাত বলল, তুমি বিশ্রাম নাও দাশুদা, আমার আসতে সেই সন্ধ্যা হবে। কালীদাসী বলল, একটু তাড়াতাড়ি ফিরো। ওঘর থেকে প্রভাতের মা ডেকে জানতে চাইছেন, কে এসেছে গো বৌমা? কালীদাসী বলল, দাশু ঠাকুরপো এসেছে খুড়িমা। দাশু? কাছে এসে বললেন, এতদিন পরে মনে পড়ল মাসিকে? কি যে বল মাসিমা? তারপর বলল, একথা ভাবলে কি করে যে তোমাদের কথা আমার মনে পড়ে না? আসলে আমি তো এখানে ছিলামই না তাই কিছুই জানি না। প্রায় পাঁচ মাস পরে কাল ফিরে এখানকার কথা জানতে পেরেই তো আজ চলে এসেছি। ভাল করেছিস! তারপর কালীদাসীকে বললেন, বৌমা ঘরে বাজার-টাজার কিছু আছে? তার আগে দেখ না ঘরে কিছু আছে কিনা? ওকে কিছু খেতে দাও।

দাশু বলল, এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন মাসি? আমি তো আর এখনি চলে যাচ্ছি না। কি জানি বাপু? এর আগে যে কয়বার এসেছিস, এসেই শুধু যাই যাই। তারপর বললেন, নিকুঞ্জের মেয়েকে তো দেখিসনি? দাঁড়া নিয়ে আসি।

কালীদাসী বলল—আর কতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলবে? এস ভিতরে এস। দাশু ভিতরে এলে কালীদাসী বলল, একটু বোস ঠাকুরপো। তোমাদের তো আবার চা খাবার অভ্যেস। দেখি চা পাতা টাতা কিছু আছে কি না। উত্তরে দাশু বলল, কোন প্রয়োজন নেই বৌদি। চা খাই বটে, তবে তা না হলে চলবে না এমনটা নয়। তার চেয়ে বরং বোস। এই আসছি বলে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় কালীদাসী। প্রভাতের মা নিকুঞ্জের মেয়েকে তার কোলে দিয়ে বলে এ হ'ল নিকুঞ্জের মেয়ে। দেখ দেখ কি ড্যাব ড্যাব করে তাকাচ্ছে? দাশু কোলে নিয়ে বলে, ভারি সুন্দর হয়েছে তো মেয়েটা। তারপর বলল, কিন্তু মাসি আমি তো ওর জন্য কিছু নিয়ে আসিনি। নাইবা আনলি? এমনি আশীর্বাদ কর। দাশু তার পার্স খুলে ১০০ টাকার ২ খানা নোট ঝিমলীর হাতে দিয়ে বলে কি কিনবে মামনি?

কথাটা কানে যায় কালীদাসীর। দাশুর জন্যে আনা চায়ের কাপটা মেঝেতে রেখে ঝিমলীকে দাশুর কোল থেকে নিজের কোলে নিয়ে বলে, কাকুকে টাকাটা ফিরিয়ে দাও মামনি। দাও! আধো আধো বুলিতে ঝিমলি বলে, না? কালীদাসী বলে দেখলে তো ঠাকুরপো তোমার ভাইঝি কেমন টাকা চিনে গেছে? উত্তরে দাশু

বলে, তাই তো স্বাভাবিক। ও তো এ যুগের মেয়ে বৌদি! ও ঠিক জানে টাকা না হলে সব মিথ্যে। কালীদাসী, হেসে বলে, যা বলেছো? অথচ ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলতেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা। দাশু হেসে বলে, অত্যন্ত দূরদর্শী ছিলেন কিনা! তাই পৌনে দুশো বছর আগে এতবড় সত্য কথাটি বলতে পেরেছিলেন। লোকে তার কথার ভুল ব্যাখ্যা করে বৌদি। তা না হলে একবার ভাবতো আজকের এক চিলতে মাটি মানে জমি কত টাকায় কিনতে হয়? বলে হাসতে থাকে দাশু।

কালীদাসী তবু ঝিমলীর হাত থেকে টাকাটা কেড়ে নিয়ে তা ফিরিয়ে দিয়ে বলে, ঠাকুর দূরদর্শী কিনা জানি না ভাই, আর আমি এও জানি না কতটুকু জমি কতটাকা দিয়ে কিনতে হয়? কিন্তু এতটুকু বাচ্চার হাতে তুমি টাকা দেবে এটা যে মানতে পারছি না।

দাশু উত্তরে বলে, আমি তো ওর জন্যে কিছু নিয়ে আসিনি বৌদি? তাতে কি হয়েছে? তুমি কি আর কোনদিন আসবে না? সেদিন না হয় হাতে করে কিছু নিয়ে এসো। আজ এই টাকাটা তুমি ফিরিয়ে নাও ভাই। এরপর আর কথা চলে না। দাশু টাকাটা পকেটে রাখে। কালীদাসী বলল, রাগ করলে? না বৌদি, রাগ করবো কেন? তারপর নিজেই মাটি থেকে চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে চুমুক দিয়ে বলে, তখন অবশ্য বলেছিলাম, চা না হলে চলবে না এমনটা নয়। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এতক্ষণ বুঝি ওটাই চাইছিলাম মনে মনে। তারপর বলল, চাটা কিন্তু ভারি সুন্দর হয়েছে। ঠাট্টা করছ? দাশু বলল, ঠাট্টা করব কেন? যা সত্যি তাই তো বললাম। হঠাৎ কালীদাসী বলল, তাহলে আমার পুরস্কার?

হঠাৎ এমন অদ্ভুত এক দাবির কথা শুনে হেসে ফেলে দাশু। তারপর বলে, পুরস্কার? মিটিমিটি হাসতে থাকে কালীদাসী। তারপর ঘাড় নেড়ে বলে, বুঝেছি। কি বুঝেছো? বুঝেছি তুমি মনে মনে ভাবছ এ মেয়ে তো আচ্ছা বাচাল। এই কয়দিন আগে যার বর মারা গেছে তার মুখে এইসব ঠাট্টা ইয়ারকি কি মানায়?

দাশু প্রতিবাদ করে বলে, আমি মোটেই এসব ভাবছি না। তাহলে কি ভাবছো? জানি না, বলে মাথা নীচু করে দাশু। কালীদাসী বলে, জানি না বললে তো আর সত্যিটা গোপন থাকবে না। তারপর বলল, আমি নিশ্চিত জানি তুমি কি ভাবছো? কি ভাবছি? ভাবছো যে মেয়েটার কি সুখ দুঃখ বোধ বলে কিছু নেই? এই তো ক'দিন আগে যার বর মারা গেল তার মধ্যে কোন দুঃখবোধ থাকবে না?

দাশু বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, মাসিমা এদিকে আসছেন। কাজে এলে কালীদাসী বলল—কিছু বলবে খুড়িমা? না বৌমা দেখতে এসেছিলাম তোমরা কি করছো? কালীদাসী বুঝতে পারে এটা অজুহাত। আসলে দাশুর সঙ্গে আমি হেসে হেসে কথা বলি এটা উনি চান না। মনে মনে ভাবে কি অদ্ভুত মানসিকতা এই বাংলাদেশের মেয়েদের। স্বামী মারা গেছে অতএব এই সময় এমন একটা ভাব

করে থাকতে হবে যে, দেখ আমার স্বামী নেই, তাই আমার মত দুখিনী আর কেউ নেই। আমার হাসতে মানা, ঠাট্টা ইয়ারকি করা মানা। আমাকে থাকতে হবে এমন ভাবে যে যাতে অন্যের মনে দয়া হয়। অথচ প্রভাতের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করলে তো উনি কিছু মনে করেন না? দাশুও তো ঠাকুরপো। যে হাসিঠাট্টা প্রভাতের সঙ্গে করা যায় তা যে কেন দাশুর সঙ্গে করা যাবে না এটা তার মাথায় ঢোকে না। প্রভাতের মা বললেন, আমি কি ভাতের জলটা বসিয়ে দেব? না না খুড়িমা, আমিই যাচ্ছি।

কালীদাসী কোলের মেয়েটাকে তার হাতে তুলে দিয়ে চলে গেলে তিনি বললেন, বুঝলি দাশু বৌমা এমনিতে ভাল। আমায় খুব যত্নআত্তি করে। কিন্তু নিকুঞ্জ যে নেই, তার যে এমন হাসিঠাট্টা করা উচিত নয়, লোকে ভাল চোখে দেখে না এটা ও বুঝতেই চায় না। এই তো কাল সোনার মা বলে গেল তোমার বৌমাকে দেখে তো মনে হয় না তার বর মারা গেছে! বলতো এসব কথা কি শুনতে ভাল লাগে? দাশু বলল, এই তোমাদের এক দোষ মাসি? তারপর বলল, আচ্ছা তুমি বল তো নিকুঞ্জদার জন্য কান্নাকাটি করলে সব সময় দুঃখী দুঃখী ভাব করে থাকলে কি নিকুঞ্জদা ফিরে আসবে? মাসি বললেন, তোদের সেই এক কথা।

দাশু বলল, উনি তো এখন স্বাধীন। তোমার কাছে আছে বলে তোমার মনে হচ্ছে। যদি নিজের ঘরে নিজের মতো করে থাকত তোমার মনে কি এসব কথা আসতো? মাসি বললেন, সে ওর নিজের ঘরে যা খুশি করতো আমি তো আর রোজ দেখতে যেতাম না। আমার এখন ভয় প্রভাতকে নিয়ে। ওকে কি যাদু যে করেছে কে জানে? বৌমার বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না। বললাম ওর ঘরে ও থাকুক, তাতেও রাজি নয়। বলে, তোমার মনে কি মায়াদয়া বলে কিছু নেই মা? আরে বাপু আমিও তো মেয়ে মানুষ? প্রভাতের এই মায়াদয়ার মানে কি আর বুঝি না? কিন্তু কি করবো বল্? থুথু উপরের দিকে ফেললে তো সেই গায়ে এসেই পড়বে। দাশু বুঝতে পারে সমস্যাটা জটিল আকার নিয়েছে। আর নেবে নাই বা কেন? কালীদাসীর আর কতই বা বয়স, প্রভাত বা আমার থেকে বয়সে তো ছোটই হবে। জীবনের স্বাধআহ্লাদ মিটবার আগেই তো নিকুঞ্জদা চলে গেল। কিন্তু মাসি যা আঁচ করছে সত্যি হলে ব্যাপারটা তো পাঁচ কান হতে দেরি হবে না। বলল--আমাকে কি করতে বল মাসি? মাসি বললেন, তোকে আর কি বলব? প্রভাতকে যদি একটু বুঝিয়ে বলিস? কি বলব? বলবি যে আমরা তো সেই ভাড়াবাড়িতে ভাল ছিলুম। আমাদের দরকার নেই নিজের ঘর মাটি। বৌমাই ভোগ করুক সব।

দাশু বলল, কিন্তু মেয়েটা যে রকম নেওটা তোমার, ওকে ছেড়ে থাকতে পারবে? ওকে ছাড়ব কেন? ও থাকবে আমার কাছে। দাশু হেসে বলে, তা হয় না মাসি। তার চেয়ে এক কাজ কর। কি? প্রভাতের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখ বৌদিকে

নিয়ে ও কি ভাবছে?

মাসি উত্তরে বলে, তুই জিজ্ঞেস করে দেখ না? তারপরে বললেন, ও যদি বৌমাকে আলাদা থাকতে দিতে না চায় আমি দেশের বাড়িতে চলে যাব। চলে যাবে? চলে যাবো না তো কি করবো?

দাশু বলল, এতদিন তো তোমরা এখানে, সিদ্ধেশরদা কোন খোঁজখবর নিয়েছে? মাসি তার কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকে।

৯

শেখ আখতার অনেকদিন হল তার রিকশায় আর যাতায়াত করেন না। আজকাল প্রায়ই গাড়ি নিয়ে বেরোন। আজ স্ট্যান্ডে এসে প্রভাত দেখে যে আখতার সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। প্রভাত আস্তে রিকশাটা তার পাশে দাঁড় করিয়ে বলে উঠুন বাবু! ও তুমি? কেমন আছো? ভাল। আপনি? আমিও ভাল আছি। কিন্তু! কিন্তু কি বাবু? আখতার চুপ করে থাকেন। প্রভাতও দ্বিতীয়বার জানতে চায় না কিন্তু কি? স্টেশনে নেবে বলেন, বিকেলে পাঁচটায় একবার আসতে পারবে? হ্যাঁ আসবো বলে। ও রিকশা ঘুরিয়ে ফিরে আসে। তার মনে হাজারো প্রশ্ন। আজ কেন আখতার সাহেব গাড়ি নিয়ে বেরোলেন না? গাড়ি তো তার বরাবর আছে। তবু তিনি বরাবর তার রিকশায় যাতায়াত করতেন। পরে তো আখতার সাহেবকে তাঁর বাড়ি থেকে তুলে নিতে হতো। হঠাৎ তিনি গাড়িতে যাতায়াত আরম্ভ করলেন। প্রভাতও এসব নিয়ে আর বেশি ভাবনাচিন্তা না করে নিজের কাজে মন দেয়। আজ কিন্তু আখতার সাহেবকে দেখে তার বেশি ভাল মনে হল না। শরীর স্বাস্থ্যও বেশ খারাপ হয়ে গেছে বলে মনে হয়। তবে কি তিনি অসুস্থ?

ইদানীং পিয়াশাকে একদম দেখা যায় না কোথাও। তবে কি পিয়াশা অসুস্থ? মনের মধ্যেই প্রতিবাদ গড়ে ওঠে, না না তা কি করে হবে? পিয়াশা অসুস্থ হলে কি সে জানতো না? তারপর মনে হল আরে সে জানবে কি করে? ওদিকে তো তার ইদানীং যাওয়াই হয় না। আর আখতার সাহেবও রিকশায় খুব একটা যাতায়াত করেন না। তবু পিয়াশার অসুস্থতার চিন্তা তার মন জুড়ে থাকে।

ফেরার পথে কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা এক ভদ্রলোক হাত দেখিয়ে থামায় তাকে। দরদাম করার সময়ে হঠাৎ চমকে ওঠে প্রভাত। বলে, আরে সিরাজ ভাই না? সিরাজ নাম শুনে চমকে ওঠেন ভদ্রলোক। জানতে চান কে আপনি? প্রভাত অবাক হয়ে বলে, আমায় চিনতে পারছ না সিরাজ ভাই? আমি প্রভাত। পটেশ্বরী গ্রামের প্রভাত। ভদ্রলোক তবু যেন চিনতে না পেরে বললেন, পটেশ্বরী গ্রাম? সেটা আবার কোথায়? তারপর বললেন, না ভাই পটেশ্বরী গ্রাম আমি তো চিনি

না। আর কে প্রভাত তাও আমি জানি না। তারপর বললেন, তুমি কি কচুখালি যাবে?

কচুখালি এখান থেকে বেশ খানিকটা পথ। অঞ্চলটা মুসলমান প্রধান। কিছু মুসলমান রিকশাওয়ালা আছে। এরা সাধারণত তাদের রিকশায় যাতায়াত করে থাকে। প্রভাত যে একদম সেখানে যায়নি বা যায় না তা নয়। তবে বিভিন্ন অজুহাতে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আজও হয়তো এড়িয়ে. যেত যদি ভদ্রলোককে সিরাজ ভাই বলে মনে না হত। বলল, আমারই হয়তো ভুল। কিন্তু আপনাকে দেখে আমার আমাদের দেশের সিরাজ ভাই বলে মনে হয়েছিল। নিন উঠুন। ভদ্রলোক ইতস্তত করে বললেন, কিন্তু কত নেবে বললে না তো? সে আপনার যা ইচ্ছে দেবেন। আমি তো ওদিকে খুব একটা যাই না। তাই ভাড়া ঠিক জানি না।

ভদ্রলোক রিকশায় উঠে বললেন, জান তো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। কত রিকশাওয়ালাকে বললাম, কিন্তু কেউ যেতে চায় না। প্রভাত বলল, যাবে না কেন! অনেক রিকশাওয়ালাই তো যায়। কি জানি কারা যায়? প্রভাত জানতে চাইল, আপনি কি এদিকে নতুন? কোথায় এসেছিলেন? ভদ্রলোক বললেন, কোথায় যে এসেছিলাম জানি না ভাই! একমাত্র খোদাতাল্লা জানেন কোথায় এসেছিলাম, কেন এসেছিলাম? কিন্তু আজও তার সাথে দেখা হ'ল না। কে সে? এই তো মুশকিলে ফেললে ভাই? সে যে কে তা তো আমি নিজেও জানি না। কখনো মনে হয় সে আমার আশীর্বাদ আবার কখনো মনে হয় সে আমার জীবনের অভিশাপ। এ জীবনে তাকে আমায় খুঁজে পেতেই হবে।

প্রভাত বলল, আপনি তো ভারি অদ্ভুত মানুষ। কাকে খুঁজছেন, তিনি কোথায় থাকেন কিছুই জানেন না, অথচ তার সঙ্গে আবার দেখা করার জন্য মরিয়া। ঠিকানা না জানলে তাকে খুঁজবেন কোথায়? ভদ্রলোক বললেন, খোদাতাল্লার রাজ্যে কোথাও না কোথাও সে আছে, আল্লা চাইলে দেখা আমাদের হবেই, কি হবে না?

প্রভাতের মনে হয় এ সিরাজ ভাই না হয়ে যায় না। কিন্তু তা প্রকাশ না করে সে সিরাজ ভাই কোথায় থাকেন সেই জায়গাটা চিনে নিতে চায়। তাই সে বলে, নিশ্চয় পাবেন সাহেব। মনে গভীর বিশ্বাস থাকলে একদিন তার সন্ধান পাবেনই। আমাদের শাস্ত্রেই তো আছে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদুর। বহৎ সুন্দর বাত বলেছো তো ভাই? তারপর বললেন, তুমিও কি কাউকে খুঁজছো নাকি? কাকে খুঁজবো? আমার তো কেউ হারিয়ে যায়নি। স্বগতোক্তির মতো ভদ্রলোক বললেন, তাই হবে। তোমার তো কেউ হারিয়ে যায়নি। তারপর বললেন, হারিয়ে আমারও যায়নি, মনের মধ্যে সে তো আছেই। তবু তাকে একবার দেখার জন্য কেন যে এত

বাসনা? হঠাৎ বলে ওঠেন, আচ্ছা ভাই তুমি দোজখ মানো? দোজখ মানে? ঐ তোমরা যাকে নরক বল! প্রভাত বলল, না মানি না। মানব কেন? স্বর্গ-নরক এমন আবার আছে নাকি? কিছুলোক অকারণ ভয় পেয়ে এসব মানে, আর মুখ বুজে সবকিছু সহ্য করে যায়। ভদ্রলোক হেসে বললেন, তুমি বুঝি কোন কিছুকে ভয় পাও না? পাব না কেন? পাই তো। আর সবচেয়ে বেশি ভয় পাই নিজেকে। আসলি বাৎ তো এই হ্যায়। মানুষ সব চেয়ে বেশি ভয় পায় নিজেকে। আর যে লোক সত্যি সত্যি নিজেকে ভয় পেয়ে আপনাকে সামলানোর চেষ্টা করে তার কাছে স্বর্গ নরকের কোন ভেদাভেদ থাকে না। রোজকিয়ামতের বিচার নিয়ে তার কোন মাথাব্যথাও নেই।

কথা বলতে বলতে কচুখালির মোড়ে চলে আসে প্রভাত। ভদ্রলোক বললেন, আর যাবে না রিকশা। এটুকু পথ আমি হেঁটেই যাবো। রিকশা থেকে নামেন ভদ্রলোক, তারপর তার লম্বা পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা ৫০ টাকার নোট বের করে বলেন, এর থেকে আর বেশি নেই। জানি না কম হয়ে গেল কিনা। প্রভাত বলল, সবই যদি দিলেন নিজের থাকল কি? অদ্ভুত মানুষটি মধুর হেসে বললেন, আমার থাকল কি? আমার থাকল এই দুনিয়া, এই আকাশ জল মাটি সব। তারপর বললেন, আসি ভাই। তোমার সাথে আর দেখা হবে কিনা জানা নেই। হোক না হোক তোমার কথা আমার সবসময় মনে পড়বে।

বাড়িতে এসে এই অদ্ভুত লোকটির বর্ণনা দিতে দিতে কালীদাসীকে প্রভাত বলে, এ কিছুতেই সিরাজ ভাই না হয়ে পারে না। কিন্তু উনি কিছুতেই স্বীকার করলেন না যে উনি সিরাজ ভাই। সিরাজের কথা শুনে কালীদাসী গুম হয়ে যায়। প্রভাত বলল, কি হল বৌদি? তোমার মনে হচ্ছে না যে, উনি সিরাজ ভাই? কালীদাসী উত্তরে বলে, না আমার মনে হচ্ছে না। আর উনি যদি সিরাজ ভাই হন, তবে বলবেন না কেন? আর তোমাকেও বা চিনতে পারবেন না কেন? সবই ঠিক বৌদি কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস উনি সিরাজ ভাই।

কোথায় থাকেন বললে? জানতে চায় কালীদাসী। কচুখালি মুসলমান পাড়ায়। তুমি তার বাড়ি চেন? না। মোড়ের রাস্তায় নেমে বললেন, এটুকু পথ উনি হেঁটে যেতে পারবেন। তাহলেও তোমার একবার তাঁর বাড়িটা দেখে আসা উচিত ছিল। কেন? বাঃ রে তোমার মনে যখন এত সন্দেহ, তখন সে কোথায় থাকে কিভাবে থাকে, সাথে আর কে কে আছে দেখা উচিত ছিল না? জানা উচিত ছিল ওনার নাম, কতদিন তিনি এখানে আছেন?

প্রভাত আনন্দিত হয়ে বলে, তুমি ঠিক বলেছো। আমি না এত বোকা যে কিছু না জেনে চলে এলাম। তারপর বলল, রিকশাওয়ালার বুদ্ধি তো!

হেসে কালীদাসী বলল, অন্য কাজ করলে বুঝি বুদ্ধি আরো ধারালো হত?

হতেও তো পারত। তাই বুঝি? তা এবার বলত ঠাকুরপো সিরাজ ভাইয়ের ব্যাপারে তোমার এত আগ্রহ কেন? ঘাড় থেকে বোঝা নামাতে চাও নাকি? বোঝা? কিসের বোঝা? বলল, প্রভাত।

উত্তরে কালীদাসী বলল, আচ্ছা ঠাকুরপো, আমি কি তোমার বোঝা নই? আশ্চর্য হয়ে প্রভাত বলে, তুমি আমার বোঝা? বলেছি কখনো? না বলনি। কিন্তু আমি তো জানি আমি তোমার জীবনে বোঝা ছাড়া কিছু নই। প্রভাত বলল, মা কিছু বলেছে? খুড়িমা কেন বলতে যাবে? আমি তো আর ওনার বোঝা নই।

প্রভাত বলল, তুমি তিন সত্যি করে বললেও বিশ্বাস করবো না যে মা তোমাকে কিছু বলেনি। উনি কি বলবে বলত? প্রভাত বলল, তুমি জান না বৌদি মা বলতে পারেন না এমন কিছু নেই। কালীদাসী প্রতিবাদ করে বলে, ছিঃ ঠাকুরপো ছিঃ? মায়ের নামে এসব কথা বলতে নেই। বলি কি আর সাধে? এখন বুঝতে পারছি কেন মা, দাদা-বৌদির সাথে থাকতে পারল না? এখন আবার বায়না ধরেছেন উনি এখানে থাকবেন না। দাদা-বৌদির কাছে ফিরে যাবেন। সেই দাদা-বৌদি যারা মাকে তাড়িয়ে দিয়ে আজ পর্যন্ত একবারও খোঁজ নিল না। কারণ কি? না, তুমি এখানে আছো বলে লোকে নাকি পাঁচ কথা বলছে? কেন বলছে? মা কোন প্রতিবাদ করতে পারেন না? কিন্তু করবেন না, শুনে যাবেন।

কালীদাসীর কানে অবশ্য কোন কথা আসেনি। আর উনিও কোনদিন ইঙ্গিত দেননি। তবে তারা গল্প করলে হাসিঠাট্টা করলে উনি যে আজকাল বিরক্ত হন এটা বোঝা যায়। কিন্তু কোনদিন তো একটা জোরে কথা কিংবা কটুকথা বলেননি। কালীদাসী ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দিয়ে বলে, লোকে যদি পাঁচ কথা বলে সেটা কি খুব অন্যায় ঠাকুরপো? অন্যায় নয়? না অন্যায় নয়। আমি তোমার কে? যে তারা চুপ করে থাকবে? তারপর বলল, তুমি খুড়িমাকে বলে দিও, আমি কালই আলাদা হয়ে থাকবো? মানে? মানে কিছু নয় ঠাকুরপো, আমিও বেশ কিছুদিন ধরে আঁচ করছি যে খুড়িমা আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেন না ঠিকই কিন্তু আগের সেই উষ্ণতা যেন হারিয়ে গেছে। তারপর দাশু ঠাকুরপোও বলে গেল, আমার আলাদা হয়ে থাকা উচিত, লোকের মুখ তো আর বন্ধ করা যাবে না। প্রভাত উত্তেজিত হয়ে বলে, কি দাশুদা এই কথা বলেছে? তারপরে বলে, দাশুদা জানবে কোথা থেকে? এ নিশ্চয়ই মায়ের কাজ। তারপর বলল, মা যেন দিনে দিনে কেমন হয়ে যাচ্ছে? হেসে কালীদাসী বলল, খুড়িমা মোটেও বদলে যায়নি। বদলে গেছো তুমি। তারপর বলল, আচ্ছা ঠাকুরপো তুমি আমাকে ধরে রাখতে চাইছো কেন? এর পরিণতি জান?

প্রভাত চুপ করে থাকে। ওঘর থেকে ভেসে আসছে তার মা ঝিমলিকে গান গেয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে। তার মানে আপাতত উনি আর এ ঘরে আসছেন না।

হ্যারিকেনের আলোটা একটু কমিয়ে দেয় প্রভাত। কালীদাসী বলে, কি ব্যাপার, আলো কমালে কেন? আমার মুখটা বুঝি দেখতে চাও না। প্রভাত তার উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকে। কালীদাসী বলে, কিছু বলবে? প্রভাত উঠে দাঁড়ায়। কালীদাসী বলে, একি চললে নাকি? প্রভাত আস্তে আস্তে তার পিছনে এসে দাঁড়ায়। সন্তর্পণে একটা হাত রাখে তার কাঁধে। একবার কেঁপে ওঠে কালীদাসী। তার প্রথম ভালবাসার স্পর্শ। কিন্তু কোন কথা না বলে চুপ করে থাকে। প্রভাতও যে কি বলবে বুঝতে পারে না। অনেকক্ষণ সে একটা হাত তার কাঁধে রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। ও ঘর থেকে তখনো ভেসে আসছে খুড়িমার ঘুমপাড়ানি গান,

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে
বুলবুলিতে খেয়েছে ধান খাজনা দিব কিসে
ধান ফুরালো পান ফুরালো খাজনার উপায় কি
আর ক'টা দিন সবুর কর চিনা বুনেছি।

প্রভাত বলল, ঝিমলি মনে হয় ঘুমাতে চাইছে না। একবার কাঁধটা ঝাঁকিয়ে তাকায় কালীদাসী। প্রভাত বলল, একটা কথা বলবো? বল। একদিন আমায় তুমি ভালবাসতে চেয়েছিলে তাই না? কালীদাসী তার কোন উত্তর না করে চুপ হয়ে থাকে। প্রভাত বলল, আমিও সেই সময় থেকে সত্যি তোমায় ভালবেসে ফেলেছিলাম। তেরছা চোখে আর একবার অবাক হয়ে তাকায় কালীদাসী।

প্রভাত বলে, যেদিন নিকুঞ্জদার সাথে তোমার বিয়ে হয়ে গেল, সেদিন যে আমার কি কষ্ট হয়েছিল তোমাকে তা বুঝাতে পারব না। তারপরে বলল, কিন্তু গোঁয়ার-গোবিন্দের ভালবাসা তো? আমার সেই ভালবাসার কথা কেউ জানতেও পারল না। সিরাজ ভাই কেন পালিয়েছিল আমি জানি না। কিন্তু আমি পালিয়েছিলাম, নিকুঞ্জদার ঘরে তোমাকে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলাম না বলে। তোমাকে যে অনেক কুকথা বলেছিলাম, তা কিন্তু আমার অন্তরের কথা ছিল না। যা বলেছিলাম, তা বলেছিলাম স্রেফ রাগের মাথায়। তার জন্য যে পাগলের মতো তোমার সাথে দেখা করে ক্ষমা পেতে চেয়েছিলাম, কেউ না বুঝলেও নিশ্চয়ই তুমি তা বুঝতে পেরেছিলে।

থামে প্রভাত। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে কালীদাসী বলে, আজ আর আমায় ভালবাস না? উত্তরে প্রভাত বলে, জানি না একে ভালবাসা বলে কি না। আমাদের গ্রামের ভালবাসা আর এই শহরের ভালবাসার রূপ কত আলাদা। এই পার্থক্যটা আমি আগে কখনো বুঝিনি। কালীদাসী বলল, যে রকম?

উত্তরে প্রভাত বলল—গ্রামের ভালবাসার মধ্যে ছিল একটা হিংস্রতা, কিন্তু এখানে এসে বাবুদের দেখে দেখে বুঝতে পেরেছি ভালবাসার মধ্যে হিংস্রতাই সব নয়। তার একটা সুন্দর রূপ আছে, তা প্রকাশ না করেও মনকে আনন্দে ভরে

দেওয়া যায়। তারপর বলল, এই যে তুমি এত কাছে, তবু কত দূরে! আমি ঠিক জানি গ্রামে হলে এই দূরত্বটা এতদিনে কবে যে শেষ হয়ে যেত! অথচ সারারাত ঘুমাতে পারি না। চোখের সামনে শুধু তোমার ছবি, অথচ তাকে যে একবার ছুঁয়ে দেখবো সে সাহসটুকুও সঞ্চয় করতে পারি না। মনকে সান্ত্বনা দিই, নাই বা ঘুচলো এ দূরত্ব, কিন্তু তুমি যে আমার কাছে আছো এটাই বা কম কি?

কালীদাসীর বুকের ভিতরটা হুহু করে কাঁদতে থাকে। প্রভাতের যে এত কষ্ট, এত তাকে ভালবাসে কোনদিনও সে তা ভাবেনি। এ যেন এক নতুন মানুষকে দেখছে কালীদাসী। কিন্তু প্রভাত কি করে জানবে তার একটু স্পর্শ পাওয়ার জন্য বুকটা তার ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। হাসিঠাট্টায় কতবারই তো সে ধরা দিতে চেয়েছে। পৌরুষহীন বলে মনে মনে তাকে অভিশম্পাত করেছে। অথচ তার বুকটাও যে ভেঙে তছনছ হয়ে যাচ্ছে, একথা মুখে না বললে সে তো বুঝতেও পারত না। কিন্তু এখন সে কি করবে? যে ভবিষ্যতের কল্পনা সে করে, দাশু বা খুড়িমা তা কিছুতেই মেনে নেবে না। অথচ প্রভাতকে ছেড়ে যে সে কোথাও যাবে তাও সে পারবে না। তাছাড়া তাকে সে ফিরাবে কিভাবে? এখনই তো মনে হচ্ছে তাকে বুকে তুলে নিয়ে আদরে আদরে ভরে দিই। কিন্তু কোন কিছু করার ক্ষমতা তার নেই। যে কাজগুলো সে করত, তাও তো সে ছেড়ে দিয়েছে গত কয়েকমাস। মুখে যতই বলুক সে আলাদা হয়ে যাবে, কিন্তু তা যে তার পক্ষে সম্ভব নয় কালীদাসীর চেয়ে তা আর বেশি কে জানবে?

এর মধ্যে আবার নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে, সত্যেনবাবু। সত্যেনবাবু যে এখানকার জন্য অনেক করেছে তা অস্বীকার করতে পারে না কালীদাসীও। কিন্তু খোকন মল্লিকদের কথাও একদম ফেলে দিতে পারে না সে। কিছু না হলে এতটা ঘৃণা তাদের মনে জন্মায় কি করে? এর মধ্যে প্রভাতকে দিয়ে ৩/৪ বার সংবাদ দিয়েছেন সত্যেনবাবু তার অফিসে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে। তার মেয়ে মন এই অতি আগ্রহকে স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারেনি।

প্রভাত পুরুষ মানুষ, একজন পুরুষের পক্ষে আর একজন পুরুষের চোখের ভাষা বোঝা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়, অথচ একটা মেয়ের কাছে তা অনেকটা জলভাত। কে জানে সত্যেনবাবু আর কত ধৈর্যের পরীক্ষা দেবেন? এতটা বয়স হয়েছে তবু আজো পর্যন্ত তিনি বিয়ে থা করেন নি। এটাও ভাল ভাবে নিতে পারে না কালীদাসী। বলল, ঝিমলি মনে হয় ঘুমিয়ে গেছে। চল খাবে। এই সামান্য কথা কটি বলতেও তার মনে যে কি কষ্ট।

১০

পিয়াশার অবস্থা দিনে দিনে বেশ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অথচ তার যে কি হয়েছে কোন পরীক্ষায় তা ধরা পড়ছে না। রানি বললেন, তোর কি হয়েছে মা কিছু তো বলবি? কৈ আমার তো কিছু হয়নি। তোমরা তো কত বড় বড় ডাক্তার দেখালে কত পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে, পেলে কিছু? সেটাই তো বড় ভয় মা! কিসের ভয় আম্মি? আমি তো ভালই আছি। না মোটেই ভাল নেই। তোর সেই চঞ্চলতা কোথায় গেল? বাঃ রে! আমি এখন বড় হয়ে গেছি না? আমার কি ছেলেমানুষি খাটে? আখতার সাহেব মেয়ের জন্য অকাতরে টাকা ব্যয় করে চলেছেন, কিন্তু মেয়ের স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি তো দূরের কথা দিনে দিনে তা আরো খারাপ হয়ে গেছে। সেদিন একবার আখতার সাহেবকে পৌঁছতে গিয়ে দেখে এসেছে প্রভাত। পিয়াশা তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেনি। তাই মাঝে মাঝে মনে পড়লেও ইচ্ছে করেই যায়নি আর।

আজ আখতার সাহেব তার কাছে জানতে চাইলেন, তুমি কি জামতলা চেনো? চিনি বাবু। একবার আমায় নিয়ে যেতে পার? পারব না কেন? কিন্তু রিকশায় তো অত পথ যাওয়া যাবে না। আখতার সাহেব বললেন, রিকশায় কেন যাবো? আমার গাড়িতেই যাবো, তুমি শুধু সঙ্গে থাকবে। তারপরে কি ভেবে বললেন, না না তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। সারাদিন রিকশা চালিয়ে তুমি যা পাও, আমি তা পুষিয়ে দেবো।

প্রভাত বলল, কি বলছেন বাবু? আপনি আমাকে এত স্নেহ করেন, বিশ্বাস করে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন, আর আমি আপনার কাছ থেকে টাকা নেবো? এরপর কি ভেবে বলল, আমি জানি আপনি সেখানে কেন যাবেন? কেন যাবো তুমি জান? উত্তরে প্রভাত বলল, ঠিক জানি বললে ভুল হবে, তবে অনুমান করতে পারি আপনি সেখানে পীর সাহেবের কাছে যাবেন।

আশ্চর্য হয়ে আখতার সাহেব বললেন, তুমি ঠিকই অনুমান করেছো। তুমি কি ঐ পীর সাহেবকে চেন নাকি?

না। তবে খালঘাটে গদাধর বাবু তার মেয়ের জন্য একবার গিয়েছিলেন। আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি কি এক জলপড়া দেন। তবে সে জল পিতলের ঘটিতে আপনাকে নিয়ে যেতে হবে। তাই নাকি? আমাকে তো সে কথা কেউ বলে দেয়নি। তারপর বললেন তাহলে তো একবার বাড়ি যেতে হয়। আমি তো ওসব কিছু নিয়ে আসিনি।

অগত্যা বাড়ি থেকে পিতলের ঘটিতে জল নিয়ে পীর সাহেবের ওখানে যখন পৌঁছলেন, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পীর সাহেব সন্ধ্যার নামাজ শেষ করে ধ্যানে

বসেছেন। আখতার সাহেব প্রভাতের কথা মতো জলের ঘটিটা তার সামনে রেখে মাটিতে বসলেন। আরো অনেকে বসে আছেন। এখানে এটাই নিয়ম। কথা বলা যাবে না। শুধু ঘটির নীচে কাগজে লিখে রাখতে হবে কি জন্যে এসেছেন। পীর সাহেব এঁকে একে ডাকবেন। আর মন্ত্রপূত করে যার ঘটি তাকে ফিরিয়ে দেবেন। আখতার সাহেবের যুক্তিবাদী মন এসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু কি করবেন? ডাক্তারবদ্যি তো কম দেখালেন না। কিন্তু মেয়ের যে কি হয়েছে ধরতেই পারলেন না কেউ। রানির অনুরোধ তাই ফেলতে না পেরে তাঁর এই পীর সাহেবের কাছে আসা। প্রভাত তো কারো জন্যে আসেনি তাই সে বাইরে অপেক্ষা করে। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ধ্যানভঙ্গ হয় পীর সাহেবের। তারপর একে একে সবাইকে যার যার ঘটিটা ফিরিয়ে দিয়ে বলেন, তিনদিন রোজ তিনবার করে এই জল খেতে হবে। বাকি জলটা নদী বা পুকুরে ফেলে দিতে হবে। ফেরার পথে আখতার সাহেব বললেন, তোমার কি মনে হয় প্রভাত এই জল খেলে বুলি ভাল হয়ে যাবে? প্রভাত উত্তরে বলে, গদাধর বাবুর মেয়ে তো ভাল হয়ে গেছে। আশ্বস্ত হয়ে আখতার সাহেব বললেন, সত্যি বলছ? অসহায় বাবার শেষ বিশ্বাস। বড় করুণ আর মর্মস্পর্শী। মিথ্যে কেন বলব বাবু? তাহলে বুলিও ভাল হয়ে যাবে কি বল প্রভাত? তারপর বলল, তুমি তো দেখেছো কি ছটফটে ছিল। এখন কারো সঙ্গে কোন কথাই বলে না। চেহারাও এত খারাপ হয়ে গেছে যে চেনাই যায় না। এরপর প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বললেন, তুমি তো সেই একদিন গিয়েছিলে, আর যাওনি তাই না? উত্তরে প্রভাত বলে, একদম সময় পাই না বাবু। তাছাড়া সেদিন তো ও আমার সঙ্গে একটা কথাও বলেনি! আখতার সাহেব বললেন, সেই জন্য যাও না? প্রভাত চুপ করে থাকে। আখতার সাহেব বলেন, আমার কি মনে হয় জান প্রভাত? কি? ওর অভিমানটা তোমার পরেই। তাই তোমার নাম শুনলে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তুমি কি ওকে কিছু বলেছো? যা অভিমানী মেয়ে? আমি আর কি বলব? কিন্তু সেদিন ওকে দেখে খুব কষ্ট হচ্ছিল।

আখতার সাহেব আর কিছু বলেন না! আব কি বলবেন? মন তার ক্ষত বিক্ষত। রিকশাস্ট্যান্ডে প্রভাতকে নামিয়ে দিতে চেয়েছিলেন আখতার সাহেব। প্রভাত তাকে একাকী ছাড়তে রাজি হয়নি। বাড়ি ফিরে আখতার সাহেব ভক্তি ভরে পিয়াশাকে সেই ঘট থেকে জল খেতে দিলে পিয়াশা হেসে বলে ডাক্তারবদ্যির 'পরে তোমার বুঝি আর কোন বিশ্বাস নেই আব্বু? চিরকাল যা তুমি বুজরুকি বলে ভেবে এসেছো আজ সেখানেই গেলে শেষ ভরসা হিসাবে? আখতার সাহেব বললেন, কি করব মা? মানুষের শেষ ভরসা তো করুণাময় আল্লাহ। তাই তার সেবকের কাছে গিয়েছিলাম যদি তিনি দয়া করেন। ঢক ঢক করে জলটা খেয়ে নেয় পিয়াশা। প্রভাত কাছে না গিয়ে দূর থেকে দেখে পিয়াশাকে। হঠাৎ তার খুব কান্না

পেয়ে যায়। কান্না লুকোতে সে বাইরে এসে দেখে একটি ছেলে হন্তদন্ত হয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

রিণ্টু তুই এতদিন পরে এলি? তোর চাচী তোকে কতদিন ধরে সংবাদ দিচ্ছেন বলতো? রিণ্টু শুধু সরি বলে ভিতরে ঢুকে যায়। রিণ্টু আখতার সাহেবের ভাইপো। পিয়াশার সমবয়সী। আখতার সাহেবের ইচ্ছে রিণ্টুর সাথেই তিনি তার মেয়ের বিয়ে দেবেন। ওর বাবা গরিব বলেই আখতার সাহেব তাকে তাই ভাল স্কুলে পড়িয়েছেন। এখন সে প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিজিক্স নিয়ে অনার্স করছে। পিয়াশাও ওই কলেজে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছিল। তারপর যে কি হল, রিণ্টুর নামও সে শুনতে পারে না। রিণ্টুও আর যখন তখন আসে না। রানি তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন যদি তার রোগশয্যার পাশে রিণ্টুকে দেখে ধীরে ধীরে তাকে মেনে নেয়।

কিন্তু তাকে দেখে পিয়াশা এমন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে যে, চিৎকার ক'রে বলে, বেরিয়ে যাও। লজ্জা করে না তোমার আমার কাছে আসতে? কি ভেবেছো তুমি? আমাকে বিয়ে করে আব্বুর সম্পত্তির মালিক হবে? আমি বলে দিচ্ছি কোন দিনও তোমার এই ইচ্ছে পূরণ হবে না। তারপর প্রভাত যে বাইরে আছে অনুমান করে চিৎকার করে ডেকে বলে প্রভাতদা, ওকে তুমি এখান থেকে নিয়ে যাও।

প্রভাত তার চিৎকার শুনে ভিতরে এসে দাঁড়ায়। তাকে দেখে বুলি আবার বলে শুনতে পাচ্ছ না প্রভাতদা? তোমরা সবাই এমন অবাধ্য কেন? রিণ্টু বলল, তুমি শান্ত হও পিয়াশা। আমি চলে যাচ্ছি। রানি বললেন, আমায় ক্ষমা করো বাবা। ও যে তোমাকে দেখে এমনটা করবে ভাবতে পারিনি। রিণ্টু বলল, একি কথা চাচী? আপনি ক্ষমা চেয়ে আমায় লজ্জা দেবেন না। তাছাড়া ও তো অসুস্থ। একটা অসুস্থ মানুষের কথায় ওরকম গুরুত্ব দেবেন না। আমি আবার আসব। বার বার আসব। দেখি কতবার ও আমায় তাড়ায়। আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায় রিণ্টু।

আখতার সাহেব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখেন। কিন্তু কিছু বলতে পারেন না। ও চলে গেলে পিয়াশা প্রভাতকে তার কাছে ডাকে। বলে, আমার উপর খুব রাগ করে আছো প্রভাতদা? উত্তরে প্রভাত বলে, রাগ করবো কেন? তাহলে আস না কেন? প্রভাত বলল, আমি তো জানতাম না তুমি এতটা অসুস্থ। এর পর থেকে মাঝে মাঝেই আসব। হাসি ফোটে পিয়াশার মুখে। জানতে চায় খালা কেমন আছে? ভাল। আর ঝিমলি? সেও খুব ভাল আছে। একদিন ওকে নিয়ে আসবে? আচ্ছা নিয়ে আসব। কালীদাসীর কথা সে ইচ্ছে করেই জানতে চায় না।

প্রভাত বলল, সবার কথা তো জানতে চাইলে আর একজনের কথা জানতে চাইলে না তো? কে? ভাবী? প্রভাত চুপ করে থাকে। পিয়াশা বলে, উনি তো ভাল আছেন। ওনার সাথে তো রোজ আমার দেখা হয়। কি সুন্দর হয়েছে এখন? প্রভাত

অবাক হয়ে বলে, রোজ দেখা হয় মানে? মানে আবার কি? রোজই তো উনি আসেন। কত সান্ত্বনা দেন। কত সুন্দর করে বলেন, তোমার সামনে অনাগত ভবিষ্যৎ, এখন এমন করে শুয়ে থাকলে হবে? রানি ইশারায় প্রভাতকে চুপ থাকতে বলেন।

পিয়াশা বলে, ঝিমলিকে কিন্তু একদিন নিয়ে আসবে, বলে পাশ ফিরে শোয় সে।

ফিরতে তাই রাত হয় প্রভাতের। তার মনের মধ্যে প্রশ্ন কালীদাসী রোজ যায় পিয়াশার কাছে। কৈ একবারও তো সেকথা কালীদাসী তাকে বলেনি। বললে কি সে নিষেধ করতো? হঠাৎ তার মনে হয় কালীদাসী তাকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করতে পারে না বলেই এই গোপনতা।

ফেরা মাত্র কালীদাসী জানতে চায় আজ এত দেরি করলে কেন? কোথায় গিয়েছিলে? প্রশ্নটা চট করে তাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। বলে, কোথায় গিয়েছিলাম তা তোমাকে বলতে হবে? তুমি রোজ রোজ কোথায় যাও সে কথা আমায় বলো?

কালীদাসী বলল, আমি রোজ রোজ কোথায় যাই? কোথায় যাও তা আমি কি করে জানবো? তারপরে বলে, রক্তে তোমার বহু পুরুষের নেশা। তোমার পক্ষে কি ঘরে থাকা সম্ভব? কালীদাসীর চোখ ফেটে জল আসে। বলে কি বললে? রক্তে আমার বহু পুরুষের নেশা? তা নেশাই যদি, তাহলে সে নেশা থেকে তুমি বাদ থাক কি করে? না তুমি পুরুষ নও? কথা ঘুরিও না। তারপর বলল, সিরাজ ভাইকে ঘোল খাইয়েছো, নিকুঞ্জদাকে খুন করেছো। এখন আছ আমার রক্ত খাওয়ার অপেক্ষায়। কিন্তু সে সুযোগ তুমি পাবে না। রাগে অভিমানে ক্ষিপ্ত হয়ে কালীদাসী বলল, আমি চাইও না, পেতে। কি আছে তোমার? ভালবাসার কোন ঐশ্বর্য আছে তোমার মধ্যে? তুমি তো পুরুষ নামের কলঙ্ক। আছে তোমার বুকের মধ্যে কোন জোর? তুমি তো এক নম্বরের ভীরু আর কাপুরুষ। মেয়েরা তোমাকে ভালবাসতে যাবে কিসের লোভে?

কোন লোভই যদি না থাকে তবে এখানে পড়ে আছো কেন? কালীদাসীও চাপা গলায় বিদ্রূপের সুর ফোটায়। আমি পড়ে না থাকলে তোমার চলবে কি করে? আর সেকথা আমার চেয়ে তুমিই বেশি জান। বাজে কথা বল না, তুমি যে কি চিজ তা আর জানতে বাকি নেই। জেনেই যখন গেছ তখন সেকথা ঢোল পিটিয়ে বলছ না কেন?

তাদের ঝগড়া শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন প্রভাতের মা। এসেই জানতে চান, কি হয়েছে বৌমা? এত চিৎকার কিসের? সামনে প্রভাতকে দেখে বলেন, ও তুই? তা তোর এত দেরি হল যে? কোথায় গিয়েছিলি? উত্তরে প্রভাত বলে, আমি কোথায় গিয়েছিলাম জানতে না চেয়ে তোমার বৌমার কাছে জানতে চাও না ও

রোজ রোজ কোথায় যায়?

প্রভাতের মা আশ্চর্য হয়ে বলেন, ও আবার কোথায় যাবে? ও তো সব সময় বাড়ি থাকে। মিথ্যে কথা? প্রভাত? চোখ রাঙাচ্ছ কেন মা? একজন আমারই খাবে আমারই পরবে, আবার আর আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তাকে কিছু না বলে তুমি আমার কাছে কৈফিয়ত চাইছো? তোমরা সবাই সমান।

মা ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, কি বললি? আমরা সবাই সমান? তা বৌমাকে কে আটকে রেখেছে, আমি না তুই? মেয়েটা আজ কত মাস হল বাইরে পর্যন্ত পা দেয় না। ঘরে থাকতে থাকতে ও ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। আর তাকেই তুই বলছিস রোজ রোজ বাইরে বেরোয়? বাপের ধাঁচ যাবে কোথায়। একগাদা তাড়ি গিলে এসে আমায় সন্দেহ করত আর বলতো আমি কোথায় যাই? তা তুইও নিশ্চয়ই গিলে এসেছিস কিছু?

গিলেছি তো বেশ করেছি? আমার পয়সায় আমি যা ইচ্ছে করবো। তুমি বলার কে?

মা আর থাকতে না পেরে অতবড় ছেলের এক গালে পাঁচটা আঙুল বসিয়ে দিয়ে বলে কি বললি? যা ইচ্ছে করবি? আবারও হাত তুলতে গেলে কালীদাসী বাধা দিয়ে বলে একি করছো খুড়িমা? অতবড় ছেলের গায়ে হাত দিলে লোকে কি বলবে? লোকে যা বলার বলুক, তাই বলে মিথ্যে অপবাদ দেবে?

কালীদাসী বলল, যে কোন কারণে হোক ওর মনটা অশান্ত। তাই কি বলছে বুঝতে পারছে না। তুমি ঘরে যাও খুড়িমা। আমি দেখছি।

কালীদাসী ওকে নিয়ে কলতলায় যায়। বাধ্য ছেলের মত ভাল করে চান করে প্রভাত। কালীদাসী তার আঁচল দিয়ে ভাল করে ওর মাথা ও গা মুছিয়ে দিয়ে বলে, এই ধর লুঙ্গি। ভিজে প্যান্টটা বদলিয়ে ফেলত। প্রাতিবাদ না করে প্যান্টটা বদলিয়ে লুঙ্গিটা পরে নেয় প্রভাত।

কালীদাসী বলল, দেরি করবে না কিন্তু আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি। এসে তাড়াতাড়ি খেয়ে নেবে, তারপর ঘুমুবে, একদম অবাধ্য হওয়ার চেষ্টা করবে না!

রুটি আর কয়েকটা আলু ছিল, তাই ভেজে রেখেছে কালীদাসী। কথা ছিল প্রভাত ফেরার পথে বাজার করে নিয়ে আসবে। কিন্তু সে কোন বাজার করে আনেনি। তাই থালার একপাশে খানিকটা আখের গুড় আর আলুভাজা দিয়ে খেতে দেয় কালীদাসী। কোন কথা না বলে চুপচাপ খেয়ে নেয় প্রভাত। তারপর মুখ আঁচাতে আঁচাতে বলল, মা কিন্তু ভাল করল না। আবার কথা বলছো? বলছি না খেয়ে উঠে ঘুমুবে। তারপর বলল, এস আমি বিছানা করে দিচ্ছি। একদম কথা বলবে না। শুয়েই ঘুমিয়ে পড়বে।

প্রভাতের মনে হয় এ এক আশ্চর্য মেয়ে। আজ বেশ কয়েক মাসতো হয়ে গেল

ও আছে এই বাড়িতে, কিন্তু এমন শাসনতো ও কোনদিন করেনি। অথচ কি ভাল যে লাগছে? প্রভাত বলল, ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে। ঘুমুবো। তুমি আসবে তো? ভীষণ আশ্চর্য হয়ে কালীদাসী বলল, আমি আসবো তো মানে? কোথায় আসবো? প্রভাত কোন রকম দ্বিধা না করে বলল, আমার কাছে। আমার বিছানায় আজ তুমি আমার কাছে শোবে। ভয়ঙ্কর বিস্ময়ে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল সত্যি তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে! তারপর বলল, তোমার কাছে, তোমার বিছানায়। এর মানে বোঝ? প্রভাত অবুঝের মতো বলল, আমি কিছু বুঝতে চাই না। তুমি আমার কাছে শোবে, ব্যস! হাতটা ধরে আছে তখনো। কালীদাসী ফিস ফিস করে বলল, আচ্ছা শোব। এবার ছাড় তো?

একটু আগে খাওয়া হয়ে গেছে। ঝিমলি থাকে খুড়িমার কাছে। তাকে নিয়ে কোন চিন্তা নেই। কিন্তু সে এখন কি করবে? একাকী বিছানায় ছটফট করতে থাকে। কিছুতেই ঘুম আসে না কালীদাসীর। মনে মনে ভাবে প্রভাতও নিশ্চয়ই ঘুমায়নি। ও-ও নিশ্চয় ছটফট করছে ওর বিছানায়। একবার উঠতে চেষ্টা করে, কিন্তু কে যেন জোর করে তাকে বিছানার সঙ্গে চেপে ধরেছে। তার ভাল লাগার প্রথম পুরুষ। নিকুঞ্জের সঙ্গে যেদিন সে প্রথম এসে দাঁড়িয়েছিল তার সামনে সেদিন থেকে তাকে সর্বস্ব দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিয়েও তা সে পারেনি। অথচ কতবার মনে হয়েছে একবার যদি সে ডাকে, তার বুকে পাগলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে কালীদাসী, কিন্তু তেমন কোন আহ্বান না পেয়ে সে সিরাজের কথা ভেবেছে। কিন্তু সিরাজ নয় জীবনের এই প্রান্তে এসে তার মন জুড়ে শুধু আসন অধিকার করে আছে প্রভাত। আর কেউ নয়। ২৫/২৬ বছরের এক বলিষ্ঠ যুবক প্রভাত। তার চেহারায় রয়েছে এমন এক পুরুষালী আকর্ষণ যা কোন মেয়ের পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

পিয়াশার চোখেও কালীদাসী দেখেছে সেই আকর্ষণ। কিন্তু বুদ্ধিমতী মেয়ে পিয়াশা দেখেছে অন্য এক প্রভাতকে। যে প্রভাত শুধু যৌবনের টানে নিজেকে ভাসিয়ে দেয় না। তার আত্মমর্যাদা বোধ, যুক্তি ও বিচারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আর যেদিন সে জানতে পারল কালীদাসী প্রভাতের আপন নয় পাড়ার বৌদি, সেদিনই সে নিজেকে সরিয়ে নিল। তার পক্ষে এক গ্রাম্য বিধবার সঙ্গে লড়াই করা কোন সম্মানজনক ব্যাপার নয়। কালীদাসী নিশ্চিত যে প্রভাতের মনের মধ্যে পিয়াশার কোন ছায়া নেই। তার মনের মধ্যে যদি কেউ থাকে সে কালীদাসী। সেই কালীদাসীকে আজ ভীষণভাবে চাইছে প্রভাত। তবু সে পারছে না। কিন্তু তাকে যে পারতে হবে। নিজের উপোসী মন নিয়ে সে যে ক্ষতবিক্ষত।

তখন রাত কত? জানে না কালীদাসী। নিশ্চয়ই শেষ প্রহরের দিকে এগিয়ে চলেছে। কালীদাসী মনের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে উঠে পড়ে। পাশের ঘরে

একবার কান পেতে শোনার চেষ্টা করে ঝিমলি কাঁদছে কিনা। খুড়িমা জেগে আছে কিনা। না তারা কেউ জেগে নেই। নিশ্চিত হয়ে সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলে প্রভাতের ঘরে। অন্ধকারকে চোখে সইয়ে নিয়ে বুঝবার চেষ্টা করে দরজাটা খোলা না ভিতর থেকে বন্ধ? দরজাটা যে খোলা আছে নিশ্চিত হয়ে ভিতরে পা ফেলে কালীদাসী। বুকের মধ্যে তার সমুদ্রের তুফান। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে সে প্রভাতের বিছানার পাশে।

প্রভাতও কি বুঝতে চাইছে কালীদাসী সত্যি সত্যি তার কাছে এসেছে? তার চোখেও তো ঘুম নেই। ঘুমোবার চেষ্টা সেও করেছে, কিন্তু পারেনি। তার বুকেও ঢেউ ভাঙার খেলা। যখন বুঝতে পারে তা কালীদাসী ছাড়া আর কেউ নয়, একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে কালীদাসীকে স্পর্শ করে। বলে, এলে তাহলে?

কালীদাসী উত্তরে শুধু বলে, এখনো ঘুমোওনি? প্রেম যে কখন কি ভাষায় কথা বলে তা বুঝি দুটি হৃদয় ছাড়া আর কেউ জানে না।

১১

খোকন মল্লিকেরা কিন্তু চুপচাপ বসে নেই। তারাও ঘুঁটি সাজাতে ব্যস্ত। সত্যেনবাবুর এই পরোপকারী ভাল মানুষী আর ক্ষমতার দম্ভকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার জন্য তাদের চেষ্টার অন্ত নেই। এই কাজে তারা অতসীকে ব্যবহার করতেও পিছপা নয়। সেই অতসী যাকে নিয়ে সত্যেনবাবুকে জড়িয়ে দুর্নাম এই খোকন মল্লিকেরা ছড়িয়েছিল। সে তখন খোকন বাবুদের কাছের লোক হয়ে গেছে কিভাবে, সত্যেনবাবু তা বুঝতে পারেন না।

অথচ এই অতসীকে একসময় সর্বক্ষণ দেখা যেতো সত্যেনবাবুর সাথে। এমনও সময় গেছে যে, সত্যেনবাবুর কাছে পৌঁছাতে গেলে তার অনুমতি নিয়েই যেতে হতো। খোকন মল্লিকেরা যে কিভাবে সেই অতসীকে সত্যেনবাবুর কাছ থেকে ছিনিয়ে এনেছে সে এক রহস্য। অন্যদিকে সত্যেনবাবুর চরিত্রের একটা দিক হল, যে কেউ যদি তার কাছ থেকে চলে যায় তার দিকে ফিরেও না তাকানো। অতসী তাই সত্যেনবাবুর কাছে অতীত। তাকে নিয়ে ভাবতেও চান না তিনি। কিন্তু তিনি না ভাবলে কি হলে? ঘটনার গতিপথ তো রুদ্ধ করবার ক্ষমতা মানুষের নেই, তারপর সেখানে যদি থাকে পরিকল্পনা মাফিক ষড়যন্ত্র।

বেশকিছুদিন তিনি এখানে ছিলেন না। ছুটি কাটাতে দীঘা গিয়েছিলেন। অতসীরাও গিয়েছিলেন। সেখানে হোটেল থেকে বেরোতে দেখা হয়ে যায় সত্যেনবাবুর সাথে। একেবারে মুখোমুখি। সত্যেনবাবু তখন হোটেলে ঢুকছেন, তাই এড়িয়ে যেতে পারেন না। তার সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা। তাকে ইশারায় কিছু

বলতে ভদ্রমহিলা হোটেলের সিঁড়িতে দাঁড়ান। অতসী বললেন, নতুন আমদানি বুঝি! আশ্চর্য হয়ে সত্যেনবাবু তাকান তার দিকে।

তিনি তার বিশ্বস্ত কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে কাউকে কিছু না বলে এখানে এসেছিলেন, অতসীর তো তা জানার কথা নয়। অতসী বোধহয় জানতও না। খোকন মল্লিকরাই তাকে জানিয়েছে, সত্যেনবাবু একটি মেয়েকে স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে দীঘার এই হোটেলে উঠেছেন। থাকবেন প্রায় একমাস। তুমি যদি প্রতিশোধ নিতে চাও তবে এটাই সুযোগ। ওখানে তোমার রাখী ভাই সুজয় দত্ত আছেন দীঘা থানার চার্জে।

সত্যেনবাবু তাকে কোন প্রতিশ্রুতি না দিলেও অতসীর মনে একটা স্বপ্ন ছিল যে, একদিন সত্যেনবাবু তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেবেন। কিন্তু সত্যেনবাবু যখন বললেন, অসম্ভব, অতসী মনে খুব আঘাত পায়। কথায় আছে নারী তার প্রেমে ব্যর্থ হলে ভয়ংকরী হয়ে ওঠে, মরিয়া চেষ্টা করে প্রেমিকের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার। আর খোকন মল্লিকরা এই সুযোগটা নেয়।

সুজয় দত্ত এক সময় অতসীকে ভালবাসত। কিন্তু গ্রাম্য জীবনে জাতিগত কারণে এ বিয়ে সম্ভব নয় বুঝতে পেরে অতসী ও সুজয় নিজেদের মধ্যে রাখী ভাইবোনের সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল। যতদিন তারা গ্রামে ছিল এই সম্পর্ক তারা বজায় রেখেছিল। পরে তো কে কোথায় হারিয়ে গেল। খোকন মল্লিকেরা কিন্তু সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে পৌঁছিয়ে যায় সুজয় দত্তের কাছে। এবং সত্যেনবাবুর কাছে অতসী কীভাবে অপমানিত হয়েছে সেকথা ইনিয়ে- বিনিয়ে বলেন আর সুজয় দত্তও এতদিনকার হারিয়ে যাওয়া রাখী বোনের সম্মানরক্ষার্থে তার যা করার তা করার শপথ নিয়ে বসে। আর সেকথা খোকন মল্লিক বুঝিয়ে বলে অতসীকে। তার বিদ্রোহী নারী মন এমনই কোন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

সত্যেনবাবু হয়তো তাকে এড়িয়ে যেতেন, কিন্তু তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের পরে এই বিদ্রুপ, তাঁর সমস্ত স্থৈর্যের বাঁধ ভেঙে দেয়। চিৎকার করে বলেন, অতসী? অতসীও ছাড়বার পাত্রী নয়, বলল, থামুন আপনি? কাকে চোখ রাঙাচ্ছেন? আপনাকে কি আমি চিনি না? নিজের স্ত্রীর পরিচয় দিয়ে এই আমাকে নিয়ে কি আপনি এই হোটেলে রাত কাটাননি? সে প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে সত্যেনবাবু বললেন, তুমি কেন এসেছো এখানে? বাঃ চমৎকার! দীঘা কি আপনার পৈতৃক সম্পত্তি নাকি যে আপনার অনুমতি ছাড়া এখানে আসা যাবে না? সত্যেনবাবু বললেন. ঠিক আছে এসেই যখন পড়েছো তখন আর কি করা যাবে? কাল ভোরেই তুমি চলে যাবে। আর আমার সঙ্গে যে তোমার দেখা হয়েছিল একথা কাউকে বলতে পারবে না। অতসী বলল, যদি না শুনি? শুনতে তোমাকে হবেই অতসী. না হলে...

না হলে কি? পরিণতিটা মারাত্মক হবে। তাই নাকি? আচ্ছা দেখা যাক আপনার ক্ষমতা। আমিও অতসী সমাদ্দার। এক গরিব ঘরের বিধবা মেয়ে। এ দেহটা ছিঁড়ে খাওয়ার জন্য আপনার মতো লোকে র অভাব হয়নি। বলতে পারেন এ দেহটা বিষে জর্জর হয়ে গেছে। বয়ে বেড়াতে ঘেন্নাই হয়। কিন্তু আপনার তো তা নয়। বাঁচার ইচ্ছে ষোলআনা, ভোগের ইচ্ছে তার থেকেও বেশি। ভয় তো আপনার পাওয়ার কথা। সত্যেনবাবু বললেন, খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু। তুমি কি জান আমার এক তুড়িতে তোমার দেহটা সমুদ্রের জলে ভাসবে। অতসী বললেন, জানি। কিন্তু তারপর? পারবেন তো মুখ দেখাতে? তার চেয়ে এক কাজ করুন। কি? আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিন, যদি ভোগের ইচ্ছে থাকে ভোগ করে নিন, কিন্তু শর্ত একটাই আমাকে যে আপনি টাকা দিয়েছেন তা কাউকে বলা যাবে না। অতসীর এই দুঃসাহস কল্পনাও করতে পারেন না সত্যেনবাবু। কিন্তু নিজের 'পরে তাঁর আত্মবিশ্বাস এত যে অতসী আর পালাবে কোথায়? গোটা খালঘাট আর খালপাড় অঞ্চলটা তো তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাদের বোঝাতে কষ্ট হবে না। আপাতত প্রসঙ্গ যাতে এখানেই ইতি হয় তার জন্য বললেন, ঠিক আছে আমি চেক লিখে দিচ্ছি। অতসী প্রতিবাদ করে বলে, ও সব চলবে না সত্যেনবাবু। আমাকে ক্যাশ টাকাই দিতে হবে। কিন্তু অত টাকা ক্যাশ তো দিতে পারব না। অতসী বলল, সঙ্গে তো অনেকগুলো ব্যাঙ্কের এ টি এম কার্ড আছে, তুলে দিন। আচ্ছা তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমি টাকা তুলে নিয়ে আসি। বেরিয়ে তার মনে হয় কেন দেবেন টাকা? অতসীর মতো একটা দেহপসারিনীর কাছে তাঁকে হেরে যেতে হবে? কিছুতেই নয়।

অতসী হাসতে থাকে। সেবার সাতরাতের জন্য ১০০ টাকা করে ৭০০ টাকা দিয়েছিলেন। আর এবার সামান্য শক্ত হতেই এক নাগাড়ে ৫০,০০০ টাকা। ভিতরে গিয়ে ওয়েটিং রুমের বেঞ্চিতে বসে অপেক্ষা করে অতসী। মনে মনে কল্পনা করে এতগুলো টাকা দিয়ে সে কি করবে? মনে মনে অসংখ্য ধন্যবাদ জানায় খোকন মল্লিককে। না লোকটার এলেম আছে। আর অন্তর থেকে স্বীকার করে নেয়, এলেম আছে বলেই না সত্যেনবাবুর মতো এমন প্রবল প্রতাপ নেতার বিরুদ্ধে লড়াই করার হিম্মত রাখে? কিন্তু ভয়ও একটা আছে যদি সে হেরে যায়? কিন্তু সে সব পুরনো কথা ভাবতে রাজি নয় অতসী। সে এখন এক অবশ্যম্ভাবী জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত।

কিন্তু এত বছর পরে সুজয় দত্ত তাকে চিনতে পারবে তো? দেশের বাড়ির রাখী বোনকে সে যে চোখেই দেখুক না কেন, আজকের পুলিশ অফিসার সুজয় দত্ত রাখী বোনের মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট হবে তো? মনে মনে ভাবে, খোকন মল্লিক এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাননি তো? সত্যেনবাবু আর তাকে শেষ করতে

পারলে খোকন মল্লিককে তো আর কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না।

হঠাৎ মনে পড়ে, যায় খোকন মল্লিকের কথা, আরে সে তো বলেছিল সুযোগ সামনে এসে দাঁড়ালে সে যেন সুজয় দত্তকে ফোন করে। আর এখনই তো সেই সুযোগ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এখনই তো তাকে ফোন করার ধ্রুব মুহূর্ত। ফোনের ও প্রান্ত থেকে ভেসে আসে সুজয়ের কণ্ঠস্বর। কত কত বছর পরে অতসী কথা বলছে তার রাখী ভাইয়ের সাথে। সংক্ষেপে সব কথা বলে বলল, আমার ভীষণ বিপদ। সুজয় জানতে চায়, তুমি আছ কোথায়? অতসী হোটেলের নাম এবং ঠিকানা দিয়ে বলে বিপদ কিন্তু একেবারে শিয়রে সুজয়দা, দেরি করো না, এখনি চলে এস।

সত্যেনবাবু চলে আসেন এর মধ্যে। সঙ্গে তার দলের আরো ৩/৪জন। অতসী একবার দেখে নিয়ে বলে, ও তোমরা? তা ভালই তো একসঙ্গে পাওয়া গেলো বলে আমারও লাভ তোমাদেরও লাভ।

কালু ছেলেটি বলল, অত নকর বকর করবে না অতসীদি। মুখ বুজে চল আমাদের সাথে। তোদের সাথে? কেন রে? ভোগের বখরা পেয়েছিস নাকি?

কালু সঙ্গে সঙ্গে এক থাপ্পড় বসিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নিয়ে বলে, ছেনালি মেয়ের আবার মুখে খই ফুটছে। সেন্টুকে বলল, ধরতো ওকে সেন্টু।

পুলিশের গাড়ি যে ততক্ষণে ওদের ঘিরে ফেলেছে ওরা তা বুঝতে পারেনি। বন্দুকে কয়েকটা ফাঁকা আওয়াজ করতেই চারপাশের লোকজন সরে যায়। অতসীকে দ্রুত এক হাতে টেনে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসতে বলে, সুজয় দত্ত। সত্যেনবাবু অতটা আঁচ করতে পারেননি। তিনি ফাঁক বুঝে সরে যেতে চাইলে তাঁর দিকে বন্দুক তাক করে সুজয় দত্ত বলে, একদম পালাবেন না। সত্যেনবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনি কিন্তু অন্যায় আদেশ করছেন অফিসার। আমাকে আপনি না যেতে দিতে পারেন না? সেটা বুঝবে পুলিশ, আপনি নন। পরে আপনি পুলিশের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যা করার করবেন। কিন্তু আপাতত আপনি আমাদের অবাধ্য হবেন না। তারপর সে অতসীর কাছে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা আরো একবার সংক্ষেপে শুনে নিয়ে সত্যেনবাবুর কাছে জানতে চান আপনি সত্যেনবাবু? হ্যাঁ। আপনি দীঘায় কতদিন আছেন? তা প্রায় দিন পনেরো হবে। সঙ্গে আর কে আছেন? আমার স্ত্রী। এই হোটেলে থাকেন আপনি? হ্যাঁ। চলুন আপনার স্ত্রীর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

সত্যেনবাবু বললেন, এভাবে বিনা কারণে একজন সম্ভ্রান্ত গৃহবধূর সঙ্গে আপনি কথা বলতে পারেন না। থামুন আপনি। কি করা যায় বা না যায় সেটা কি আপনি আমাকে শিখাবেন? তারপর যে ৩/৪ জন সত্যেনবাবুর হয়ে অতসীকে অশ্লীল ইঙ্গিত করেছিল, তাদের জিপে তোলার আদেশ দিয়ে সুজয় দত্ত সহকর্মীদের

নিয়ে আসে সত্যেনবাবুর হোটেল রুমে। সঙ্গে ম্যানেজারকেও ডেকে নেওয়া হয়।

দরজাটা ভেজানো। সত্যেনবাবু বাইরে থেকে ডাকেন শিলা! কোন সাড়া নেই। আবারও ডাকেন শিলা! এবারও কোন সাড়া নেই। সত্যেনবাবু দরজা হা করে খুলে ঘরে ঢোকেন। কিন্তু এ কি! মেঝেটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে কেন? শিলা উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। সুজয় দত্ত বলল, কই ওনাকে ডাকুন। কিন্তু শিলা তখন সব ডাকাডাকির বাইরে। সত্যেনবাবু কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, শিলা এ তুমি কি করলে?

শিলা শহরেরই এক বস্তির মেয়ে। অনেকদিন ধরে সত্যেনবাবুর দৃষ্টি ছিল তার দিকে। আর ভোগ নয়, এবার এক শান্ত জীবনের স্বপ্ন দেখেন সত্যেনবাবু। অনেক তো হল, আর কেন? শিলার বয়স বেশি নয়। খুবই গরিব ঘরের মেয়ে খুবই শান্তশিষ্ট। সত্যেনবাবু এমনই একটা মেয়েকে নিয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চান। শুভাকাঙ্ক্ষীরাও বারে বারে তাকে এমন কথাই বলছিল। কিন্তু এই বয়সে বিয়ের টোপর মাথায় দিতে ভীষণ তার লজ্জা, তাই কেবলমাত্র সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে তাকে স্ত্রী হিসাবে স্বীকৃতি দিলেন, পরে কোন এক সময় রেজিস্ট্রেশন করে নেওয়া যাবে। শিলা এতেই খুশি, শুধু বলল, এ কেমন বিয়ে, পুরুত নেই, মন্ত্র নেই, লোকে মানবে তো? মানবে মানবে, তুমি আর আমি মানলে সবাই মানবে।

দীঘাতে আনন্দেই কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। এমন সময় অতসীর ঐ কথাগুলো কানে আসে শিলার। তারপরে লুকিয়ে সব কথা শুনে নিজের উপর তীব্র ধিক্কার হয় তার। এ মুখ সে দেখাবে কেমন করে? অপমান আর লজ্জায় তার মাথা নুইয়ে আসে।

সত্যেনবাবুর মত একজন প্রভাবশালী নেতা তার মেয়েকে বিয়ে করতে চান, হোক না বয়স একটু বেশি, তাঁর দারিদ্রের অবসান কল্পনায় শিলার বাবা রাজি হয়ে যান। তাঁর তো আরো দুটি মেয়ে আছে, তাদেরও তো বিয়ে দিতে হবে। সত্যেনবাবু জামাই হলে অন্তত তাঁর ভাবতে হবে না। তাঁর মনে যা একটু খুঁতখুতানি তা এই সিঁদুর পরিয়ে আগে স্বীকৃতি, তারপর রেজিস্ট্রেশন। তিনি চেয়েছিলেন বিয়েটা হোক শাস্ত্রমতে। কিন্তু সত্যেনবাবু যখন বললেন, আমাকে কি অবিশ্বাস করছেন? তখন তিনি আর কোন বিতর্কে জড়াতে চাইলেন না।

শিলার মায়ের কিন্তু এ বিয়েতে একদম মত ছিল না। তিনি বার বার শিলাকে বলেওছিলেন, সব দিক ভেবে দেখ মা। বাপের বয়সী একজনকে বিয়ে করে তুই কি সুখি হবে? উত্তরে শিলা বলেছিল, তুমি এত ভাবছ কেন মা? তুমি দেখে নিও আমি ঠিক সুখী হব। তাছাড়া একবার ভাবতো আমাদের মতো গরিব ঘরে কে আসবে তোমার জামাই হয়ে? এ ব্যাপারে ওনার সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়েছে। উনি বলেছেন দীঘা থেকে ফিরেই একটা ভদ্র এরিয়ায় তোমাদের থাকার

ব্যবস্থা করবেন। বোনেদের পড়ার দায়িত্ব নেবেন। বাবার জন্য একটা ১০—৫টা স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা করবেন। তোমাকে আর বাড়ি বাড়ি কাজ করতে হবে না। এত কিছুর বিনিময়ে আমি না হয় সামান্য ত্যাগ স্বীকার করলাম। তবু তার মা খুশি হতে পারেন না। বলেন, মা, আমাদের গরিবের সংসার। তাতে আমার খুব একটা দুঃখ হয় না। আমরা সবসময় একে অপরকে জড়িয়ে থাকি। কিন্তু উনি অনেক বড়লোক, আর ক্ষমতাবান। এতদিন কেন বিয়ে করেননি কে জানে? চাইলে তো তিনি এখনো অনেক ভাল মেয়ে এবং বড় ঘর পেতে পারেন? অথচ তিনি আমাদের মতো ঘরে বিয়ে করতে চাইছেন, এতে কেন যেন মন সায় দিতে পারছে না। তার অতীতও তো আমরা জানি না।

শিলা অভিমান নিয়ে বলে তুমি চাও না আমি ভাল থাকি? মায়ের চোখে জল। বললেন, একথা তুই বলতে পারলি? বেশ তোরা যা ভাল বুঝিস কর। পরে কিন্তু আমাকে দোষ দিবি না।

ছবিটা জ্বলজ্বল করে ওঠে চোখের সামনে। তার মানে সত্যেনবাবু আসলে এক দুশ্চরিত্র লোক। আগেও আর একজনকে স্ত্রী সাজিয়ে মজা লুটেছেন, আজ এসেছেন তাকে নিয়ে মজা লুটতে! না তা সে হতে দেবে না। তার যা হওয়ার হয়ে গেছে, কিন্তু আর কোন মেয়েকে নিয়ে উনি যাতে এই জঘন্য কাজ আর না করতে পারেন তার ব্যবস্থা সে করে যাবে। বেশিক্ষণ ভাবার অবকাশ নেই। তাকে যা করতে হবে তাড়াতাড়ি করতে হবে। নিজে তো মরবে, আর ঐ শয়তানটাকেও ফাঁসিয়ে যাবে। মাধ্যমিক পাশ মেয়েটি কাগজ টেনে নিয়ে পুলিশের উদ্দেশে লেখে, "আমি বুঝতে পারিনি আমাকে ঠকানো হয়েছে। অভাবের সংসারে ওঁর প্রস্তাব মেনে নিই। আমার সিঁথিতে সিদুর পরিয়ে বলেছিলেন আজ থেকে আমি ওঁর স্ত্রী। হানিমুনে আমাকে উনি দীঘায় নিয়ে আসেন। এখানে একটা মেয়েকে দেখে চমকে ওঠেন উনি। পরে ওঁদের কথা চালাচালির মধ্যে জানতে পারি মেয়েটির নাম অতসী, তাঁকেও একদিন স্ত্রী সাজিয়ে এখানে নিয়ে এসেছিলেন সত্যেনবাবু। যতোদুর বুঝেছি দীঘাতে উনি প্রায়ই আসেন এবং সঙ্গের মেয়েটিকে স্ত্রী পরিচয় দিয়ে তাকে ভোগ করেন। আমিও তার বলি। এ মুখ আমি আর দেখাতে চাই না। তাই মৃত্যুকে বেছে নিলাম। আর আপনার কাছে অনুরোধ রেখে গেলাম শয়তানটার যেন চরম শাস্তি হয়। যাতে আর কোন গরিব আর অসহায় মেয়েকে ওর লালসার বলি না হতে হয়। —শিলা।

বি. দ্র.—পারলে আমার মৃতদেহটা এখানেই সৎকার করে, ঝাউতলায় আমার বাবা-মাকে সংবাদটা দিয়ে দেবেন।

ভাঁজকরা কাগজটা খাটের এক কোনে পড়েছিল। সত্যেনবাবুর চোখে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে তা তুলতে গেলে সুজয় দত্ত কড়া আদেশে বলল একদম ছোঁবেন না।

তারপর এগিয়ে গিয়ে কাগজটা তুলে নেয়, এবং ভিতরের লেখাটায় একবার চোখ বুলিয়ে তা পকেটে রেখে দেয় সুজয় দত্ত। সহকর্মীকে বলল, ডেডবডিটা মর্গে পাঠানো দরকার। তুমি তার ব্যবস্থা করো। ওটা পকেটে রাখলেন কেন? আমাকে দিন তো। আমার জানা দরকার আমার স্ত্রী কি লিখে গেছেন?

সুজয় দত্ত উপেক্ষায় হেসে ওঠে। তারপর বলে, স্ত্রী? বেশ! তাহলে শুনুন, উনি কি লিখেছেন? বলে লেখাটা শব্দ করে পড়তে আরম্ভ করে সুজয় দত্ত। পড়া শেষ করে কূটীল দৃষ্টি হেনে বললেন, কি শুনলেন তো? সব শুনে সত্যেনবাবু বললেন, আমাকে ছক কষে ফাঁসানো হচ্ছে। সুজয় দত্ত বলল, সে কথা আপনি কোর্টকে বলবেন। আপাতত আপনাকে অ্যারেস্ট করা হল।

পরের দিনই পাঁচজনকে তোলা হল কনটাই কোর্টে। বিচারক পাঁচজনকেই পুলিশি হেফাজতে রাখার আদেশ দিলেন। জামিন আর কিছুতেই হয় না।

দলের রাজ্য নেতৃত্বের কাছে সংবাদটা পৌঁছাতেই তাকে সঙ্গে সঙ্গে বহিষ্কার করা হয়। আখতার সাহেবের কানেও সংবাদটা পৌঁছয়। কাগজেও লেখালেখি হয়। কিন্তু আখতার সাহেব প্রথমে একথা বিশ্বাসই করতে চাননি। এমন একজন লড়াকু মানুষের এমন জঘন্য চরিত্র কি করে হয় বুঝতে পারেন না তিনি। কিছুদিন ধরে সত্যেনবাবু নেই, এটাই জানে প্রভাত, এর বেশি তার জানারও প্রয়োজন নেই। সামান্য রিকশাওয়ালা সে, সত্যেনবাবুদের মতো মানুষদের দৈনন্দিন খবর জেনে তার কি লাভ?

একদিন প্রভাতের রিকশায় বাড়ি ফিরবার সময় আখতার সাহেব জানতে চান, সত্যেনের সম্পর্কে কিছু জান? প্রভাত বলল, লোকে অনেক আজেবাজে কথা বলছে তাঁর সম্পর্কে, কাগজেও কি সব আজেবাজে কথা লিখছে, কিন্তু বাবু আমার একদম বিশ্বাস হয় না এসব। আমার মনে হয় এসব খোকন মল্লিকের কারসাজি।

আখতার সাহেব বললেন, আমারও প্রথমে বিশ্বাস হয়নি, কিন্তু পরে বুঝতে পেরেছি এ সবই সত্যি। প্রভাত বলল, আপনি কি দীঘায় গিয়েছিলেন? উত্তরে আখতার সাহেব বললেন, কনটাই কোর্টে একটা কেস ছিল। সেখানে গিয়ে জানতে পারি সত্যেনের কীর্তিকলাপ। হোটেলের ম্যানেজার তাকে সব বলেছেন। তারপর বললেন, কাকে বিশ্বাস করব বলতে পার? রিণ্টুকে তো তুমি দেখেছো? আমার ভাইপো হয় সম্পর্কে। ওর বাবা খুব গরিব। আমি নিয়ে এসে ওকে ভাল স্কুলে ভর্তি করলাম। রাজ্যের সবচেয়ে নামজাদা কলেজে ভর্তি করে হোস্টেলে রেখে পড়ালাম। আর এসব করেছিলাম বুলির সঙ্গে ওর বিয়ে দেব বলে। কি যে হল কে জানে? বুলি ওকে একদম সহ্য করতে পারছে না। অন্যদিকে রিণ্টুর বাবা অনেক টাকার বিনিময়ে ছেলের বিয়ে অন্যত্র ঠিক করেছেন।

প্রভাত জানতে চায় বুলি এখন কেমন আছে? অনেকটা ভাল। সবই আল্লার

ইচ্ছে। তারপর বললেন, তুমি তো মাঝে ক'দিন নিয়মিত যাচ্ছিলে, এখন আবার যাওয়া বন্ধ করলে কেন?

একদম সময় পাইনা বাবু। সে তো ঠিক কথা। হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর আর কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে থাকে না। তবু সময় করতে পারলে যেও, আর পারলে সত্যেনের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলো। জানো নিশ্চয়ই দল ওকে বহিষ্কার করেছে। শুনেছি বাবু, কিন্তু এতটা অকৃতজ্ঞ হই কী করে বলুন? এই যে মাথা গুঁজবার ঠাঁই পেয়েছি সে তো ওনার জন্য।

আখতার সাহেব বললেন, তোমার ভালর জন্যই বলছি ওসব ভুলে যাও। তাছাড়া সত্যেন তো বিনালাভে কিছু করেনি। তোমাদের জন্য লাখ চারেক টাকা ব্যয় করেছেন বিনিময়ে তিন মাসে ফেরত পেয়েছেন ৬ লাখ টাকা। ২ লাখ টাকা লাভ করেছেন এই ব্যবসায়। তাই বলছি দল যাকে বহিষ্কার করেছে তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখাই ভাল।

বাড়ির গেটে নেমে আখতার সাহেব বললেন, চল ভিতরে। প্রভাত অস্বীকার করতে পারে না। ভিতরে গিয়ে বসে।

পিয়াশা কাছে এসে বলে, খুব কাজ বেড়ে গেছে তাই না প্রভাতদা? প্রভাত দেখে পিয়াশা অনেকটা সুস্থ। বলল, কাজ তো আছে বুলি। কাজ না করলে খাব কি? পিয়াশা সে কথার কোন প্রতিবাদ না করে বলে, জান আজ ভাবি এসেছিল। কি সুন্দর হয়েছে দেখতে? প্রভাত মনে মনে ভাবে তাহলে পিয়াশা এখনো সুস্থ নয়। কিন্তু রানির কথায় সে ভুল ভাঙে প্রভাতের। উনি বললেন, তোমার বৌদি কিন্তু ভারি সুন্দর। খুব হাসিখুশি। আগে তো দেখিনি তাই চিনতে অসুবিধা হচ্ছিল। উনি যদি নিজেকে কালীদাসী বলে পরিচয় না দিয়ে তোমার বৌদি বলে পরিচয় দিতেন, তাহলে এই ভুলটা হতো না। সেই সময় বুলি ভিতর থেকে বাইরে এসে বলল, আরে ভাবী যে! এস এস। প্রভাতদা কোথায়? গেটের বাইরে কোন রিকশা না দেখে বলল, প্রভাতদা পৌঁছিয়ে দিয়ে গেল বুঝি? তোমার বৌদি বললেন, ওতো আসেনি, আমি একাই এসেছি। শুনে বুলি বলে যে, খুব ভাল করেছো। জান কতবার তোমাকে দেখতে ইচ্ছে হয়েছে? কতবার ভেবেছি একবার চলেই যাবো, কিন্তু যাবো কিভাবে? প্রভাতদা তো আসেই না। কি এত কাজ তার বলতো ভাবী! কথাগুলো বলে রানি থামেন।

প্রভাত বলল, আমাকে তো বলেনি যে এখানে আসবে, তাহলে না হয় দিয়ে যেতাম আবার ফেরার পথে নিয়ে যেতাম।

পিয়াশা বলল, আজ কিন্তু খেয়ে যাবে প্রভাতদা। তা কি করে হবে? বাড়িতে চিন্তা করবে না? না করবে না। তারপর বলল, তুমিত খেয়ে যাবে আর ওনাদের জন্যও নিয়ে যাবে। আমি নিজের হাতে বানিয়েছি। রানি বললেন, বাড়িতেই যখন

পাঠাবি, তখন ওরটাও পাঠিয়ে দে। সবাই মিলে একসাথে খাবে। ওর কি একা একা খেতে ভাল লাগবে? ঠিক আছে তাই হবে। তারপর বলল, প্রভতাদা চলে যেও না কিন্তু।

ও চলে গেলে রানি বললেন, তোমার বৌদি তো তোমার থেকেও বয়সে ছোট হবে মনে হয়। সামান্য ছোটই হবে। রানি বললেন, সারাটা জীবন ও কি করবে? আবার বিয়ে করতে বল না? প্রভাত বলে, আপনি তো জানেন আমাদের সমাজের কত বাধানিষেধ, নিয়মকানুন। জানব না কেন, আমিও তো ওই সমাজেই বড় হয়েছি। কিন্তু এখন বেশ বুঝতে পারি সমাজের এ এক চরম নিষ্ঠুরতা। আইন হয়েছে, তবু সমাজের শাসনটাই বড়। প্রভাত বলল, বিধবা বিয়ে যেমন আমাদের সমাজ মেনে নিতে পারে না তেমনি বিধবাকে কেউ বিয়ে করতেও চায় না। রানি সঙ্গে সঙ্গে বলেন, কেউ না করে না করুক, কিন্তু তুমি তো বিয়ে করতে পার? কালীদাসীর সঙ্গে কথা বলে মনে হল, ও তোমাকে সত্যি ভালবাসে। তারপর বললেন, তোমার যদি কোন আপত্তি না থাকে, আমি তোমার মাকে বুঝিয়ে বলতে পারি।

প্রভাত এর কি উত্তর দেবে? বলল, আগে নিজে মনস্থির করি তারপর না হয় মাকে বলবেন। সেই ভাল। আগে মনস্থির কর। আর নিজের যদি সাহসে না কুলোয় ওকে অন্যত্র বিয়ে দিও। ওর জীবনটাকে মোটেই নষ্ট হতে দিও না।

বুলির দেওয়া চিলি চিকেন আর ফ্রায়েড রাইস খেতে খেতে প্রভাত জানতে চাইল, ওদের ওখানে যাবে তা আমাকে তো বলতে পারতে? কালীদাসী বলল, তুমি তো আজকাল ওখানে যাও না। তাতে কি? তোমাকে পৌঁছিয়ে দিতাম, আবার ফেরার সময়ে নিয়ে আসতাম। তা হঠাৎ ওখানে গেলে কেন? কালীদাসী বলল, ভীষণ মন কেমন করছিল। মেয়েটার অসুস্থতার কথা যেভাবে বললে, একবার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে না গেলেই ভাল করতাম। কেন ওরা কি কিছু বলেছে? অনেক কথাই বলেছে। যেমন? যেমন আমার কি এভাবে তোমার কাছে থাকা উচিত? তোমার কাছে থেকেও তোমার শরীরের প্রতি যত্ন নিই না। তোমার শরীরের পরে অসম্ভব ধকল যাচ্ছে। সারাদিন রিকশা টানা কি কম কথা? আমি তো বাড়িতে বসেও তোমাকে কিছু হেল্প করতে পারি। আর আমি যদি রাজি থাকি তাহলে বুলির বাবা তার অফিসে আমাকে একটা কাজ দিতে পারেন। বিয়ের বাজারে নাকি ওটা খুব দামী? প্রভাত বলল, আমি যদি তোমাকে কাজ করতে দিতে রাজি না হই? সে কথাও বলেছিলেন। তুমি কি বললে? আমি আবার কী বলবো। উনিই তো বললেন, তুমি হয়তো রাজি হবে না, তাতে তোমার পৌরুষে আঘাত লাগবে। কিন্তু আমি যেন তোমার কথা না শুনি। এযুগে মেয়েদেরও কাজ করা দরকার। কাজ করলে মনের প্রসারতা বাড়ে, দায়িত্ববোধ

বাড়ে। তাছাড়া কাজটা খুব ভাল। ওর বাবা যে একজন বড় উকিল তা তো জানতাম না। উনি বললেন ওনার অফিসে আরো মেয়ে কাজ করে। ভদ্র কাজ আমার কোন অসুবিধা হবে না। কে জানে কবে আবার আমাকে তাড়িয়ে দেবে? তাই কাজটা যেন আমি নিই।

প্রভাত বেশ অভিমান আর রাগ মিশিয়ে বলল, তাহলে ফাইনাল কথা দিলে না কেন? তার রাগটা টের পেয়ে বেশ মজা পায় কালীদাসী। বলল, আহা অত রেগে যাচ্ছ কেন? তারপর বলল, দেখ কাজই যদি করব তাহলে তো তোমার সত্যেনদার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যেতাম। এতদিনে হয়ত রানির হালে থাকতাম। প্রভাত বলল, আমারই ভুল। তুমি যে রাজি হওনি খুব ভাল করেছ।

অবাক হয়ে কালীদাসী বলল, সে কি কথা? আমি রাজি হইনি বলে কত কথাই না আমাকে শুনিয়েছো। এখন আবার কি হল? তোমার সত্যেনদার সঙ্গে ঝগড়া করেছো নাকি? তাকে পাব কোথায় যে ঝগড়া করবো? কেন উনি এখানে নেই? প্রভাত বলল, তুমি কি তার সম্পর্কে কিছুই শোননি? কার কাছে শুনবো? আমি কি কোথাও যাই নাকি? তা কি হয়েছে তোমার সত্যেনদার? প্রভাত বলল, খোকন মল্লিকই ঠিক কথা বলেছিল, ওনার চরিত্র একদম ভাল নয়। তারপর সবকথা কালীদাসীকে খুলে বলে বলল—উনি এখনো জামিন পাননি, জেল খাটছেন। কালীদাসী 'থ' হয়ে যায় সব কথা শুনে। তারপর বলল, তোমার সত্যেনদা যাইই করুক না কেন, তুমি কিন্তু তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করো না। হাজার হোক তার জন্যই কিন্তু আমরা একটু থাকার জায়গা পেয়েছি। হ্যাঁ সত্যি কথা। কিন্তু বিনা লাভে তো তিনি কিছু দেননি। ৬০০০ টাকার বিনিময়ে তিন মাসে ৯০০০ টাকা তাকে দিয়েছি। একবার ভাব তো এটা ডাকাতি নয়?

কালীদাসী অতশত বোঝে না। ওসব নিয়ে মাথাব্যথাও করতে চায় না। সত্যেনবাবু ডাকাতি করেছেন কি না সেটা পরের কথা। কিন্তু এ কথা তো ঠিক যে অগ্রিম না নিয়ে সত্যেনবাবু এতগুলো লোকের থাকার জায়গা করে দিয়েছেন। নিজের ঘর জমি দিয়েছেন। তার মতে যারা আজ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে তারাও তো তার কাছ থেকে উপকৃত। আর ঐ যে অতসী, তার সব কথা যদি অক্ষরে অক্ষরে সত্য ধরেও নেওয়া যায়, তাতে কি অতসীকে নির্দোষ বলা যায়? এমনি এমনি তো সে আর সত্যেনবাবুর বৌ সেজে দীঘায় যায়নি? যদি তার মনে হয়ে থাকে এটা তার অপমান তবে সে কথা সে বলল না কেন? আর শিলা নামের যে মেয়েটি এবার তার বৌ সেজে গিয়েছিল তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে এত কথা বলার দরকার কি ছিল? হয়তো অভাবের তাড়নায় বা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে মেয়েটি সত্যেনবাবুর প্রস্তাবে রাজি হয়েছিল। সে তো আর অতসীর মতো বিধবা ছিল না। এমনো তো হতে পারে শিলাকে সত্যেনবাবু সত্যি সত্যি স্ত্রীর মর্যাদা দিতে

চেয়েছিলেন। কিন্তু সে সুযোগ তাকে দেওয়া হল না। তারপর বলল, অতসী যখন সত্যেনবাবুকে জানে, তখন তাকে এড়িয়ে গেলেই তো হতো। অথচ তা না করে সে আসলে তো ঐ মেয়েটিকেই অপমান করেছে। তাই আমার মতে শিলার আত্মহত্যার জন্য সত্যেনবাবু দায়ী নন, দায়ী ঐ অতসী। শাস্তি যদি পেতেই হয় তবে অতসীরই তা পাওয়া উচিত।

প্রভাত এভাবে কখনো ভাবেনি। সে সোজা বুদ্ধির মানুষ। তার ভাবনাগুলোও সহজ। হ্যাঁ, অতসীকে প্রভাত ভালভাবেই চেনে। এই তো সত্যেনবাবুর এখানে প্রায়ই তার ঘরে তাকে দেখা যেত। তাকে বৌ করে দীঘায় নিয়ে গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই তারও আগে। তাহলে তার পরও তাকে সত্যেনবাবুর ঘরে দেখা যেত কেন? সে কি ভয়ে? কি জানি? প্রভাতের সব কিছু কেমন গোলমাল হয়ে যায়। একদিকে আখতার সাহেবের নিষেধ আর একদিকে কালীদাসীর যুক্তি, কোনটাই তো অস্বীকার করার মতো নয়।

কালীদাসী বলল, কি ভাবছো? কিছু না। একেবারে কিছু না? প্রভাত বলল, ভাবছিলাম বড়লোকেরা যেমন ভাবে, ভাবে, আমাদের পক্ষে তেমনভাবে ভাবা সম্ভব নয়। আমরা গরিব লোক, আমাদের সমস্যাও আমাদের মতো গরিব। কি দরকার ওদের নিয়ে মাথা ঘামিয়ে? তবে তুমি যা বলেছ তাও ফেলে দেওয়ার মতো নয়।

এ ঘটনার কিছুদিন পরে যে সত্যেনবাবুর সাথে তার সত্যি সত্যি দেখা হয়ে যাবে একবারও ভাবেনি প্রভাত। দূর থেকে দেখতে পায় যে সত্যেনবাবু একাকী হেঁটে চলেছেন অন্যমনস্কভাবে। প্রভাত যতোবার তাকে দেখেছে একা কখনো দেখেনি। সব সময় ৪/৫ জন লোক সঙ্গে থাকত তার। রিকশাটা আস্তে সে সত্যেনবাবুর একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে দেয়। সত্যেনবাবু বিরক্ত হয়ে বলেন, কি রিকশা চালাও চোখ নেই? প্রভাত তাতে কিছু মনে না করে বলে, উঠে পড়ুন সত্যেনদা। একা একা এত অন্যমনস্কের মতো কোথায় চলেছেন? বিষণ্ণ হেসে সত্যেনবাবু বললেন, ও তুই? কেমন আছিস? ভাল। আর আপনি? সত্যেনবাবু বললেন, তুই কিছু শুনিসনি? উত্তরে প্রভাত বলে, কয়েকদিন আগে শুনেছি, কিন্তু বিশ্বাস হয়নি। কেন? বিশ্বাস হয়নি কেন? দল যেখানে বিশ্বাস করে আমায় বহিষ্কার করেছে সেখানে তোর বিশ্বাস হয় না কেন? আর সত্যি সত্যি আমি তো আমার অপরাধ অস্বীকার করতে পারি না। প্রভাত বলল, অতসব জানি না সত্যেনদা। আমাদের আপনি মাটি দিয়েছেন ঘর দিয়েছেন। দলের থেকে আপনি অনেক বড়। হাসি ফোটে সত্যেনবাবুর মুখে। বলেন, একথা বলিস না প্রভাত। তোকেও তাহলে বহিষ্কার করবে। উত্তরে প্রভাত বলে, আমাকে আবার বহিষ্কার? কেন আমি দলের? দল কি কখনো আমাদের কথা শুনতে চেয়েছে? দিয়েছে

আমাদের মতো গরিব গুর্বোদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই? আপনিই দিয়েছেন।

সত্যেনবাবু বললেন, নারে, আমিও দিইনি। আসলে তোদের ঘুঁটি সাজিয়ে আমিও ব্যবসা করেছি। টাকা? বুঝলি টাকাই আমাকে খেয়েছে? প্রভাত বলল, ওসব কথা থাক সত্যেনদা। এখন কোথায় যাবেন বলুন? কোথায় আর যাব? গিয়েছিলাম আখতার সাহেবের বাড়ি। তাকে বলেছিলাম কেসটা নিতে। রাজি হলেন না। অবশ্য তাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। দলের সিদ্ধান্তের বাইরে তিনিই বা যাবেন কেমন করে?

প্রভাত বলল, দল তো সব বড়লোকদের। ওদের কথাই শেষ কথা। কিন্তু আমরা আছি আপনার সাথে। আপনি নতুন দল করুন। সত্যেনবাবু প্রতিবাদ করে বলে, নারে! তা হয় না।

তারপর বললেন, এখানকার দল তো আমার নিজের হাতে গড়া, সে দল আমি ভেঙে দেবো? দলের বিরুদ্ধে যাব? না রে, তা পারব না। তবে কি করবেন? সত্যেনবাবু বললেন, তোরাই চালাবি। আমি আড়ালে থেকে তোকে এবং তোদের সাহায্য করব। কি পারবি না?

প্রভাত বলল, আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেব? বাড়ি? বাড়ি কোথায় প্রভাত? ওটা তো দলের অফিস। আশ্চর্য হয়ে প্রভাত বলে, দলের অফিস মানে? ও বাড়ি তো আপনার নিজের পয়সায় করা। তাতে কি? কিন্তু বাড়িটা তো আমার নামে নয় দলের নামে করেছিলাম। দল আজ তাই সেখানে আমার প্রবেশ নিষেধ করে দিয়েছে। প্রভাত বলে, এটা অন্যায় সত্যেনদা, ঘোরতর অন্যায়। সত্যেনবাবু বললেন, চুপ কর প্রভাত। তারপর বললেন, আমি মাত্র কয়েকদিন হল জামিন পেয়েছি। পরশু কোর্টে ডেট আছে। কালই চলে যেতে হবে। প্রভাত বলল, রাতটা কোথায় থাকবেন? দেখি কোথাও কাটিয়ে দিলেই হবে। প্রভাত বলল, আমার প্রস্তাবটা ঔদ্ধত্য বলে নেবেন না। যাবেন আমার ওখানে? ও ভীষণ খুশি হবে? সত্যেন বুঝতে না পেরে বললেন, ও মানে? তুমি কি বিয়ে করেছ নাকি? না মানে?

সত্যেনবাবু বললেন ও বুঝেছি, নিকুঞ্জের স্ত্রীর কথা বলছ? প্রভাত চুপ করে থাকে। সত্যেনবাবু বললেন, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি, তোমার আদর্শ থেকে তুমি যেন কখনো বিচ্যুত না হও। ওকে বলো, দল আমার সঙ্গে যে ব্যবহারই করুক, আমি সব সময় তোমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকব। প্রভাত বলল, তাহলে চলুন না রাতটা আমাদের ওখানে কাটাবেন! সত্যি বড্ড পাগল তুমি বলে রিকশায় উঠে পড়েন সত্যেনবাবু।

১২

অন্যতম সাক্ষী হিসাবে কোর্টে দাঁড়িয়ে দীঘার হোটেলের ম্যানেজার স্পষ্ট এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, অতসীকে নিয়ে সত্যেনবাবু এখানে কোনদিন আসেননি। এর আগে যতবার এসেছেন সত্যেনবাবু একাই এসেছেন। এবারই প্রথম তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিলেন। শাস্ত্রীয় মতে তাদের বিয়ে হয়েছিল কিনা তিনি জানেন না। কিন্তু শিলাদেবীকে তিনি স্ত্রী হিসাবেই পরিচয় দিয়েছিলেন, এবং তাঁদের ব্যবহারে স্বামী স্ত্রী ছাড়া তাঁদের আর কিছু মনে হয়নি। অতসীর সঙ্গে কয়েকটি মেয়ে যেমন ছিলেন তেমনি কয়েকজন পুরুষ সঙ্গীও ছিলেন। তারা নিজেদের আত্মীয় হিসাবে পরিচয় দিয়ে ৩টে ঘর বুক করেন। হোটেলের বাইরেই সত্যেনবাবুর সঙ্গে তার কথাকাটাকাটি হয়। শিলাদেবী হোটেলের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ওদের কথা শোনেন। অতসী যে কুৎসিত ইঙ্গিত করেন তাতে সম্ভবত শিলাদেবী অত্যন্ত মানসিক আঘাত পান এবং অতসীর কথাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে ফেলেন। তিনি প্রতারিত হয়েছেন একথা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে, আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। এটা খুব দুর্ভাগ্যের বিষয় যে তিনি একবার সত্যেনবাবুর কাছে সত্যমিথ্যা সম্পর্কে কিছু জানতেও চাইলেন না। তারপর বলেন, হ্যাঁ এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে শিলাদেবীর আত্মহত্যার জন্য যদি কেউ দায়ী হন তবে তিনি অতসী, সত্যেনবাবু নন।

আখতার সাহেবের মুখে হাসি ফোটে। তিনি প্রথমে এ কেস নিতে চাননি। কিন্তু বুলির অনুরোধে নিতে বাধ্য হন। বুলিকে অনুরোধ করেছিল প্রভাত। সরকারি তরফে বলা হয় এসব মিথ্যে। সাজানো। আখতার সাহেব পাঁচবছরের রেজিস্ট্রার পেশ করে বলেন, এর কোথাও কি আছে সত্যেনবাবু অন্য কাউকে নিয়ে এখানে এসেছেন? যতবার এসেছেন তিনি একা এসেছেন। এবারই শুধু নববিবাহিতা স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন।

কেসটা যে এভাবে ঘুরে যাবে কেউ ভাবেনি। আখতার সাহেব বার বার নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করছিলেন। মেয়ের অনুরোধে তাকে এমন একটা কেসে সওয়াল করতে হবে যেখানে হার অনিবার্য। বুলি বলেছিল, তুমি হারবে না আব্বু। দেখে নিও আল্লাহ তোমার সহায় হবেন। সবচেয়ে বড় কথা সত্যেনবাবুও তো মানুষ। কিছু মানসিক দুর্বলতা থাকতেই পারে। আর এজন্য শুধু সত্যেনবাবুকে দোষ দিয়ে লাভ কি? ঐ অতসী কি ধোয়া তুলসীপাতা? যদি তার কথা সত্যিও হয়, কিন্তু সে তো অতীতের ঘটনা, নিজের ভাগ্যকে অতসী মেনেও নিয়েছে, তাহলে আর একটা মেয়ের মনকে বিষিয়ে দেওয়া কেন? তুমি স্থির জেনো আব্বু, শিলার মৃত্যুর জন্য অতসীই দায়ী। আখতার সাহেব বললেন, বুঝলাম. কিন্তু কে সাক্ষী

দেবে? বুলি বলল, হোটেলের ম্যানেজার সাক্ষী দেবে। আমিই তাকে কনভিন্স করব। সত্যেনবাবুকে আমি নির্দোষ বলছি না। কিন্তু উনিই তো খালঘাট এবং খালপাড় অঞ্চলের গরিব মানুষদের আশা ভরসার স্থল। এমনকি তোমার জন্যও উনি বুক উচিয়ে লড়েছেন, বিনিময়ে সামান্য প্রতিদান দেওয়ারও চেষ্টা করবে না?

আদালতের রায়ে সত্যেনবাবু নির্দোষ প্রমাণিত হন। কিন্তু তার সঙ্গীদের অশালীন আচরণের জন্য একবছর করে শাস্তি হয়। সুজয় দত্ত ভাবতে পারেনি আঁটঘাট বেঁধেও তার রিপোর্ট এমন মাঠে মারা যাবে।

কোর্টে সেদিন হাজির ছিলেন মিসেস আখতার রানি, বুলি, প্রভাত এবং কালীদাসী। কালীদাসী আসতে চায়নি। কিন্তু বুলিই তাকে জোর করে নিয়ে আসে। বলে ভাবী, শিক্ষিত লোকেরা ভাবে যারা তথাকথিত একাডেমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তারা আবার আইনের কি বোঝে? কিন্তু আইনও যে সাধারণ জ্ঞানের বাইরে কিছু নয় তোমার যুক্তিগুলো না শুনলে আমারও ভুল ধারণা থেকে যেত। তাই আজকের জয় কিন্তু হবে তোমার জয়। কালীদাসী লজ্জিত হয়ে বলে, ঠাট্টা করছ? ঠাট্টা নয় ভাবী। তারপর বলল, তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, কিন্তু যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম ভীষণ চমকে উঠেছিলাম। কালীদাসী বলল, চমকে তো উঠবে ভাই। আমার মতো মুখুসুখ্যু মেয়ে মানুষকে দেখলে কে না চমকায়?

জয়ের আনন্দে মিষ্টি বিলোন আখতার সাহেব। হঠাৎ খোঁজ পড়ে সত্যেনের। কিন্তু কোথায় সত্যেন? প্রভাত জানে না। ম্যানেজার জানেন না। কেউ বলতে পারেন না উনি কোথায় গেলেন?

কালীদাসী চুপচাপ বসে আছে একটা বেঞ্চিতে। সকালে না খেয়ে এসেছে। বলেছে আজ আমার উপোস। কিন্তু কেন উপোস তা কাউকে বলেনি। আর কেউ তা জানতেও চায়নি।

বুলি এসে বলল, তোমাদের উপোস সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই ভাবী। তবু জয়ের আনন্দে এই মিষ্টিটা খেয়ে নাও তো। কালীদাসী হেসে বলল—আচ্ছা খাব। কিন্তু সত্যেনবাবুকে তো দেখছি না। অনেক পীড়াপীড়িতে ম্যানেজার বললেন, আজ আর উনি আপনাদের সামনে আসতে চান না। উনি বলেছেন জীবনে বেশ কিছু ভুল করেছেন, সেগুলো না শোধরানো পর্যন্ত উনি আর আপনাদের সঙ্গে দেখা করবেন না। তারপর আখতার সাহেবকে বললেন, আপনাকে একটা ছোট্ট চিঠি দিয়ে উনি এই হোটেলের একটা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। বলে গেছেন ব্ল্যাঙ্ক চেক রেখে গেলাম, প্রয়োজনীয় টাকা তুলে নেবেন।

আখতার সাহেব হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিলেন, তারপরে না পড়েই পকেটে রেখে দিয়ে বললেন, চল এবারে ফেরা যাক। বুলি বলল, তুমি দেখলে না আব্বু

সত্যেনবাবু কি লিখেছেন? উত্তরে আখতার সাহেব বললেন, কি আবার লিখবে? হয়তো ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা যা হোক কিছু একটা লিখেছে। চল ফেরা যাক।

ফিরেও কালীদাসীর মনটা ভাল না। কোথায় গেল মানুষটা? এতদিন তো দোর্দণ্ডপ্রতাপ এক মানুষের কথা শুনে এসেছে। এ অঞ্চলের তিনি মুকুটহীন সম্রাট। কত অলংকারেই না তাকে অলংকৃত করা হয়েছে। কিন্তু সেদিন যখন প্রভাতের সঙ্গে রাতের অন্ধকারে মানুষটি নামলেন তার ঘরের দ্বারে, কালীদাসী দেখল এক দুর্বল আর অসহায় মানুষকে। বুকের মধ্যে কান্না জমে ওঠে, কালীদাসীর। অথচ বুঝতে পারে না কেন এ কান্না? সত্যেনবাবু তো তার কেউ নয়। বরং মানুষটাকে সে নারীলোলুপ বলেই ভেবে এসেছে। কতবার তাকে তিনি তাঁর বাড়িতে যেতে বলেছে, যায়নি। তার প্রতি বিশ্বাস ছিল না বলেই তো যায়নি। আজ তবে তার মনে এমন কি সুর বাজালেন যে তার মনটা শুধু তাকেই ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে?

কালীদাসী ভাল করে জানে তাকে গ্রামের কেউ ভাল বলে না। অসতী কুলটা দ্বিচারিণী বেশ্যা কত কিছুই না বলে। সে এও জানে যে এখানকার অনেকেই তাকে নিয়ে কেচ্ছা বানায়। এমনকি প্রভাতের মা, যিনি বৌমা ছাড়া কখনো ভুলেও ডাকেন না, তিনিও এই কেচ্ছায় যোগ দেন। তার বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না যে দাশুকে তিনি এমন অনেক কথা বলেছেন যাতে সে বলতে বাধ্য হয়েছে আমি যেন আলাদা থাকার ব্যবস্থা করি। কিন্তু সে তো জানে তাকে।

যে সিরাজ ভাইকে নিয়ে তার চরিত্রের এত বদনাম, সেই সিরাজ ভাই কোনদিন তাকে ছুঁয়েও দেখেনি। অথচ সিরাজ যে তাকে গভীরভাবে ভালবাসতো এটা সে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করত। সিরাজের ভালবাসা ছিল স্বর্গীয় সম্পদের মতো। সিরাজ বলত, কালী, ভালবাসা কি শুধু দেহেই থাকে? মনে থাকে না? তুমি বোঝ না আমি তোমাকে ভালবাসি কিনা, কতবার তার উত্তরে কালীদাসী বলেছে, না সিরাজ ভাই তোমার মনের ভালবাসা আমি চাই না। আমি চাই দেহের উত্তাপ। এ দেহ জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে আর তুমি শুনাচ্ছ মনের ভালবাসা? না আমি তোমার মনের ভালবাসা চাই না। উত্তরে সিরাজ বলেছে, আচ্ছা তোমাদের রাধার ভালবাসা কি দেহের ছিল না মনের? কালীদাসী বলেছে, ওসব দেবদেবীদের কথা আমি জানি না সিরাজ ভাই। জানবার ইচ্ছেও আমার নেই। আমার দেহ তোমার স্পর্শে কানায় কানায় ভরে উঠবে এটাই আমি চাই। আমার যৌবনকে তুমি দু'হাতে দুমড়ে-মুচড়ে দেবে এর চেয়ে বেশি কিছু চাই না আমি। উত্তরে সিরাজ বলেছে, তুমি একটা আস্ত পাগলী কালী। ভালবাসার মানেই জান না অথচ ভালবাসার কথা বল। তারপর বলে, আমাকে কি তুমি সত্যি ভালবাস? কালীদাসী বলে, আমার বুক চিরে যদি দেখাতে পারতাম তাহলে বুঝতে পারতে আমি তোমায় ভালবাসি কিনা? ওটা তোমার ভুল কালী। তোমার বুকের মধ্যে যেটা

আছে সেটা তোমার মোহ। আমাকে পেলে সে মোহও কেটে যাবে। আজকের এই পাগল পাগল ভাব উধাও হয়ে এক তিক্ততার মধ্যে অবসান হবে আমাদের ভালবাসা। আমি তা চাই না কালী। তাহলে তুমি কি চাও? আমার জন্য তোমার এই তৃষ্ণাটা আমৃত্যু বেঁচে থাক। তাতেই তুমি পৌঁছিয়ে যাবে আল্লাহর দরবারে। কি শক্ত হৃদয় অথচ শিশুর মতো সরল। আপন মনে গান গেয়ে চলেছে। কালীদাসী ভেবে পায় না কেন যে ছাই মরতে এই মানুষটাকে ভালবাসতে গিয়েছিল? তেষ্টায় বুক ফেটে যাবে তবু একফোঁটা জল মিলবে না তার কাছে। মাঝে মাঝে মন হত কালীদাসীর, লোকটা ক্ষমতাহীন নয়তো? কিন্তু সেকথা কোনদিন মুখ ফুটে জানতে চাইতে পারেনি।

একদিন বলেছিল, আমি যা চাই তা যখন তোমার দেওয়ার সামর্থ্য নেই মুখে আর অত আশনাই করো না তো? আমার একদম ভাল লাগে না। তারপর বলেছিল, তুমি জান আমাদের নিয়ে কিসব আলোচনা হয়? উত্তরে সিরাজ বলেছিল, কি হবে জেনে? ওদের যা ইচ্ছে ভাবুক না, ওদের ভাবনা নিয়ে আমাদের ভেবে লাভ কি? ঠোঁট উল্টিয়ে কালীদাসী বলেছিল, তোমার আবার কি? কিন্তু আমার কথা ভেবে দেখেছো কি? এরপরে কেউ আমাকে বিয়ে করবে? আরো বলেছিল, তোমাদের সমাজে চারটে বৌ নিয়ে তুমি দিব্যি চালিয়ে যেতে পার, কিন্তু আমাদের সমাজে যে তার উপায় নেই। সিরাজ সান্ত্বনা দিয়ে বলে, কিন্তু তুমি তো কুলটা নও। তোমার কৌমার্য তো কেউ কেড়ে নেয়নি?

কালীদাসী রাগ করে বলেছে, ছাড় তো তোমার কৌমার্যের কথা। একথা কি কেউ বিশ্বাস করবে যে তুমি আমায় একটা দিনের জন্যও ভোগ করনি? উত্তরে সিরাজ বলেছে, কেউ বিশ্বাস না করলেও তুমি তো জান একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাহলে এত ভয় কেন? সে তুমি বুঝবে না সিরাজ ভাই, দু চোখে তার জল।

সে সময়কার কত কথা যে আজ মনে পড়ে যাচ্ছে। সব চেয়ে ব্যথা লাগে যখন মনে পড়ে সিরাজের কাছে তার ব্যাকুল আকুতি। কান্নাকাটি করে কালীদাসী বলেছিল, তুমি একবার বলো কালীদাসীকে তুমি শাদি করবে। আমি সবকিছু ছেড়ে তোমার সঙ্গে চলে যাবো। উত্তরে বলেছিলে, তুমি তো জান কালী, আমি তোমার ইজ্জত নষ্ট করিনি। আর আমি বললেও ওরা যে তা মেনে নেবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? অথচ সামান্য একটা কথায় তোমার সব পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে, না কালী আমি তা পারবো না। তার চেয়ে আমি চলে যাব। চলে যাবে? উপায় কি কালী? তোমাকে নিষ্কলুষ করতে আমি সবকিছু করব। তবু তুমি শাদি করতে পারবে না এই তো? তারপর বলল, যাও চলে যাও আমার সামনে থেকে। আর কোনদিনও আসবে না এই গ্রামে। আরও বলল, মনে মনে একদিনের জন্যও যদি ভালবেসে থাক, তবে আমার কথা তুমি ফেলতে পারবে না। ফিরে যদি কোনদিনও

আস, নিশ্চয় জেনো সেদিন তুমি আমার মরা মুখ দেখবে। সিরাজ কোন প্রতিবাদ না করে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে যায়।

যতোদিন কালীদাসী গ্রামে ছিল সিরাজ ফিরে আসেনি। সে যে কোথায় গেছে তাও কেউ জানে না। কিন্তু মুখে যাইই বলুক, মনে মনে সে কিন্তু সিরাজকে ভুলতে পারেনি। তার জন্য তীব্র বেদনা বোধ করেনি সত্যি কিন্তু নিকুঞ্জের মৃত্যুর পর সিরাজ আবার তাকে আকৃষ্ট করতে থাকে। একদিকে সিরাজ আর একদিকে তার প্রথম ভাললাগার পুরুষের আকর্ষণে মন যখন ক্ষতবিক্ষত, সেই সময় সত্যেনবাবু না এসেও জীবনের উপর ছায়া ফেলে।

আজ কেন যেন মনে হয়, সত্যেনবাবু সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় তা বোধহয় সবটা সত্যি নয়। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে বোঝে, যা কিছু রটে তা সব সময় সত্যি নয়। ঐ যে সত্যেনবাবু বলেছেন তিনি তো আর সম্পূর্ণ নিরপরাধ নয়। নিজের সম্পর্কে এই যে স্বীকারোক্তি তাতেই তার মনের বিরাট আকাশটি কালীদাসীর চোখের সামনে ভাসতে থাকে। কোর্টের রায়ে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পরে সত্যেনবাবু পালিয়েছেন। সিরাজও পালিয়েছিলেন, অথচ এই দুই পালানোর মধ্যে কত পার্থক্য!

১৩

সত্যেনবাবু পালিয়েছেন বিবেকের দংশনে। খালপাড়ের মানুষেরা মিছিলে হেঁটেছেন আর স্লোগান দিয়েছেন সত্যেনদা তুমি ফিরে এস। কিন্তু আসেননি সত্যেনবাবু। কবে আসবেন কেউ জানে না। দল তার উপর থেকে সাসপেনসন অর্ডার তুলে নিয়েছে। তবু তার কোন সংবাদ কেউ বলতে পারে না। অতসীর বন্ধুরা ফিরেছেন কিন্তু অতসী ফেরেনি অপমানের ভয়ে। অতসীর দাদা দিলীপ ভয়ে ভয়ে থাকে। কি জানি কখন খালপাড়ের মানুষগুলো তার বাড়িতে চড়াও হবে। দিলীপও রিকশা চালায়। বেশ কয়েকদিন সে রিকশা বের করছে না দেখে প্রভাত একদিন সরাসরি আসে তার বাড়িতে। প্রভাতকে দেখে গলা শুকিয়ে যায় দিলীপের। দিলীপ তখন তার ঘরের পাশে যে খালি জায়গাটুকু আছে সেখানে বসে ভাবছে, এ তুই কি করলি অতসী? এখন আমি কি করি বলতো? বাইরে বেরুতে পারি না। ভয় করে। সব সময় মনে হয় কারা যেন আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। ঘরে যে বসে থাকবো সে উপায়ও নেই। মনে হয় কারা যেন আক্রমণ করবে। ঘরে যা ছিল তা তো সবই প্রায় শেষ হয়ে আসছে। এর পরে যে কি করব কে জানে? ওর বৌ শিখা এসে বলল, এভাবে বসে থাকলে চলবে? টাকাপয়সা যা ছিল সব শেষ। তারপর বলল, এখন কেন? তখন তো বোন বলতে অজ্ঞান। বিধবা বোন

শ্বশুরবাড়ি থাকবে না, না সেখানে ঝি-এর মতো খাটতে হয়। এখানে দাদার সংসারে উনি বিবি সেজে বেড়াবেন। কতবার বলেছি, শুনলে আমার কথা? এখন পুড়লো তো মুখ? দিলীপ ফোঁস করে ওঠে, চুপ করবি? তা তো বলবেই। বৌ তো পরের মেয়ে, যতো হম্বিতম্বি তার উপর? পারবে চুপ করাতে তোমার ঐ গুণধরী বোনকে? দিলীপ বলল, তাকে পাব কোথায়?

প্রভাত কিন্তু শান্তভাবে বলে দিলীপদা এইভাবে বাড়িতে বসে থাকলে চলবে? ভুলে যাও অতসীদির ব্যাপার। আমরা গরিব খেটে-খাওয়া মানুষ। আমাদের কি ওসব নিয়ে ভাবলে চলে? এতটা ভাল ব্যবহার যে প্রভাত করবে একবারও ভাবেনি দিলীপ। মনটা যেন তার জুড়িয়ে যায়। শিখা বলল, বুঝাও তো ঠাকুরপো তোমার দাদাকে। তারপর কি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে না খেয়ে থাকতে হবে না কি? উত্তরে প্রভাত শুধু বলে, তাহলে কাল কিন্তু অবশ্য কাজে বেরিও। আসছি। দিলীপ সারা রাত ধরে ভাবে, না, এভাবে বসে থাকলে হবে না। প্রভাত যখন বলেছে তখন কালই সে কাজে বেরোবে।

রাত শেষ হয়ে সকাল হয়। শিখা সেই ভোর থেকে তাড়া দিচ্ছে, কই বেরোবে না? কিন্তু কাল রাতের সঞ্চিত সাহস সকাল হতে যেন কর্পূরের মতো উবে যায়। সমস্ত শরীরটা যেন পাথরের মত ভারি মনে হয়। না সে পারবে না। আজও সে পারবে না বেরোতে। শিখা তাকে প্রথমে অনুরোধ করে, তারপর উত্তেজিত হয়ে বলে, সারাদিন তাহলে বৌয়ের মুখই দেখ, দেখ তাতে পেট ভরে কিনা? রাগে দুঃখে অভিমানে শিখার দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

আজ আর শিখার কোন কথারই কোন প্রতিবাদ করে না দিলীপ। চুপচাপ শুনে যায় তার কথা, আর মনে মনে ভাবে এসবের জন্য ঐ খোকন মল্লিকই দায়ী। অতসীকে তো সেইই সত্যেনবাবুর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়েছে। তাকে লোভ দেখিয়েছে, নতুন সংসারের স্বপ্ন দেখিয়েছে। আর বোকা মেয়েটা সেই খাদে পা দিয়ে আজ কোথায় হারিয়ে গেল? খোকন মল্লিক তাকেও তার দলে ভিড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু সে রাজি হয়নি বলে একটা ক্ষোভ তো তার আছে।

হঠাৎ খোকন মল্লিককে আসতে দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে দিলীপ। বৌকে বলল—তুই ভিতরে যা। ঝেঁঝে উঠে বৌ বলল, কেন ভিতরে যাব? ওর জন্যই তো আমাদের এই অবস্থা। আসুক তোমার খোকন মল্লিক। বলতে বলতে খোকন মল্লিক উঠোনে পা দিয়ে বলে, আজো কাজে বেরোসনি? বৌ বলল, কি করে বেরোবে মল্লিকদা, বোনটার তো মাথা খেয়েছো, এখন এসেছো ওকে পাগল বানাতে? তোমার আর কি? ছেলেরা বড় হয়েছে, কাজ করছে। এখন আমাদের কিভাবে চলবে বলতে পার? না পারি না, বলল, খোকন মল্লিক। তারপর দিলীপকে বলল, তোর ভয় কাকে বলতো? এসব ঐ প্রভাত ছোঁড়াটার কাজ।

ছোকরার নেতা হওয়ার শখ হয়েছে। ওর নেতা হওয়ার সাধ যদি না আমি মিটিয়ে দিই তবে আমার নাম খোকন মল্লিক নয়। দিলীপ আঁতকে উঠে বলে, না খোকনদা ওসব করতে যেও না। তারপর বলল, তোমাকে তো কেউ ছুঁতে পারবে না। সব দায় এসে পড়বে আমার ঘাড়ে। তাছাড়া প্রভাতের কি দোষ? ও ছেলেমানুষ হলেও আমাদের সবার জন্য ভাবে। কালই তো এসে কত করে আমায় বলে গেল, এই ভাবে মনমরা হয়ে ঘরের কোণে পড়ে থেকো না দিলীপদা। বৌদি ছেলেমেয়েরা তো তোমার মুখ চেয়ে বসে আছে। আরো বলল, সত্যেনদা অতসীদির ব্যাপার নিয়ে তুমি কেন এত ভাববে? কালই কাজে বেরুবে। চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু পারিনি।

খোকন মল্লিক বলল, ও বললেই হ'ল অতসীকে নিয়ে ভাবার দরকার নেই? একথা ও বলে কি করে? ও কি জানে না অতসী তোমার বোন? তারপর বলল, খুব লায়েক হয়ে গেছে। এদিকে তো নিকুঞ্জের বৌকে নিয়ে যা করে বেড়াচ্ছে?

শিখা বলল, কি করে বেড়াচ্ছে মল্লিকদা? কি করে বেড়াচ্ছে তা শুনতে পাও না? শুনতে তো অনেক কিছুই পাই। সবই তো কানে আসে। এই যে তোমার মেয়ে সীমা সেদিন যে কাণ্ডটা করল—ঐ প্রভাতই তো তাকে বাঁচালে! কথাটা খোকন মল্লিকও জানে, তাই চুপ করে রইল। শিখা বলল, ওসব কথা থাক মল্লিকদা। আমাদের অনেক উপকার করেছো, আর করতে হবে না। এখন দেখ অতসী কোথায়? যদি খুঁজে পাও তাহলে হয় ওর শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিও, না হয় নিজের কাছে নিয়ে রেখ। দয়া করে এখানে পাঠিও না। এ বাড়িতে তার জায়গা হবে না।

এতবড় মুখের উপর অপমান খোকন মল্লিক ভাবতেও পারেনি। রাগে তার সারা শরীর কাঁপতে থাকে। বলল, দিলীপ তোমারও কি এই এক কথা? দিলীপ বলল, আমি আর ঘুঁটি সাজতে চাই না খোকনদা। কাল নিজেরই কি জুটবে তাই জানি না। তাই অতসী যদি ফিরে আসে আমিও তাকে শ্বশুরবাড়ি চলে যেতে বলব। ওঃ তাহলে আমি আর তোমাদের কেউ নই। বেশ চলে যাচ্ছি। কিন্তু যাওয়ার আগে একথাও বলে যাচ্ছি, তোমাদের এর জন্য একদিন পস্তাতে হবে। শিখা বলল, পস্তাতে হয় পস্তাবো। কিন্তু তোমার সাহায্য আমরা আর নিতে চাই না।

এরপরে খোকন মল্লিকের আর থাকা সম্ভব নয়। থাকেওনি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে প্যাঁচ কষতে থাকে। যত সর্বনাশের গোঁড়া ঐ প্রভাত। ছোকরার নেতা হওয়ার শখ হয়েছে? দেখা যাক কে জেতে?

প্রভাত আজ আবার রাতে ফেরার পথে আসে দিলীপের কাছে। বলে, দিলীপদা এত করে বলে গেলাম আজ কাজে বেরুবে, বেরুলে না তো? দিলীপ

বলল, বিশ্বাস কর প্রভাত চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারলাম না। অতসীটা যে আমার মুখে এমন করে চুনকালি মাখিয়ে দেবে ভাবতে পারিনি। সুজয়কে ফোন করেছিলাম, ওখানেও সে নেই। কোথায় যে গেল মেয়েটি? হাজার হোক মায়ের পেটের বোন তো! প্রভাতও বোঝে অস্বীকার করবো বললেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কোথায় গেল অতসীদি? বলল, চিন্তা করো না দিলীপদা, আমিও আমার মতো করে খুঁজবার চেষ্টা করব। ব্যাকুল হয়ে দিলীপ বলল, সত্যি খুঁজবি অতসীকে? উত্তরে প্রভাত বলল, কেন খুঁজব না বলতো? দোষত্রুটি যাইহ় সে করুক না কেন, অতসীদি তো এই খালপাড়েরই একজন। দিলীপ তার দুটি হাত ধরে বলে, দেখ ভাই যদি খুঁজে পাওয়া যায়। একবার যদি ওকে পাই, হাতের পাঁচটা আঙুল আগে শুধু গালে বসিয়ে দেব, তারপর বলব তোর অক্ষম দাদাকে ক্ষমা করিস বোন। কিন্তু এখানে আর থাকিসনে। তোকে নিয়ে খোকন মল্লিকরা টানাটানি করবে তা আমি মেনে নিতে পারব না। বলতে বলতে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলে সে।

প্রভাত বলে, দিলীপদা তোমার বুকের মধ্যে যে কি হচ্ছে তা আমি বুঝি। কিন্তু ঘটনার পর তো আমাদের কারো হাত নেই। শিখা বলল, ঠাকুরপো তোমাকে যে এক কাপ চা করে দেব সে সঙ্গতিও আজ আর নেই। কাল যদি কাজে বেরোয় তবে উনুন চলবে। প্রভাত তার পকেট থেকে ১০০ টাকার একটা নোট বের করে বলে এটা রাখ দিলীপদা। না দয়া নয়। ধার হিসাবেই রাখ। তারপর বলল, কাল কিন্তু কাজে বেরিও। অকারণ ভয় পাচ্ছ। তোমাকে কেউ কিছু বলবে না।

এদিকে প্রভাতের ফেরার সময় গড়িয়ে গিয়ে রাত বাড়তে থাকে। কালীদাসী রান্না করে বসে আছে প্রভাতের জন্য। ওর মাকে খাইয়ে দিয়েছে সে। মেয়েটাও বড় বিরক্ত করছে আজ কিছুতেই ঘুমোতে চাইছে না। ইতিমধ্যে ওর মাও বেশ কয়েকবার খোঁজ নিয়েছে কালীদাসীর কাছে, বৌমা, প্রভাত কি ফিরেছে? না খুড়িমা এখনো ফেরেনি। এখনো ফেরেনি? এত রাত পর্যন্ত কি করছে বলত?

কালীদাসী বলল, অকারণ এত চিন্তা করছ কেন? হয়তো কোথাও আটকে গেছে। ঠিক চলে আসবে দেখো। কে জানে বাপু! যা সব চলছে চারিদিকে? চিন্তা হবে না? তা তুমি তো বাপু একটু এগিয়ে দেখতে পারতে? অনেক তো আদিখ্যেতা কর। কানে তো সব আসে। তোমাদের ব্যাপার-স্যাপার আমার ভাল লাগে না বাপু? একজনকে তো খেয়ে বসে আছো! তাই তো ভয়ে ভয়ে থাকি, তোমার শনির দৃষ্টি ওকেও না গ্রাস করে? খুড়িমা! আর ভালমানুষী দেখিও না তো? তারপর আপন কপালে করাঘাত করে বলে, এ সবই আমার ভাগ্য, তা না হলে বড় খোকা বাড়ি থেকে বের করে দেয়? ভেবেছিলাম বাকি জীবনটা ছোট খোকার কাছে কাটিয়ে দেবো। তা আর হবে না মনে হয়। তোমাদের অনাসৃষ্টি

কাজকাম দেখে গা বমি বমি করে। তাই ভাবছি চলেই যাব। তবে হ্যাঁ ঝিমলিকে কিন্তু নিয়েই যাব। তা না হলে ওকেও তুমি খাবে!

কালীদাসী ভাবতে পারছে না তার কি দোষ? সে তো বার বার চলে যেতে চেয়েছে আর এই খুড়িমাই তাকে বার বার আটকেছে, আর আজ সেই খুড়িমার মুখে অন্য সুর? না কালীদাসীকে একটা শক্ত সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। আসুক প্রভাত, তাকে আজ স্পষ্ট করে বলবে, তুমি তোমার মতো থাক। আমার জন্য অনেক করেছো, অনেক ভেবেছো আর ভাবতে হবে না।

অথচ এঁদের জন্য, বিশেষ করে প্রভাত চায় না বলে সে কিনা করেছে? নিজের কাজ ছেড়েছে, সত্যেনবাবুর অফার ছেড়েছে, এমন কি আখতার সাহেবের অত লোভনীয় প্রস্তাবেও না করে দিয়েছে। সে তো বুকের মধ্যে একটা ছোট্ট স্বপ্নের জন্য। কিন্তু প্রভাতের তো সেদিকে কোন খেয়াল আছে বলে মনেই হয় না। সে যে কি ভাবছে তা শুধু সেইই জানে।

আজকাল তাকে আর প্রভাতকে জড়িয়ে অনেক কথাই কানে আসে তার। মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয়। সব কষ্টকে সে ভুলে থাকে। প্রভাত তো আজো কোন কটুকথা বলেনি। দুয়েকবার যা হয়েছে তা হয়েছে তীব্র অভিমান থেকে। তাই মেনে নিয়েছে।

কিন্তু প্রভাত যে সত্যি কি চায় কালীদাসী আজো তা বুঝতে পারে না। এখন তো সে আবার এই খালপাড়ের এক গণ্যমান্য ব্যক্তি। সকাল-বিকাল বাড়িতে লোক ভিড় করে। কতক্ষণ আর নিজেকে আড়ালে রাখা যায়? তাদের কাছেও স্পষ্ট হয়ে যায় মনের দুর্বলতা। একদিন সে বলেও ফেলেছিল, বাড়িতে ওদের আসতে তো বারণ করতে পারো? প্রভাত উত্তরে বলে, তুমি কি ভাবো? বারণ করিনি? কিন্তু না শুনলে কি করবো? তাহলে একটা বিয়ে কর! উত্তরে প্রভাত বলে—কালী! থর থর করে কেঁপে ওঠে কালীদাসী। এতদিন তো হয়ে গেল আছে একসাথে। আগে বৌদি বলে সম্বোধন করত, পরে কিছুই সম্ভাষণ করত না, আর এখন একেবারে নাম ধরে? পুরুষের মনের কোন গহন থেকে যে এই হৃদয় চঞ্চল করা আবেগ উঠে আসে, তা শুধু সেই নারী জানে যে নারী তাকে ভালবাসে। কালীদাসীর মনে হয় এ যেন তার অপ্রাপ্তির শূন্য খাতায় জমা অংকের হিসাবনিকাশ। কালীদাসী মনে মনে বলে, আর একবার বল প্রভাত! তুমি তো জান না, কতকাল এই নামটাই শুনতে চেয়েছি তোমার কাছে। মুখে কিন্তু হেসে বলে, বাঃ বেশ উন্নতি হয়েছে তো! তারপর আরো কত কি যে শুনতে হবে কে জানে? তার চেয়ে এক কাজ কর, খুড়িমাকে বলছি, একটা আনকোরা মেয়েকে ঘরে নিয়ে এসো। বৌ বলে কথা!

প্রভাত বলে, আমি যে তোমায় নাম ধরে ডাকলাম তাতে কি রাগ করলে?

হেসে ওঠে কালীদাসী, বলে রাগ করবো কেন? এমন তো নয় যে কোনদিন নাম ধরে ডাকনি। বরং মাঝের ঐ বৌদি ডাকটা বড় বেমানান মনে হত। কিন্তু লোকে কি বলছে তা নিশ্চয়ই কানে গেছে? এরপরে একেবারে বৌদি থেকে নাম ধরে ডাকলে ঠেলা সামলাতে পারবে তো?

কতবারই তো প্রভাত এই নামেই ডাকতে চেয়েছে। কিন্তু পারেনি। আজ যখন পেরেছে তখন সে যুক্তি সাজায়। লোকের কথা তো তারও কানে এসেছে, কিন্তু এসব কথা গুরুত্ব দিতে গেলে মনের যন্ত্রণাই শুধু বাড়বে। কাজের কাজ কিছু হবে না। কটাক্ষ হেনে কালীদাসী বলে, তাই বুঝি? তা এক কাজ করো না? কি? বিয়েটা করে ফেল। তুমিও বাঁচ, আমিও বাঁচি। প্রভাত বলল, আমার কাছে তুমি খুব কষ্টে আছ তাই না কালী? উত্তরে কালীদাসী বলে—সে কি আর বলতে? এত কষ্ট কি আর আগে সয়েছি নাকি? ব্যাকুল হয়ে প্রভাত বলে, তোমার এত কষ্ট! অথচ আমি কিছুই বুঝতে পারি না। সত্যি আমি একটা অপদার্থ। তারপর বলল, আচ্ছা কালী কিসে তোমার এই কষ্ট লাঘব হবে? সত্যি তুমি আমার কষ্ট লাঘব করতে চাও? আমার পরে তোমার একবিন্দুও বিশ্বাস নেই তাই না? জানি না, তাহলে ব'ল কিসে তোমার কষ্ট লাঘব হবে? কালীদাসী বলে, আমার এ কষ্ট কোনদিনও শেষ হবে না। সারাজীবন এ কষ্ট আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে। তারপর বলল, তোমার মধ্যেও মাঝে মাঝে আমি সেই কষ্টের আঁচ পাই। আর তাতে আমার ভিতরের নিভে যাওয়া আগুনটা দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে। একদিকে তোমার এই কষ্ট আর একদিকে বুকের মধ্যে এই জ্বলন্ত আগুন, আমি আর পারছি না প্রভাত! হয় তুমি বিয়ে কর, না হয় আমাকে যেতে দাও। তোমার এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব।

চিরকালের গোঁয়ার-গোবিন্দ প্রভাত কালীদাসীর এই কথা ঠিকমতো বুঝতে পারে না। কালীদাসী কি চায় তার কাছে? একবার মুখ ফসকে বলেও ফেলেছিল—সেদিন যদি নিকুঞ্জদার মার কথায় হীরুকাকা রাজি না হতো, আমি ঠিকই করে ফেলেছিলাম তোমাকে আমিই বিয়ে করব। সেদিন কালীদাসী খিল খিল করে হেসে উঠে বলেছিল, সত্যি তুমি একটা বদ্ধ পাগল। কেন বদ্ধ পাগল কেন? বাঃ রে ওসব কথা ভাবতে আছে? আমাকে বিয়ে করলে যদি তোমার অবস্থা তোমার নিকুঞ্জদার মতো হ'ত আমি তো কেঁদেও কূল পেতাম না। তার চেয়ে এই ভাল। আমাকে বিয়ে করলে কি এর চেয়েও আমাকে বেশি পেতে? প্রভাত তারপরে আর কোন দিন তাকে বিয়ের কথা বলেনি।

কিন্তু তাদের নিয়ে যে সর্বত্র আলোচনা হয় এটা সে জানে। এই তো ক'দিন আগে দিলীপের বৌ শিখা বৌদি বলেছিল, ঠাকুরপো তোমাকে একটা কথা বলব? কি কথা? উত্তরে বলল, নিকুঞ্জের বৌকে নিয়ে কিছু ভাবছো? চমকে উঠে প্রভাত।

কিন্তু শান্তভাবে বলে, কি জানতে চাইছ বৌদি? কি আর জানতে চাইব? সোমত্ত মেয়ে। তোমাদের নিয়ে অনেক কথা বাতাসে ভাসছে। একটা কিছু কর ঠাকুরপো। প্রভাত কোন কথা না বলে চুপ করে থাকে। শিখা বলল, রাগ করলে ঠাকুরপো? রাগ করবো কেন বৌদি? কথা তো অনেক আমার কানেও আসছে। কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি না আমার কি করা উচিত? শিখা বলেছিল, ঠাকুরপো সত্যি যদি তুমি কালীদাসীকে ভালবাস, তাহলে ওকে তুমি বিয়ে কর। আঁতকে উঠে প্রভাত বলল—কি বলছ বৌদি! বিয়ে? মেনে নেবে তোমরা? তাছাড়া মা কিছুতেই মেনে নেবে না। শেষ পর্যন্ত আমাকে হয়তো খালপাড় ছাড়তে হবে। উত্তরে শিখা বলল, খালপাড় ছাড়তে হবে কেন? এমন তো নয় যে বিধবা বিয়ে আগে কেউ করেনি? তাছাড়া তুমি তো কোন অন্যায় করছ না। কালীদাসীর পরে আজ আর কারো কোন অধিকার নেই। তোমাকে সে ভালবাসে। তুমিও তাকে ভালবাস। তাহলে অসুবিধাটা কোথায়? প্রভাত চুপ করে থাকে।

শিখা বলল, খালপাড়ের মানুষ কি ভাবছে না ভাববে তা নিয়ে মাথাব্যথা করে কি লাভ? তুমি কি জান এর চেয়েও কি জঘন্য কাজ চলছে এই খালপাড়ে?

প্রভাত বলল, কি কাজ চলছে? কই আমি তো কিছু জানি না। জান ঠাকুরপো জান। আমি জানি তুমি নিশ্চয়ই জান। তারপর বলল, সন্তোষ ঠাকুরপোর বৌ যে তাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল তা কি জান না? উত্তরে প্রভাত বলল, সন্তোষ তো বলল, ও ওর বাপের বাড়ি গেছে। মৃদু হেসে শিখা বলল, তা ছাড়া আর কি বলবে? প্রভাত বলল, আসল ব্যাপারটা তাহলে কি? তুমি পাঁচকান করবে না বল? আচ্ছা করব না।

শিখা বলল, ও কোথাও যায়নি। তিনমাস বীরেন ঠাকুরপোকে নিয়ে বাইরে কাটিয়ে কাল সে সন্তোষের কাছে ফিরেছে। সন্তোষ ওকে কিছু বলতে গেলে বলেছে সে আবার যাবে, আর এ নিয়ে সন্তোষ যদি বাড়াবাড়ি করে তবে তাকে জেল খাটাবে। ওকে নাকি কে বলেছে আইন এখন মেয়েদের পক্ষে। দিনে দিনে কি যে হচ্ছে ঠাকুরপো?

আইন কার পক্ষে তা নিয়ে অত মাথাব্যথা নেই প্রভাতের। সে শুধু ভাবছে সন্তোষের বৌ তিন মাস বীরেনের কাছে থেকে আবার ফিরে এসেছে সন্তোষের কাছে। উল্টে আবার তাকে ভয়ও দেখাচ্ছে। এ তো ভারি আশ্চর্যের ব্যাপার। প্রভাত বলল, আমি এসব কিছু জানি না বৌদি। শিখা হেসে বলল, এখানকার সবাই জানে আর তুমি জান না? আমাকে তা বিশ্বাস করতে হবে? সেটা তোমার ব্যাপার বৌদি। তার মাথায় এখন ঘুরপাক খাচ্ছে কালীদাসীকে তো বিয়ে করতে পার? পারবে না কেন? কিন্তু কালীদাসী কি রাজি হবে?

শরৎরাও কয়েকদিন ধরে বলছে, এত কিন্তু কিন্তু করছিস কেন প্রভাত?

কালীদাসীকে তুই বিয়ে কর এটা আমরাও চাই। সবচেয়ে বড় কথা কালীদাসী তোকে চায়। আমরা তোর পিছনে আছি। এসব কথা ও কালীদাসীকে বলতে চায়। কিন্তু পারে না। প্রভাত নিজেও বোঝে কালীদাসী ছাড়া সে বাঁচবে না, অথচ সে কথা বলার ক্ষমতাটুকুও সে অর্জন করতে পারে না। এর মধ্যে আবার অনেক দিন পরে সত্যেনবাবুর একটা চিঠি এসেছে কালীদাসীর নামে। সত্যেনবাবু লিখেছেন, কালীদাসী, মাত্র একটা রাত তোমাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছি। বুঝতে চেয়েছি তোমার ভালবাসার গভীরতা। কিন্তু এভাবে তুমি আর ওখানে থেকো না। প্রভাতের দুর্বল মন তোমাকে ভীষণভাবে চায় একথা সত্যি, কিন্তু ও তোমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দেবে কিনা জানি না। যদি না দেয়, তাহলে আর এক মুহূর্তও নয়। তুমি তোমার নিজের ঘরে চলে যাও। আখতারদাকে তোমার কথা বল। উনি একটা ব্যবস্থা অবশ্যই করে দেবেন। আর ও যদি তোমাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে কাছে রাখে, আমার আশীর্বাদ রইল তোমাদের দুজনকেই।

আর হ্যাঁ, দলের অনুরোধ ফিরাতে পারলাম না। তাই আমি ফিরে আসছি খুব তাড়াতাড়ি। প্রভাতকে এবার নির্বাচনে লড়তে হবে, আমি পাশে থাকব। —আশীর্বাদক দাদা—সত্যেন দাস।

আনন্দ ও ব্যথা একসাথে কালীদাসীকে অথৈ জলে ফেলে দেয়। প্রভাতকে সে কি করে ছেড়ে যাবে? ও বিয়ে করতে না চাইলেও ওকে ছাড়া একদিনও বাঁচবে না কালীদাসী। সত্যেনবাবুকেই বা সে একথা কি করে বলবে? চিঠিটা এসেছে প্রায় দিন সাতেক হয়ে গেল। অথচ সেকথা সে জানাতে পারে না প্রভাতকে। কি এক ভয় তাকে গ্রাস করে ফেলে।

আজই সে প্রভাতকে না জানিয়ে চলে গিয়েছিল আখতার সাহেবের বাড়ি। বুলির চেহারায় ফিরে এসেছে সেই আগের জৌলুস। প্রায় গেট থেকে টানতে টানতে ভিতরে নিয়ে এসে এক নজরে পর্যবেক্ষণ করে কালীদাসীকে। কালীদাসী লজ্জা পেয়ে বলে, কি দেখছ এমন করে? বুলি বলল, খুব খারাপ ভাবী খুব খারাপ! কি খারাপ? বুলি বলল, এমন চেহারা হল কি করে? দিনরাত কি প্রভাতদার সঙ্গে ঝগড়া কর নাকি?

কালীদাসী বলল, তুমি তো নিজে গিয়ে দেখে আসতে পার? যাবো যাবো ভাবী। কিন্তু উনি যে আবার একটা দায়িত্ব দিয়ে গেছেন। কে? প্রভাত? তাছাড়া আবার কে? তারপর বলল, আচ্ছা বলতো ভাবী, চালাও তো রিকশা। কি দরকার তোমার অতসব বড় বড় দায়িত্ব নেওয়ার? কালীদাসী হেসে বলে, কী দায়িত্ব দিয়েছে তোমাকে? বুলি বলে, রাস্তা থেকে একটা পাগলকে ধরে এনে বলে, বুলি একে একটু হাসপাতালে ভর্তি করে দেবে? আমি তো অবাক। বললাম, ওসব পাগল-টাগল নিয়ে আমি হাসপাতালে যেতে পারব না। তুমি নিজেও তো যেতে

পার? বলল—পারব না কেন? কিন্তু আমাকে ওরা পাত্তা দেবে না। তাই তোমাকে বলা। উত্তরে কালীদাসী বলে—ও তো ঠিক বলেছে। রিকশাওয়ালার আবার দায়িত্ববোধ? এই তো আঁতে ঘা লাগলো তো? বলল, পিয়াশা। তারপর বলল, তা লাগুক, কিন্তু প্রভাতদার এই গুণগুলো যদি আমার মতো এই যাকে তোমরা বড়লোক বল, ভদ্রলোক বল তাদের থাকত! কালীদাসী চুপ করে থাকে। পিয়াশা বলে, পাগলটাকে নিয়ে তো আমি হাসপাতালে গেলাম। একেবারে চুপচাপ, কোনরকম বিরক্ত করেনি, কিন্তু যেই গেট পর্যন্ত গেছি, বলে কি জান? কি? বলে যে আমি পাগল? পাগল ঐ রিকশাওয়ালাটা, বলেই হন হন করে হাঁটা। আমি যতো ডাকি ও তো শোনেই না, শেষে বলে, আমি আল্লার সেবক, আমাকে বলে পাগল! ও মরবে! মরবেই!!

কালীদাসী চিৎকার করে বলে, না! বুলি আশ্চর্য হয়ে বলে, কি না, ভাবী? কালীদাসী বলল, ঐ যে বলল না, ও মরবে! মরবেই!! তারপর বলল, আমি যাই ভাই। কিন্তু কেন এসেছিলে সে কথা তো বললে না? পরে বলব, দেখি ও ফিরেছে কিনা।

ফেরেনি দেখে চিন্তা বাড়ে। রাত যত বাড়ে চিন্তা তাকে গ্রাস করতে থাকে, তারপর খুড়িমার ঐ কথা। কালীদাসী এখন কী করবে? সবাইকে তো ভাল করে চেনেই না। তবু সে ঐ অতরাতে দিলীপের বাড়িতে আসে। শিখা বলে, কালীদাসী তুমি? কালীদাসীর তখন সময় নষ্ট করার উপায় নেই। বলল, দিদি, প্রভাত এসেছিল? হ্যাঁ এসেছিল তো। কিন্তু সে তো অনেক আগে চলে গেছে? কোথায় গেছে জান? কেন বাড়ি যায়নি? না বাড়ি যায়নি। কালীদাসী একে একে অনেক বাড়ি যায়, কেউ হাসে, কেউ সহানুভূতি জানায়। কিন্তু প্রভাতের খোঁজ কেউ দিতে পারে না। এই ঘটনায় সারা খালপাড়ে একটা সাড়া পড়ে যায় প্রভাতকে পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রভাতকে পাওয়া যাচ্ছে না? অনেকে যেমন বিশ্বাস করতে চায় না, তেমনি অনেকে মনে করে, এমনটা যে ঘটবে সে তো জানা কথা। ওরে বাবা আমাদের কি নেতা হতে আছে? লোকে তা মানবে কেন? তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে। কিন্তু যারা প্রভাতের সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী তারা বেরিয়ে পড়ে চারিদিকে।

একেবারে ভোররাতে খবর পাওয়া যায় যে এখান থেকে অনেক দূরে কারা যেন মেরে ফেলে রেখে গেছে একজন ২৫/২৬ বছরের যুবককে। স্থানীয় লোকেরা ধরাধরি করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে। ডাক্তার জানিয়ে দিয়েছেন কেউ যেন এই মুহূর্তে কোন বিরক্ত না করে। ৭২ ঘন্টা না গেলে কোন আশ্বাস দিতে পারছে না। কালীদাসী ডুকরে কেঁদে ওঠে। খুড়িমা বললেন, এখন আবার

কাঁদার কি হল? যা চেয়েছিলে তাই তো হল? তুমি তো শোননি বৌমা। তোমাকে যে কেন বিশ্বাস করতে গেলাম? কালীদাসী বলল, খুড়িমা! আর খুড়িমা খুড়িমা করো না তো বাপু! আমার যা সর্বনাশ করলে তাতে তোমায় খুন করলেও গায়ের জ্বালা জুড়োবে না। যাও বাপু আমার চোখের সামনে থেকে। ওসব কুমিরের কান্নায় আমার বুকের জ্বালা মিটবে না।

সেই ভোর রাতেও বহু লোক জড়ো হয়েছে প্রভাতের উঠোনে। দিলীপের বৌও এসেছে। বলল, তোমার প্রাণে কি কোন মায়াদয়া নেই খুড়িমা? তুমি কি বলতে চাও কালীদাসী প্রভাতকে মেরেছে? তবে আর বলছি কি? ও আসার পর থেকেই তো আমার সুখশান্তি সব উধাও। দিলীপ, রহমান, মুকুন্দ এরা বলল, খুড়ি অভিযোগ করার সময় তো পরেও পাবে। আর পরে? চিতায় গেলে তো সব শেষ।

একটা ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে বাহিরের রাস্তায়। কে বা কারা ভ্যান পাঠিয়েছে জানে না কেউ। জিজ্ঞাসা করেওনি কেউ। ভ্যানওয়ালা এখানকার লোক নয়। শুধু বলল, আমাকে বলা হয়েছে তোমাদের নিয়ে যেন হাসপাতালে যাই। প্রভাতের মা বলল, আমি যাবো না। ঐ রাক্ষুসী বৌটা যদি যেতে চায়, তবে যাক না। কালীদাসী চোখের জল মুছে খুড়িকে বলল, খুড়িমা আমাকে যতো গালাগালি দিতে চাও পরে দিতে পারবে। তুমি চল খুড়িমা, তোমার কোলে তোমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব, তুমি না করো না খুড়িমা। উপস্থিত প্রায় সবাই সেই একই অনুরোধ করে। কিন্তু প্রভাতের মায়ের সেই এক গোঁ না তিনি যাবেন না। উল্টে কালীদাসীকে বললেন, এতই যদি সতীপনা, তবে তাকে আগে আমার কোলে ফিরিয়ে দাও বাপু! কালীদাসী মনে মনে বলল, হ্যাঁ তাকে সে ফিরিয়ে দেবে তার মায়ের কাছে। তাতে যদি তার জীবনও দিতে হয় তবে তাই সে দেবে। সে সতী নারী নয়। রক্তমাংসেরই এক মানুষ। তার কামনা-বাসনা যেমন আছে তেমনি আছে ভালবাসার জোর। বেহুলা সাবিত্রী যদি তাদের স্বামীদের ফিরে পেতে পারে তবে সেই বা পারবে না কেন? তাদের কারো চেয়ে তো সে কম ভালবাসে না প্রভাতকে? ও যে তার ভালবাসার প্রথম পুরুষ। আঘাত তার যেমনই হোক না কেন, ভগবান কিছুতেই তার প্রতি এত নির্দয় হতে পারে না। কিন্তু মুখে বলল, খুড়িমা না গেলে সেও যাবে না হাসপাতালে।

দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে দিলীপ ও রহমান গিয়ে ভ্যানে বসল। দিলীপের বৌ কালীদাসীকে বলল, তুমি কেন যাবে না কালীদাসী? হোক না খুড়ি তার মা। কিন্তু আমি ভাল করে জানি, তোমার চেয়ে প্রভাতকে কেউ বেশি ভালবাসে না। একমাত্র তোমার ভালবাসাই তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে। তারপর বলল, চল আমিও যাব তোমার সাথে।

খালঘাটের যত রিকশাওয়ালা আছে তারা প্রায় সবাই আগে থেকে এসে

হাসপাতালে ভিড় জমিয়েছে। প্রভাতের আঘাত যে এত বেশি, ডাক্তাররা কিছুই বলতে পারছেন না, আর তার সঙ্গে কাউকে দেখা করতেও দিচ্ছেন না। ওয়েটিংরুমের বেঞ্চিতে বসে কালীদাসী শুধু কেঁদেই চলেছে। কোন কিছুই আজ আর গোপন নেই। সে কি করবে? এক যদি বুলিটাও আসতো! দুটো কথা বলা যেত।

হঠাৎ সে চমকে ওঠে একজনকে দেখে। কাঁচাপাকা চুল দাড়িতে কে উনি? তাকেই সব থেকে বেশি দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা যাচ্ছে। ডাক্তারের সঙ্গে কথা পুলিশের সঙ্গে কথা সব উনি একাই করছেন। কালীদাসীর সামনে দিয়ে তিনি বেশ কয়েকবার যাতায়াতও করেছেন। ভীষণ চেনা চেনা মনে হচ্ছে অথচ কিছুতেই চিনতে পারছে না।

এতক্ষণে ডাক্তার একজনকে দেখার অনুমতি দিয়েছেন। দিলীপের বৌ বলল, তুমি যাও কালীদাসী। ভগবান আছেন, তোমার এতবড় ভালবাসা মিথ্যে হতে পারে না। কথাটা কানে যায় কাঁচাপাকা দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের। দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, আপনি ঠিক বলেছেন, আল্লাহর দুনিয়ায় ভালবাসার চেয়ে দামী আর কিছু নেই। ভালবেসেই তো কেউ ফকির আর কেউ উজির। এ কার কণ্ঠস্বর? কেঁপে ওঠে কালীদাসী। অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে সিরাজ ভাই! ভদ্রলোক আর দাঁড়ান না। দিলীপের বৌ বলল—ওকে তুমি চেন নাকি কালীদাসী? না না! আমার ভুলও হতে পারে। দিলীপের বৌ শিখা বলল, মোটেই ভুল নয় কালীদাসী। যা শুনেছি তাতে ওঁর জন্যই মনে হয় প্রভাত বেঁচে যাবে। কি রকম?

উত্তরে শিখা বলল, ওঁকে দেখেই তো গুণ্ডাগুলো পালায়। আর উনি লোক জড়ো করে ঐ শেষ রাতে প্রভাতকে নিয়ে হাসপাতালে আসেন। এতবড় হৃদয়বান মানুষ আর হয় না। কালীদাসী শুধু বলে, হবে হয়তো। তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু তুমি যে বললে, সিরাজ ভাই। তিনি কে? কালীদাসী বলল, কেউ না দিদি কেউ না। তাছাড়া তিনি হবেন কি করে?

সময় গড়িয়ে যায়। সকাল হয়। আরো অনেকে আসে খালঘাট ও খালপাড় থেকে। আসেন আখতার সাহেব ও পিয়াশা। চোখে মুখে তার গভীর উদ্বেগের চিহ্ন। ডাক্তারকে বলে আখতার সাহেব দেখে এলেন তাকে। বুলি বলল, কেমন দেখলে বাবা? এখন কিছু বলা যাবে না। শিখার হাজার অনুরোধেও কালীদাসী যায়নি দেখা করতে। শিখাই দেখে এসেছে। নির্জীবের মতো শুয়ে আছে প্রভাত। চোখ দুটি ছাড়া সারা শরীর কাপড় দিয়ে ঢাকা। মাথায় ব্যাণ্ডেজ। কালীদাসী জানতেও চাইতে পারেন না কেমন দেখলে? চোখেমুখে তার গভীর উদ্বেগ। তাকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে আসে পিয়াশা। হাত রাখে তার কাঁধে। ফিরে তাকায় কালীদাসী, বলে, এসেছো ভাই? এতক্ষণ আমি তোমায় খুঁজছিলাম। ওকে

দেখলে? শিখা চেনে না এই সুন্দরী মেয়েটিকে। বড়লোকের মেয়ে হবে নিশ্চয়ই। পিয়াশা বলল, ভাবী, তোমাকে আজ এক আশ্চর্য মানুষকে দেখাব। কালীদাসী বলল, কে? আরে এস না?

কালীদাসীকে উঠতে হয়। জানে এর কাছে জোর খাটবে না। কালীদাসী বলল, কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? দেখতেই পাবে। তারপরে বলে, তোমরা বল না স্বর্গ আর নরকের কথা। আমরাও বলি বেহেস্তের কথা। সে যে কোথায় আমরা কেউ জানি না। তবু সেই অজানা স্বর্গ নরক আমাদের নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের ভাল কাজ আর খারাপ কাজকে পরিচালিত করে। এই দেশেরই এক কবি বলেছেন—

"কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক কে বলে তা বহু দূর!
মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক মানুষেতেই সুরাসুর।"

কালীদাসী বলল, অত বড় বড় কথা আমি বুঝি না ভাই। আর স্বর্গ নরকে আমার কি হবে? আমি বুঝি শুধু আমাকে। আমার কষ্ট আমার দুঃখ আমার ব্যথা-বেদনা ছাড়া আমি কিছু বুঝতে পারি না। আমার মতো স্বার্থপর মানুষ আর দ্বিতীয়টি নেই। আমি অন্যের কষ্ট বুঝি না। আমার জন্যে যে কারো বুকে ব্যথা হতে পারে বুঝতে পারি না। এবং একদম বুঝতে চাই না। আমি কাউকে সুখ দিতে পারি না, শান্তি দিতে পারি না। আমারই জন্য একজন কোনদিন গ্রামে ফেরেনি, আমারই জন্যে আর একজন ইহজগতে নেই, আর সেই আমারই জন্য আর একজন জানি না আবার তার মায়ের কোলে ফিরে যাবে কিনা। আমি রাক্ষুসী, শনি, খুনি। আমার যে কেন মরণ হয় না।

ততক্ষণে তারা হাসপাতালের কাছে একটা জরাজীর্ণ মসজিদের সামনে এসে থামে। কালীদাসী আশ্চর্য হয়ে বলে, এখানে কেন? এইখানেই তো সেই আশ্চর্য মানুষটি আছে। কোন আশ্চর্য মানুষ? বুলি বলল, আচ্ছা ভাবী তোমার মনে আছে, প্রভাতদা একদিন একটা পাগলকে আমার কাছে নিয়ে গিয়ে বলেছিল তাকে যেন আমি হাসপাতালে পৌঁছিয়ে দিই? কালীদাসী বলল, কিন্তু সে যে পাগল নয় তা তো তুমি নিজেই বলেছিলে। হ্যাঁ বলেছিলাম। আর উনিও বলেছিলেন ওই রিকশাওয়ালাটাই পাগল, আর উনি আল্লাহর সেবক। হ্যাঁ বলেছিল। কিন্তু তিনি এখানে কোথায়?

পিয়াশা বলল, তিনিই তো সব। আজ প্রভাতদা এখানে তার জন্য। প্রভাতদা ভাল হয়ে যাবেও সেই তার একান্ত বিশ্বাস। এতটা মনের জোর তিনি পান কোথা থেকে? বদ্ধ পাগল না হলে এতটা মনের জোর কারো থাকে নাকি? কাঁচাপাকা দাঁড়িওয়ালা ভদ্রলোক নামাজ সেরে সেই ভাঙা মসিজদ থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বললেন, তুমি ঠিক বলেছো কালী, বদ্ধ পাগল ছাড়া এমন আজব স্বপ্ন আবার কেউ দেখে নাকি? কিন্তু তুমি কি জান না এমনি কিছু বদ্ধ পাগলের জন্য

পৃথিবীটা আজও সুন্দর। ওরাই মানুষের মনে আজও জিইয়ে রেখেছে মায়াদয়া স্নেহ-ভালবাসা। বদ্ধ পাগল না হলে আমার কি দায় ছিল প্রভাতকে ঐ প্রায় শেষরাতে লোক জোগাড় করে এই হাসপাতালে নিয়ে এসে তাকে সুস্থ করে তোলার? বলতে গেলে ও তো আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে তাই না? সিরাজ ভাই! থরথর করে কাঁপতে থাকে কালীদাসী। সিরাজ বললেন, কি হল কালী? পিয়াশা বলল, ভাবী? উত্তরে কালীদাসী বলল, তুমি আমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছো ভাই! পিয়াশা বুঝতে পারে না কিছুই।

এই হাসপাতালে কালকের সেই পাগল মানুষটাকে দেখে পিয়াশা বলেছিল, আপনি এখানে? সরল হেসে সিরাজ বলেছিল, তাহলে চিনতে পেরেছো? তারপর বলল, প্রভাতটা আমায় পাগল ঠাউরেছিল, রাস্তার জঞ্জালের পাশে পড়ে থাকতে দেখে আমাকে তুলে নিয়ে তোমার কাছে জিম্বা করে দিয়েছিল, আর আজ ওকেই আমি তুলে এনে হাসপাতালে জিম্বা করে দিলাম। পিয়াশা জানতে চায় ওকে আপনি আগে চিনতেন? হ্যাঁ। একই জায়গায় বাস করতাম, চিনতাম বৈকি? কিন্তু আমি ধরা দিতে চাইনি। কেন? সে আর এক ইতিহাস। তুমি শুধু জেনে রেখ আল্লার দুনিয়ায় ভালবাসার চেয়ে বড় আর কিছু নেই। এই ভালবেসেই কেউ ফকির আবার কেউ উজির। পিয়াশা জানতে চায় আপনি নিশ্চয়ই কাউকে ভালবাসতেন? আবারও তার শুভ্র দাঁতে মধুর হেসে বললেন, বাসতামই তো। না বাসলে কি এমন করে আল্লাকে ভালবাসা যায়? তার ভালবাসার মধ্য দিয়ে যেমন আমি আল্লার স্পর্শ পাই, আবার আল্লাহকে ভালবাসার মধ্যেও আমি তাকে দেখতে পাই। পিয়াশা বলল, তবে তাকে শাদি করলেন না কেন? সিরাজ বললেন আমি তো আল্লার সেবক। আল্লাহই আমার সব। তাই যদি তাহলে আজো তার কথা ভাবেন কেন? কি করবো, আল্লাহকে ভাবতে গেলে যে আমার তার মুখটা মনে পড়ে যায়? আবার তাকে ভাবতে গেলে সেই আল্লাহই সামনে এসে দাঁড়ায়। আল্লাহকে কি শাদি করা যায়? তার মানে আপনি যাকে ভালবাসেন তিনি আপনার আল্লাহ।

তার কোন উত্তর না দিয়ে সিরাজ বললেন, বৃন্দাবনের শ্রীরাধাকে জান? হ্যাঁ রাধাকৃষ্ণের কথা বলছেন তো? হ্যাঁ, আর তাদের সম্পর্কে লোকে জানে তাদের প্রেমের কোন তুলনা হয় না, তবু তারা নিজেরা কিন্তু শাদির কথা একবারও ভাবেননি, তেমনি তাদের সম্পর্কেও কেউ ভাবেন না। এত প্রেম যেখানে সেখানে কেন তারা শাদি করলেন না? তারপর বললেন, শাদি করলে তো আর প্রেম থাকে না, তাই না? পিয়াশা তবু তর্ক করে বলে কিন্তু সব প্রেম তো শেষ পর্যন্ত শাদি করতে চায়। পরিণয় তো প্রণয়ের শেষ গন্তব্য। সিরাজ বললেন, এই বোকামির জন্যই তো মানুষের মুক্তি হল না। পিয়াশা বলল, এ যুগের ঈশ্বর রবিঠাকুর কিন্তু

সেকথা বলে না। কি বলেন? বলেন "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।"

সিরাজ বললেন, ঠিকই তো বলেন। আল্লাহর সঙ্গে ভালবাসায় আবার বৈরাগ্য কি? বৈরাগ্য তো স্বার্থপর মানুষের সাধনা। তারপর বললেন, রবিঠাকুর বৈরাগ্য চাননি ঠিক কথা, কিন্তু ঈশ্বরকে অস্বীকারও করেননি। তিনিই তো বলেছেন, আমার মাথা নত করে দাও হে প্রভু তোমার চরণ ধূলার তলে। এক দিকে বৈরাগ্য নয়, আর একদিকে ঈশ্বরের পায়ে সর্ব অহংকারের আত্মনিবেদন, একবার ভেবে দেখেছো কতবড় সাধক হলে তা সম্ভব? পিয়াশা বলল, কিন্তু তিনি তো প্রেমকে অস্বীকার করেননি। কেন করবেন? প্রেমের যন্ত্রণাই তো আসল সত্য। বৃন্দাবনের রাধার কথা একবার ভাবতো? শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তার মিলনের মধ্যেও তার মনে আনন্দ নেই। বিচ্ছেদের ভয়ে তটস্থ শ্রীরাধিকা। 'দুহু কোরে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।' কে কাঁদছে? শুধু কি রাধা? কৃষ্ণও তো কাঁদছে তাই না। তাই বলছিলাম সেই প্রেম সর্বোৎকৃষ্ট যে প্রেম প্রতি মুহূর্তে বিচ্ছেদের ভয়ে দিশেহারা।

পিয়াশা বলল, অতসব তত্ত্বকথা বুঝি না। এই যে প্রভাতদা, তাকে গভীরভাবে ভালবাসে কালীদাসী ভাবী, কিন্তু হিন্দুসমাজ আজও বিধবা বিবাহকে অন্তরের সঙ্গে মেনে নিতে পারেনি। তবে কি তাদের প্রেম ব্যর্থ হয়ে যাবে? সিরাজ বললেন, না যাবে না। মিলন তাদের হবেই, কিন্তু যন্ত্রণা তাদের শেষ হবে না। পিয়াশা বলল, একবার যে ভালবেসেছে তার যন্ত্রণা হয়তো কোনদিন শেষ হয় না। কিন্তু সে সব কথা থাক, বরং বলুন না প্রভাতদা কি আগের মতো সুস্থ হয়ে যাবে? নিশ্চয়ই হবে। আল্লাহ কখনো কখনো নির্মম হন বটে, কিন্তু নিষ্ঠুরতা তার চরিত্রে নেই। কিন্তু ভাই আমার যে নামাজের সময় হ'ল, এবার যেতে হবে। কোথায় নামাজ করবেন? ঐ যে ঝোপের মধ্যে একটা পোড়ো বাড়ি দেখছো না, ওটা একটা মসজিদ। একদিন হাজার হাজার লোকে ওখানে নামাজ করতেন আজ আর কেউ করেন না। আমি ওখানেই নামাজ করব। কেন? জীবনটা দেওয়ার এত শখ কেন? ভুল বললে ভাই। জীবন দেওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু ওটা মসজিদ, আল্লাহর অবস্থান ওখানে। পিয়াশা তর্ক করে বলে, আল্লাহ কি আমাদের মতো মানুষ যে মসজিদ ছাড়া তিনি আর কোথাও বাস করতে পারেন না? সিরাজ হেসে বললেন, আল্লাহর 'পরে তোমারও এত রাগ কেন? পিয়াশা বলল, রাগ তো আমার সবার প্রতি বিশেষ ভাবে যারা ভালবাসা ছাড়া বোঝে না কিছুই। এই যেমন প্রভাতদা ভালবেসে করতে পারে না এমন কিছু নেই। এই যে কালীদাসী ভাবী, ভালবেসেই জীবনটা শেষ করতে বসেছে, আর এখন দেখছি আপনাকে। কি পান এই অন্ধের মতো ভালবেসে? যন্ত্রণা, শুধু যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণার আনন্দময় স্বাদ যে পেয়েছে তার কাছে কোন বিপদই বিপদ নয়। একবার তুমিও ভালবেসে দেখ। তখন বুঝবে এর থেকে বড় শক্তি পৃথিবীতে আর কিছু নেই।

তখন থেকেই পিয়াশার মনে হয়েছে এই আশ্চর্য মানুষটার সঙ্গে একবার কথা বললে কালীদাসী ভাবী বুকে জোর পাবে। নিজের মনের ঈর্ষা যে কখন কালীদাসী ও প্রভাতের ভালবাসার কাছে ম্লান হয়ে গেছে নিজেও তা জানে না। এখন তার একমাত্র কামনা কালীদাসী ভাবী ও প্রভাতদার ভালবাসা একটা পরিণতি পাক। তাই তাকে জোর করে নিয়ে আসা। কিন্তু এ কি দেখছে সে? সিরাজ তো কালীদাসীর অপরিচিত নয়? তবে কি কালীদাসীর জন্যই সিরাজ আর গ্রামে ফেরেনি? আর সেই অভিমানেই কালীদাসী তার মুখোমুখি হতে চায় না?

সিরাজ হেসে বললেন, কাকে ভয় পাচ্ছ কালী? আমি তো তোমায় চিরকাল বলে এসেছি আমি আল্লাহর সেবক। ভুল যদি কিছু করে থাক সে ভুল তোমার। তোমার চরম ভুল নিকুঞ্জকে বিয়ে করা। ও তোমার মনকে কোনদিন বুঝতে পারেনি। তোমাকে সত্যিকারে যে মনেপ্রাণে চেয়েছিল সে ঐ প্রভাত। গোয়ারগোবিন্দ বলে একদিন যাকে চিনতে পারনি অন্য পরিবেশে তাকে চিনতে তোমার একদম ভুল হয়নি। আর সেজন্যই তো তোমার ভালবাসার মর্যাদা রাখতে একাকী রুখে দাঁড়িয়েছিলাম। ওরা ওকে বাঁচতে দিতে চায়নি। কিন্তু আল্লাহ দুনিয়ায় কি নিজের জোর খাটে? তাই তো আমার ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে ওরা পালাল। কালীদাসী বলল, একদিন যাকে নিজের পরিচয় পর্যন্ত দিতে চাওনি, চিনতে চাওনি, তার প্রাণটা তোমার কাছে এত দামী হল কেন? আবারো হেসে সিরাজ বললেন, কালীদাসী আজো তুমি সেই অবুঝ রয়ে গেলে? তারপর বললেন—সেদিনও যে তোমার মোহ থেকে মুক্ত হতে পারিনি। নিজেও পারনি তুমি প্রভাতের কাছে সম্পূর্ণ ভাবে নিজেকে সঁপে দিতে। তাই তো নিজে যেমন ধরা দিতে চাইনি, তেমনি চিনতেও চাইনি কাউকে। কালীদাসী বলল, আজও তুমি তেমনি নিষ্ঠুরই রয়ে গেলে। সিরাজ বললেন, আমি নিষ্ঠুর না হলে তুমি শান্ত হবে কি করে? কিন্তু আর নয়। প্রভাতের জ্ঞান যে কোন মুহূর্তে ফিরে আসতে পারে, চল যাওয়া যাক।

তাদের কথোপকথনে পিয়াশা শুধু নীরব দর্শক। হাসপাতালে ফিরে এসে দেখে সত্যেনবাবু কথা বলছেন ডাক্তারের সঙ্গে। সত্যেন জানতে চাইলেন কারা এমন করে ওকে মারলেন জানা গেছে কি? আমরা কিছু জানি না সত্যেনবাবু। তবে উনি হয়তো জানলেও জানতে পারেন। কে? ঐ তো উনি আসছেন! সামনে সত্যেনকে দেখে কালীদাসী অবাক হয়ে বলল, সত্যেনদা আপনি? কি করবো বল? দলের অনুরোধ তো ফিরিয়ে দিতে পারি না। পিয়াশা বলল, খুব ভাল করেছেন চাচা। এই মুহূর্তে আপনাকে খুব দরকার। তারপর বলল, পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, ইনি সিরাজ ভাই। ঐ গুণ্ডাদের সঙ্গে একা লড়াই করে প্রভাতদাকে মনে হয় এবারের মতো বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আর সিরাজ ভাই ইনি সত্যেন দাস। সিরাজ বললেন, আমি জানি। তারপর বললেন, আপনারা সবাই যখন এসে গেছেন, তখন নিশ্চিন্ত

হওয়া [illegible] আমি আসি। আসি মানে? কোথায় যাবেন? কোথায় যাব জানি না [illegible]। [illegible] যা চেয়েছিলাম আল্লাহ তা পূর্ণ করেছেন। এখন আর মিথ্যে আমায় আমার বাঁধনে বাঁধবেন না। আখতার সাহেব বললেন, ওকে যেতে দাও সত্যেন। কিন্তু আখতারদা উনিই তো একমাত্র সাক্ষী। তুমি প্রতিশোধ নিতে চাও নাকি? আপনি কি বলেন, এমনি এমনি ছেড়ে দেবো? কালীদাসী বলল, ওকে ছেড়ে দিন সত্যেনদা।

এ এমন এক আবেদন যা অস্বীকার করা যায় না। সত্যেনের মতো প্রভাবশালী নেতা যে কালীদাসীর আবেদনের উত্তরে একটাও কথা বললেন না, তাতেই অনেকেই বেশ অবাক হয়ে যায়। সিরাজ বললেন, সত্যেনবাবু, একদিন হয়তো জানতে পারবেন কারা এর পিছনে দায়ী? তবু আমার অনুরোধ প্রতিহিংসাপরায়ণ হবেন না। তারপর কালীদাসীকে বললেন, কালী আমি আসছি। হ্যাঁ, এখন এস সিরাজ ভাই। কিন্তু আবার কবে দেখা হবে? সিরাজ বললেন, আর কোনদিনই দেখা হবে না। আমার জন্যে ভেবো না। আমি আল্লাহর সেবক। দেখি আল্লাহ আবার কোথায় নিয়ে যান? ও সুস্থ হলেও একবার আসবে না? না কালী আর কোনদিনই আমাদের দেখা হবে না। চলে যান সিরাজ। পিয়াশা শুধু বলে, আমি আপনাকে সেদিনও চিনতে পারিনি আজও আপনি তেমনি অচেনা রয়ে গেলেন! সিরাজ শুধু হাসলেন, কোন কথাই বললেন না।

ইতিমধ্যে সিস্টার জানিয়ে গেলেন, প্রভাত বিশ্বাসের বাড়ির কে আছেন? ওর জ্ঞান ফিরেছে। ডাক্তার কথা বলার অনুমতি দিয়েছেন। একজন যেতে পারেন। সংবাদ দিয়েই ভিতরে চলে যান সিস্টার। এখন সেই একজন কে? যিনি যাবেন দেখা করতে? কেউ কেউ বলেন, সত্যেনদা আপনি যান! উত্তরে সত্যেন বললেন না ভাই। আমি তো সবে এসে পৌঁছলাম। তারপর বললেন, এখানে এসে যা বুঝলাম তাতে একমাত্র যিনি যেতে পারতেন, তিনি তো নেই। তাই কালীদাসী তুমিই যাও। কালীদাসীর আজ যেন কিছুই হারাবার নেই। যত কথা এতদিন গোপন ছিল তা প্রকাশ পাওয়ায় কালীদাসী আজ সাহসিনী। আর কিছু গোপন করার নেই। শিখা বলল, সত্যেনবাবু ঠিক বলেছেন, এবার চল কালীদাসী। সিস্টার জানতে চাইলেন, উনি পেশেন্টের কে হন? শিখা শুধু বলল, 'ওর স্ত্রী'।

বহির্বঙ্গ
ও
বিদেশের
কবিতা

গৌতম দাশগুপ্ত (নতুন দিল্লি)

আলোয় পোড়ে কালো

বাড়িওয়ালা ভালো
ভাড়াটে খুব সাদা
মেয়েটা খুব কালো
বাড়িওয়ালা ভালো

এদেশে সব তাজা
এদেশে সব রাজা
টেলিভিশন বলে
কালোর মুখে আলো

বাড়িওয়ালা ছবির
দোকানদারি করে
ভাড়াটে আলমগীর
ছবির রঙ-এ ঢলে

টেলিভিশন রঙিন
বাড়িওয়ালা ভালো
পালার ছেঁড়া পাতা
আলোয় পোড়ে কালো।

অমিতাভ দেব চৌধুরী (আসাম)

পশু

ততটা নগ্নতা আর বেঁচে নেই তোমার শরীরে।
হাত ধাক্কা খায় কাচে,
অদৃশ্য অক্ষরে লেখা :
'রক্তপাত থেকে সাবধান।'
ফুলের এ আত্মপ্রেম ফুলশয্যা ছারখার করে।

আমার পশুত্ব তাই ছুটে যায় ঈশ্বরীর ডিহি অন্তঃপুরে।

কল্যাণ চট্টোপাধ্যায় (জয়পুর)

কোনো একদিন

অন্ধকার দেখতে দেখতে অন্ধ হয়ে আছি,
এখন আমার চোখ আলোই দেখে না।
পাথর ঘসতে ঘসতে পাথর হয়েছে হাত,
পাথর এখন জগদ্দল।
মাটি কাটতে কাটতে মাটি হয়েছে শরীর,
মাটির বুকে ধুলো কাদা—
এখন ধুলো ওড়ে না,
বাতাস বয় না।
রক্ত ঝরতে ঝরতে বুক হয়েছে মরা নদী,
স্রোত আসে না পাড় ভাঙে না।
শুকনো বালির চর হৃৎপিণ্ডখানি,
শব্দ ওঠে না ছন্দ বাজে না।
গোধূলির ক্লান্ত বেলা ঘুমায় অঘোরে,
সূর্য জ্বলে না নক্ষত্র জাগে না।

একদিন, কোন একদিন,
পাহাড় ভাঙতে ভাঙতে পাথর,
পাথর ফাটতে ফাটতে শব্দ,
শব্দ জমতে জমতে ক্রোধ,
ক্রোধের নির্মাণ এক কঠিন কবিতা।
একদিন, কোনো একদিন,
আলোর আকাশে উত্তাপ,
উত্তাপ বাড়তে বাড়তে বোধ,
বোধ যেন চকমকি, ঠিকরে পড়বে আগুন,
সর্বগ্রাসী দাবানল,
অনিবার্য জ্বলে উঠবে মৃত্যুদ্বীপের অন্ধকার।

সুকুমার চৌধুরী (মধ্যপ্রদেশ)

জীবনময়

"The greatest weankess of most humans is their hesitancy to tell others how much they love them while they 're alive."

চুপ করে থাকি। যেন ওই হৃদকম্প
বীতশব্দে ক্রমশ বিলীন হয়ে যায়। যেন কেউ টের না পায়।
ঈভন নিজেও। আর বিনিদ্রার কাছে যাই।
প্রলয়ারও। ওরা সখী। সখীদের রমণীবারতা
যদি কাজে লাগে। তাই।

এমন নয়, সখীরা সখা ব্যতিরেকে ভালো বোঝে
অন্য সখীদের। এমন নয়,
ঈর্ষা ছাড়া সখীকুল অন্য সখীদের জন্য
তুলে রাখে সম্পন্ন বকুল। এমন নয়,
সখীরাও পাশাপাশি শুয়ে নাড়াচাড়া
করে অনুভূতি। হয়তো এমন
প্রতিটি সখীই অন্য সখীকে তার
যৌন প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে, কী জানি রমণীতন্ত্র
কে বোঝে তেমন, এতসব ভাবি টাবি
দিন যায় যৌনতায় যৌনসখীহীন আর
এই টালবাহানায় কী হয় জানো
প্রেমিকের বেয়াকুল মন, অস্থিরতা বেড়ে গেলে
কী করি কী করি আর সখীদের
বিনুনিতে হাত চলে যায়। যেন খুনশুটি
পেড়ে বসি নৈঃশব্দ্য অপার।

কেমন প্রবল শব্দ প্রলয়ার। কেঁপে ওঠে বুক।
ভুলে যাও। যে রকম সেও... ...।

পারি কই, সমরজিতের পদ্য মনে পড়ে
প্রাণের আবেগে পড়ে, মমতায়
পৃথিবীকে ভালবেসে পড়ে।

মাধ্যাকর্ষণ এই শব্দ তার উত্তরে কোথাও
ছিল না যেহেতু
দিদিমণি শূন্য দিয়েছেন।

ভালোবাসা কথাটিতে আকর্ষণ,
পৃথিবী বিপুল তাই পৃথিবীর ভালোবাসা
তাও সুবিপুল—বিজ্ঞান দিয়েছে নাম
অভিকর্ষ—যার টানে
আপেল উন্মার্গগামী নয়।

মেয়েটি লিখেছে কিন্তু সে কথাই

দিদিমণি শূন্য দিন,
আমি তাকে কবিতা দিলাম।

পীযূষ রাউত (ত্রিপুরা)

সত্যি সত্যি আমি কি দ্বিপদ মানব

আমি কি দ্বিপদ কোনো রক্তমাংসের মানব?
এই প্রশ্ন কদাচ উঠত না, যদি না চোখে পড়ত চেনা মানুষের,
সমবয়সী, কিছুটা বড়ো, খানিকটা ছোটো
অন্তত জনা পঁচিশেক মানুষের যাপনকর্মকে
দর্শকের চোখে না দেখতুম।
যেমন—মিঃ 'ক'।
সকাল আটটায় ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে
গরম চা আর দৈনিকের তরতাজা খবর।
বাজার সেরে চান। আপিস। বাড়ি। তাসের আড্ডা। ভাত খেয়ে
রাত এগারোটায় বউকে জড়িয়ে ধরে ঘুম
যেমন—মিঃ 'খ'
রামদেবজীর শিক্ষা ও প্রাতঃভ্রমণ সেরে ছোলা খেয়ে ঘণ্টাখানেক
সন্তানকে প্রথম করার প্রাণপণ চেষ্টা।
হন্তদন্ত হয়ে আপিস। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে
রুটি-সবজি খেয়ে আবারো বিনি পয়সার ট্যুশন।
যেমন—মিঃ 'গ'
নটায় হাই তুলে ঘুম থেকে উঠে আপিসে পৌঁছতে পৌঁছতে
আধঘণ্টার লেটলতিফ।
তার এমন একটা দপ্তর—প্রাপ্তিযোগ না ঘটলে ফাইলটা
পড়ে থেকে নিরন্তর ঘুমোয়। নচেৎ দৌড়োয়।
আপিস ছুটির ঘণ্টাখানেক আগেই
শ্রমিক সংগঠনের কর্মালয়ে নেতাসুলভ ব্যস্ততা। সরকার বিরোধী
জ্বালাময়ী ভাষণ। মিছিল-মিটিং। শত্রুনিধনের নীল নক্সা তৈরি করে
রাত বারোটায় টলতে টলতে বাড়ি ফেরা
আর আমি?
কিছুই না করে চরমতম স্বার্থপর; শুধু কবিতার জন্য
সৃষ্টিছাড়া যাপনকর্ম।
বলুন তো, আমি কি সত্যি সত্যি রক্তমাংসের দ্বিপদ মানব?

কেতকী কুশারী ডাইসন (ইংলন্ড)

ম্লান গঙ্গা বর্ষাকে চেয়েছিল

ম্লান গঙ্গা বর্ষাকে চেয়েছিলো;
তাই স্নিগ্ধ দুপুরে তার দুই তীরের
হালকা সবুজ, কালচে সবুজ, শুকনো সবুজ
খুঁটিতে বাঁধা গরু, চটকল, ভাঙা জেটি
অনাগতের প্রত্যাশায় হয়ে উঠল স্তব্ধ, রুদ্র, মেদুর
যেন এখানকার গঙ্গা স্মরণ করলো মোহনার গঙ্গাকে
যেন সেখানকার ষ্টিম লঞ্চে জ্বলে উঠলো নির্বাণ দিনের আলো
কনে দেখানো মুহূর্তে।

কিন্তু বৃদ্ধ মসজিদের কোলে
বট্‌ল-পামের উরুতে যখন মেঘের ছায়া পড়লো
আর যে লিলি বর্ষায় ফোটে
তার মন ভিজে উঠলো গন্ধর মাদকতায়
তখন মনে পড়লো
সামনের লাল টালি ছাদের পাশে যত্নলালিত মাঠে
যেখানে একটি কালো ছাগল আর একটি কালো অস্টিন
একই সঙ্গে বর্ষণের প্রতীক্ষা করে,
তার কোণে অনুচ্চ খাঁচায়
একটি করুণ ময়ূর আছে।

ঘোলাজল মৌসুমী আকাশকে চেয়েছিলো
তার তীরে নীল জীব বন্দী হয়ে আছে।

অশোক চক্রবর্তী (কানাডা)

বাদুড়ঝোলা

বাসেতে লাগাও গুঁতো বেজায় ভিড়ে
উঠবেন জলদি উঠুন চ্যাপটা-চিঁড়ে
ভিরমি খাবেন গায়ে গা ঠেকিয়ে
বগলের গন্ধ শুকুন মুখ বেঁকিয়ে

দু-বাসে লড়াই লাগে লাগ ঝমাঝম
বাসেতে চাপড় লাগাও দমদমাদম
হাতটা ছিটকে পড়ে চৌরাস্তায়
তাতে কি, বাস চলেছে জোরসে বেজায়

পায়েতে পা লাগিয়ে ঝগড়া করো
এখানে লুকিয়ে আছে পকেটমারও
মেয়েদের সিটের কাছে কিসের গুজব
ভিড়েতে কেউ নিয়েছে একটু সুযোগ

আরে রে একেই বলে বাদুড়ঝোলা
একবার চাপলে বাসে যায় না ভোলা
ইচ্ছে-অনিচ্ছের আর দাম নেই ভাই
বাসের ওই চাকার তলায় হয় যদি ঠাঁই।

অঞ্জলি ভট্টাচার্য (আমেরিকা)

তাই নেমে যাই

স্ক্রিনের বুকে আমার জন্যে লিখেছ
বারোমেসে কোলাজে অস্থিরতার ঠাসবুনোটে
স্ট্যাচু অব লিবার্টির প্রশ্রয়ে এথনিক আর্টিফ্যাক্টের
সলজ্জ বিভাব,
ফিফথ্ এ্যাভিনু বরাবর অহংকারী পায়ের
শব্দিত কমটিশন,
নায়াগ্রার ধোঁয়া ওড়া জলে ফসিল মনের প্রতিভাস,
আনন্দগর্বী ডিসকভারির সবুজ মাটিতে ফেরা,
অগাস্টের খোলা চুলে শেষ গ্রীষ্মের
ধূসর ধুলোর ছিটেফোঁটা,
লাইন টানা পাতা জুড়ে না-লেখা কবিতার
উপচে পড়া উসখুস,
ব্রেকফাস্ট টেবিলে দুটি চেয়ারের বারবার
ঘড়ি গোনা।।

তোমার জন্যে এঁকেছিলাম কেজো সময়ের বুড়ি ছুঁয়ে
শুধু আমাদের প্রথম দেখার মুহূর্তটি
একটি বিন্দুতে স্থির।
তার একটু আদলও ফুটে ওঠেনি আজ।
স্ক্যান ডিস্ক বারবার এরর মেসেজ জানাচ্ছে,
কমপিউটার খুলছি আর বন্ধ করছি
ভুল তবু রয়ে যায়।
শোধরাবার প্রোগ্রাম আমার হার্ড ডিস্কে নেই।

তোমার আঙুলে আর আঙুল ছোঁয়াতে পারি না
তোমার চোখে দুচোখ বুলিয়ে নিতে পারি না
রৌদ্র ছায়ার কানাকানিতে কান পাতি না।
তাই থাকতে চাই অন্ধকারের অসহ শৈত্যে
তাই নেমে যাই দুঃখ স্যাঁৎসেঁতে
এবড়োখেবড়ো চাতালে।

নির্মল ব্রহ্মচারী (নরওয়ে)

রাজগুরু

যতই বানাক তোমাকে বয়োজ্যেষ্ঠ পরম রাজগুরু
যতই কর না জপতপ, হাতে নিয়ে রুদ্রাক্ষের মালা
যতই সাজাক তোমাকে লাল গোলাপ ও জবায়,
আসলে ছিলে ভণ্ড সাধু, আজও তেমনি আছ

পুরোহিত সেজে করেছ রাজমন্দিরে পুজো
নরবলি দিয়েছ তুমি বলির ছাগ বলি দিতে
তারই মন্ত্র কানে পেয়েছে সব ভক্ত শিষ্যকুল
গুরু! গুরু! পরম গুরু! আওড়ায় আহ্লাদে স্ফূর্তিতে

রাজ পুরোহিত হয়ে নাকি চাইতে হয়েছে রক্ত
দোষ, পাপ কর নাই, পুণ্য করেছ সারা জীবন
তাই 'শ্রেষ্ঠ বঙ্গ রাজগুরু', বলে শিষ্যরা ধন্য
আধুনিক কাপালিককে সাধু করেছে রাজভক্তকুল

রাজ পুরোহিতের যতই 'সম্মান' আজ পাও
বৃদ্ধ বয়সে শোন, তুমিই নিষ্ঠুর নরবলির হোতা
ছাগবলি দিয়ে অন্ন প্রসাদ দেবার কথা যাদের
তাদেরই প্রাণ তুমি কূট কৌশলে নিয়েছ কেড়ে।

নিরীহ মানুষ পাঁঠার মতো প্রাণ দিয়েছে তোমার হাঁড়িকাঠে
তুমি তার দিয়েছ ভেট ধনীদের রাজ সিংহাসনে,
আসলে মানুষের সঙ্গে করেছ চরম বিশ্বাসঘাতকতা
বঙ্গে নিকৃষ্ট মীরজাফর তুমি, জেনে যাও অন্তিমকালে।

রঞ্জিত চৌধুরী (সুইডেন)

তুমি চিনতেই পারো

তুমি চাইতেই পারো
ক্ষয়িষ্ণুদানের ক্ষমতাকে অবজ্ঞা করে
তুমি চাইতেই পারো।

কারণ তুমি জানো না
অনেক সময় চাওয়ার তীব্রতা পেরিয়ে
অদানের অক্ষমতা, দেবতার প্রশ্রয়ে
অনেক অনেক ঊর্দ্ধে উঠে যায়।

তুমি চাইতেই পারো
তুমি ভেবেও দেখো না
সব চাওয়ার মধ্যে নিষ্পাপ বৈধতা অনুপস্থিত
যে ভাবে বেড়ে ওঠে দৈন্যতার চাওয়া
তাকে অদানের আচ্ছাদনেই শুধু ক্ষমা করা যায়।

তুমি চাইতেই পারো
যেমন করে অন্ধকারবর্তী হওয়া যায় সহজেই
সিঁড়িভাঙার শব্দাবলি না জেনেই,
আর চাওয়ার সীমানার মধ্যিখানে এসে দাঁড়াবে
আলোয় ফেরার নিঃশব্দ বৈধতা।

ডঃ নিত্যগোপাল পোদ্দার (সুইজারল্যান্ড)

দমন

লোকটা খুব মাথা উঁচু করে তাড়াতাড়ি চলছে
ওর মাথায় একটি ভারী পাথর চাপিয়ে দাও।
লোকটা ন্যায়-অন্যায় নিয়ে খুবই চিৎকার করছে
ওর মুখে একটি বেশ পুরু টেপ লাগিয়ে দাও।
লোকটা অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে রাতদিন মাথা ঘামাচ্ছে
ওকে উল্টোডাঙার খালে ডুবিয়ে পেট ভরে জল খাওয়াও।

এরপর দেখবে, সে শুধু হাতের ঘড়ির দিকে চাইছে
একেবারে সাদামাটা মাথা নিচু করে ধীরপায়ে হাঁটছে।

বাংলাদেশের
কবিতা
ও
গল্প

আল মাহমুদ

জলের ছোঁয়া

মেঘের ওপর মেঘ করেছে
রং লেগেছে মেঘে,
মেঘের ভেতর স্বপ্ন আমার
আমিই আছি জেগে।

মেঘ নিয়ে সব খেলছে খেলা
বৃষ্টি ঝরার মাস,
জলের ছোঁয়া পেয়েই বুঝি
সবুজ হল ঘাস।

ইচ্ছে হল শয্যা বিছাই
গড়িয়ে পড়ি ঘাসে,
এমন দিন কি আসবে আবার
এমন বোশেখ মাসে।

নির্মলেন্দু গুণ

আকাশ সিরিজ

শুধু একবার তোমাকে ছোঁব,
ওই আনন্দে কেটে যাবে সহস্র জীবন।

শুধু একবার তোমাকে ছোঁব,
অহংকারে মুছে যাবে সকল দীনতা।

শুধু একবার তোমাকে ছোঁব,
স্পর্শসুখে লেখা হবে অজস্র কবিতা।

শুধু একবার তোমাকে ছোঁব,
শুধু একবার পেতে চাই অমৃত আস্বাদ।

শুধু একবার তোমাকে ছোঁব,
অমরত্ব বন্দী হবে হাতের মুঠোয়।

শুধু একবার তোমাকে ছোঁব,
তারপর হবো ইতিহাস।

আসাদ চৌধুরী

উৎস

নারী জানে,
কেবল রমণী জানে
কোন কোন কবিতায়
শুয়ে আছে তার আকুলতা
আর উত্তপ্ত নিঃশ্বাস।
মিলন-বিরহ-গীতি
প্রণয়-পিরিতি

হাফিজের বাঁশি জানে,
হেথা নয়, হেথা নয়
অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।
ধেয়ে চলে সকল ভালোবাসা
ও প্রভু, তোমার টানে,
তোমার পানে
তোমার গানে।

সালেম সুলেরী

নগদে ডাক এলে

সকালে ফোন দিও বিকেলে মন দেবো—
দুপুরে ভাবনার কিছুটা অবকাশে
এড়িয়ে ভাত ঘুম বাজাবো মন-বাঁশি,
সাজাবো মন-পাখি যেনো সে ডেকে ওঠে
প্রেমের পদাবলী, নগদে ডাক এলে—

প্রভাত শিশুদের সকাল কিশোরের
দুপুর তরুণের বিকেল যুবকের,
গোধূলি যুবতীর বনানী সুগভীর
সেখানে মোলাকাত সবুজ সংলাপে,
ঘাসের শ্বাস ভরা উজাড় বন দেবো—
সকালে ফোন হলে বিকেলে মন দেবো।

সূর্য শুতে গেলে বিরহে আলো কাঁদে,
আমারো শোয়া মানে স্মৃতিকে গুলে ফেলা,
প্রবীণ চশমাতে ঝাপসা ভালোবাসা...
বরং জেগে ওঠো ভোরের কাঁচা মন

প্রেমের নবায়ন হোক না প্রতিদিন
হোক তা জনে জনে অথবা একজনই,
এ বেলা বুক করো এ বেলা বুঝে নাও
প্রেমের খাঁচা-পাখি সালিশে খুঁজে নাও—
নিজেকে নিবেদন, নিজেকে পণ দেবো
সকালে ফোন দিও, বিকেলে মন দেবো...

মনের পুঁজিগুলো সহজে লোন দেবো—
সকালে ফোন দিও বিকেলে মন দেবো।

মুহাম্মদ সামাদ

হুমায়ুন আজাদ মঞ্চের মোমগুলো

কুয়াশার ধূসর চাদরে মোড়া করুণ সন্ধ্যায়
কাঁচা-কাঁচা মেয়েগুলো
কাঁচা-কাঁচা ছেলেগুলো
রক্তের কিনার ঘিরে জ্বালায় মোমের আলো

অতঃপর
ছেলেগুলো দেয় স্লোগান—আজাদ স্যারের রক্ত...
মেয়েগুলোর কণ্ঠে জ্বলে ওঠে—রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি...

ছেলেগুলো দেয় স্লোগান—আমাদের সংগ্রাম চলবেই
মেয়েগুলো গায় গান—ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো...

ছেলেদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো...
মেয়েগুলো গায় গান—এ আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে...
ছেলেগুলো দেয় স্লোগান—পরাভব মানব না
মেয়েগুলো গায় গান—আগুনের পরশমণি...

হঠাৎ, কোত্থেকে ছুটে আসে কনভয়-ত্রাস!
অন্ধ অমানিশার আর্ত চিৎকারে
সুকান্তের দেশলাইকাঠির মতো হুমায়ুন আজাদ মঞ্চের মোমগুলো
মুহূর্তে আলোর বর্শা হাতে বলে ওঠে—আর এক পা এগোলে...

কাঁচা-কাঁচা মেয়েগুলো ছেলেগুলো সমকণ্ঠে জ্বলে ওঠে—
এ আলো ছড়িয়ে দেব সবখানে...আমরা করব জয়...

হাবিবুল্লাহ সিরাজী

দস্যু

আঙুলের ফাঁকে নক্ষত্রের মতো জ্বলছে বৃটিশ-আমেরিকান ট্যোবাকো
যেনো ঘামে ভেজা মাটিতে ধোঁয়া উঠছে—
অগ্নিদস্যু!
কম্পিত মুঠোয় নেচে ওঠে স্কটল্যান্ডের শাদা ঘোড়া
যেন ওলান থেকে টানা দুধ ছিটকে—ছলকে পড়ে—
জলদস্যু!

হাসপাতালের পিচ্ছিল পাথরে চমকে যায় অ্যাসিডদগ্ধ মেয়েটির মুখ
কবর খোঁড়ার শাবল ফেলে পাঁজরে পোঁতা হচ্ছে পেরেক;
মার্সিডিজের পাশে দাঁড়ানো ও কে?
ঢোলা আস্তিনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে ঠাণ্ডা নল।
পঁচাত্তরেই কাঁটা-ছেঁড়া শেষ,
এখনতো জংধরা টিনে কেবল লেফ্‌ট রাইট—
দস্যু!

শিপ্রামণি রায়

অবশেষে বৃষ্টি

বাতাসে ঝড়ের ইশারা
 কিন্তু ঝড় আসেনি
অবশেষে এসেছিল বৃষ্টি
 মৌন আকাশ
চুপচাপ বসে থাকা
 নির্জনে স্মৃতির জাবরকাটা
হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকানি
 কল্পনার রাজপ্রাসাদে ফাটল ধরে
পাশে কেউ ছিল
 . যে এখন নেই
আছে বৃষ্টি
আর আছে রিমঝিম শব্দতরঙ্গ
 নেই শুধু নূপুরের নিক্বনধ্বনি
হাস্যে কল্লোলিত তরঙ্গিনী
 সেই কবে ভাটা পড়েছে
রয়ে গেছে একটি রেখা
সেই রেখাতে ফাটল ধরে
 রক্ত ঝরে
আবার বিদ্যুতের ঝলকানি
 ভেঙে যায় নির্জনতা
সজল দুটি চোখ মেলে দেখি
 নেই সেই কল্পনার রাজপ্রাসাদ
আছে শুধু বৃষ্টি উচ্ছলতা
 আর সারা উঠানে ছোট ছোট নদীর রেখা
যে নদীতে বয়ে যায় রক্তক্ষয়ী স্রোতোধারা
 সে নদীতে ভেসে গেছে চোখের দৃষ্টি
অন্ধ দুটি চোখে অবশেষে নেমে এলো বৃষ্টি...

তারিক সুজাত

ভাষার জন্য ভালোবাসা

তখনও ভালোবাসা দিবসের কথা
আমরা শুনিনি
জ্বলন্ত ফাল্গুনে শহরের পথে পথে
মিছিলের সাথে হাঁটছে সকাল
চির চেনা রোদ, গাছের শাখায়
আগুন রঙের ফুল, উদ্বেল আকাশ,
সেদিনও যে যার কাজেই ব্যস্ত ছিলো নাগরিকজন;
রমনার ঘাসগুলো নিবিড় উষ্ণতায় মাখা
প্রিয় পাখিগুলো ডাক দিচ্ছে চির চেনা স্বরে
ভাষা ও ভালোবাসার দাবিতে গুলিবিদ্ধ হওয়ার কথা
স্বপ্নেও ভাবেনি কেউ, তবু হায়েনার থাবা আর
বারুদের ঘ্রাণে
ভারী হলো ঢাকার বাতাস
অজস্র কণ্ঠের বুদবুদে
অমল অক্ষরে লেখা হলো
'একটি জাতির জন্ম'
ভাষার জন্য ভালোবাসার অমেয় আখ্যান
২১শে ফেব্রুয়ারি...

অচেনা

সেলিনা হোসেন

প্রতিদিন শহরটা অচেনা হয়ে যাচ্ছে।

নার্গিস জাহান এমনই ভাবছেন। দুজন কাজের লোক নিয়ে তিনি একা বাস করেন। বছর দশেক আগে স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকে দু-ছেলেমেয়েকে বড়ো করা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে কীভাবে সময় কেটেছে টের পাননি। তখন সময় নিজের ছিল না, ছিল ছেলে-মেয়েদের। এখন সময়টা তার খুবই নিজের। ছেলে-মেয়েরা বড়ো হয়ে নিজ নিজ সংসারে ঢুকেছে। নিজেদের মতো করে জীবন সাজিয়েছে। সেখানে তার প্রবেশ নেই। সেটা তার জন্য নিষিদ্ধ পৃথিবী।

এই মুহূর্তে অচেনা শহরের একটি ফুটপাতে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি জানেন ছেলে-মেয়েদের কোনো একটি আচরণে শহরের সঙ্গে একটি সম্পর্ক তৈরি হয়। সম্পর্কের সূত্র ধরে শহরের চরিত্র বদলায়। নার্গিস জাহানের মনে হয় এভাবেই সময়ের ধূসর হয়ে ওঠা। আর রঙটা তার ভেতরে ক্রমাগত ছড়াতে থাকে।

চারদিকে ভীষণ দুপুর। তাঁর মনে হয় ক্লান্ত দুপুর, যেন ঝিমিয়ে আছে। ভাবলেন, দুপুর কি ক্লান্ত? আসলে তার বুকের ভেতরে যে দুপুরের অনুভব, সে অনুভব ক্লান্ত। ক্লান্ত দুপুরই দীর্ঘশ্বাস ফেলার উপযুক্ত সময়, আমি দুপুর চাই, তিনি ভাবনার সঙ্গে চারদিকে তাকান। শুন্য জায়গাগুলো যেন কুঁকড়ে আছে। আসলে তিনি দীর্ঘশ্বাস উপভোগ করেন, দারুন লাগে। তারকাছে দীর্ঘশ্বাস বর্ষার মেঘ ছুঁয়ে আসা স্নিগ্ধ বাতাসের মতো। বুকের ভেতর থেকে উঠে আসার সময় ভেজা মেঘের স্পর্শ নিয়ে আসে। তিনি আবারও ভবলেন, দুপুরও ক্লান্ত হয় এবং তার মতো নিঃসঙ্গ, একাকী থাকে। কখনো-কখনো তিনিই দুপুর।

এই মুহূর্তে এমন বোধে তিনি আক্রান্ত। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে মনে হয় অচেনা শহরটাকে গোলাকার লাগছে। কোনো একজন ফুটবল খেলোয়াড়ের পায়ে শহরটা গড়ানোর জন্য তৈরি। তার স্বামীর প্রিয় খেলা ছিল ফুটবল। খেলতেন না, কিন্তু দেখতে ভালোবাসতেন। আবার একটি ভাবনার সঙ্গে সম্পর্কের সূত্র গাঁথছেন। এমনই হয়।

এ রাস্তায় রিকশা চলে না। বাসের রাস্তা তিনি চেনেন না। তিনি একটি অটোরিকশা বা ট্যাক্সি-ক্যাব ধরবেন। পাচ্ছেন না। দু-একটা দাঁড় করিয়েছেন। ভাড়া বেশি চাইছে বলে ছেড়ে দিয়েছেন। রোদ চড়চড়িয়ে বাড়ছে। গরমে শরীর পুড়ছে। ব্লাউজ ভিজে গেছে। কপালে-গালের ঘামের বিন্দু মুছে কুলাতে পারছেন না।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে মেয়ে শম্পা তাকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে বলেছে, তুমি একটা কিছু ধরে বাড়ি যাও। আমি আগোরা শপে যাব। বাজার করতে হবে। তোমাকে পৌঁছতে পারব না।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ধারে নেমে পড়লেন। শম্পার নতুন বড়ো গড়িটি সাঁই করে বেরিয়ে যায়। না, ধুলো ওড়েনি। ধুলো তার মুখের ওপর ছড়ায়নি। তারপরও ব্যাগ থেকে টিস্যু পেপার বের করে মুখ মুছলেন। একটি কালো-ক্যাবে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার কানে বাজতে থাকে শম্পার কণ্ঠ। শম্পা আরও বলেছে, এত ঘিঞ্জি এলাকায় থাকো যে গাড়ি ঢোকে না। বলি যে পাঁচতলা বাড়িটা বিক্রি করে বারিধারায় একটা ফ্ল্যাট কেনো, তা-ও করবে না। তোমাকে নিয়ে চলা মুশকিল মা। কীভাবে যে বাবা তোমার সঙ্গে সংসার করেছে, বুঝি না।

তিনি বলতে চেয়েছিলেন, আমার সংসার তোমার বোঝার কথা নয়, মা। তুমি তা বুঝতে চাইতেও পারো না।

কিন্তু বলা হয়না। কাকে বলবেন? বলেই বা কী হবে? কথাগুলো তার বুকের ভেতরে নিঃসঙ্গ দুপুর, মলিন রোদ, বাতাস হা-হা ফেরে। ছুটে-চলা ক্যাবের জানালা দিয়ে তাকালে মনেহয় পরিচিত শহরটার কোনো স্থাপনাই চিনতে পারছেন না। মানুষগুলোকে একদম অন্যরকম লাগছে, যেন অন্যগ্রহের। পরে অনুভব করলেন, তার চোখে ভরা জল। বুকের ভেতর থেকে কান্নার ধ্বনি বের হচ্ছে। তিনি নিজেকে কাঁদতে দেন। কাঁদতে ভালোলাগছে তার। ড্রাইভার মুখ ঘুরিয়ে ডাকে, আন্টি।

বলো।

আপনার কী হয়েছে?

আমার বাড়ির ঠিকানা তোমার মনে আছে তো?

হ্যাঁ আছে, আপনি যেখানে যাবেন সে এলাকাতো আমি চিনি। অনেব গিয়েছি। রাস্তাও চিনি। ওখানে গেলে বাড়িও চিনে নেব।

তুমি কিন্তু আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ো। পথে কোথাও নামিয়ে দিয়ো না।

ছিঃ ছিঃ পথেনামাব আপনাকে? আমি তেমন ড্রাইভার না। ভাড়াও বেশি চাই না। মিটারে যা ওঠে তাই নিই।

ওর কণ্ঠস্বর অচেনা মনে হয় নার্গিস জাহানেব। আবার অচেনা হয়ে ওঠার কষ্ট। ছেলে-মেয়েরা ছোটো থাকতে শহরটা যেমন ছিল তেমন আর নেই। ছেলে-মেয়েরা বড় হতে হতে যেমন অচেনা হয়ে যায়, শহরটাও সেভাবে বদলাল। সুত্রটা কোথায়? নার্গিস জাহান নিঃশ্বাস ফেলে নিজেকে বললেন, সম্পর্কের!

ড্রাইভারের ঘাড়ে হাত দিয়ে ওকে ডাকেন, ড্রাইভার।

জি আন্টি।

আমরা কী এসে গেছি?

হ্যাঁ, আপনার বাড়ির গলিতে ঢুকেছি।

এটা কী খুব ঘিঞ্জি গলি?

না, তেমন না। তবে বড়ো গাড়ির জন্য ঘিঞ্জি। বড়ো লোকেরা তো এসব গলিতে থাকবে না। আপনার আমার কী? আমাদের ছোটো গড়ির জন্য অসুবিধা নেই।

ও আচ্ছা। তুমি ঠিকঠাক এসেছ তো?

আপনি যে ঠিকানা দিয়েছেন সেটা ঠিক থাকলে তো ঠিকই এসেছি। আন্টি তাকিয়ে দেখেন যে আমি ঠিক এসেছি কি না।

বুঝতে পারছি না।

ড্রাইভার বিড়বিড় করে বলে, আপনার মাথা ঠিক নাই। তিনি তখন ভাবছেন, শম্পা বড়ি-গাড়ি করে দূরে সরে গেছে। ও এমন জায়গায় না গেলে বাবার বানানো বাড়িটার লোভে এই গলিতেই থাকত। ওর অন্যখানে যাবার জায়গা হয়েছে বলে সম্পর্কটা অন্যরকম তৈরি হয়েছে।

আন্টি নামুন এসে গেছি।

নার্গিস জাহান ভাড়া মেটালেন। বাড়িতে ঢোকার সময়ও তার মনে হল যে তিনি একটি অচেনা বাড়িতে এসেছেন।

খালাম্মাগো—বলে চিৎকার করে উঠল ময়নার মা।

মুহূর্ত সময় মাত্র, দরজাটা খোলাই ছিল, ময়নার মা হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসেছিল। নার্গিস জাহান একটু দূর থেকে ওকে দেখেন। বাড়িটায় তার এতদিনের অভ্যস্ত জীবনযাপনের চিত্রটা ওলোটপালোট হয়ে আছে। এটাও তার অচেনা দৃশ। তিনি মৃদু হাসেন। এগিয়ে গিয়ে বলেন, কী হয়েছে ময়নার মা?

মালেক পলাইছে!

পালিয়েছে? নার্গিস জাহান সময় হিসেব করলেন, তেরো বছর ধরে তিনি ওকে পেলেছেন, বড়ো করেছেন। সবাই যায়, ও-তো যাবেই, কিন্তু এভাবে কেন?

খালাম্মা ও আপনের টেহাপয়সা সব লইয়া পলাইছে। আপনে আজকে আলমারির তালা দিতে ভুইলা গেছেন।

তিনি বিড়বিড় করলেন, ভুলতো হতেই পারে। তাই বলে এভাবে বাড়িটাকে অচেনা করে দিতে হবে কেন?

খালাম্মা দেখেন আপনের কী কী গেছে?

গেছেইতো। তেরো বছর ধরে যাকে দেখাশোনা করলাম—। ধুর, এটা

কোনো কথা হল। সম্পর্কতো ছিঁড়বেই। নিজেকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন।

খালাম্মা, ভাইয়ারে খবর দেন। আসুক। পুলিশে খবর দেক।

ভাইয়া!

নার্গিস জাহান হাসলেন। তার ছেলে সজীব। সম্পর্কের আর একটি সূত্র। সে-ও তো তার শহরকে অচেনা করে দিয়েছে। এই সূত্রও ছিঁড়ছে। খালাম্মা আপনের কী হয়েছে?

নার্গিস জাহান ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন। মুখে কিছু বলেন না। কী বলবেন? ময়নার মা কি ছুঁতে পারবে তার চিন্তার জায়গা? উলটে বলবে, আপনি কী পাগল হয়ে গেলেন খালাম্মা। নার্গিস জাহান কয়েক পা হেঁটে নিজের শোবার ঘরে ঢোকেন। আলমারির কাপড়-চোপড় সব মেঝেতে ছড়ানো। বিছানা এলোমেলো, বলিশ, চাদর, তোষক উলটে-পালটে আছে। ভাবলেন, বেশতো লাগছে দেখতে। অন্যরকম। প্রতিদিনের একঘেঁয়ে দৃশ্য নয়। তিনি বাথরুমে ঢুকলেন। চোখে-মুখে জল ছিটালেন। কেমন জানি লাগছে, মনে হচ্ছে শরীর ক্রমাগত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, গরম থেকে ঠাণ্ডায় গেলে শরীর কেমন জুড়িয়ে যায় তেমন অনুভব নয়। শীতল শরীর শীতলতর হয়ে যাচ্ছে। তিনি চিৎকার করে ডাকেন, ময়নার মা?

ছুটে আসে ময়নার মা। কী হইছে খালাম্মা?

মালেক যাবার সময় কী বলেছে?

আমারেতো কিছু কয় নাই। গরম চোখ দেখায়ে গেছে। আমি কইলাম, কী রে মালেক কী হইছে? ও ঘুঁষি দেহাইল। আমি ওর গরম চোখ দেইখা আর কথা কই নাই।

ও। নিস্তেজ শোনায় নার্গিস জাহানের কণ্ঠ।

আপনে কী কথা শুনতে চাইছিলেন খালাম্মা?

জানতে চেয়েছিলাম আমার কাছে থাকতে ওর কোনো খারাপ লেগেছিল? ও পালাল কেন?

হা-হা করে হাসে ময়নার মা বাঁধভাঙা হাসি। পুরো বাড়িতে ছড়িয়ে যায় হাসি। নার্গিস জাহান বিস্ফারিত চোখে মধ্যবয়সি এই নারীকে দেখেন। মৃদুকণ্ঠে বলেন, তুমি হাসছ কেন ময়নার মা?

অ-তো নিজের আখের গোছাইছে। অহন নিজের সংসার করব।

আবার সেই হাসি। নার্গিস জাহান বারান্দায় রাখা আরাম চেয়ারে বসেন। দেখতে পান যে দুপুর মাথায় করে বাড়ি ফিরেছিলেন সেই দুপুর আর নেই। নিস্তেজ হয়ে এসেছে রোদ। বারন্দায় নীচের শিউলিগাছের পাতার ফাঁকে রোদ

আলতো ছায়া ফেলেছে। তিনি তখন ভাবলেন, ছেলেকে ফোন দিয়ে কী দেখবেন ও কী বলে? বাড়িতে এমন একটা ঘটনা ঘটল, ওর কাছে কী এর কোনো মূল্য আছে? তিনি নিঃশ্বাস ফেলে ধরে নিলেন, এর কোনো মূল্য ওর কাছে নেই। কারণ তিনি ওর জীবনসঙ্গী বেছে নেয়ার সময় মেয়েটিকে অপছন্দ করেছিলেন। ছেলেটি তার পছন্দ-অপছন্দ তোয়াক্কা না করে নিজের বন্ধুদের নিয়ে কাজী অফিসে বিয়ে করে ভিন্ন বাসায় চলে যায়। পরে অবশ্য বিষয়টি মিটমাট হয়ে যায়। ওরা তার সঙ্গে সহজ সম্পর্ক রাখে। সে সম্পর্কে আন্তরিক উষ্ণতা নেই, আছে লোকদেখানো সামাজিকতা। যেদিন ওদের বিয়ে তিনি মেনে নিয়েছিলন, সেদিন নিজের বেশ কয়েকটা গয়না মেয়েটিকে দিলেও হাতে নেয়নি। বলেছিল, আমিতো সোনার গয়না পরি না। আপনার কাছে থাক।

তিনি কথা বলতে পারেননি। নিঃশব্দে তুলে রেখেছিলেন আলমারিতে। বিষয়টি আর কখনও আলোচনা প্রসঙ্গেও ওঠেনি। এখন ছেলেটি বড়ো চাকরি করে, মেয়েটিও। দুটো ছেলেমেয়ে আছে। বছরে একবার দেশের বাইরে বেড়াতে যায়। দুজনে দুটো অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছে। গাড়িও আছে দুজনের দুটো। কিন্তু মেয়েটি এখনও সোনার গয়না পরে না। বলে, বিয়ের সময় সজীব আমাকে একটি আংটিও দিতে পারেনি। নতুন কাপড়ও না। ওটাকেই আমি আমার বিয়ের সত্য বলে ধরে রাখতে চাই। তাহলে সম্পর্ক সহজ থাকে। অহেতুক সোনাদানার দাড়িপাল্লার সম্পর্ককে উঠিয়ে ক্ষতি ছাড়া লাভ নেই।

নার্গিস জাহান দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলেন, ওরা ভালো আছে। ওদের কারো বিরুদ্ধে কারোর অভিযোগ নেই।

খালাম্মা ভাত খাইবেন না?

খাব। খিদে পেয়েছে।

আজ বেশি কিছু রাঁধতে পারি নাই। আমার মন খারাপ ছিল। কেবল কান্নাকাটি করছি।

ঠিক আছে, যা রেঁধেছ তাই দাও।

ময়নার মা হাসিমুখে চলে যায়। তখন তার মুঠোফোন বেজে ওঠে। নাম্বার দেখে বুঝলেন শম্পা ফোন করেছে।

মা ঠিকমতো বড়ি ফিরেছ?

হ্যাঁ, ফিরেছি তো।

ভাত খেয়েছে?

খাব এখন।

এতক্ষণ খাওনি কেন?

খাবার কথা মনে ছিল না।

তুমি যে কেমন একটা মানুষ, বুঝি না। যাও ভাত খাও। শম্পার কণ্ঠে ধমক তিনি ফোন বন্ধ করেন। বলেন, আমার বিচারটা তুমি আর নাইবা করলে মা।

শম্পা আবার ফোন করে।

ফোনটা কেটে দিলে যে মা?

কথাতো শেষ হয়েছে। তুমি আমাকে ভাত খেতে যাবার হুমুক দিয়েছ।

তাই বলে আমাকে কিছু না বলে লাইন কেটে দেবে?

চুপ করে থাকেন নার্গিস জাহান। নিজেকে ভীষণ অসহায় লাগে। ছেলে-মেয়ের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে যাওয়ায় অসহায় বোধ কাজ করে।

কথা বলছ না যে?

কী বলব মা?

ফেরার সময় তুমি সময়মতো ট্যাক্সি পেয়েছিলে?

অনেকক্ষণ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল।

তুমি নিশ্চয় ভাড়া নিয়ে দরাদরি করছিলে?

করেছি। হুট করে বেশি ভাড়ার গাড়িতে চড়ার সাধ্য কী আমার আছে?

এখন বলবে তোমার ছেলে-মেয়েরা তোমাকে দেখে না। এই তো?

আমি কি তাই বলেছি?

বলো না। কিন্তু তোমার একটা বড়ো অস্ত্র আছে।

অস্ত্র? কী সেটা?

তোমার দীর্ঘশ্বাস।

লাইন কেটে দেয় শম্পা। এটাও শম্পার নতুন অভিযোগ নয়। ও এ কথাটা প্রায়ই বলে। নার্গিস জাহান আপন মনে হেসে বলেন, দীর্ঘশ্বাস আমি উপভোগও করি। তোমরা জানবে না বদলে-যাওয়া এই শহরে কেমন আমার বেঁচে থাকা। কী অদ্ভুত দিনযাপন, প্রতি মুহূর্তে নিজের ভেতর নিজেকে অচেনা দেখা।

খালাম্মা, পুলিশে খবর দিবেন না? পোলাডা এত টেহাপয়সা-সোনাদানা লইয়া পার পাইয়া যাইব?

নার্গিস জাহান এক লোকমা ভাত মুখে ঢোকান, মাছের কাঁটা বাছেন। সেদ্ধ ঢেঁড়স নেড়েচেড়ে আবার প্লেটের একপাশে রেখে দেন।

খালাম্মা, আপনে কিছু কইরবেন না?

না, ময়নার মা।

না! ময়নার মায়ের আর্ত-চিৎকারে চমকে তাকান নার্গিস জাহান।

তাইলে আপনে আমারে এক লাখ টেকা দেবেন।

কেন?

আমিও তো আপনের লাইগা জানপরান দিয়া খাটাখাটনি করি। করি না? নার্গিস জাহান এর দিকে তাকিয়ে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়েন।

তাইলে দিবেন না ক্যান?

কণ্ঠে কর্তৃত্বের সুর। চোখ বড়ো হয়ে যায় ময়নার মায়ের। নার্গিস জাহান হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকেন। আবার সেই একই বৃত্তে প্রবেশ।

পুরোপুরি অচেনা হয়ে গেছে মানুষটা। আবার সম্পর্কের জটিলতায় নিজেকে ঢোকানো—

ময়নার মা দু-পা এগিয়ে এসে বলে, দিবেন কিনা কন?

দেব।

কহন দিবেন?

এখনই।

দ্যান।

তুমি আলমারি ঘেঁটে দেখো। দেখো কোথায় কী আছে। আমারতো সবকিছু মনে থাকে না।

হ, ঠিকই কইছেন। যাই।

নার্গিস জাহান উঠতে পারেন না। গালে হাত দিয়ে বসে থাকেন। শোবার ঘর থেকে ভেসে আসছে ধুপধাপ শব্দ। বোঝাই যায় যে এটা টানছে, ওটা ফেলছে। শব্দের অর্থ ফুরিয়ে যায় তার কাছে, প্রবল হয়ে সম্পর্কের কাছে আত্মসমর্পণ। বেঁচে থাকার জন্য যে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয় তার সঙ্গে বাঁধা পড়ে— । নার্গিস জাহান আর ভাবতে পারেন না। ঘরের ভেতর থেকে আর শব্দ আসে না। মনে হয় ময়নার মায়ের উত্তেজনা কমেছে। হয়তো স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। তিনি খুব বিপন্ন বোধ করেন। ময়নার মা-ও যদি চলে যায় তবে কী হবে? তিনি বুঝতে পারেন দুজন ভিন্ন মানুষের ওপর তার নির্ভরশীলতা কত প্রবল ছিল। ময়নার মা চলে গেলে এই অচেনা শহরে বাড়িটা তার কাছে মৃত্যুপুরী হয়ে যাবে। একজন জীবন্ত মানুষ হয়ে তিনি মৃত্যুপুরীতে কীভাবে থাকবেন? আকস্মিকভাবে নার্গিস জাহানের চোখে জল আসে। তার ভীষণ কান্না পায়।

তখন ডাইনিং স্পেসে ফিরে আসে ময়নার মা।

খালাম্মা, আমারে মাফ কইরা দেন। আমি ভুল করছি। আমি আর কহন আপনের কাছে কিছু চামু না। আপনে যহন আমারে কইলেন তুমি আলমারি ঘাঁইটা দেহো, তখন আমি গেলাম ঠিকই কিন্তু কাছে গিয়া আমার বুক তোলপাড় কইরা উঠল। মনে হইল, আপনে আমারে বিপদের সমুয় ফালাইবেন না। আমারে দেখবেন। তখন মনে হইল আমি একডা মানুষ না। আমি আপনেরে ছাইড়া যামু না খালাম্মা।

নার্গিস জাহান দু-হাতে চোখের জল মোছেন। ময়নার মা তার পায়ের কাছে বসে বলে, আপনে আমারে মাফ করছেন খালাআম্মা?

তিনি শুধু ঘাড় কাত করেন। মুখে কিছু বলেন না। বলতে চান, সম্পর্ক এমনই। মানুষ মানুষের ওপর অধিকার ফলায়। যারা অধিকার আদায় করতে শেখে না তারা ডাকাতি করে। অন্যায়ভাবে কাড়ে। ময়নার মা অধিকার সম্পর্ক দাঁড় করিয়েছে। তিনি ময়নার মায়ের মাথায় হাত রেখে বলেন, তুমি আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছ ময়নার মা।

আপনেরে চা দিমু?

দাও।

তখন মুঠোফোন বেজে ওঠে। অপরপাশে তার ছেলে।

হ্যাঁ, বাবা কেমন আছ? কাল বাংকক যাচ্ছ? আচ্ছা ঠিক আছে। ভালোয় ভালোয় ফিরে এসো। আমি ভালো আছি। ময়নার মা, মালেকও ভালো আছে। ওরাইতো আমার ভরসা। আচ্ছা বাবা, ভালো থাকো।

কথা শেষ হয়ে যায়। ময়নার মা ছুটে আসে। ভাইয়ারে মালেকের কথা কিছু কইলেন না?

তিনি চুপ করে থাকেন। বললেন, ছেলেটি হা-হা করে হেসে বলবে, তোমার শাস্তিটা ঠিকই হয়েছে মা। মানুষকে তো তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতেই হয়। কী আর করবে, ছেড়ে দাও। এখন তো আর তোমার সোনাদানা পরার বয়স নেই।

খালাম্মা।

তিনি পরিপূর্ণ অচেনা দৃষ্টিতে ময়নার মায়ের দিকে তাকান। বুঝতে পারেন ময়নার মা-ও তাকে বুঝতে পারছে না।

ভাইয়ারে আপনে কইতে না পারলে ফোনডা আমারে ধরাইয়া দ্যান আমি কই। দিবেন খালাম্মা?

নাও। তিনি ফোনে সংযোগ দিয়ে ওকে ফোনটা দেন।

ভাইয়া, আমি ময়নার মা। খালাম্মাতো আপনেরে কয় নাই। মালেক খালাম্মার টেহাপয়সা, সোহাদানা লইয়া—

পালিয়ে গেছে?

হ, পলাইছে।

সঞ্জীবের হা-হা হাসিতে তোলপাড় হতে থাকে নার্গিস জাহানের বুকের ভেতর। ময়নার মা ফোনটা কানে লগিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। তাকে কেমন হতবিহ্বল দেখাচ্ছে।

হাসি কমলে মৃদুস্বরে বলে, হাসলেন ক্যান ভাইয়া?

আমার মাকে তো আমি চিনি। মা কেন কিছু গুছিয়ে রাখতে জানে না।

আপনে থানায় যান ভাইয়া।

আমার অত সময় নাই। তোমার এত মাতব্বরি কিসের? কেন ফোন করেছ আমাকে? সাহস তোমার কম না। আমি জানি আমার মা কাজের লোকদের লাই দিয়ে মাথায় তোলে।

কেটে দেয় ফোন। ময়নার মা ডুকরে কেঁদে ওঠে। ফোনটা নার্গিস জাহানের হাতে দিয়ে রান্না ঘরে চলে যায়। তার কান্না থামতে চায় না।

নার্গিস জাহান, গেটের সামনে এসে দাঁড়ান। গলির মধ্যে অজস্র রিকশা। লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। এগোতে পারছে না। শহরটা এখন এমনই। সাঁই সাঁই ছুটে চলার গতি হারিয়েছে। তিনি রিকশা পাশ কাটিয়ে সামনে এগোতে থাকেন। বড়ো রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজেকে খতিয়ে দেখার বাসনা তার মধ্যে এখন খুবই প্রবল। গলির মুখে এসে দেখলেন সেখানেও যানজট। তিনি ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থাকেন। বুঝতে পারেন নিজের বুকের ভেতরে তোলপাড়। সম্পর্কের যানজটে এই অচেনা শহরের একজন অচেনা মানুষ তিনি। নিজেই নিজেকে চিনতে পারেন না। চেনার সূত্রগুলো হারিয়ে তিনি এখন একজন বোকা মানুষ।

দেখতে পান বাড়িগুলো এগোচ্ছে। ভাবেন, প্রত্যেকেরই একটা ঘর আছে।

সেই ঘরে সবাইকে ফিরতে হয়। মৃদু হাসিতে তিনি রাস্তার গতি অনুভব করেন।

ইঁদুর এবং একটি আত্মহত্যা

হাসানুল মতিন

ইঁদুরের উৎপাত বেড়ে গেছে আমাদের একতলা বাসায়। দিন নেই, রাত নেই, ইঁদুরগুলো এটা ফেলে দেয়; ওটা ফেলে দেয়; কেটে ফেলে বই! দলিলপত্র, পুরোনো যত হিসাব-নিকাশের কাগজ! হিস হিস করে দৌড়ে যায় এ ঘর থেকে সে ঘরে। খাটের তলায় কিংবা বইএর আলমারিতে!

আমার মা ভীষণ বিরক্ত! আরো বিরক্ত আমার বোন, লতা! লতা প্রসঙ্গে প্রথমেই বলে রাখা দরকার—ও আমার বড়বোন। প্রায় সাতবছর আগে তার বিয়ে হয়। দুলাভাই আমেরিকায় গেছেন ৬ বছর হলো। টেলিফোনে, ইমেলে যোগাযোগ হয়, কিন্তু ওয়ার্ক পারমিট, গ্রীন কার্ড বা সিটিজেনশীপ কোনোটাই পাচ্ছেন না বলে দেশে আসতে পারছেন না। নিতেও পারছেন না আপুকে। লতা আপুর কাছে লেখা দুলাভাই-এর বিয়ের পূর্বকালের চিঠিগুলো ইঁদুরের দাঁতের তলায় পড়ে যখন কুটি কুটি তখন থেকে লতা আপু বিরক্ত হচ্ছেন। তবে লতা আপুর ছেলে পলিন ইঁদুর নিয়ে মোটেও বিরক্ত নয়। প্রতিদিনই একটা ইঁদুরের বাচ্ছা ধরে তার লেজে রশি বেঁধে খেলে। রশিটা লুজ দিলে ইঁদুরটা কয়েকপা এগিয়ে যায়। আবার রশি টেনে ধরলে আর যেতে পারে না।

ইঁদুরের নয় পলিনের আনন্দ চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায় আমার। আমি বিছানা থেকে তাকিয়ে দেখি, পলিন ইঁদুরটিকে নিয়ে খেলছে। একবার লুজ দিলে সে দৌড় দেয়; আবার টেনে ধরলেই থেমে যায় তার চলার পথ। আমার মতো পূর্ণবয়স্ক দর্শক পেয়ে পলিনেবও আনন্দের মাত্রা বেড়ে গেলো।

আমি ইঁদুরটিকে ছেড়ে দিতে বললে, সে একই সঙ্গে অবাক ও বিস্মিত হয়। তার মুখ ভেজা সাদা টিস্যু পেপারের মতো হয়ে যায়। আর সেই মানসিক অনুপস্থিতি টের পেয়ে ইঁদুরটা পালায়, আমার খটের তলায়। কিছুই বুঝতে পারে না? কী হয়ে গেলো কয়েক মুহূর্তেই। আমি প্রসঙ্গ বদলাতে তাকে জিজ্ঞাসা করি, তোব দাঁত দিয়েছিলি ইঁদুরের গর্তে?

—না।

পলিন কথাটি বলেই হেসে ফেলল। সুন্দর কবে সাজানো, শাদা দাঁতের লাল মাড়িও যেন দেখা গেলো।

—শোন, এর পরের দাঁতটি পড়লে সেটা ইঁদুরের কাছে দেবে। তাহলে ইঁদুরের মতো শক্ত দাঁত হবে।

—আচ্ছা মামা, ইঁদুরকে পাবো কোথায়?

—কেন, আমার খাটের তলায় রেখে দিবি। তাহলে ইঁদুর এলে খেয়ে যাবে, আর তোর জন্য দোয়া করবে।

পলিন খানিকটা কী যেন চিন্তা করে। তারপরে বলে, আচ্ছা মামা, যাদের বাড়িতে ইঁদুর নেই, তারা দাঁত কী করে?

পলিন এমন প্রশ্ন করতে পারে, তা মোটেও ভাবিনি। তার জন্য অপ্রস্তুত হয়ে যাই। খানিকটা চিন্তা করে বলি, তারা দাঁত জমিয়ে রাখে আর একদিন চিড়িয়াখানায় গিয়ে ইঁদুরের খাঁচায় দাঁতগুলো দিয়ে আসে।

আবার কী জিজ্ঞাসা করে, তার চেয়ে পলিনকে বলি, মামা শোনো। দেখো তো সকালের নাস্তা রেডি কিনা?

—হ্যাঁ। সেই কখন থেকে রেডি।

পলিনকে রেখে আমি দ্রুত বিছানা থেকে নামি। দেয়ালের ঘড়িতে তাকিয়ে দেখি সকাল ১১টা বাজে। তারপর ব্রাশ নিয়ে পেস্ট লাগিয়ে দাঁতব্রাশ করতে করতে হঠাৎ আয়নায় চোখ পড়ে। আয়নায় দেখি আমার গালের নীচে রক্ত জমে আছে। তা দেখে গতরাতের কথা মনে পড়ে যায়। আমাদের একটি বাসার পরের বাসায় সোমারা তাকে। সোমার বড়বোন রুমার আজ গায়ে হলুদ। গতরাতে তাই আমাকে ডেকে নিয়েছিলো হলুদের স্টেজ, স্টেজের সম্মুখে আল্পনা আর সিঁড়িতে আল্পনা আঁকার জন্য।

তিনতলা বাসার ছাদে হলুদের জন্য স্টেজ বানানো হয়। তারপাশে শিকায় ঝুলিয়ে দেওয়া হয় মাটির বিভিন্ন পটারি। সামনের মেঝেতে আলপনা আঁকার সময় সোমা আসে। মেয়েটা আমারই সমবয়সি। আমি চারুকলায় ঢুকলাম আর সোমা ঢুকলো সোসিওলজিতে। ভার্সিটির বাসে যাওয়া আসা, পাশাপাশি বাসা হবার কারনে আমাদের মাঝে এতদিন ছিলো নির্মল বন্ধুত্ব। হঠাৎ করে রাত আড়াইটার দিকে সে আসে ছাদে; ফ্লাস্কে চা নিয়ে। আকাশে চাঁদ ছিলো। কিন্তু সোমা আসার পরই যেন মেঘে ঢেকে যায় তার মুখ। কোনকারণ ছাড়াই এতো রাতে ঘটে লোডশেডিং। আকাশ জুড়ে কেবল তারা আর তারা। নক্ষত্র আর নক্ষত্র! আমি রঙের কৌটায় রঙের ব্রাশ, তুলি গুছিয়ে গিয়ে বসি সোমার পাশে। এর আগেও বসেছি সোমার পাশে, কিন্তু কখনোই গতরাতের মতো মনে হয়নি।

—তুমিও এলে আর বিদ্যুতও গেলো চলে, এর মানে কী!

—কী আবার! অবসর! চা এনেছি, খাও।

—শুধু চা খাবো?

তো, আর কী খেতে ইচ্ছে করে?

কথাটা বলেই, সোমা আমার মুখ চেপে ধরে। যাতে অশ্লীল কোনো কথা বলতে না পারি।

—অসভ্য কথা বলবে না।

—আচ্ছা বলবো না।

সোমা ফ্লাস্কের কাপে চা ঢালতে থাকে। আমি তখন জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা তুমি কি বলতে পারো, দুজনের মুখ একসঙ্গে একটি জিনিস খায়, সেটা কী?

সোমা চা ঢেলে কাপটা আমার দিকে দিয়ে বলে, জানি না।

আমি বিজ্ঞের মতো বলি, দুজন মানুষ একসঙ্গে 'চুমু' খেতে পারে। আর কিছু নয়!

সোমা হাত তুলে আমাকে থাপ্পড় মারে আর বলে, অসভ্যতা কেন করছো?

সোমার শাড়ির খস খস আওয়াজ, চুড়ির রিনরিনে শব্দ আমার গালে থাপ্পড় মারা, আকাশের সহস্র তারা আর ছাদের নির্জন পরিবেশ আমাদের দুজনকে মুহূর্তেই পৃথিবী থেকে আলাদা করে ফেলেছিল।

প্রসঙ্গ বদলানোর জন্য সোমা বলে—আজকের রাতটা রুমা আপুর জন্য অন্যরকম রাত। তাই না?

—হ্যাঁ। ঠিকই বলেছো। বলতে পারো, কুমারী জীবনের শেষ রাত।

আজকের রাতটা আমাদের জীবনেরও তো অন্যরকম রাত হতে পারে।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে সোমা আরো একটা থাপ্পড় মারে আমার শরীরে। আমি তখন বলি, তুমি ডাঃ কস্টার এর নাম শোনে নি। সে বলেছিলো, ও সুইট হেলেন, গিভ মি এ কিস এন্ড মেক মি ইম্মোর্টাল। ও হেলেন আমাকে একটি চুমু দিয়ে আমাকে অমর করে দাও!

অন্তত আজকের রাতে তুমি আমাকে একটা চুমু দিতে পারো। তুমি এনি ফ্লাস্কের ডায়েরি পড়োনি! একটা চুমু তার বন্দী জীবনে যুগিয়ে ছিলো বাঁচবার আশা। সোমা, তুমি কি আমাকে একটা চুমু দিতে পারো না।

সোমা আস্তে আস্তে মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে বুঝতে পারছি। আমি তাকে কাছে টেনে আনি। তার আঙুলগুলি নিয়ে খেলা করি। তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে গভীর চুমু দেবার পর শ্যামাঙ্গী তনু দেহের সোমা যেন অবিন্যস্ত হয়ে যায়। আমি হয়ে যাই তার খেলার পুতুল।

হঠাৎ বিদ্যুত আলোতে সোমা যেন লজ্জা পায়। সে তার পরিধেয় বস্ত্রাদি ঠিক করতে করতে চলে যায়। আমি কোনোরকমে অবশিষ্টাংশ অঙ্কন সম্পন্ন করে ফিরে ঘুমাই।

গলা পর্যন্ত শেভিং স্ক্রীম নিয়ে গতরাতের চুম্বনচিহ্ন নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করি। কিন্তু পারিনা! কেউ দেখে ফেলে কিনা এই আশঙ্কায় গলায় মাফলার জড়িয়ে নাস্তার টেবিলে আসি। দেখি, কাজের মেয়ে সখিনা ঠোঁট টিপে টিপে হাসছে। তারদিকে তাকাতে চাই না। তবু চোখ চলে যায় ওর দিকে। সে যেন

ঠাট্টা করছে, ভাইজান কি গলায় ঠাণ্ডা লাগাইছেন? গরম পানি দিতাম?

আমি কঠিন স্বরে বলি, না। তুই এখান থেকে যা।

সখিনা চলে গেলো। কিন্তু অঙ্গভঙ্গি, মুখ, সব যেন কেমন হাসি, হাসি। আমার মনে বিদ্রুপাত্মক আঘাত করছে।

এমন সময় লতা আপু এসে বলে, দ্যাখতো, ইঁদুরের যন্ত্রণায় আর পারলাম না। আমাদের বিয়ের কাবিননামাটা কেটে কী করেছে দ্যাখ!

আমি দেখলাম, একটা কাবিননামা মাঝে মাঝে গোলকরে কাটা। ভাঁজ করে রেখেছিলো। গোলকরে কেটেছে। আমি নিজের ভেতরকার উৎকণ্ঠা দূর করার জন্য বললাম, বাহ! ভালো তো! নান্দনিকভাবে কেটেছে তো! রুচিশীল শিল্পকর্ম!

লতা আপু রেগে যায়!

—কী বললি! তুই জানিস, এটা তোর দুলাভাই আর আমার বিয়ের কাবিননামা!

—তাতে হয়েছে কি?

—তাতে হয়েছে কি, মানে?

—একটা কেটেছে, আরেকটা নকল এনে রেখে দিলেই হলো! এটা নিয়ে চিন্তার কিছু আছে?

এমন সময় সখিনা আবার আসে। সে উৎসাহের সঙ্গে বলেন, আপা জানেন, গতরাতে ভাইজানে ছাদে কী করেছে, আমি...

আমি সখিনাকে বলতে দেইনা। থামিয়ে দিয়ে বলি, তুই যা তো... আমার চোখের সামনে থেকে। আর একবার এলে সত্যিই মার দেবো।

সখিনা চলে যায় বটে, কিন্তু আমার মনে অনুরণন ঘটতে থাকে! ওকি দেখেছে আমার আর সোমার সেই মুহূর্তকাল?

এর মধ্যে বড় আপু বলে, ইঁদুর মারা বিষ কিনে এনে দিস।

কোনোরকমে নাস্তা শেষ করে আমি বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ি। একটু হাঁটলেই গলির শুরুর দিকে কয়েকটা মনোহরি দোকান। সেখান থেকে ল্যানির‍্যাটসহ আরো চার ধরনের দেশীয় ইঁদুর মারার বিষ নিলাম।

প্রত্যেকটাই ভাতের সাথে মিশিয়ে ফেলে রেখে দিতে হবে। ইঁদুর খাবার তিন-চার ঘণ্টা পর মারা যাবে।

আমি ইঁদুর মারার বিষ এনে দিলাম সখিনার হাতে। সখিনা বিষগুলো হাতে নিতে নিতে আবার বলল, ভাইজান, গতরাতে আমি সোমা আপুদের বাসার ছাদে...

হঠাৎ করে আমি যেন পশু হয়ে যাই। ওর মুখ চেপে ধরে বলি, সখিনা, কেউ যদি ঘটনাটা জানতে পারে, তোরে শেষ করে ফেলবো!

ঘটনার আকস্মিকতায় সখিনাও অবাক হয়ে যায়। সখিনা, অনাথ একটা

মেয়ে, আমাদের দূর-সম্পর্কের বোন। তাকে আমাদের বাসার সবাই আদর করে, স্নেহ করে। আমিও ওকে স্নেহই করি। উঠতি বয়স। সারাক্ষণ টিভি দেখার পোকা। পলিনকে নিয়ে খেলা করে। আবার বাসার সব কাজ করে। মায়ের ফরমাশ খাটে!

এরপর আমি চলে যাই সোমাদের বাসায়।

বিকেলের দিকে বাসা থেকে আমার কাছে মোবাইল আসে। 'সখিনা ইঁদুর মারার বিষ খেয়েছে।'

কথাটা আমার কানে বজ্রপাতের মতো আঘাত করে। দিকচিহ্ন ভোলা নাবিকের মতো কী করবো বুঝতে পারিনা। দ্রুত নিজের বাসায় এসে দেখি, মা কাঁদছে। কাঁদছে লতা আপু। সামনে শুয়ে আছে সখিনা। বিছানার চাদর দিয়ে সমস্ত শরীর ঢাকা!

আমি ঘরে ঢুকতেই মা চিরকুটটা এগিয়ে দিলেন।

'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। এ বড়ির লোকদের এত ভালোবাসা আমি রাখতে অক্ষম! আমাকে যেন হাসপাতালে না নেয়া হয়।'

এরপরের ঘটনাগুলো খুব দ্রুত ঘটে। আমি একটা মাঝারি সাইজের ট্রাক ভাড়া করে আনি। সখিনাদের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাবো। মোবাইলে ওর পরিচিতজনদের খবর দেয়া হয়েছে।

যখন রুমা আপুকে তার বর নিয়ে যাচ্ছেন তার বাড়িতে সেই একই সময়ে আমি রওনা দিলাম ট্রাকে, সখিনার লাশ নিয়ে; অথচ আকাশে তখন একই রাত্রির সব তারা জ্বলছে জ্বলজ্বল করে।